পশ্চিমা মিডিয়ার স্বরূপ

নজরুল হাফীজ নদভী

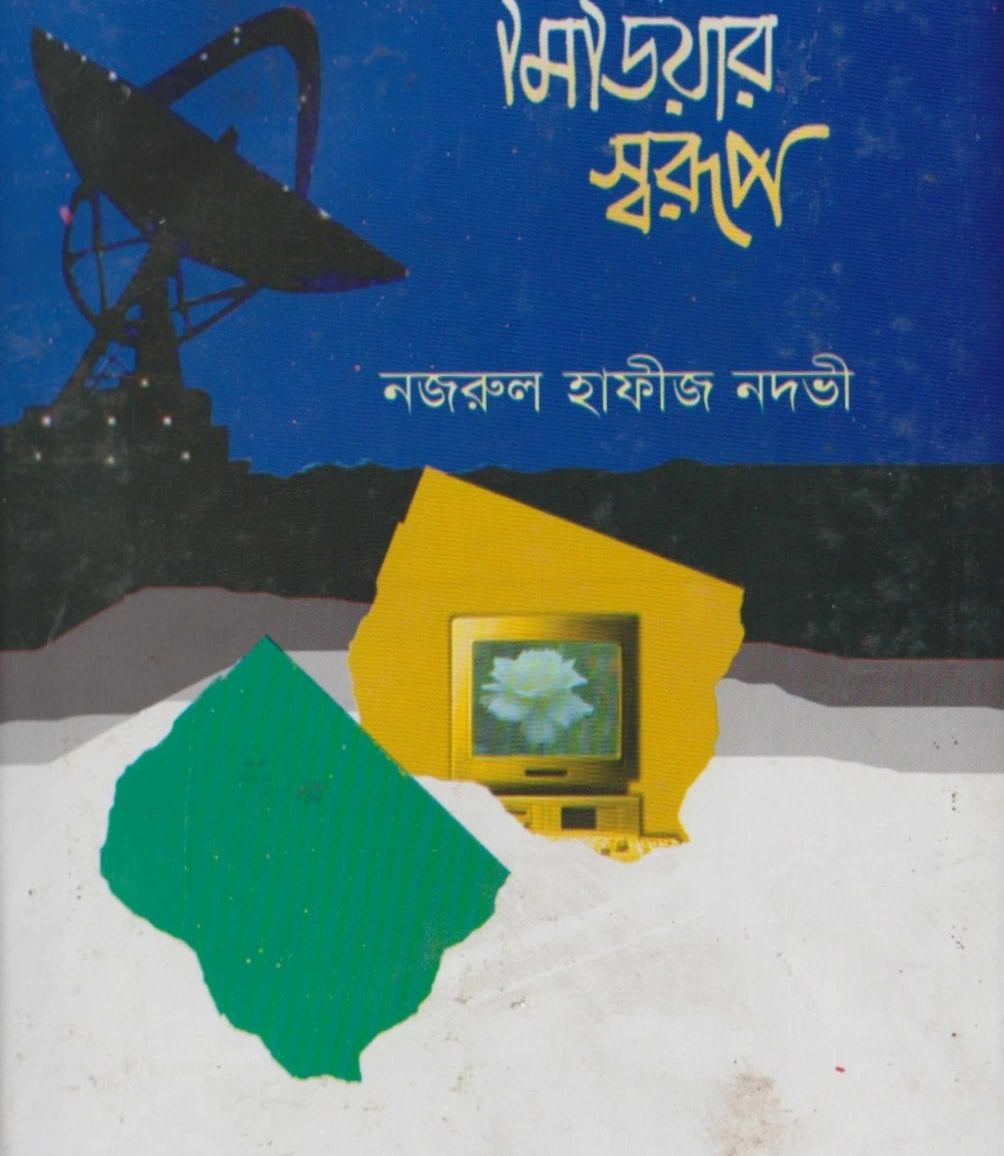

পশ্চিমা মিডিয়ার স্বরূপ

মূল

নজরুল হাফীজ নদভী

শহীদুল ইসলাম ফারুকী

অনূদিত

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ ❑ মার্চ ২০০৯

পশ্চিমা মিডিয়ার স্বরূপ ❑ মূল : নজরুল হাফীজ নদভী
শহীদুল ইসলাম ফারুকী (অনূদিত)

প্রকাশক ❑ মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ৫০ বাংলাবাজার
পাঠক বন্ধু মার্কেট, ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১১১৯৯৩, স্বত্ব ❑ লেখক
কম্পিউটার সেটিং ❑ বাড কম্প্রিন্ট, প্রচ্ছদ ❑ সালসাবীল
মুদ্রণে ❑ বরাত প্রিন্টার্স, ১৯/এ, জয় চন্দ্র ঘোষ লেন
প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য ❑ ২০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN-984-839-166-05

www.pathagar.com

অর্পণ

সেসব লেখক-সাংবাদিকের উদ্দেশে,
যাঁরা ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে তাঁদের
ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের
বিষদাঁত উপড়ে ফেলা ও ইসলামের
পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে আপোসহীন
সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার লাখো কোটি শোকর, তিনি মানবজাতির জন্য ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের সকল মানুষের জন্য শান্তি ও মুক্তির একমাত্র দীন ও জীবনব্যবস্থা। বিশ্বনিয়ন্তা রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে। প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা সৃষ্টি এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্ব আঞ্জাম দানের জন্য তাদের দিয়েছেন তাঁর পবিত্র কিতাব-আল-কুরআন; আর তাদের হেদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে, যাঁর আজীবনের মিশন ছিল ইসলামকে সকল মতাদর্শের ওপর বিজয়ী করা।

বর্তমান বিশ্বব্যাপী মুসলিম নির্যাতনের মূল হাতিয়ার মিডিয়া। মিডিয়ার সহযোগিতায় নিরীহ নিরপরাধ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। পরাশক্তিগুলোকে বিভিন্ন ইস্যুতে উত্তেজিত করা হচ্ছে। মিডিয়াগুলো শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতেই উসকে দেয় না; বরং যুদ্ধ শেষে যুদ্ধের বৈধতা প্রমাণ করতে মিডিয়াই সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। একটি মুসলিম দেশ ধ্বংস হলে পরবর্তী মুসলিম দেশ ধ্বংস করার অভিযান শুরু করে। আফগানিস্তানের পর ইরাক, ইরাকের পর ইরান, এভাবেই চলবে একের পর এক মুসলিম দেশ ধ্বংসের তান্ডব। ইহুদী নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া যা চাচ্ছে তা-ই হচ্ছে। ইহুদীরা বিশ্বের সকল মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য, ইসলামের আলো নিভানোর জন্য মিডিয়া আগ্রাসন চালাচ্ছে। আর এতে সহযোগিতা করছে মুসলিম বিশ্বের মুসলিম নামধারী কিছু ইসলামবিরোধী লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী।

মিডিয়া মানে গণমাধ্যম। বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশন সবই গণমাধ্যম। অর্থাৎ যাকে অবলম্বন করে কোন তথ্য, ধারণা, শিক্ষা ও বিনোদন ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছানো হয়, তা-ই মিডিয়া। আগ্রাসন মানে বিনা উস্কানিতে বৈরী আচরণ, বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ, হামলা, বিবাদ বা যুদ্ধের সূত্রপাত ইত্যাদি। মিডিয়া আগ্রাসন বলতে আমরা বুঝি, মিডিয়ার সহায়তায় মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া, উসকানিমূলক তথ্য-বক্তব্য পরিবেশনের মাধ্যমে কোন দেশ, জাতি বা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূত্রপাত করা। এ আক্রমণ, এ যুদ্ধ হতে পারে যে কোন ধরনের মিডিয়ার মাধ্যমে। হতে পারে রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে, হতে পারে কোন জাতির চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধ-পরিপন্থী অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে, হতে পারে চলচ্চিত্র, নাটক ও আবৃত্তির মাধ্যমে, হতে পারে সভা-সেমিনারে মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে, হতে পারে বিজ্ঞাপন, সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং হতে পারে তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে। মিডিয়া আগ্রাসনের মাধ্যমেই কোন দেশ, জাতি, ধর্ম ও গোষ্ঠীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ধ্বংস ত্বরান্বিত করা যায়।

www.pathagar.com

অসত্য, বিকৃত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিকে জনগণের ধ্যান-ধারণা, অনুভূতি ও কার্যাবলীকে পরিচালিত করা এবং ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করার নাম প্রোপাগান্ডা, আর মিডিয়া আগ্রাসনকে আমরা বলতে পারি প্রোপাগান্ডার চূড়ান্ত পর্যায়।

বিশ্বের অধিকাংশ মিডিয়া ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে। আর ইহুদীরা মুসলমানদের আজন্ম শত্রু। সেই ভিত্তিতে আজ বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্ ইহুদী মিডিয়ার নির্মম আগ্রাসনের শিকার। তথ্য সন্ত্রাসীরা ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী শরীয়ত, ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে আদা-জল খেয়ে লেগেছে। কোথাও ইসলামের গন্ধ পেলেই মৌলবাদ আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠে পশ্চিমা মিডিয়াগুলো। ইসলামী আদর্শ বিলীন করে মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতাহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেছে ওরা। 'সভ্যতার দ্বন্দ্ব' তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে সরাসরি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিরুদ্ধে।

মার্কিন রাষ্ট্রশক্তি ও ইহুদী মস্তিষ্ক দুটো একযোগে ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহকে নির্মূল করার জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়ে ময়দানে আবির্ভূত হয়েছে। একদিকে সামরিক শক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের গণহত্যা, অপরদিকে বিশ্বায়নের নামে মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকে নির্মূল করার নিরন্তর অপপ্রয়াস চলছে। আর অর্থনৈতিক যাঁতাকলে তো বহু পূর্ব থেকেই ইসলামী বিশ্বকে নিষ্পেষণ করা হচ্ছে।

বর্তমানে ইসলামী বিশ্বের যে পরিস্থিতি, তা এদিক দিয়ে অত্যন্ত সঙ্গীন যে, সরাসরি ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ভয়াবহ আগ্রাসন চলছে। এই সর্বগ্রাসী আগ্রাসনে ইসলামী বিশ্ব শুধু বস্তুগত ও মানবিক দিক দিয়েই চরম ক্ষতিগ্রস্ত নয়; বরং তাদেরকে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আকীদা-বিশ্বাস থেকেও দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে; বরং শত্রুই বানিয়ে দেয়া হচ্ছে। বস্তু-সম্পদ, আকীদা-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভাষা-সাহিত্য সর্বদিক দিয়ে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে। ডিশ এন্টিনা ও ইন্টারনেট মুসলমানদেরকে তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বানিয়ে দিচ্ছে। অপরদিকে সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈচিত্র ও স্বাতন্ত্র্য নির্মূল করে একটি আন্ত র্জাতিক সভ্যতা তথা মার্কিন সভ্যতাকে গোটা মানব সমাজের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে শুধু মুসলিম উম্মাহই নয়; বরং প্রতিটি দেশ ও জাতিগোষ্ঠী তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে। ইহুদী নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াগুলোর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হচ্ছে, যেসব দেশ ও জাতিগোষ্ঠী এই আন্তর্জাতিক তথা মার্কিন সভ্যতা গ্রহণ করতে কোনোভাবে অস্বীকার করবে, তাদের গোটা বিশ্ব থেকে আলাদা ও কোণঠাঁসা করে দেয়া হবে। অপরদিকে সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আমেরিকা মিডিয়ার শক্তির মাধ্যমে বিজয়ের পরিধি বিস্তৃত করে চলেছে। যেমন উপসাগরীয় যুদ্ধের সফল অভিজ্ঞতা আমেরিকার সাহস হিম্মত আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সে ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডার তথা বিশ্বব্যবস্থার স্থলে গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের পরিভাষা ব্যবহার করে বিজয়ের পরিধি আরো বিস্তৃত করছে। ইরাক-ইরান যুদ্ধের পর আমেরিকা আরবদের

www.pathagar.com

সাথে যুদ্ধ করার যে পরিকল্পনা ও নীল নকশা তৈরি করেছে, সে ক্ষেত্রে সে মিডিয়াকে 'অগ্রগামী সেনাবাহিনী' হিসেবে ব্যবহার করছে।

বর্তমান যুগকে আমরা মিডিয়ার যুগ বলতে পারি। এ যুগে সমরাস্ত্র ও সেনাবাহিনীর মাধ্যমে মানুষ হত্যার পরিবর্তে মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। এটাকে আমরা সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক লড়াই বলতে পারি, বলতে পারি স্নায়ুযুদ্ধ। এ যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরি করে সংবাদপত্র, রেডিও ও টিভি বিশেষজ্ঞরা। আর সামরিক যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরি করে সমর বিশেষজ্ঞরা। বর্তমান বিশ্বে সে-ই বিজয়ী ও প্রবল, যার প্রোপাগান্ডার পাল্লা ভারী। এ সুদূরপ্রসারী চিন্তার ভিত্তিতেই ইহুদী জাতি যুগের পর যুগ ধরে সুপরিকল্পিতভাবে মিডিয়া জগতের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। আমেরিকার ঘাড়ে জেঁকে বসে আজ তারা মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা বিশ্ব শাসন করছে। বিশেষ করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে নির্মূল করার জন্য তারা বিশ্বব্যাপী মিডিয়ার মাধ্যমে নয়া ক্রুসেডের সূচনা করেছে। এই ক্রুসেডের অংশ হিসেবে তারা নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে হামলার নাটক মঞ্চস্থ করেছে। আর এর দোষ চাপিয়েছে উসামা বিন লাদেন তথা মুসলমানদের ঘাড়ে। অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ, গবেষক ও সাংবাদিক বাস্তবতার আলোকে বার বার একথা বলেছেন, ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার জন্য যে অসাধারণ দক্ষতা, উপকরণ ও মস্তিষ্ক দরকার, উসামা বিন লাদেন ও আল কায়দার নিকট তা নেই, কিন্তু এ চিৎকার নীরব-নিভৃত মরু সাহারায় অসহায়ের রোদন ছাড়া আর কিছুই সাব্যস্ত হয়নি।

একদল ফরাসী ও মার্কিন গবেষক শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে এমন কিছু মজবুত দলীল-প্রমাণ একত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন, যা দ্বারা আলোকিত দিবসের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্মরণকালের এই ভয়াবহ হামলার পেছনে আর কারো নয়, খোদ মার্কিনী ও ইহুদীদেরই হাত রয়েছে। ৭৫ জন মার্কিন গবেষক, চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীর বক্তৃতা এবং আলোচনার আলোকে চূড়ান্তভাবে একথা প্রমাণিত হয়, এই নাটক হোয়াইট হাউসেরই সাজানো। আমেরিকার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ৭৫ জন প্রফেসর পাঁচ বছরের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পর যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনা এমন একটি ষড়যন্ত্র, যা সংঘটনে গোঁড়া মার্কিন রাজনীতিক, শাসক ও প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন সরাসরি জড়িত, কিন্তু ইহুদী নিয়ন্ত্রিত পাশ্চাত্য মিডিয়া এ ধরনের কোন বক্তব্য-বিবৃতি, দলীল-প্রমাণ ও তথ্য-গবেষণা বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ হতে দেয়নি। এই হামলার উদ্দেশ্য প্রথমে আফগানিস্তান, অতঃপর ইরাক, সর্বশেষ ইরানের ওপর হামলার বৈধতা সরবরাহ করা, যাতে সহজেই ইসলামী বিশ্বকে দখল করা যায়।

এই হামলার পর পাশ্চাত্যের সকল মিডিয়া মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে এবং মার্কিন সরকার আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে অব্যাহত প্রচার-প্রোপাগান্ডা শুরু করে দেয়। যে বা যারাই ইহুদী লবির এই ভয়ানক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস করেছে, পশ্চিমা মিডিয়া তার বিরুদ্ধেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে; বরং অসাধারণ দ্রুততার সাথে বুশ প্রশাসনের সকল মেশিনারী তার মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে গলা টিপে হত্যা

www.pathagar.com

করেছে। এত শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমা মিডিয়া সেই একই রাগিনী অব্যাহত রেখেছে যে, নাইন ইলেভেনের পেছনে আল কায়দা ও তার নেতা উসামা বিন লাদেনের হাত রয়েছে। এই সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা মিডিয়া রাতকে দিন এবং দিনকে রাত বানাচ্ছে।

অভিশপ্ত ইহুদীরা আমেরিকার বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র খ্যাত টুইন টাওয়ারে পরিকল্পিত হামলার মধ্য দিয়ে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে এক নয়া ক্রুসেডের সূচনা করেছে। এই নয়া ক্রুসেডের নিয়ামক শক্তি হলো পশ্চিমা মিডিয়া। আর এসব বিষয়েই চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে। বর্তমানে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে ক্রুসেড চলছে এবং মুসলমানদের জবাই করার জন্য পাশ্চাত্য যে পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তার সর্বশেষ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ গ্রন্থে। গ্রন্থটি ভারত, পাকিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। একটি ভূমিকা ও দশটি অধ্যায়ের বিশাল পরিসর জুড়ে সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি, বিশ্বব্যাপী পশ্চিমা মিডিয়ার ভয়াবহ ধ্বংসলীলা এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে চলমান ক্রুসেড সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এতে। আশা করি গ্রন্থটি এ বিষয়ে একটি 'রেফারেন্স বুক' হিসেবে বিবেচিত হবে। গ্রন্থটির লেখক এশিয়ার বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ ভারতের দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার উস্তাদ মাওলানা নজরুল হাফীজ নদভী আযহারী। মাত্র কয়েক বছরে 'মাগরেবী মিডিয়া আওর উছকে আছারাত' নামক মূল উর্দূ গ্রন্থটির পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। আরবী, ইংরেজী ও হিন্দীসহ বেশ কয়েকটি ভাষায় ইতোমধ্যেই গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকায় তিনি আমাকে গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আরো আগেই অনুবাদ হওয়া দরকার ছিল, কিন্তু ব্যস্ততার কারণে দেরি হয়ে গেছে। দেরিতে হলেও অনুবাদ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এজন্য আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করছি। বাংলাদেশে গ্রন্থটির সবচেয়ে বেশি মূল্য ও মর্ম যিনি অনুধাবন করেছেন তিনি হলেন বিশ্ববরেণ্য চিন্তাশীল আলেমে দীন, মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (দা. বা.)। খান সাহেব হুজুর বেশ কয়েক বছর যাবত গ্রন্থটির অনুবাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিলেন। এজন্য তিনি অনেকজনকে এ ব্যাপারে নির্দেশনাও দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আমার দ্বারা করিয়েছেন, এজন্য তাঁর শোকর আদায় করছি–আলহামদু লিল্লাহ। এর প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকেই আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। গ্রন্থটি প্রকাশে খুব তাড়াহুড়া হয়ে যাওয়ার কারণে ভুল-ক্রটি থেকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারো দৃষ্টিতে যদি কোন ভুল-ক্রটি ধরা পড়েই যায় তাহলে আমাদের জানালে আমরা পরবর্তীতে তা শুধরে নেবার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। গ্রন্থটি পাঠ করে একজন পাঠকও যদি দিশা খুঁজে পান তাহলেই আমার এ প্রয়াস সার্থক হবে। আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটিকে কবুল করে নিন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

দু'আ প্রার্থী
শহীদুল ইসলাম ফারুকী
১০/ডি, ২৯/৩, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
০১৭১৫-৮৪০৮৬০

www.pathagar.com

মূল লেখকের অনুমতিপত্র

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

پیش لفظ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، امابعد

یہ معلوم کر کے دلی مسرت ہوئی کہ مغربی میڈیا اور اس کے اثرات کا ترجمہ عزیز القدر مولوی شہید الاسلام نے بنگالی زبان میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔

مغربی میڈیا اور اس کے اثرات کا اردو ایڈیشن چھ ماہ میں ختم ہو گیا، تو دوسرا اور تیسرا ایڈیشن بھی ایک سال کے اندر ختم ہو گیا، اس کے ساتھ غیر قانونی طور سے تین ایڈیشن شائع کر کے ناشروں نے اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کیا، پھر ایک سال قبل کتاب نظر ثانی اور اہم اضافوں کے بعد شائع ہوئی اس کے ساتھ انگریزی اور عربی کے ساتھ ہندی میں بھی کتاب کا ترجمہ ہوا، انگریزی ایڈیشن نے بھی قبولیت حاصل کی، اب اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بنگال ایڈیشن بھی مقبول ہوگا۔

یہ کتاب وقت کا سب سے بڑا تقاضا پورا کرتی ہے، اسلامی دنیا میں مؤثر اور طاقتور ذرائع ابلاغ کا زبردست خلا ہے، حالانکہ مادی وسائل سے ہم مالا مال ہیں۔

ایسے تو مغربی میڈیا کے شکار تمام اسلامی ممالک ہیں لیکن بنگلہ دیش ان کا خاص نشانہ ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمارے بنگالی نوجوان کا شعور اس کتاب کو پڑھ کر بیدار ہوگا، ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک اور مخلص بندے مؤثر اور طاقتور ذرائع ابلاغ کا ہتھیار مغرب کے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھائیں گے اور ترکی میں جس طرح اس خلا کو پُر کیا گیا ہے اسی طرح یہاں بھی جدید ترین ہتھیار سے اسلام اور امت مسلمہ کی ہی نہیں پوری انسانیت کی خدمت کا کام لیا جائے گا، بنگلہ دیش کی صرف زمین میں سونا نہیں اگلتی اس کی سرزمین اہل خیر اور غیرت مندوں سے بھری ہوئی ہے اسی وجہ سے یہ ملک تمام سازشوں کے مقابلہ میں جما ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، آمین۔

آخر میں مترجم اور ناشر دونوں کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ ان کی مخلصانہ جدو جہد سے یہ کتاب منظر عام پر آئی۔

والسلام دعا گو

(نذر الحفیظ ندوی)

www.pathagar.com

অনুমতিপত্রের অনুবাদ

হামদ ও সালাত অন্তে বক্তব্য এই, এটা শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম যে, প্রিয়ভাজন মাওলানা শহীদুল ইসলাম ফারুকী উর্দূ ভাষায় লিখিত আমার বই 'মাগরেবী মিডিয়া আওর উছকে আছারাত'-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন। (বইটির বাংলা নাম হলো 'পশ্চিমা মিডিয়ার স্বরূপ')। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে কবুল করুন। আমীন।

'মাগরেবী মিডিয়া আওর উছকে আছারাত'-এর উর্দূ প্রথম সংস্করণ মাত্র ছয় মাসেই শেষ হয়ে যায়। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণও মাত্র এক বছরেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এছাড়া বইটির বিপুল চাহিদা দেখে কয়েকজন প্রকাশক বেআইনীভাবে এর তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করে তাদের ব্যাংক ব্যালেন্সে প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। দীর্ঘদিন পর এক বছর পূর্বে গ্রন্থটি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিমার্জন, সংযোজন, বিয়োজন ও সম্পাদনার সাথে পুনঃপ্রকাশ লাভ করে। ইতোমধ্যে গ্রন্থের ইংরেজী, আরবী ও হিন্দি অনুবাদও হয়ে গেছে। ইংরেজী সংস্করণ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আল্লাহ্ তাআলার সমীপে প্রত্যাশা এই যে, এর বাংলা অনুবাদও ব্যাপকভাগে জনপ্রিয়তা অর্জন করুক।

এ গ্রন্থটি সময়ের সবচে' বড় দাবী পূরণ করছে। বর্তমানে ইসলামী বিশ্বে শক্তিশালী, কার্যকর মিডিয়া ও গণমাধ্যমের বিরাট শূন্যতা বিরাজ করছে। অথচ বস্তুগত সম্পদে মুসলিম বিশ্ব ভরপুর ও সমৃদ্ধ। পশ্চিমা মিডিয়ার টার্গেট হচ্ছে কমবেশ সকল মুসলিম দেশ। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশেষভাবে এর টার্গেট। গ্রন্থটি পাঠে বাংলা ভাষাভাষী তরুণদের মধ্যে নতুন চেতনা, নতুন জাগরণ সৃষ্টি হবে এটাই আমার ঐকান্তিক প্রত্যাশা। পাশাপাশি এটাও আশা রাখি যে, মুসলিম সমাজে আল্লাহ্ তাআলার যেসব নেক ও নিষ্ঠাবান বান্দা সম্পদশালী রয়েছেন, তারা পাশ্চাত্যের মিডিয়া সন্ত্রাসের মোকাবেলায় শক্তিশালী ও কার্যকর ইসলামী মিডিয়ার অস্ত্র নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হবেন। তুরস্কে যেভাবে এই শূন্যতা পুরণ করা হয়েছে, তেমনি বাংলাদেশেও তাঁরা সর্বাধুনিক মিডিয়া উপকরণে সজ্জিত হয়ে শুধু ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহই নয়, বরং গোটা মানবতাকে রক্ষার সুমহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেন। বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে শুধু স্বর্ণই উৎপন্ন হয় না। তাছড়া জ্ঞানী-গুণী, বিত্তশালী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন প্রচুর লোকের সমাহারও এখানে বিদ্যমান। এ কারণেই দেশটি সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ্ বাংলাদেশকে কবুল করুন। আমীন।

পরিশেষে অনুবাদক ও প্রকাশক উভয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, যাঁদের প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থ পাঠক-পাঠিকার হাতে আসার সুযোগ লাভ করেছে।

www.pathagar.com

মূল গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদু লিল্লাহ, 'মাগরেবী মিডিয়া আওর উসকে আছারাত (পশ্চিমা মিডিয়ার স্বরূপ) শীর্ষক গ্রন্থটি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ও পরিমার্জনের সাথে প্রকাশিত হচ্ছে। সংযোজনের মধ্যে বিবিসি ও অন্যান্য সম্প্রচার সংস্থার রিপোর্টিং পদ্ধতি এবং ১১ সেপ্টেম্বর সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ রয়েছে, তাতে আমেরিকার পঁচাত্তর জন বুদ্ধিজীবীর বরাতে বলা হয়েছে, ১১ সেপ্টেম্বরের নাটক খোদ হোয়াইট হাউসের রচিত, এতদসত্ত্বেও পশ্চিমা মিডিয়া সেই একই পুরাতন রাগিনী অব্যাহত রেখেছে।

গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ করেছেন কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. নযীর আহমদ যরগর। ভারতের বিভিন্ন ইংরেজী দৈনিক ও ম্যাগাজিন গ্রন্থটির দু' দু'টি কপি পেয়েও তার প্রাপ্তি রসিদ দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি। এটি ভারতীয় মিডিয়া যে পূর্ব থেকে আরো জোরেশোরে পশ্চিমা মিডিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ। মুসলমানদের সন্ত্রাসী প্রমাণ করার জন্য নাইন ইলেভেনের নাটক কমবেশি প্রতিটি দেশেই মঞ্চস্থ করা হচ্ছে। তাদের বদনামগ্রস্ত করার জন্য মিথ্যা ও অপবাদের কারখানা খোলা হচ্ছে, যা প্রতিদিন নিত্য নতুন পদ্ধতিতে মার্কিন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। অনুমান করা যাচ্ছে, মুসলমানদের কোনো শ্রেণীই সন্ত্রাসের অপবাদ থেকে বাঁচতে পারবে না। যেমন অস্ট্রেলিয়া ও বৃটেনের ডাক্তারদের সাথে করা হয়েছে। মুসলমানদের বদনাম করার বিভিন্ন সংবাদ ঝাল মরিচ লাগিয়ে মিডিয়া অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করছে, কিন্তু যখন নিরীহ নিষ্পাপ মুসলমানদের সংবাদ আসে তখন পশ্চিমা মিডিয়া মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে।

গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদও হয়ে গেছে। আরবী অনুবাদ করেছেন কাতার প্রবাসী মাওলানা হাসীবুর রহমান নদভী।

গ্রন্থটি যেভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তা একমাত্র মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)-এর দু'আর ফসল।

www.pathagar.com

এটি গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ। এ ছাড়াও এক প্রকাশক লেখকের অনুমতি না নিয়েই গোপনে দু'টি সংস্করণ প্রকাশ করেছে। পাকিস্তানের এক প্রকাশক ছাপার পরও বলেছেন, ছাপাইনি। লাহোরের এক অদেখা বন্ধু ওমর ফারুক দাওয়াতী উদ্দেশে নিজের পক্ষ থেকে এক হাজার কপি ছেপে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও বন্ধু মহলে বিতরণ করেছেন। দু'বছর পূর্বেই গ্রন্থের সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। অসুস্থতাজনিত কারণে নতুন সংযোজন ও পরিমার্জনে বেশ দেরি হয়ে গেল। মহান আল্লাহ্ তাআলার কাছে আশাবাদী তিনি এ সংস্করণও পূর্বের মতো কবুল করবেন এবং এটিকে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির উসিলা বনাবেন। আমীন।

নজরুল হাফীজ নদভী
৯ই রজব, ১৪২৮ হিজরী
২৪ জুলাই, ২০০৭ ঈসায়ী

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিমত ১৯-২৯
লেখকের কথা ৩০-৩৮

ভূমিকা

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার নাটক : ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে নয়া ক্রুসেডের সূচনা ৩৯
১১ই সেপ্টেম্বরের নাটক ৫১
১১ই সেপ্টেম্বরের নাটক খোদ আমেরিকার তৈরি ৫৩
১১ই সেপ্টেম্বরের উদ্দেশ্য ৫৪

প্রথম অধ্যায়

নতুন বিশ্বব্যবস্থা : বৈশিষ্ট্য, উপকরণ ও উদ্দেশ্য

পূর্বাভাস ৬৪
নতুন বিশ্বব্যবস্থা ৬৮
মার্কিন সরকারের সকল সেক্টরে অনুপ্রবেশের পরিকল্পনা ৬৮
বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সূচনা ৭১
বিশ্বের সরকারগুলোর মূল ক্ষমতা জাতিসংঘের নিকট হস্তান্তর করা ৭২
জাতিসংঘকে আন্তর্জাতিক সরকারের মর্যাদাদান ৭৩
নতুন গ্রুপ ৭৫
বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মগজ ধোলাইয়ের সূচনা ৭৫
নতুন বিশ্বব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ৭৮
মানব বসতি ও নৈতিক মূল্যবোধ ৮১
আধুনিক যুগের আন্দোলন ৮৫
নতুন বিশ্বব্যবস্থার অন্তরালে ক্রিয়াশীল সংগঠন-সংস্থাসমূহ ৮৭
লন্ডন ইকোনোমিক্স স্কুল ৮৯
মার্কিন গির্জা সংগঠন ৮৯
পররাষ্ট্র সম্পর্ক কমিটি-(C.F.R) ৮৯
নতুন বিশ্বব্যবস্থা : রূপরেখা ও কর্মপদ্ধতি ৯২
নতুন বিশ্বব্যবস্থার রাজনৈতিক অবকাঠামো ৯২
নতুন বিশ্বব্যবস্থার গোড়াপত্তনে জাতিসংঘের ভূমিকা ৯২
জাতিসংঘের সামরিক শক্তি ৯৪
নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ৯৫

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

পশ্চিমা মিডিয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইহুদী মিডিয়া ও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ৯৭
আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ৯৯
রয়টার্স ৯৯
এসোসিয়েটেড প্রেস ১০০
ইউনাইটেড প্রেস ১০০
ফরাসী নিউজ এজেন্সী ১০১
বৃটিশ সংবাদ মাধ্যম ১০১
মার্কিন মিডিয়া ১০৩
মার্কিন দৈনিক পত্র-পত্রিকা ১০৪
মার্কিন সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্র-পত্রিকা ১০৫
কোম্পানীর বুলেটিন ও প্রচারপত্র ১০৮
প্রসিদ্ধ মার্কিন পত্রিকাসমূহের প্রচার সংখ্যা ১০৯
মার্কিন মিডিয়ার ওপর ইহুদীদের আধিপত্যের দাস্তান ১০৯
মার্কিন মিডিয়া সম্পর্কে খোদ মার্কিনীদের মতামত ১১৫
আন্তর্জাতিক ইহুদী সংবাদ মাধ্যম ১১৫
খৃস্টীয় সমাজ ধ্বংসে ইহুদী মিডিয়ার ভূমিকা ১১৮
খৃস্টবাদ সম্পর্কে ইহুদীদের আকীদা ও সংকল্প ১১৯

তৃতীয় অধ্যায়

মিডিয়ার ভূমিকার ব্যাপারে ইহুদীদের সংকল্প

মিডিয়ার ভূমিকা ১২৩
মিডিয়ার সংজ্ঞা ১২৪
পশ্চিমা মিডিয়ার পলিসি ১২৫
পশ্চিমা নিউজ এজেন্সীগুলোর রিপোর্টিং পদ্ধতি ১২৬
বিবিসি সম্প্রচার সংস্থা : একটি পর্যালোচনা ১৩৪
আফগান সমস্যা ১৩৫
জিহাদবিরোধী মানসিকতা প্রস্তুতকরণ ১৩৭
সাম্প্রদায়িকতা ১৩৮
গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের শ্লোগান ১৩৯
বিবিসির সমসাময়িক অন্যান্য সম্প্রচার সংস্থা ১৪১

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

দুনিয়ার চলচ্চিত্রের পর্দায় মুসলমানদের চিত্র

পশ্চিমা চলচ্চিত্র ১৪২
উড়ন্ত বিড়াল ১৪৮
ধুলোর জাহাজ ১৪৯
পশ্চিমা চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত মুসলমানদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ১৪৯
মুসলমানরা–বিত্তশালী ও বিলাসী ১৫০
মুসলমানরা–সন্ত্রাসী ও বিপর্যয়-বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ১৫০
মুসলমানরা–প্রবৃত্তি ও নফস পূজারী ১৫০
মুসলমানরা–প্রান্তিক ও হাসি-তামাশার পাত্র ১৫১
মুসলমানরা–শয়তান ও নির্মম নির্দয় ১৫২
মুসলমানরা–আগামীর জন্য বিপদ ১৫২
পাশ্চাত্য টিভি কোম্পানীসমূহের মাধ্যমে মুসলমানদের চরিত্র হনন ১৫২

পঞ্চম অধ্যায়

আরব বিশ্বে পশ্চিমা মিডিয়ার আগ্রাসন

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ১৫৬
মিসরী মিডিয়া : একটি জরিপ ও বিশ্লেষণ ১৫৮
দারুল হেলাল ১৬০
মিসরী মিডিয়ার দৃষ্টান্ত ১৬৪
মিসরী টেলিভিশন ১৬৬
মিসরীয় মিডিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ফল ১৬৭
মিসরীয় সমাজে মিডিয়ার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি ১৬৯
কায়রো টেলিভিশন ১৭২
কায়রো রেডিও ১৭২
কুয়েতী মিডিয়া ১৭৪
সৌদি মিডিয়া ১৭৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

পশ্চিমা মিডিয়ার পথ ধরে ভারতীয় মিডিয়া ১৮৩
নগ্নতা অশ্লীলতার প্রসারে ভারতীয় মিডিয়ার ভূমিকা ১৮৪
বিজ্ঞাপনের নমুনা ১৮৮
বিশ্ব সভ্যতায় ভারতের অবস্থান ১৯০
বড়দের পদাঙ্ক অনুসরণে ছোটরা ১৯২

www.pathagar.com

ভারতীয় সমাজে টিভির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ১৯৫
পাকিস্তানী মিডিয়া : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ১৯৯
পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পলিসির কিছু দৃষ্টান্ত ২০১
পাকিস্তানী সমাজে পশ্চিমা মিডিয়ার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ২০৩
পাঞ্জাব প্রদেশের চালচিত্র ২০৪

সপ্তম অধ্যায়

টিভির নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া : একটি পর্যালোচনা ২০৬

অষ্টম অধ্যায়

মিডিয়া বা গণমাধ্যম : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মিডিয়া বা গণমাধ্যম ২১২
মগজ ধোলাই ২১৬
মিডিয়ার চিত্র ২১৬
জনমত ২১৯
যা ভাল ছিল না, ধীরে ধীরে তাই ভাল হয়ে গেছে ২২১
প্রকাশনার বৈশিষ্ট্য ২২৪
শ্রবণ উপকরণ ২২৬
মানব জীবনে রেডিও'র প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ২২৬
দেখার উপকরণ ও মাধ্যম ২২৮
শ্রবণ ও দর্শনের উপকরণ এবং মাধ্যম ২২৯
টিভির সামাজিক ভূমিকা ২৩০
নাটক এবং কিসসা-কাহিনী ২৩০
চলচ্চিত্র ২৩২
ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সম্পর্ক ২৩৩
গুজব ছড়ানো ২৩৪
প্রোপাগান্ডা ও মনস্তাত্ত্বিক লড়াই ২৩৪
প্রোপাগান্ডার প্রকার ২৩৫
প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্য ২৩৬
প্রোপাগান্ডার মানদন্ড ২৩৬
টেকনিক্যাল প্রোপাগান্ডা ২৩৬
স্ট্র্যাটেজিক্যাল প্রোপাগান্ডা ২৩৭
প্রোপাগান্ডার পদ্ধতি ২৩৭
লবিংয়ের আধুনিক সিস্টেম ২৩৮

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

ইসলামী মিডিয়া : দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতি

ইসলামে মিডিয়ার দীনী গুরুত্ব ২৪৩
মিডিয়া ও দাওয়াত ২৪৪
পুনরাবৃত্তি ২৪৫
নতুনত্ব ২৪৫
মনে করিয়ে দেয়া ২৪৬
ইসলামী মিডিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ২৪৮
সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা ২৪৮
পবিত্র ও উন্নত উদ্দেশ্য ২৪৮
ইসলামী মিডিয়ার সার্বক্ষণিক জাগৃতি ও তত্ত্বাবধান ২৫০
নওজোয়ানদের ব্যাপারে ইসলামী মিডিয়ার যিম্মাদারী ২৫২
নওজোয়ানদের মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজন ২৫২
নারী ২৫৩
বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ ২৫৪
সফল মিডিয়ার বৈশিষ্ট্য ২৫৪

দশম অধ্যায়

তিমিরাচ্ছন্ন রাতের পর উজ্জ্বল প্রভাতের সোনালী সূর্য উদিত হবেই ২৬০
দীন-ধর্মের ভবিষ্যত ২৬৬
ইসলামের সম্ভাবনা ২৬৮
পথের অন্তরায় ২৭৭
প্রমাণপঞ্জি ৩০১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মূল বই-এর বাংলা সংস্করণ উপলক্ষ্যে দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা, লাখনৌর শিক্ষক, বিখ্যাত ম্যাগাজিন পাক্ষিক তামীরে হায়াতের সহকারী সম্পাদক ও আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর নাতী

মাওলানা মাহমূদ হাসান হাসানী নদভীর মূল্যবান ভূমিকা

মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো, 'যথাসাধ্য তোমরা তাদের (অর্থাৎ শত্রুদের মোকাবেলার) উদ্দেশ্যে শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করো।' (সূরা আনফাল-৬০)

আলোচ্য আয়াতের আলোকে মুসলমানদের সাধ্য অনুযায়ী ইসলাম ও মুসলমানদের উচ্ছেদকামী দুশমনদের বিরুদ্ধে এমন সব শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা অর্জন করা ফরয, যা শত্রুর ওপর ভীতিকর প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যখন ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী শক্তি ইসলামকে নির্মূল করার জন্য সকল উপায়-উপকরণ প্রয়োগে তৎপর। ইসলামের শত্রুরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন উপায়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করেছে। বর্তমানে ইসলামকে নির্মূল করার জন্য সব ধরনের উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতি অবলম্বনে ইসলামের সকল বৈরি শক্তি ঐক্যবদ্ধ। এ জন্য মিডিয়া হলো তাদের নিকট সবচে' শক্তিশালী ও কার্যকর হাতিয়ার। পশ্চিমা মিডিয়া ইহুদী ও মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে অব্যাহত প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচার-প্রোপাগান্ডার জাল ছিন্ন করতে ইসলামী মিডিয়ার কোনো বিকল্প নেই।

আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ইসলাম ও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় যতদূর সম্ভব জিহাদের সময়োপযোগী উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা মুসলমানদের জন্য ফরয। বিভিন্ন যুগের উপায়-উপকরণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন, ভবিষ্যতে আরো যত সমরাস্ত্র ও যুদ্ধাস্ত্র তৈরি হবে সবই এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত। (তাফসীরে উসমানী)

আল্লামা উসমানীর এ ব্যাখ্যার পর আর অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। কারণ, বাস্তবতা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, ইউরোপ, আমেরিকা ও জায়নবাদী শক্তি ইসলামী বিশ্বে তাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবচে' বেশি সাহায্য নিয়েছে মিডিয়ার। আপন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তারা পত্র পত্রিকা, সংবাদ মাধ্যম ও ম্যাগাজিন-সাময়িকী ইত্যাদি ব্যাপকভাবে চালু করেছে। প্রিন্টিং মিডিয়ার পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া তথা রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিশ্ব জনমতকে নিজেদের পরিকল্পনার অনুকূলে ঢেলে সাজানোর কাজ জোরেশোরে চালিয়ে যাচ্ছে। এসব গণমাধ্যমে গোয়েবলসীয় কায়দায় মিথ্যা, ধোকা, প্রতারণা ও বাস্তবতা বিকৃতির কাজ এমনভাবে চলছে যে, মানুষ মিথ্যাকেই সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নিচ্ছে।

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার শিক্ষাসচিব মাওলানা ওয়াজেহ রশীদ হাসানী নদভী বাস্তবতার পর্দা উন্মোচিত করে লিখেছেন, 'আজ মুসলমানরা যে যুদ্ধের মুখোমুখি, তা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ।' জনৈক ইউরোপিয়ান বুদ্ধিজীবী লেখেন, 'ইসলামের দুর্গ দখল করার সবচে' কার্যকর অস্ত্র হলো শিক্ষা।' এটি সামরিক লড়াই থেকেও অধিক কার্যকর। এর মাধ্যমে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদেরকে সহজেই আমাদের স্বার্থের সমর্থক ও রক্ষকে পরিণত করা সম্ভব।

মাওলানা ওয়াজেহ রশীদ হাসানী নদভী যে যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তা হলো মিডিয়ার যুদ্ধ। আর এটাই স্বাভাবিক যে, প্রতিপক্ষ যুদ্ধের যেই পদ্ধতি অনুসরণ করে, তার জবাবও সে পদ্ধতিতে দেয়াই যুক্তিযুক্ত। অন্যথায় বিপদ অনিবার্য। মাওলানা নজরুল হাফীজ নদভী তাঁর বিখ্যাত সাড়া জাগানো 'পশ্চিমা মিডিয়ার স্বরূপ' গ্রন্থটিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। যার দ্বারা একদিকে যেমন মিডিয়া সন্ত্রাস এবং এর ধ্বংসলীলা ও অসাধারণ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানা যায়, অপরদিকে মুসলমানদের মনে এই সচেতনতা জাগ্রত হয় যে, তারা এ ক্ষেত্রে যদি সামান্যতম অবহেলাও করে, তাহলে বর্তমানে তারা যে কঠিন পরিস্থিতির শিকার, তার চেয়েও বেশি কঠিন বিপজ্জনক পরিস্থিতির শিকার হবে তাদের আগামী প্রজন্ম। এই গ্রন্থের গুরুত্ব ও উপকারিতা জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী মহল ভালভাবেই অনুধাবন করেছেন। ইতোমধ্যে গ্রন্থটির আরবী, ইংরেজি ও হিন্দি অনুবাদ হয়ে গেছে। বাংলা ভাষায় এর অনুবাদের বিরাট কাজটি করেছেন মাওলানা শহীদুল ইসলাম ফারুকী। তিনি একজন উচ্চ সাহসী, প্রতিভাদীপ্ত, যোগ্যতাসম্পন্ন ও ইসলামের জন্য দরদী হৃদয়ের অধিকারী তরুণ আলেমেদীন। দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে লেখাপড়া শেষ করে মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর ভাগ্নে ও স্থলাভিষিক্ত খলীফা, মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত আলেমেদীন ও দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার রেক্টর হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ রাবে' হাসানী নদভী (দা.বা.)-এর কাছে বাইআত ও ইস্তেফাদার সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে এক মাসের বেশি সময় অতিবাহিত করেন। এছাড়া মাঝে মাঝে এখানে তার যাওয়া-আসা ও যোগাযোগ সব সময়ই আছে। তিনি হযরতের তাওয়াজ্জুহ, সুদৃষ্টি ও ভালবাসা লাভে বিশেষভাবে ধন্য হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা হযরতের তাওয়াজ্জুহ ও বরকত দ্বারা তাঁকে আরো উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন এবং যুগ-চাহিদার প্রেক্ষিতে তাঁর দীনী খেদমত কবুল করুন। আমীন।

মাহমূদ হাসান হাসানী নদভী
দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা
০৯ রবিউল আওয়াল-১৪৩০ হিজরী

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষার ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর ঢাকার প্রিন্সিপাল, লন্ডনভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফোরাম বাংলাদেশ ব্যুরোর সভাপতি ও আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র. -এর বিশিষ্ট খলীফা

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান সাহেবের অভিমত

বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় ও অগ্রযাত্রার প্রয়াসকে গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রয়োজন ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-দর্শন অনুধাবন করা, পাশ্চাত্যের নানামুখী চ্যালেঞ্জ ও তার ভয়াবহতা উপলব্ধি করা এবং পশ্চিমা মিডিয়ার মেযাজ ও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগতি লাভ করা। কারণ পশ্চিমা রাষ্ট্রশক্তি ও ইহুদী মস্তিষ্ক দুটো একযোগে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে নির্মূল করার জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়ে ময়দানে আবির্ভূত হয়েছে। শত্রুর সামরিক কৌশল ও সমরাস্ত্র সম্পর্কে ভালভাবে অবগতি লাভ করা ছাড়াই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিণাম লজ্জাজনক পরাজয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

কমিউনিজমের পতনের পর বর্তমানে পাশ্চাত্যের প্রধান প্রতিপক্ষ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে নির্মূল করার জন্য পাশ্চাত্য শুরু করেছে নতুন ক্রুসেড, যার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে কথিত সন্ত্রাসী হামলার নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্য দিয়ে। এটিকে অজুহাত বানিয়ে তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে আফগানিস্তানকে। রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়া হয়েছে ইরাকে। না জানি কতদিন চলবে মুসলিম দেশ জবরদখলের এ ধারা। আর এ ক্রুসেডে তাদের অগ্রসেনানী হলো বিশ্ববিস্তৃত ইহুদী নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমা মিডিয়া নেটওয়ার্ক। বর্তমান যুগকে আমরা মিডিয়ার যুগ বলতে পারি। এ যুগে সমরাস্ত্র ও সেনাবাহিনীর মাধ্যমে মানুষ হত্যার পরিবর্তে মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। এটাকে আমরা সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক লড়াই বলতে পারি। বলতে পারি স্নায়ুযুদ্ধ। এ যুগ মানুষকে শারীরিকভাবে গোলাম বানানোর পরিবর্তে মেধা-মনন ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে গোলাম বানানোর যুগ। আর মনস্তাত্ত্বিক দাসত্ব শারীরিক দাসত্বের তুলনায় অনেক বেশি ভয়াবহ। মেধা-মনন ও চিন্তা-চেতনাকে বিষাক্ত করার সবচে শক্তিশালী কার্যকরি অস্ত্র হলো মিডিয়া। মিডিয়ার শক্তি আণবিক শক্তির চেয়েও বেশি ভয়াবহ। মিডিয়া কোটি কোটি মানুষের মেধা-মনন ও চিন্তা-চেতনা যখন যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই ঘোরাতে পারে। পাশ্চাত্য ভালকরেই জানে, যদি তাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আধিপত্য ধরে রাখতে হয় এবং গোটা বিশ্বকে মার্কিনীকরণ করতে হয়, তাহলে মার্কিন জীবনব্যবস্থাকে আদর্শ ও অনুসরণীয় বানাতে হবে। ফাঁদ পেতে মানুষের বিবেক স্বীয় প্রভাববলয়ে নিয়ে আসতে হবে। মানুষের

www.pathagar.com

চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার ওপর অতর্কিত হামলা চালাতে হবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সবচে মোক্ষম অস্ত্র হলো, মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যম। এ রাস্তায় সহজেই মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতি গোটা বিশ্বে গ্রহণীয় ও অনুসরণীয় বানানো সম্ভব। এজন্যই পাশ্চাত্য আজ মিডিয়ার সাহায্যে পশ্চিমা জীবনব্যবস্থার বিশ্বকরণ করছে।

ইসলামী বিশ্বের চিন্তাশীল ওলামায়ে কেরাম দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করে আসছেন, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্ সম্পর্কে পশ্চিমা মিডিয়া ও ইসলাম বিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক লবির শত্রুতা ও বিদ্বেষমূলক প্রোপাগান্ডার সাইন্টিফিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং এই লবি নিশ্চিহ্ন করার জন্য পরিকল্পিতভাবে কাজ শুরু করা দরকার। এর জন্য দীনী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, ওলামায়ে কেরাম এবং ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সমকালীন বিভিন্ন বাদ-মতবাদ ও চিন্তা-দর্শনের জ্ঞান আহরণের অনুভূতি জাগ্রত করে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকে সুসংগঠিত করা। এক কথায় মুসলিম উম্মাহকে জবাই করার জন্য পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ যেসব ষড়যন্ত্র নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং ইহুদী নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমা মিডিয়া যেগুলোর বাস্তবায়ন করছে, তারই সর্বশেষ বিশ্লেষণ নিয়ে একটি ব্যতিক্রমী গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন ভারতের নদওয়াতুল ওলামার অধ্যাপক মাওলানা নজরুল হাফিজ নদভী। **'পশ্চিমা মিডিয়ার স্বরূপ'** নামে যার বাংলা অনুবাদ করেছেন তরুণ আলেমেদ্বীন, বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক স্নেহভাজন মাওলানা শহীদুল ইসলাম ফারুকী। দু'আ করি আল্লাহ তাআলা যেন এ গ্রন্থখানা প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে কবুল করেন এবং মুসলিম জাহানের দিশেহারা মানুষের নৈতিক পুনর্জাগরণে গ্রন্থখানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, তার তাওফীক দান করেন। আমীন।

০৩-০২-০৯ ঈ.

মুহাম্মদ সালমান
প্রিন্সিপাল
মাদরাসা দারুর রাশাদ
মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা

www.pathagar.com

মুসলিমবিশ্বের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আলেমেদীন, মক্কাভিত্তিক রাবেতা আলমে ইসলামীর স্থায়ী কমিটির সদস্য, খ্যাতিমান লেখক, গবেষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও মাসিক মদীনার সম্পাদক

হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (দা. বা.)-এর সুচিন্তিত অভিমত

বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে মুসলমানগণ নানামুখী আগ্রাসনের শিকার। আর এই আগ্রাসনের প্রধান একটি অস্ত্র হচ্ছে মিডিয়া। পাশ্চাত্য দুনিয়া নানা ধরনের মারণাস্ত্র তৈরিতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তার সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে মিডিয়া আগ্রাসনের পিছনে। ফলে মুসলমানগণ সর্বত্রই উগ্র, মৌলবাদি এবং জঙ্গি নামে অভিহিত হচ্ছে। এই মিথ্যা অভিযোগ এতটাই প্রচারিত হয়েছে যে, দুনিয়ার সব দেশেই একটি শিশুও এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, মুসলিম জাতি সত্যিই শান্তিপূর্ণ বিশ্ব নির্মাণের পথে প্রধান অন্তরায়। আর এই বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও পাকিস্তান প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলোর উপর পাশ্চাত্য ভয়ানক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এবং নির্বিচারে গণহত্যার মাধ্যমে দেশগুলোকে ইতিমধ্যেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের মুসলিম পরিচিতি শেষ করে দেয়ার লক্ষ্যেও সেই ধরনের আয়োজন চলছে।

এইরূপ একটি নাজুক মুহূর্তে বিশ্বখ্যাত মিডিয়া ব্যক্তিত্ব নজরুল হাফীজ নদভী কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত "পশ্চিমা মিডিয়ার স্বরূপ" বইটি মুসলিম জনগণকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বইটির বাংলা অনুবাদ কাঙ্ক্ষিত ছিল। তরুণ লেখক মাওলানা শহীদুল ইসলাম ফারুকী এই দুরূহ কাজটি সম্পাদন করেছেন। দোয়া করি, আল্লাহ্ পাক লেখককে আরও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তাং ১৫.০২.০৯ ইং

মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক মাসিক মদীনা
ঢাকা।

www.pathagar.com

এশিয়ার বিখ্যাত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার রেক্টর এবং বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)-এর ভাগ্নে ও স্থলাভিষিক্ত খলীফা

আল্লামা সাইয়েদ মুহাম্মদ রাবে' হাসানী নদভীর ভূমিকা

প্রথম যুগের মুসলমানদের সামাজিক জীবনের ঘটনাসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি ঘটনা পবিত্র হাদীস শরীফে তাবুক যুদ্ধের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ঘটনাটি ছিলো, ঐতিহাসিক তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল গ্রীষ্ম মৌসুমে। সে সময় ছিল ফল-ফলারি পাকার মৌসুম। পাকা ফল-ফলারির দৃষ্টিনন্দন চিত্তহারী দৃশ্যে প্রভাবিত হয়ে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে গমন থেকে বিরত থাকেন। তন্মধ্যে কিছু তো ছিল যারা অন্তর দিয়েই ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং দ্বি-মুখী নীতি পোষণ করত। তাদের ইসলাম গ্রহণের মিথ্যা দাবী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। যেহেতু তারা তাদের কর্মপদ্ধতি গোপন করত, এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের কিছু বলতেন না। এই শ্রেণী ছাড়াও তিন জন এমন ছিলেন, যারা ইসলামের সত্য দাবীদার এবং রাসূলের একনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন। মিথ্যা দাবীদাররা তো জেনে শুনেই তাবুকে অনুপস্থিত ছিলো, কিন্তু ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এ তিন জন ঠুনকো বাধা ও কিছুটা অলসতার কারণে দূর-দূরান্তের পথ সফর করেননি। তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর মিথ্যা দাবীদাররা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে মিথ্যা অজুহাত পেশ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) সব কিছু জেনে শুনেও চুপ রইলেন। আর ইসলামের নিবেদিতপ্রাণ তিন জন তাঁদের ত্রুটি ও অলসতার কথা স্বীকার করে নিলেন। রাসূল (সা.) তাঁদের পাকড়াও করে বললেন, এখন আল্লাহ পাকই তোমাদের ফয়সালা করবেন। তাঁদের তিন জনকে বয়কট করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) সকল ঈমানদারের প্রতি কড়া নির্দেশ জারি করলেন, কিন্তু ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এ তিন জন বিচলিত না হয়ে রাসূলের নির্দেশকে খোদায়ী ফয়সালা বলে মেনে নিয়ে অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন। একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁরা জনবিচ্ছিন্ন রইলেন। এ ঘটনাটি হযরত কাব (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাবুক যুদ্ধে কেন যাওনি। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), আমি যদি ওজর বর্ণনা করি তাহলে এমন ওজর বর্ণনা করতে পারব, যা আপনি বিশ্বাস করে নেবেন। কারণ কোনো কথা দলীল-প্রমাণের আলোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করার মতো যোগ্যতা রয়েছে, কিন্ত এমনটি করলে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হবে। এর দ্বারা আমি আপনাকে ধোকা দিতে পারব, কিন্তু আল্লাহকে রাজি করতে পারব না। সত্য কথা হলো, আমার কোনো ওজরই ছিল না; বরং শুধু অলসতার কারণেই আমি যুদ্ধে শরীক হতে পারেনি।' রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত কাব (রা.)-এর কথা শুনে বললেন, সে সত্য বলেছে। তবে এখন আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা কর।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের তিন জনকে বয়কট করার জন্য সকলের প্রতি নির্দেশ জারি করেন। হযরত কাব (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে ঘটনার বিবরণ দেয়ার সময় যে বলেছিলেন, 'আমার কোনো কথা দলীল-প্রমাণের আলোকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার মতো যোগ্যতা রয়েছে।' হযরত কাবের সেই 'যোগ্যতা দক্ষতা'ই আজ মিডিয়া প্রদর্শন করছে। এই যোগ্যতা দক্ষতা যদি সৎ ও উপকারী উদ্দেশে প্রয়োগ করা হয় তাহলে তাকে সৎ মিডিয়া বলা হবে। আর যদি তা অসৎ ও ধ্বংসাত্মক উদ্দেশে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তাকে অসৎ ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর মিডিয়া বলা হবে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ মিডিয়া এ ধ্বংসাত্মক পথ ধরেই এগুচ্ছে। ইসলামবিদ্বেষী শক্তি আজ মিডিয়ার ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে। তারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে নির্মূল করার জন্য মিডিয়াকে ব্যবহার করছে।

মিডিয়া আজ রাতকে দিন এবং দিনকে রাত বানাচ্ছে। বাস্তবকে অবাস্তব এবং অবাস্তবকে বাস্তবতার রূপ দিচ্ছে। মিডিয়া আজ একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। মিডিয়া মিথ্যা, মোনাফেকী, অধিকার হরণ এবং বাস্তবতাবিরোধী কথা বলতে সামান্যও পরওয়া করে না, ইসলাম এটা পছন্দ করে না। ইসলাম বলে, সত্য কথা বল, অন্যথায় বিরত থাক, ধোকা দেয়ার চেষ্টা করো না, কিন্তু ইউরোপ অত্যন্ত চালাকি ও সতর্কতার সাথে কথা বলা এবং ঘটনাকে নিজের মন মতো করে উপস্থাপনকে একটি শাস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাই তো দেখা যায়, তাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ীই আজ তাদের মিডিয়া পশ্চিমা মূল্যবোধ ও জাহেলী কর্মকান্ড ও কথাবার্তা প্রসার করছে। পশ্চিমা মিডিয়া শুধু চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধই নয়; বরং মানবিক মূল্যবোধও পদদলিত করছে। এর মোকাবেলায় বিশ্বে এমনও কিছু মিডিয়া রয়েছে, যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং মিথ্যা ও ধোকাবাজি থেকে বেঁচে থাকে। এগুলোকেই ইসলামী মিডিয়া বলে। পশ্চিমা মিডিয়া এমন সুন্দর ও চিত্তাকর্ষকভাবে সংবাদ উপস্থাপন করে, যাতে ভালো ভালো লোকও তাতে ধোকা খেয়ে যায়। পশ্চিমা মিডিয়ার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হলো ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ।

দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার উস্তাদ মাওলানা নজরুল হাফীজ নদভী অত্র গ্রন্থে পশ্চিমা মিডিয়ার ওপর ইহুদী আধিপত্যের সূচনালগ্ন থেকে এ যাবতকালের লোমহর্ষক দাস্তান ও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার কথা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। কিতাবের শেষে ইসলামের সত্যপ্রিয়তা, সত্য পছন্দের পন্থা পদ্ধতি অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করেছেন। কিতাবটি পাঠকের সামনে নতুন নতুন জ্ঞান তুলে ধরেছে। এতে দাওয়াতের সঠিক পথ পদ্ধতিও চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠ করলে পাঠকের সামনে এক নতুন বাস্তবতা ফুটে ওঠবে। আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটিকে সত্য ও ন্যায়ের জন্য কবুল করে নিন।

সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রাবে' হাসানী নদভী
দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা, লাখনৌ।

www.pathagar.com

ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রসার

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'যারা পছন্দ করে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে, আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।'

(সূরা নূর-১৯)

আলোচ্য আয়াতটি একটি মু'জিযা ছাড়া আর কিছুই নয়। আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন মদীনার সীমিত সমাজে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি লোকেরা স্ব স্ব মজলিস ও বৈঠকে আলোচনা করতে লাগল। মজলিসগুলো কত বড় ছিল, ঘটনটি কত বড় ছিল এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তি এর সাথে জড়িত ছিল, এসব কিছু থেকে কুরআনের এ আয়াতটি আরো বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল। কুরআনের আয়াতটি যুগ-যুগান্তর পেরিয়ে এবং সকল ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক দূরত্ব ভেদ করে আরো কিছু দাবী করছিল। আজ আমরা সেই আয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা বাস্তবে স্বচোখে অবলোকন করছি। যারা চায় ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা ও ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, সেসবের প্রতিচ্ছবি হলো, আজকের যুগের মিডিয়া, সংবাদ মাধ্যম, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, স্যাটেলাইট, সিনেমা, ফিল্ম, নভেল, নাটক, উপন্যাস, ম্যাগাজিন, পিকচার ও লিটারেচার ইত্যাদি। বিভিন্ন দর্শন ও মতবাদের এই যুগে উল্লিখিত আয়াতটির এর চেয়ে উত্তম আর কোন তাফসীর ও ব্যাখ্যা হতে পারে না। এ আয়াতের তাফসীর আজ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে। পূর্বের যুগে এর তাফসীর অনেক কঠিন ছিল। মদীনার সীমিত পরিসরে এর তাফসীর সম্ভব ছিল না। মদীনার সেই পরিবেশে লোকেরা শুধু অন্তর দিয়েই তা বিশ্বাস করেছিল, হয়তো কোনো একটি বিশেষ ঘটনার ওপর সেটি ফিট করেছিল, কিন্তু আজকের বিশ্বের সকল শক্তি যেভাবে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেগে গেছে, তার অনুমান তখনকার যুগে কিভাবে সম্ভব ছিল।

আমাদের সমাজে ধ্বংসাত্মক শক্তিবর্গ যেভাবে অনৈতিকতা ও বিদ্রোহ প্রসার করছে, তাদের নিকট এমন উপকরণ রয়েছে যা দিয়ে তারা দিনকে রাত এবং রাতকে দিন বানাতে পারে, আলোকে অন্ধকার এবং অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করতে পারে।

দুনিয়ার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল সংগঠন-সংস্থার একই অবস্থা। একই পথে তারা ধাবমান। ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়াকে দেখুন, পাশাপাশি প্রাচ্যের সরকারগুলোকেও দেখুন, যাদের সকলের চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ্য-

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য শুধুই ধ্বংসাত্মক, যাদের জীবন পাপাচারে ভরা, যাদের আখলাক-চরিত্র অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে। যাদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা কেবলই ধ্বংসাত্মক। তারা সকলে মিলে একটি যৌথ ও সম্মিলিত সমাজব্যবস্থা বানিয়ে নিয়েছে। আর সেই সমাজব্যবস্থাই বিশ্বের জাতি-গোষ্ঠীর ভাগ্যের ফয়সালা করছে। বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে, বিশ্বের সর্বত্র আজ সেই গোষ্ঠীর যাদু চলছে, যাদের হাতে রয়েছে মিডিয়া ও গণমাধ্যম। আর কুরআন পাক তাদের কথাই এ আয়াতে বলেছে, 'যারা পছন্দ করে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে, আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না।'[১]

১. অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলাগুলো সৌদি আরব ও উপসাগরীয় দেশগুলোতে ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। এর পেছনে সেসব দেশের সরকারগুলো কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে। এসব খেলার ম্যাচ ও টুর্নামেন্টে দর্শকদের সরগরম উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। এর পেছনে সময় ও সম্পদের অনর্থক অপচয় অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। না জানি কত মানুষ এর পেছনে পড়ে নামায বরবাদ করছে। এসব দেশের ওলামায়ে কিরাম ও দায়িত্বশীলদের বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করা ও এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া সময়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন।

www.pathagar.com

আধুনিক খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।' (সূরা লোকমান–৬)

খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের উপায়-উপকরণ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হল, যেগুলোর সম্পর্ক খেলাধুলা, প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শন ইত্যাদি থেকে অগ্রসর হয়ে চিত্তরঞ্জন ও নিমগ্নতার সাথে। আর দ্বিতীয় প্রকার হল, আনন্দ উল্লাস এবং মানসিক স্বাদ ও লাভজনক কথাবার্তা ইত্যাদি, যাতে পড়ে লোকজন আল্লাহর ফরয, ওয়াজিব ও যিকির-আযকার থেকে উদাসীন হয়ে যায়। যেমন অশ্লীল গল্প-গুজব, কিস্‌সা-কাহিনী ও ঘটনাবলী ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের উভয় প্রকার একত্র করে দিয়েছেন। কুরআনের ভাষায় তা হলো 'লাহওয়াল হাদীস'।

এটি কুরআনের একটি মু'জিযা যে, চৌদ্দশ' বছর পূর্বের আয়াত আজকের আধুনিক খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের সাজ-সরঞ্জামাদির ওপরও প্রযোজ্য হচ্ছে। বিশেষ করে রেডিও-টিভির ওপর তো পূর্ণাঙ্গভাবেই প্রযোজ্য হয়। কারণ এগুলো একই সাথে খেলাধুলা এবং চিত্তবিনোদন উভয়ই। আয়াতের পরবর্তী অংশ দ্বারা তা আরো পূর্ণাঙ্গ হয়–'একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশে অবান্তর কথাবর্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে'।

এখন দেখুন, আধুনিক এই খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন অর্জনের জন্য পয়সা খরচ করে বাজার থেকে ক্রয় করা ছাড়া আর কোনোই উপায় নেই। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায়, কেবলমাত্র রেডিও-টিভির নাম নেয়াটাই বাকী রয়ে গেছে। তাছাড়া বাকী সব উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গভাবেই বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। কুরআন তো আরবী ভাষায়। এখানে ইংরেজি শব্দ কিভাবে আসবে। এটা বিবেকও গ্রহণ করবে না, কিন্তু কুরআনের মু'জিযা দেখুন, আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, যদি আমি মসজিদে বসে বলি, এ আয়াতে রেডিও-টিভির কথা রয়েছে তাহলে ভুল হবে না। কারণ কুরআনে বলা হয়েছে, 'একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশে অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় করে।' যারা আরবী ভাষার অলংকার সম্পর্কে জানেন এবং আরবদের মতো আরবী ভাষায় ভালো দক্ষতা রাখেন, তারাই উল্লিখিত আয়াতগুলোর যথার্থ মর্ম অনুধাবনে সক্ষম হবেন। আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহর শোকর, আমাদের আরবীর উস্তাদ ছিলেন সরাসরি আরব। আমরা আরবী ভাষার সকল কিতাব তাঁর নিকটেই পড়েছি। ফলে আমরা আরবী ভাষার নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে জানি এবং এর

www.pathagar.com

ভাষালংকার বিষয়ে আমাদের পূর্ণ ব্যুৎপত্তি রয়েছে। সেই আলোকে আমি কুরআনের শব্দ 'লাহওয়াল হাদীস'-এর খুব মজা অনুভব করছি এবং আমার আরবী রুচিবোধ 'লাহওয়াল হাদীস'-এর পরিধি ও সীমারেখা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে। আমি এ শব্দের তরজমা করতে পারছি না। অথচ আমি লাখনৌর বাসিন্দা। আমি স্বীকার করছি, আমি এই শব্দের তরজমার হক আদায় করতে পারব না। এ শব্দের সরল অর্থ হলো, কথার খেলা। এখন বলুন, রেডিও টিভিতে কিসের খেলা চলে। যদি এমনটি হতো, অনেক লোক যারা একটা খেলা পছন্দ করে, তা হলে সেখানে রেডিও-টিভির কথা আসত না, কিন্তু এখানে কথার খেলা বলা হয়েছে। সুতরাং এ 'লাহওয়াল হাদীস' শব্দের মর্ম রেডিও-টিভির ওপরই পূর্ণাঙ্গভাবে প্রযোজ্য হয়। এটি কুরআনের এক অলৌকিকতা। আমি দাবী করে বলতে পারি, হিজরী প্রথম শতাব্দী, দ্বিতীয় শতাব্দী, তৃতীয় শতাব্দী, চতুর্থ শতাব্দী, পঞ্চম শতাব্দী, ষষ্ঠ শতাব্দী, এমনকি আমি বলব, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র.)-এর মস্তিষ্কেও 'লাহওয়াল হাদীস' দ্বারা রেডিও-টিভির কথা আসেনি। এটি কুরআনের এক মু'জিযা। রেডিও'র প্রোগ্রাম, টিভির স্ক্রিনে যিন্দা মানুষের ছবি এবং রেডিও ও টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি সবই 'লাহওয়াল হাদীস'।

আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে এসব জিনিস আবিষ্কার হওয়া তো দূরে থাক, কারো স্বপ্নেও তা আসেনি, কারো কল্পনায়ও ছিল না, কিন্তু আল্লাহর কিতাব সে সময়েই বলে দিয়েছে—'একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশে 'লাহওয়াল হাদীস' তথা অবান্তর কথাবার্তা খরিদ করে।'

www.pathagar.com

লেখকের কথা

সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তি–এমন দু'টি মৌলিক বিষয়, যা কোন সমাজের চেতনা, জাগরণ, অনুভূতি ও প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টিতে প্রতিনিধিত্ব করে। যে দেশ ও জাতি এ দু'টি বিষয়ের ওপর কর্তৃত্ব অর্জন করতে সক্ষম হবে, সে দেশ ও জাতিকেই চেতনাশীল ও অনুভূতিসম্পন্ন দেশ জাতি বলা হবে। এর মাধ্যমেই সে মানব সোসাইটির অন্যান্য কেন্দ্রে সহজেই পৌঁছতে সক্ষম হয়। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক হস্তক্ষেপ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে ভিন্ন। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক হস্তক্ষেপ অভ্যন্তর থেকে হয়। সেমতে যে জাতি সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে অন্য জাতি কর্তৃক প্রভাবিত হয়, সে জাতি তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। বর্তমানে ইসলামী বিশ্বের যে পরিস্থিতি তা এদিক দিয়ে অত্যন্ত সঙ্গীন এবং সুদূরপ্রসারী যে, বর্তমানে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ভয়াবহ আগ্রাসন চলছে। এই সর্বগ্রাসী আগ্রাসনে ইসলামী বিশ্ব শুধু বস্তুগত ও মানবিক দিক দিয়েই চরম ক্ষতিগ্রস্ত নয়; বরং তাদেরকে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আকীদা-বিশ্বাস থেকেও দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদের নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং আকীদা-বিশ্বাসের শত্রু বানিয়ে দেয়া হচ্ছে। বস্তু-সম্পদ, আকীদা-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভাষা-সাহিত্য সর্বদিক দিয়ে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে। ডিশ এন্টিনা ও ইন্টারনেট মুসলমানদেরকে তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বানিয়ে দিচ্ছে। অপরদিকে সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈচিত্র এবং স্বাতন্ত্র্য নির্মূল করে একটি আন্তর্জাতিক সভ্যতা তথা মার্কিন সভ্যতাকে গোটা মানব সমাজের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে শুধু মুসলিম উম্মাহই নয়; বরং প্রতিটি দেশ ও জাতিগোষ্ঠী তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে। যেসব দেশ ও জাতিগোষ্ঠী এই আন্তর্জাতিক তথা ইহুদী-মার্কিন সভ্যতাকে গ্রহণ করতে কোনোভাবে অস্বীকার করছে, তাদের গোটা বিশ্ব থেকে আলাদা ও কোণঠাঁসা করে দেয়া হচ্ছে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের ভাষায়–'সেসব দেশ ও জাতিগোষ্ঠীকে বদমাইশদের শীর্ষ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।' বর্তমানে জাতিসংঘের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলার জবরদস্ত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কায়রো, ইস্তাম্বুল ও বেইজিং সম্মেলনের মাধ্যমে পরিবার ব্যবস্থার পশ্চিমা পরিকল্পনাকে প্রাচ্যের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাচ্যের জাতি-গোষ্ঠীকে নগ্নতা অশ্লীলতার পথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, যাতে তারাও পশ্চিমা সমাজের মতো সামাজিক, নৈতিক, চারিত্রিক ও মনস্তাত্ত্বিক অন্তঃসারশূন্যতার শিকার হয়ে এমন ফোকলা সমাজের মতো হয়ে যায়, যেখানে না কোন মানবিক মূল্যবোধের কদর থাকবে, না পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসার উষ্ণতা থাকবে আর না নিষ্ঠা, হৃদয়ের উত্তাপ ও সাহায্য-

www.pathagar.com

সহানুভূতির চেতনা থাকবে। বস্তুপূজা ও লাগামহীন স্বাধীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত দর্শন মতবাদ এবং মানবিক, চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অসংরক্ষণ পশ্চিমা সমাজে যে সীমাহীন চারিত্রিক ও নৈতিক অস্থিরতা এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করে দিয়েছে, একই অস্থিরতা ও বিপর্যয় বর্তমানে প্রাচ্যের দেশসমূহেও সৃষ্টি হচ্ছে।

অপরদিকে সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আমেরিকা মিডিয়া শক্তির মাধ্যমে বিজয়ের পরিধি বিস্তৃত করে চলেছে। যেমন উপসাগরীয় যুদ্ধের সফল অভিজ্ঞতা আমেরিকার সাহস হিম্মত আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সে ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডার তথা বিশ্বব্যবস্থার স্থলে গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের পরিভাষা ব্যবহার করে বিজয়ের পরিধি আরো বিস্তৃত করেছে। ইরাক-ইরান যুদ্ধের পর আমেরিকা আরবদের সাথে যুদ্ধ করার যে পরিকল্পনা ও নীল নকশা তৈরি করেছে, তাতে সে মিডিয়াকে 'অগ্রগামী সেনাবাহিনী' হিসেবে ব্যবহার করছে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের ইহুদী উপদেষ্টা জন রুশ উপসাগরীয় যুদ্ধের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, বুশ সামরিক যুদ্ধ ছড়িয়ে দেয়ার পূর্বে মার্কিন জনমত বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যাপকভাবে মিডিয়া যুদ্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। তিনি টিভি ও সংবাদপত্রের দায়িত্বশীলদের বলেছিলেন, 'আপনারা নয়া ক্রুসেডের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। বাস্তবে যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে তখন আপনাদের প্রথম সারিতে থাকতে হবে।' এ কারণেই উপসাগরীয় যুদ্ধকে 'টেলিভিশনের যুদ্ধ' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

টেলিভিশন যুদ্ধ

উপসাগরীয় যুদ্ধের রিপোর্টিংয়ে পশ্চিমা টিভি কোম্পানীগুলোর মাঝে যে তুমুল প্রতিযোগিতা হয়েছিল, তার অন্তরালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পশ্চিমা স্বার্থ কাজ করছিল। মার্কিন টিভি কোম্পানী (C.B.S) উপসাগরীয় যুদ্ধের রিপোর্টিংয়ে সপ্তাহে দশ লাখ মার্কিন ডলার ব্যয় করত। গোটা বিশ্ব থেকে তেরশ' সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি রিপোর্টিং-এর জন্য উপসাগরীয় দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৃটিশ টিভি E.T.V রিপোটিং-এ বিপুল ব্যয় বহন করতে না পেরে ময়দান থেকে ছিটকে পড়ে। ফলে ময়দানে শুধু C.N.N–ই রয়ে যায়। সিএনএন লাগাতার চব্বিশ ঘন্টা সরাসরি যুদ্ধের অবস্থা সম্প্রচার করে বিশ্বব্যাপী রিপোর্টিং জগতে এক নয়া রেকর্ড সৃষ্টি করে। বলা হয়ে থাকে, C.N.N উপসাগরীয় যুদ্ধের রিপোর্টিং-এ এক হাজার মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিল, কিন্তু তার নয় হাজার মিলিয়ন ডলারই মুনাফা হয়েছে। C.N.N রিপোর্টিং-এ নয়া রেকর্ড সৃষ্টির পাশাপাশি মিথ্যা, প্রতারণা, ধোকাবাজি ও গুপ্তচরবৃত্তিতে গোটা বিশ্বে সর্বকালের যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, তার নযির মেলা ভার।

উপসাগরীয় যুদ্ধের ভয়াবহ চিত্র সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মার্কিন সম্পাদক র‍্যান্ডলফের এক টেলিগ্রাম বার্তা দ্বারাই অনুমান করা যায়, যা তিনি কিউবাতে অবস্থিত তার সহকর্মী এক সাংবাদিকের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এ টেলিগ্রাম বার্তায় তিনি বলেছেন, তুমি শুধু যুদ্ধের ছবি পাঠাও, আমরা যুদ্ধের ময়দান প্রস্তুত করব।

www.pathagar.com

পশ্চিমা মিডিয়া বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গি এখন এই হয়ে গেছে, পক্ষে বিপক্ষে উভয় ধরনের সংবাদ পরিবেশন করে দাও, যাতে ইতিবাচক নেতিবাচক উভয় ধরনের সংবাদ মাধ্যমের ওপর তোমাদেরই নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং নিজেদের ইচ্ছামতো তা ব্যবহার করতে পার। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবে কার্যকর করে উপসাগরীয় যুদ্ধের সকল সাংবাদিকের ওপর মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল যে, তারা কেবল পেন্টাগনের মর্জি অনুযায়ীই রিপোর্টিং করবে। সেমতে পেন্টাগন কেবল তার নির্বাচিত সাংবাদিকদেরই যুদ্ধের ময়দানে পাঠাতো। পেন্টাগনের অনুমোদনের বাইরে অন্য কোন সাংবাদিককে সেখানে ঢুকতে দেয়া হতো না। এসব সাংবাদিক রিপোর্টিংয়ে সম্পূর্ণ পেন্টাগনের মর্জির প্রতি লক্ষ্য রাখত। উপসাগরীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর এ বিষয়ে যেসব গ্রন্থ লেখা হয়েছে তার তত্ত্বাবধানের জন্য জেনারেল সোয়াজকর্ফকে মনোনীত করা হয়েছিল। উপসাগরীয় যুদ্ধের রিপোর্টিংয়ে এ একতরফা মার্কিন পলিসির বিরুদ্ধে ফ্রান্স, বৃটেন ও ইউরোপিয়ান দেশগুলোর সাংবাদিকরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তারা মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডিক চেনিকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে পেন্টাগনের এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠনও পেন্টাগনের এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, যার সদস্য সংখ্যা এক হাজারের উর্ধ্বে। তারা প্রতিবাদ জানিয়েছিল, শুধু C.N.N-কেই কেন এই যুদ্ধের রিপোর্টিংয়ে একচ্ছত্র অধিকার দিয়ে দেয়া হয়েছে। মার্কিন ম্যাগাজিন টাইম-এর সাংবাদিক ডেসকো বোকাসকে মার্কিন সেনাবাহিনী চব্বিশ ঘন্টা আটকে রেখেছিল। তার চোখে পট্টি বেঁধে রাখা হয়েছিল, যাতে সে রিপোর্টিং করতে না পারে। তার অপরাধ ছিল, সে সেসব সাংবাদিক থেকে আলাদা ও পৃথক হয়ে গিয়েছিলো, যাদের মার্কিন সেনাবাহিনী যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাচ্ছিল। এই একতরফা রিপোর্টিং-এর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগানের প্রেস সচিব টিকেল ডেভিড বলেছিলেন, জর্জ বুশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকতার রিপোর্টিংয়ে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। একদিকে আমেরিকা সাদ্দাম হুসাইনের সামরিক শক্তিকে ভয়ানক আকার বানিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করছিল, অপরদিকে মার্কিন বোমাবর্ষণে হাজারো ইরাকী নারী-শিশু নিহত হওয়ার সংবাদ ধামাচাপা দিয়ে যাচ্ছিল। কারণ যদি নারী-শিশু নিহত হওয়ার এই সংবাদ বিশ্ববাসীর সামনে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে বাধ্য হয়ে বুশকে তার প্রেসিডেন্টের কুরসি ছাড়তে হবে। মিডিয়া বিশেষজ্ঞরা উপসাগরীয় যুদ্ধের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন, পশ্চিমা মিডিয়ার নিকট যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে, তার মাধ্যমে সে বিশ্ববাসীর কাছ থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে, হক ও ইনসাফ এবং সত্য ও মিথ্যার মানদন্ড কেবল পশ্চিমের নিকটেই রয়েছে। দ্বিতীয় যে বাস্তবতার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে সেটি হলো, আধুনিক টেকনোলজি ও স্যাটেলাইট ব্যবস্থা সমরাস্ত্রের ব্যবহারকে অনেক ফলপ্রসূ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী বানিয়ে দিয়েছে।

উপসাগরীয় যুদ্ধ মিডিয়ার দিক দিয়ে ইতিহাসের সর্বপ্রথম টেলিভিশন যুদ্ধ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সংবাদ ও ছবি কেবল রেকর্ডিং ও কাটছাঁটের পরই টিভি স্ক্রিনে দেখা

www.pathagar.com

যেতো, কিন্তু উপসাগরীয় যুদ্ধ সরাসরি যুদ্ধের ময়দান থেকে সম্প্রচার করা হতো। যুদ্ধের দৃশ্যগুলো সরাসরি টিভি স্ক্রিনে ভেসে উঠত। এটা কিভাবে সম্ভব ছিল? এটা এভাবে সম্ভব ছিল যে, সাংবাদিকদের পকেটে ১৮০ সেন্টিমিটারের ডিশ এন্টিনা ফিট করা থাকতো। এর মাধ্যমে তারা সরাসরি স্যাটেলাইটের সাথে সংযোগ স্থাপন করে তাদের সংবাদ ও ছবিগুলো তৎক্ষণাত টিভি ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিত। এভাবে সরাসরি যুদ্ধের ময়দান থেকে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ, বোমাবর্ষণ, বিস্ফোরণ ও এর দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসলীলা তৎক্ষণাত হাজার হাজার মাইল দূর থেকে নিজ ঘরে বসে প্রত্যক্ষ করা যেত। যদিও এ ক্ষেত্রে ভয়েস অব আমেরিকা, বিবিসি, মোন্টি কর্লো (ফ্রান্স) ও ইসরাঈলী টিভি একে অপর থেকে অগ্রগামী হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু সিএনএন সবার থেকে অগ্রগামী ছিল। কারণ পেন্টাগনের সাথে তার বিশেষ চুক্তি ছিল। সিএনএন-এর যে অসাধারণ সুযোগ সুবিধা ও উপকরণের সরবরাহ ছিল, তা আর কোনো টিভি কোম্পানীর ছিল না। ইরাকও সিএনএন-এর সাংবাদিকদের ছাড়া বাকী অন্যসব সাংবাদিককে সে দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। এর ফলে কেবল সিএনএনই গোটা বিশ্বে ইরাক যুদ্ধের খবরাখবর এককভাবে প্রচার করছিল, কিন্তু এ রিপোর্টিংয়ের ওপরও পেন্টাগনের হাত ছিল।

সিএনএন–এর প্রধান কেন্দ্র আমেরিকার আটলান্টায় অবস্থিত। সেখানে 'সিএনএন এশিয়া' নামে তার একটি বিশেষ চ্যানেল স্থাপন করা হয়েছিল, যে চ্যানেলে লাগাতার চব্বিশ ঘন্টা ইরাক থেকে প্রেরিত যুদ্ধের সংবাদ ও ছবি প্রচার করা হতো। এ ছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল সিএনএন স্টুডিও'র মাধ্যমে সিএনএন–এর মডারেটরের সাথে বাগদাদ, রিয়াদ ও বাহরাইনে বিদ্যমান তার সাংবাদিকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ও সংযোগ থাকত। ১৯৯১ সালের ১৭ই জানুয়ারী বাগদাদে নিযুক্ত সিএনএন-এর রিপোর্টার পিটার অরেন্ট বাগদাদে মার্কিন হামলার বিস্তারিত যে রিপোর্ট আটলান্টায় অবস্থিত তাদের প্রধান কেন্দ্রে পাঠিয়েছিল, তাতে সে বাগদাদের ওপর আকাশ থেকে বোমাবর্ষণের বিস্তারিত ছবি পাঠিয়েছিল। এরপর তার ক্যামেরার মুখ জাহরান এয়ারপোর্টের দিকে ফিরিয়ে দেয়, যেখানে মার্কিন ও বৃটিশ বোমারু বিমান থেকে কমান্ডোদের অবতরণ করতে দেখা যাচ্ছিল। যারা সফল আকাশ হামলার পর খুশিতে আত্মহারা ছিল। উপসাগরীয় যুদ্ধের সংবাদ সরবরাহকারী চার হাজার ছয়শ' সাংবাদিকের তথ্য সংগ্রহের একমাত্র মাধ্যম ছিল সিএনএন। সিএনএন-এর অসাধারণ সফল রিপোর্টিং-এর কথা প্রেসিডেন্ট বুশও স্বীকার করেছেন। তিনি একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে গর্বের সাথে বলেছিলেন, সি.আই.এ থেকেও বেশি ভালো তথ্য সিএনএন থেকে পাওয়া যাচ্ছিল। খোদ সিআইএ'র ডাইরেক্টর উইলিয়াম ভিসিটার জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ব্রান্ট স্কো ক্রাফটকে ফোনে বলেছিলেন, আপনি সিএনএন খুলুন, তাহলেই দেখতে পাবেন আমাদের মিজাইল বাগদাদের কোথায় কোথায় আঘাত হানছে। ইরাকে বিমান হামলার তিন দিন পূর্বে সিএনএন তেলআবিব থেকে তার সাংবাদিক পিটার অরেন্টকে বাগদাদে প্রেরণ করেছিলো। সেখানে আগে থেকে আরো দু'জন সাংবাদিক জন হোলিম্যান ও

www.pathagar.com

বার্নার্ড শ' বিদ্যমান ছিলেন। এ তিন জন সাংবাদিক ইরাকের রশীদ হোটেলের নবম তলায় অবস্থান করছিলেন। তাদের সাথে আরো কিছু টেকনিশিয়ান ছিল, যারা গুপ্তচর বৃত্তির কাজ করছিল।

১৯৯১ সালের ১৭ই জানুয়ারী যখন বাগদাদে বিমান হামলা হলো, তখন প্রথম ধাপেই ইরাকের টিভি স্টেশন ধ্বংস এবং সকল স্যাটেলাইট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। এভাবে বহির্বিশ্বের সাথে বাগদাদ সরকারের সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু সিএনএন-এর সাংবাদিকদের নিকট ডিশ এন্টিনা ছিল, যার সাহায্যে তারা বাগদাদের টিভি ও স্যাটেলাইট ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী না হয়ে সরাসরি আটলান্টার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে যুদ্ধের সংবাদ ও দৃশ্য বিশ্ববাসীর সামনে প্রচার করছিল। আটলান্টার স্টুডিওতে বসে মডারেট যেভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন ঠিক সেভাবে পেন্টাগণ বোমাবর্ষণ ও বিমান হামলার নির্দেশ জারি করত। ১৯৯১ সালের ১৭ই জানুয়ারীর রিপোর্টিংয়ে বাগদাদ ও আটলান্টার মাঝে যেসব প্রশ্ন উত্তর হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

রিপোর্টার হোলিম্যান : আমি বাগদাদের রশীদ হোটেল থেকে দেখতে পাচ্ছি, বাগদাদের বিভিন্ন অঞ্চলে বোমাবর্ষণ চলছে।

মডারেট : আমি শুনতে পেলাম, সাদ্দাম হুসাইন জনগণের নামে কোন পয়গাম প্রচার করেছে।

রিপোর্টার : আমিও শুনেছি, আজ সকাল চারটা বিশ মিনিটে সাদ্দাম হুসাইন টিভি স্টেশনে তার পয়গাম রেকর্ড করাতে গিয়েছিলেন।

মডারেট : সাদ্দাম হুসাইন কি এখনো টিভি স্টেশনে রয়েছেন?

রিপোর্টার : আমি নিশ্চিত নয়, তবে আমাদের সাথে যেসব টেকনিশিয়ান আছেন তারা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, সাদ্দাম হুসাইন আজ সকাল চারটা বিশ মিনিটে টিভি স্টেশনে গিয়ে জনগণের নামে একটি পয়গাম রেকর্ড করিয়েছেন।

মডারেট : দ্বিতীয়বার কি আবার সাদ্দাম হুসাইন টিভি স্টেশনে আসবেন?

রিপোর্টার : আমার জানা নেই, হতে পারে আবার আসবেন।

মডারেট : আমরা শুনতে পেলাম, প্রেসিডেন্ট ভবনেও নাকি হামলা হয়েছে?

রিপোর্টার : আমরা এখান থেকে যা দেখতে পাচ্ছি তা হলো, প্রেসিডেন্ট ভবনের ডান দিকের এলাকায় বোমাবর্ষণ হয়েছে। হতে পারে এই হামলার টার্গেট ছিল প্রেসিডেন্ট ভবন। আবার এমনও হতে পারে, জবরদস্ত বোমাবর্ষণের ফলে বোমারু বিমান সঠিক টার্গেটে বোমা ফেলতে পারেনি।

মডারেট : এখনো পর্যন্ত কি প্রেসিডেন্ট ভবনের ওপর বোমাবর্ষণ হয়নি?

রিপোর্টার : আমার ধারণা, প্রেসিডেন্ট ভবন সংলগ্ন এলাকায় বোমা বর্ষণ হয়েছে।

মডারেট : অনুগ্রহপূর্বক একটু বিস্তারিত জানান, কোথায় কোথায় বোমাবর্ষণ হয়েছে?

রিপোর্টার : প্রতিটি স্থানে বোমাবর্ষণ হচ্ছে। তবে প্রেসিডেন্ট ভবন সংলগ্ন দক্ষিণ অংশেই

www.pathagar.com

কঠিন বোমাবর্ষণ হচ্ছে। বিমানবিধ্বংসী কামানের আলোও আসমানে ছড়িয়ে পড়ছে। আমার ধারণা, যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্র সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

মডারেট : আপনি কি কোনো বিপদ শংকা অনুভব করছেন?

রিপোর্টার : এমনটাই মনে হচ্ছে। যদি কোনো বিমান পাই তা হলে আজ দুপুর দুইটা পর্যন্ত বাগদাদ ছেড়ে দেব।

মডারেট : বাগদাদ এয়ারপোর্ট কি এখনো সংরক্ষিত আছে, তার ওপর বোমা বর্ষণ হয়নি?

রিপোর্টার : হ্যাঁ, বাগদাদ এয়ারপোর্ট এখনো সংরক্ষিত আছে। সেখানে এখনো বোমবর্ষণ হয়নি। যদি দুপুর দুইটা পর্যন্ত বাগদাদ এয়ারপোর্ট সংরক্ষিত থাকে তাহলে হতে পারে কোনো বিমান পেয়ে যাব।

মডারেট : আপনি কি বলতে পারেন, সাদ্দাম হুসাইন এখন কোথায় আছেন? প্রেসিডেন্ট ভবনে, না সামরিক হেড কোয়ার্টারে, না টিভি স্টেশনে?

রিপোর্টার : নির্ধারিতভাবে বলা যাচ্ছে না তিনি কোথায় আছেন। আমরা যখনই জানতে পারব, সাথে সাথে আপনাকে অবহিত করব।

মডারেট : আপনি সতর্ক থাকবেন, আপনার নিরাপত্তার বিষয়টা লক্ষ্য রাখবেন। আপনার সাথে আমরা যোগাযোগ রাখব।

টিভি রিপোর্টারদের এই কথপোকথন সকাল পাঁচটা থেকে দশটা পর্যন্ত চলছিল। সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ভবন, সচিবালয়, বাগদাদ এয়ারপোর্ট, টিভি ভবন, প্রেসিডেন্ট ভবন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনা বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়। বাগদাদ এয়ারপোর্ট ধ্বংস হয়ার পরই ইরাকের শাসকদের হুশ ফিরলো, সিএনএন-এর রিপোর্টাররা মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে কিভাবে বাগদাদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। ওইদিন সন্ধ্যায় ইরাক সরকার সিএনএন-এর সকল সাংবাদিককে বাগদাদ ত্যাগ করার নির্দেশ জারি করে। কেবল সিএনএন-এর সাংবাদিক পিটার অরেন্টকে বাগদাদে থাকার অনুমতি দেয়। কারণ তিনি ইরাকী প্রেসিডেন্টের ভাষণ ও সাক্ষাতকারগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রচার করতেন। পেন্টাগনের নির্দেশে পিটার অরেন্ট ভয়াবহ বোমা হামলার মাঝেও প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসাইন থেকে বিস্তারিত সাক্ষাতকার নিয়েছেন, কিন্তু যেহেতু সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, এজন্য এই সাক্ষাতকারটি আটলান্টায় সিএনএন-এর প্রধান কেন্দ্রে প্রেরণে বড় সমস্যা হচ্ছিল। পিটার অরেন্ট পেন্টাগনের কাছে আবেদন জানালেন মাত্র চার ঘন্টার জন্য বোমা হামলা বন্ধ রাখা হোক, যাতে ডিশ এন্টিনার সাহায্যে ইরাকী প্রেসিডেন্টের সাক্ষাতকারটি আটলান্টায় পাঠানো যায়। পিটার অরেন্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে পেন্টাগন চার ঘন্টার জন্য বোমা হামলা বন্ধ রাখে। যুদ্ধের পর জন হোলিম্যান এবং বার্নার্ড শ'-এর কাছ থেকে আটলান্টায় সিএনএন-এর প্রধান কেন্দ্র একটি সাক্ষাতকার নিয়েছিল। উক্ত সাক্ষাতকারে একটি প্রশ্ন এও ছিল, বলা হয়ে থাকে, আপনারা দু'জন পশ্চিমা দেশগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন। এ প্রশ্নের

www.pathagar.com

জবাবে তারা স্বীকার করেন, যদি এমনটি মনে করা হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের ধারণামতে এটা সঠিক এবং সিএনএন পৃথিবীর যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। আজ আমেরিকা টেকনোলজি এবং সামরিক কৌশলের দিক দিয়ে উন্নতি-অগ্রগতির সর্বশীর্ষে পৌঁছে গেছে। মার্কিন বিমানবাহিনী প্রধান রিয়াদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বীকার করেছেন, সিএনএন-এর সাংবাদিকরা পশ্চিমা দেশগুলোকে অতি মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন। আমরা সিএনএন-এর প্রোগ্রাম দেখেই অপারেশনের নির্দেশ জারি করতাম। সিএনএন যেসব এলাকা চিহ্নিত করত আমরা সেখানেই বোমারু বিমান প্রেরণ করতাম। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীও স্বীকার করেছেন, বাগদাদে বোমা হামলার দৃশ্য আমরা সিএনএন-এ দেখতাম। পরবর্তীতে সি.আই.এ স্বীকার করেছে, সিএনএন ও পেন্টাগনের মাঝে পূর্ণ সহযোগিতা ও সমন্বয় ছিল। মার্কিন সরকার যুদ্ধের পর জন হোলিম্যান ও বার্নার্ড শ'-কে যুদ্ধে তাদের অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পেন্টাগনের উচ্চ পদে সমাসীন করে।

সাবেক পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নতুন বিশ্বব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করেছে, তার মৌলিক চারটি স্তম্ভ রয়েছে। এই চারট স্তম্ভের মূল উদ্দেশ্য হলো, যে কোনো মূল্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একুশ শতকে একক পরাশক্তি হিসেবে টিকিয়ে রাখা এবং তার বিকল্প যে কোনো শক্তির উত্থান প্রতিহত করা। যে চারটি মৌল স্তম্ভের ওপর মার্কিন ইমারত নির্মিত, তা হলো–

০১. **বিশ্বায়ন বা নতুন বিশ্বব্যবস্থা :** বিশ্বায়নের অর্থ হলো, গোটা বিশ্বে এমন একটি অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করা, যেখানে স্বাধীন বাণিজ্য, পুঁজির অবাধ প্রবাহ এবং বহুজাতিক কোম্পানীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ওপর পশ্চিমা জাতিসমূহ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যকে স্থায়ী রূপ দেয়া হবে।

০২. **ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও ধর্মীয় উদারতার বিকাশ :** ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও ধর্মীয় উদারতার বিকাশ ইত্যাদি মুখরোচক এবং আপাতমধুর শ্লোগানের অন্তরালে সেসব দেশে পশ্চিমা জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যেসব দেশের ওপর রাজনীতি, অর্থনীতি, মিডিয়া ও প্রযুক্তির সরু পথ ধরে সহজেই বুদ্ধিবৃত্তিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও সভ্যতার প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভব হবে।

০৩. **টেকনোলজি :** টেকনোলজি তথা তথ্য-প্রযুক্তির ওপর, বিশেষ করে নিউক্লিয়ার ও হাইটেক টেকনোলজির ওপর পশ্চিমা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ হলো, চ্যালেঞ্জের উর্ধ্বে আমেরিকার ভবিষ্যত সামরিক শক্তিকে সুদৃঢ় সুসংহত করা এবং তার বিরুদ্ধে যে কোনো বিপদ বিপর্যয় নির্মূল করা, চাই তা লৌহ প্রাচীরের মতোই হোক না কেন।

০৪. **নতুন নতুন রাজনৈতিক গাঁটছড়া :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত সচেতনতার সাথে বিশ্ব মানচিত্রে নতুন নতুন রাজনৈতিক খেল খেলছে। যেমন– ন্যাটোর সম্প্রসারণ, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলের সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর এখন তার অর্থনৈতিক বিজয়ের

www.pathagar.com

জন্য আরব বিশ্বের সাথে সমঝোতা করার প্রচেষ্টা, মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে পার্শ্ববর্তী রুশ ও পশ্চিমাপন্থী দেশগুলোকে উসকে দেয়া এবং ভারতকে এশিয়ার সুপার পাওয়ার হিসেবে সামনে অগ্রসর করার প্রচেষ্টা, যাতে এশিয়ার ইসলামী দেশগুলো এবং সেখানকার সক্রিয় ইসলামী সংগঠনগুলোকে নির্মূল করার পরিকল্পনা সহজেই বাস্তবায়ন করা যায় ইত্যাদি।

পশ্চিমা মিডিয়ার মাধ্যমে উল্লিখিত চারটি স্তম্ভকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলো তাদের সকল শক্তি ব্যয় করছে।

উপসাগরীয় যুদ্ধের একতরফা সংবাদ পরিবেশনে মিডিয়া জগতে নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে। গোটা বিশ্বের পথনির্দেশকারী মেধাবী সাংবাদিকদের মার্কিন পেন্টাগনের একতরফা নতুন পলিসি শিহরিত করেছে যে, এ যুগেও মিডিয়া ও গণমাধ্যমের ওপর মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের শতভাগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং যে যতই হাত-পা মারুক কিংবা প্রতিবাদের ঝড় তুলুক, তার এই চিৎকার নিরব-নিভৃত পল্লীতে অসহায়ের রোদন ছাড়া আর কিছুই নয়। আর বাস্তবে এমনটিই হয়েছে এবং হচ্ছেও যে, গোটা বিশ্বের সকল সংবাদ প্রথমে আমেরিকায় পাঠানো হয়। তারপর সেখানে সেই সংবাদগুলো কেটে ছেঁটে নিজেদের আঙ্গিকে তৈরি করে গোটা বিশ্বে তা প্রচার-প্রসার করা হয়। এভাবেই বিশ্বায়নের রাস্তা সুগম করা হচ্ছে। বিশ্বায়ন আজ মিডিয়ার পথ ধরে ভয়ংকর শক্তিশালী হয়ে ওঠছে।

কিন্তু এর অর্থ এ নয়, আমরা ইহুদী সংকল্পের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করে কিংবা নিরাশ হয়ে যাব। না, বরং এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত সর্বদিক দিয়ে প্রয়াস চলছে। প্রতিটি স্তরে গঠনমূলক ও ইতিবাচক চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যদিও এই প্রচেষ্টা উটের মুখে খড়কুটা দেয়ার মতো, কিন্তু তথাপি খড়কুটার আকৃতিতে হলেও প্রয়াস চলছে। এই প্রয়াস প্রচেষ্টা বেশির ভাগ পশ্চিমা দেশেই শুরু হয়েছে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তুরস্কে রেডিও এবং টিভি স্টেশন স্থাপন করে সেখান থেকে ইসলামের শিক্ষা ও নীতিমালা প্রচার-প্রসার করা হচ্ছে। তুরস্ক ও কাতার থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টিভির প্রোগ্রাম প্রচার করা হচ্ছে, যা ইউরোপ-আমেরিকায় বিরাট জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। যখন থেকে সৌদি সরকার সিএনএন ও স্টার টিভির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে হজ্জের অনুষ্ঠানগুলো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে প্রচার শুরু করেছে, তখন থেকে ইসলাম সম্পর্কে জানার একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি সৌদি সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিশ্বময় এ যুগান্তকারী পদক্ষেপের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে। সৌদি, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার ও তুরস্কের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দাওয়াতী, শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান মিসর, সুদান, নাইজেরিয়া এবং ভারত উপমহাদেশে কাজ করছে। ইসলামের দাঈরা ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারে তাদের সম্ভাব্য সকল শক্তি ব্যয় করছে। অত্র গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে এ বিষয়টি নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে। বক্ষ্যমাণ

www.pathagar.com

গ্রন্থের বেশির ভাগ তথ্য আরবী, ইংরেজি ও উর্দূ বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও ম্যাগাজিন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যার একটি তালিকা গ্রন্থের শেষে প্রদান করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হলো, শত্রুর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া, পশ্চিমা মিডিয়ার সরবরাহকৃত সংবাদগুলোকে ওহীর দরজা না দেয়া এবং নব প্রজন্মকে একথা বলে পশ্চিমা মিডিয়ার ছাঁচে গড়ে ওঠার খোলা ছুট না দেয়া, যদি শিশুরা বাড়ীতে টিভি দেখার সুযোগ না পায় তাহলে অন্যত্র লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবে।

আশা ছিল, গ্রন্থটি মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)-এর জীবদ্দশাতেই প্রকাশ পাবে। তিনি জানতেনও কিতাবটি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। মৌখিকভাবে তিনি মূল্যায়নও করেছেন এবং সাহসও যুগিয়েছেন, এমনকি একটি ভূমিকা লেখে দেয়ার কথাও বলেছিলেন, কিন্তু তাকদীর তা বাস্তবায়ন করতে দেয়নি। এই ক্ষতিপূরণ তো আর সম্ভব নয়, তবে বরকতস্বরূপ বিষয়ের সাথে মিল রেখে তাঁর দু'টি ছোট্ট লেখা গ্রন্থের শুরুতে পেশ করা হয়েছে। আমার মুরব্বী আল্লামা সাইয়েদ মুহাম্মদ রাবে' হাসানী নদভী (দা. বা.)-এর শুকরিয়া আদায় না করে পারছি না। তিনি তাঁর মূল্যবান ভূমিকার মাধ্যমে এ গ্রন্থের আবেদনকে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন।

পশ্চিমা মিডিয়ার সুদূরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও তার প্রসারিত বিশ্বজোড়া ধ্বংসলীলা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন আর-রায়েদ পত্রিকা সম্পাদক হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ ওয়াজেহ রশীদ হাসানী নদভী (দা. বা.)। তিনি এ গ্রন্থের বিন্যাসে আমাকে তুলনাহীন সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন।

মিডিয়া আমার কোনো বিশেষ বিষয়বস্তু নয়; বরং ব্যক্তিগত আগ্রহই আমাকে এ গ্রন্থ লেখার পথে উদ্বুদ্ধ করেছে। মিডিয়া বিশেষজ্ঞদের নিকট আমার আবেদন থাকবে, আপনারা আমাকে উপকারী পরামর্শ দিয়ে এ ধারা আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সহযোগিতা করবেন। মহান আল্লাহ তাআলার নিকট সকরুণ নিবেদন, তিনি যেন এ গ্রন্থটি দাওয়াতী উদ্দেশে কবুল করে নেন এবং সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন। —আমীন।

১৭ই জমাদিউস সানী, ১৪২১ হিজরী
১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০০ ঈসায়ী

বিনীত,
নজরুল হাফীজ নদভী
দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা

www.pathagar.com

ভূমিকা

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার নাটক : ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে নয়া ক্রুসেডের সূচনা

বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তাঁর বিভিন্ন লেখা ও আলোচনায় বার বার বলতেন, 'মার্কিন (খৃস্ট) শক্তি ও ইহুদী মস্তিষ্ক দুটো একযোগে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে নির্মূল করার জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়ে ময়দানে আবির্ভূত হয়েছে।'

একদিকে সামরিক শক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের গণহত্যা, অপরদিকে বিশ্বায়নের নামে তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতি নির্মূল করার নিরন্তর প্রয়াস চলছে। আর অর্থনৈতিক যাঁতাকলে তো বহু পূর্ব থেকেই ইসলামী বিশ্বকে নিস্পেষণ করা হচ্ছে।

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনের ওপর হামলার যে নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে, তার পেছনে সম্পূর্ণ মার্কিন শক্তি ও ইহুদী মস্তিষ্ক কাজ করেছে। এটি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে একটি সুগভীর ষড়যন্ত্র, নয়া ক্রুসেডের সূচনা। এই ষড়যন্ত্রের পেছনে বহু বছর ধরে পরিকল্পিতভাবে নভেল, নাটক ও ফিল্মের মাধ্যমে মস্তিষ্ক ধোলাই করা হয়েছে। ইহুদী চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতারা এই কাজ আজ থেকে বাইশ বছর পূর্ব থেকে শুরু করেছে। তারা রাশিয়ার পতনের পর ইসলামকে প্রধান টার্গেট বানিয়েছে। ইসলামকে দাঁড় করিয়েছে পুঁজিবাদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। এর জন্য তারা চারদিকে জোরেশোরে এই প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে, আগামী শতাব্দী হবে ইসলামের শতাব্দী। আগামী শতাব্দীতে ইসলাম একটি শক্তিশালী মতবাদ ও চিত্তাকর্ষক সভ্যতার আকারে গোটা দুনিয়ার ওপর ছেয়ে যাবে। কারো সাথে যদি তার দ্বন্দ্ব সংঘাত হয় তাহলে তা হবে পশ্চিমা সভ্যতার সাথে। এসব প্রোপাগান্ডাকারী ইহুদী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সর্বশীর্ষে রয়েছেন বার্নার্ড লুইস ও স্যামুয়েল হান্টিংটন, যারা 'Clash of Civilization (সভ্যতার দ্বন্দ্ব) তত্ত্ব বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছে। বিশ্ব জায়নবাদী গোষ্ঠী এই তত্ত্বকে মিডিয়ার নিকট অর্পণ করেছে। মিডিয়া বিভিন্নভাবে সিনেমা, ফিল্ম, নভেল, নাটক, বক্তৃতা-বিবৃতি ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের মন-মস্তিষ্কে একথা মজবুতভাবে ঢুকিয়ে দেবার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়েছে যে, কমিউনিজমের পতনের পর পাশ্চাত্যের শত্রুতার গতিপথ এখন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে রুখ করেছে।

১৯৯০ সালের বসন্তকালে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ইহুদী গুরু হেনরী কিসিঞ্জার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এক বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন, 'এখন পরিস্থিতি হচ্ছে, বর্তমানে পাশ্চাত্যের সামনে নতুন দুশমন হলো ইসলাম, যা ইসলামী বিশ্ব ও আরব বিশ্বের বিশাল এলাকা জুড়ে পরিব্যাপ্ত।'

www.pathagar.com

২০০১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরে কিসিঞ্জার দ্বিতীয় বক্তৃতায় বলেন, 'ইসলামী সন্ত্রাস ও চরম পন্থার বিরুদ্ধে আগামীকালের পরিবর্তে আজই যুদ্ধ শুরু করা উচিত।' একই তারিখে বৃটিশ দৈনিক সানডে টেলিগ্রাফ একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে। যার শিরোনাম ছিলো, 'ইসলাম কি আমাদের দাফন করে দেবে?' একই তারিখে লন্ডন থেকে প্রকাশিত সানডে টাইমস তার সম্পাদকীয়তে পাশ্চাত্যের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছে, 'উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্য এশিয়ার চীন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ইসলামী ফান্ডামেন্টালিজম তথা ইসলামী মৌলবাদ ফণা তুলেছে। অতি দ্রুত এই বিষাক্ত সর্পের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়া উচিত।'

১৯৯২ সালের এপ্রিলে ইকোনোমিস্ট পত্রিকা তার প্রথম পাতায় ইসলামকে টার্গেট বানিয়ে একটি কার্টুন ছেপেছে, যাতে এক আরব ব্যক্তি বন্দুক নিয়ে একটি মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একই তারিখে সাপ্তাহিক টাইম একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। যাতে বলা হয়েছে, গোটা বিশ্বকে ইসলামের বিপদ থেকে সতর্ক থাকা উচিত। পত্রিকাটি তার কভার পৃষ্ঠায় মসজিদের মিনারার ছবি ছেপেছে, যার পাশে এক ব্যক্তি মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে ফরাসী পত্রিকা মোন্ড ডিপ্লোমেট একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে, যাতে পত্রিকাটি লেখেছে, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুধু সামরিক ময়দানেই হবে না; বরং সভ্যতা সংস্কৃতির ময়দানেও লড়াই হবে। আর এটাই হবে চূড়ান্ত লড়াই।'

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শরীক হওয়ার জন্য বিশ্ববাসীকে যে দাওয়াত দিয়েছেন, তাতে তিনি ইসলামকে শেকড় থেকে উপড়ে ফেলার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। এই লড়াইয়ে তিনি ইসলামী বিশ্বের নেতৃবর্গকেও শরীক হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

আমরা আরেকটু অগ্রসর হয়ে যদি ইহুদী ষড়যন্ত্রের গভীরে যাই, তাহলে দেখতে পাবো, হলিউডের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক এই যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে হলিউড ইহুদীদের দুর্গ ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে হলিউড বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছড়ানোর কাজে লিপ্ত রয়েছে।

বিশ শতকের আশির দশকে হলিউড 'ডেল্টা ফোর্স, প্রতিশোধ (১৯৮৬), লাঞ্ছনার পূর্বে মৃত্যু (১৯৮৭), আকাশে চৌর্যবৃত্তি (১৯৮৮) ইত্যাদি যেসব ফিল্ম নির্মাণ করেছে তার মূল কথাই ছিল, আরব বেদুঈনরা ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের মালিক। তারা এসব অস্ত্রের মাধ্যমে নিরীহ-নিষ্পাপ মানবতাকে হত্যার হুমকি দেয়, কিন্তু পাশ্চাত্যই কেবল এসব নিরীহ-নিষ্পাপ মানুষকে হিংস্র আরবদের কবল থেকে রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করছে। পাশ্চাত্য সকল মানুষের মৌলিক অধিকারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এখন পাশ্চাত্য দু'টি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। একদিকে লাল কমিউনিজম অপরদিকে ইসলামী সবুজ পতাকা, যার পুরোটাই মানবতার জন্য অনিষ্ট ও অকল্যাণকর।

www.pathagar.com

১৯৯২ সালে অভিজ্ঞতার জন্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে প্রথমবার হামলার নাটক মঞ্চস্থ করার পর হলিউড 'প্রকৃত মিথ্যা' নামে একটি সিনেমা নির্মাণ করে, যার মূল কথা ছিল, আমেরিকায় একটি গোপন আরব মিলিশিয়া সক্রিয় রয়েছে। যাদের শ্লোগান 'মুসলমানদের স্বাধীনতা'। এই মিলিশিয়া আমেরিকায় বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করছে। সেই পরিকল্পনার আওতায় তারা আমেরিকার বিমান অপহরণ করে নিউইয়র্কে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রে আত্মঘাতী হামলার জন্য আকাশে উড্ডয়ন করেছে। ইতোমধ্যে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার এক অফিসার ও তার স্ত্রী তাদের আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়। তারা উভয়ে সন্ত্রাসীদের এই হামলা ব্যর্থ করে দেয়। এভাবে তারা নিউইয়র্ককে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।

'মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিমান অপহরণ' নামে দ্বিতীয় আরেকটি ফিল্মে বলা হয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্র দাগেস্তানের কিছু লোক দীর্ঘ দিন ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। সেই ষড়যন্ত্রের আওতায় তারা বুশকে হত্যার জন্য তাঁর বিমান অপহরণ করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা ও শত্রুতা ছড়ানোর অংশ হিসেবে ১৯৯৮ সালে হলিউড আরেকটি ফিল্ম নির্মাণ করে। সেটি ছিল হলিউডের এ যাবতকালের সবচে' ব্যবসা-সফল ফিল্ম। তাতে দেখানো হয়েছে, শান্তি-নিরাপত্তার প্রবক্তা ও গোটা মানবতার কল্যাণকামী আদর্শ দেশ আমেরিকার সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য হিংসা-বিদ্বেষে ভরপুর মানবতার দুশমন মুসলমানরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে এ কাজের সূচনা করেছে। গোটা দুনিয়ার যদি ভয় ও বিপর্যয়ের আশংকা থাকে তাহলে সে আশংকা মধ্যপ্রাচ্যের আরবদের থেকে।

সুচতুর ইহুদীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে নির্মূল করার জন্য নতুন কিছু টেকনিক গ্রহণ করেছে। সে টেকনিকগুলো হলো–

এক. মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার-প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্ব-জনমত বিষিয়ে তোলা।

দুই. মুসলিম বিশ্বের যশ, খ্যাতি ও উচ্চাভিলাষী কিছু সংখ্যক নেতৃবর্গের পাশ্চাত্য বিরোধিতাকে মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার-প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে তাদের মুসলমানদের দৃষ্টিতে হিরো বানানো। এরপর তাদের দ্বারা স্থূলভাবে ইসলাম বিরোধিতার কাজ নেয়া এবং তাদের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে নির্মূল করা।

কামাল থেকে জামাল এবং গাদ্দাফী থেকে সাদ্দাম পর্যন্ত নেতৃবর্গের কর্মকান্ড দ্বারা এ তিক্ত বাস্তবতাই ফুটে ওঠে। এ জন্যই মার্কিন পত্রিকা নিউজউইক লেখেছে, যদি সাদ্দাম না হতো তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আরেকজন নতুন সাদ্দাম আবিষ্কার করার প্রয়োজন পড়ত।

পাশ্চাত্য অর্বাচীন মোস্তফা কামাল পাশা আতাতুর্ককে গাজী বানিয়ে ইসলামী খেলাফতের সিংহাসন উল্টে দিয়েছে। জামাল আবদুন নাসেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু আখ্যা দিয়ে তার হাতে হাজারো মিসরীকে হত্যা করিয়েছে। ইরাকের সাদ্দাম হুসাইনকে

www.pathagar.com

আমেরিকা তার স্বার্থে ব্যবহার করেছে, কিন্তু যখন আমেরিকার স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেছে তখন তাকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করেছে। এই সাদ্দাম হুসাইন আমেরিকার প্ররোচনায় হাজারো ইরাকী ও কুয়েতী জনগণকে হত্যা করেছে। পরে তাকেই বলির পাঁঠা হতে হয়েছে। এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইসলামী বিশ্বের অন্যান্য নেতৃবর্গও তাদের আমলনামা কলংকিত করতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। যাদের মধ্যে সিরিয়ার বাশ্‌শার আল আসাদ, পাকিস্তানের জেনারেল পারভেজ মোশাররফ, লিবিয়ার মোয়াম্মার আল গাদ্দাফী এবং আফগানিস্তানের হামিদ কারজাই উল্লেখযোগ্য।

তিন. নিজের নাক নিজের হাতেই কর্তন করে শত্রুকে নির্মূল করার বাহানা তৈরি করা।

চার. শত্রু সম্পর্কে পক্ষে বিপক্ষে উভয় ধরনের সংবাদ ধারাবাহিক ও পরিকল্পিতভাবে প্রচার করা, যাতে তৃতীয় কোন আওয়াজ না ওঠে।

সাম্প্রতিক পশ্চিমা মিডিয়া আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশে বসবাসরত মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়া ও বিশ্বব্যাপী ধর্ম হিসেবে ইসলামের ব্যাপক জনপ্রিয়তার জুজুও দাঁড় করিয়েছে। ইহুদী মিডিয়া প্রচার করছে, ইউরোপ-আমেরিকার একদিকে যেমন পূর্ব ও পশ্চিম থেকে বিপদের আশংকা রয়েছে, তেমনিভাবে অভ্যন্তরীণ বিপদও কম নয়। চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও গবেষকরা ছাড়া পশ্চিমা এবং মার্কিন রাজনীতিকরাও এসব বিপদ চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, ২০৫০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমা জগত, বিশেষত আমেরিকার অবস্থা বর্তমান তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো হয়ে যাবে।

যেমন মার্কিন রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মি. প্যাট্রিক বুকানন*তাঁর 'পাশ্চাত্যের মৃত্যু' নামক গ্রন্থে লেখেন, '২০৫০ সাল পর্যন্ত আমেরিকার অবস্থা বর্তমান তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো হয়ে যাবে। সে সময় আসল ইউরোপীয়দের সংখ্যা কেবল দশ শতাংশ হবে। তাদের মধ্যেও আবার এক তৃতীয়াংশ এমন হবে যাদের বয়স হবে ষাটের উর্ধ্বে। জাপানের অস্তিত্বও পশ্চিমাদের মতো নির্মূল হয়ে যাবে। কারণ জাপানে মানব জন্মের হার ইউরোপ-আমেরিকার মতোই ভয়াবহ আকারে হ্রাস পাচ্ছে।'[১] মি. বুকানন তাঁর গ্রন্থে বর্তমান সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণের আলোকে একটি জরিপ পেশ করেছেন, তাতে তিনি বলেছেন, ২০৫০ সাল নাগাদ ইউরোপের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে তা সর্বমোট ১৩৫ মিলিয়নে গিয়ে দাঁড়াবে। তার মধ্যে ২৩ মিলিয়ন জনসংখ্যা হ্রাস পাবে জার্মানীর। রাশিয়ার ৩০ মিলিয়ন এবং ইটালির ১৩ মিলিয়ন হ্রাস পাবে। রাশিয়ার জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে হ্রাস পাবে এবং সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাবে। মি. বুকাননের ভবিষ্যতদ্বাণী অনুযায়ী ইউরোপের জনসংখ্যা হ্রাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য তার সামনে মাত্র দু'টি রাস্তাই খোলা আছে। এক. বেকারত্ব ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তারা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন কমিয়ে

১. মি. বুকানন তিন বার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়ে তিন বারই বিফল হয়েছেন।

www.pathagar.com

দিতে হবে। দুই. আরব বিশ্ব থেকে লাখে লাখে আরবদের নিয়ে এসে ইউরোপে পুনর্বাসন করতে হবে, যাতে তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছল অবস্থা বহাল থাকে।

মি. বুকানন ইসরাঈল সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন, ২০৫০ সাল নাগাদ ফিলিস্তিনীদের সংখ্যা ১৫ মিলিয়নে গিয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ ইহুদীদের দ্বিগুণ হয়ে যাবে, যা তাদের কোমর ভাঙ্গার জন্য যথেষ্ট। বর্তমানের ইন্তেফাদা আন্দোলনের কারণে যেভাবে ইসরাঈলীরা তাদের বসতি ছেড়ে ফিলিস্তিন থেকে পলায়ন করছে তা আগামীতে আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

মি. বুকানন বলেন, সকল খৃস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সংখ্যা সবচে' বেশি ছিল, কিন্তু বর্তমান অবস্থা হলো, মুসলমানদের সংখ্যা ক্যাথলিকদের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় তিক্ত বাস্তবতা হলো, খৃস্ট জাতি দ্রুত পতনের পথে ধাবিত হচ্ছে। তাদের নিকট ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা হ্রাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কোনো পথ খোলা নেই। এটি পশ্চিমের জন্য সবচে' উদ্বেগের কারণ, যা তাদের নিজের হাতের তৈরি। এজন্য অনিবার্যভাবেই তাদের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে সীমিত হয়ে যাবে। তাদের জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার মূল কারণ হলো, অবাধ যৌন স্বাধীনতা, চারিত্রিক ও নৈতিক বিপথগামিতা এবং মানব সমাজের ওপর ধর্মের বাঁধন শিথিল হয়ে পড়া।* একে তারা নিজেরাও ধর্মীয় আকীদার অপমৃত্যু মনে করে।[২]

মি. বুকানন বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হবে, যে যুদ্ধে মেক্সিকো বিজয় লাভ করবে। কারণ মেক্সিকো জনসংখ্যা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতার দিক দিয়ে সবার চেয়ে অগ্রগামী থাকবে। গ্রন্থের সমাপ্তিতে মি. বুকানন ধর্মীয় ও চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, যখন ধর্মীয় আকীদা নির্মূল হয়ে যায় তখন অনিবার্যভাবে তার অনুসারীদের অস্তিত্বও নিরর্থক হয়ে পড়ে। সে হিসেবে ইউরোপ-আমেরিকায় খৃস্ট

২. এক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সামাজিক উন্নতির জন্য স্থায়ী অটুট পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন অবশ্যই প্রয়োজন। গবেষণা দলীল-প্রমাণের আলোকে বলেছে, প্রকৃতিগত পারিবারিক বন্ধন সন্তানদের সামগ্রিক কল্যাণের পথ দেখায়। তন্মধ্যে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা, উত্তম চেতনা, শারীরিক সুস্থতা, শৈশবকালে বালিকাদের যৌন সম্পর্ক ও যৌন বিপথগামিতা থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি। আমেরিকায় পঞ্চাশ শতাংশ শিশু পিতা-মাতার বাড়ীতে শুধু মায়ের নিকট অসহায় দারিদ্রের জীবন যাপন করছে, আর দশ শতাংশ শিশু পিতা-মাতার ঘরে অসহায়ের চেয়েও অসহায়ের জীবন যাপন করছে। জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞরা বলেন, এক বৈজ্ঞানিক জরিপে জানা গেছে, বৈধ যৌন সম্পর্কের তুলনায় অবৈধ যৌন সম্পর্ক শারীরিক ও যৌন উভয় দিক দিয়ে বেশি ক্ষতিকর। এমন যৌন সম্পর্কের ফলে যেসব সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তাদের অবস্থা আরো ভয়াবহ। ইউরোপ-আমেরিকায় ২০ থেকে ২৫ বছর বয়সের প্রায় অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে বিবাহ ছাড়াই যৌন সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং এ ধরনের জীবনই তারা বেশি পছন্দ করে। পূর্ব ইউরোপে এমন লোকের হার ৪০ থেকে ৯০ শতাংশ। তাদের হাজারে মাত্র ৩৬ শতাংশ লোক বিবাহ করে। ১৯৯৬ সালের এক জরিপ থেকে জানা যায়, ৭৫ শতাংশ অবিবাহিত বালিকা গর্ভপাত করে। সরকার দুই লাখ আইনগত গর্ভপাতকারীদের জন্য ৫৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। ৭৫% বিবাহিত নারী গর্ভপাত ঘটায়। তন্মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ শ্বেতাঙ্গ নারী, যাদের দুই তৃতীয়াংশের বয়স ১৫ থেকে ২৪-এর মাঝামাঝি।

www.pathagar.com

ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস নির্মূল হয়ে গেছে। সেখানে ধর্মহীনতার সয়লাব শুরু হয়েছে। খৃস্ট আকীদা-বিশ্বাস ও চারিত্রিক মূল্যবোধের জানাযা সম্পন্ন করে রাখা হয়েছে। খুব দ্রুত সেখানকার আদালতও খৃস্টান ধর্মকে আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির গন্ডি থেকে বের করে দেবে।

এক সময় বিশেষজ্ঞগণ মার্কিন জনগণকে সালাদের এমন প্লেটের সথে তুলনা করত, যাতে সব উপাদান পরস্পরের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে ছিল, তাদের মাঝে কোনো রকম স্বাতন্ত্র্য অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু এই অবস্থা বেশি দিন বাকী থাকেনি। এক পর্যায়ে এশিয়ান মুহাজিরদের পক্ষ থেকে শ্বেতাঙ্গদের প্রাধান্য বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, যখন এশিয়ান মুহাজিরদের জন্মের হার ১৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেতে লাগল। এখন স্প্যানিশদের জন্মের হার শতকরা ৫৩ শতাংশ, কৃষাঙ্গদের ১৩ শতাংশ এবং শ্বেতাঙ্গদের মাত্র ৬ শতাংশ। এই পরিস্থিতির আলোকে এ আশংকা আরো ত্বরান্বিত হয়েছে যে, আগামী বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে সাদা মহাদেশের বর্ণই পাল্টে যাবে। সর্বসাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী যে বাস্তবতা ফুটে ওঠে তা হলো, সর্বমোট ২৬৭ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা ১৯৪ মিলিয়ন, কৃষাঙ্গদের ৩৩.৮ মিলিয়ন, স্প্যানিশদের সংখ্যা ২৯.৯ মিলিয়ন, এশিয়ানদের সংখ্যা ১০.৫ মিলিয়ন এবং রেড ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা ২৭ লাখ।

জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার [৩] পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আমেরিকা দ্রুত পতনের কোলে ঢলে পড়ছে। এ পতন ক্রমশঃ ত্বরান্বিত হচ্ছে। প্রসিদ্ধ মার্কিন বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি বলেন, পরাশক্তির দাবীদার আমেরিকা সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ঠিক, কিন্তু সে এ ময়দানে সম্পূর্ণ একা। অথচ জাপান, জার্মানী ও আমেরিকা সম্মিলিতভাবে অর্থনৈতিক ত্রিশক্তির মর্যাদা রাখা সত্ত্বেও আমেরিকা জাপান ও জার্মানীকে সামরিক শক্তি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এ কারণেই জাপান ও জার্মানী ক্রমেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠছে। কারণ আমেরিকা তার পরাশক্তি টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতি বছর সামরিক বাজেটে দুইশ' কোটি ডলার ভর্তুকি দিতে বাধ্য হচ্ছে। এই বাজেটের ৬৫ শতাংশ অর্থ নতুন সমরাস্ত্র নির্মাণে ব্যয় করা হয়, এর বিপরীতে তারা মাত্র ২ শতাংশ অর্থ শিল্প গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ব্যয় করে। এ কারণেই আমেরিকা শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাপান এবং জার্মানী থেকে পিছিয়ে পড়ছে। জাপান ও জার্মানীর সামরিক বাজেটে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। সামরিক বাজেটের অর্থ তারা শিল্পের উন্নয়ন ও গবেষণায় ব্যয় করছে। ফলে ক্রমেই জাপান ও জার্মানী অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমেরিকার তুলনায় শক্তিশালী হয়ে ওঠছে। পক্ষান্তরে সামরিক বাজেট পূরণ করতে গিয়ে আমেরিকার শিল্প উৎপাদন বিপুলহারে হ্রাস পাচ্ছে, বার্ষিক বাজেটের আকার ছোট হচ্ছে, বৈদেশিক ঋণ বাড়ছে এবং বাণিজ্যিক

৩. জনসংখ্যা কমতির মৌলিক কারণসমূহের একটি হচ্ছে নেশাকর দ্রব্যের অভ্যাস। সর্বসাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকায় পঁয়ত্রিশ লাখ লোক এমন রয়েছে, যারা সন্তান প্রজননের ক্ষমতা বঞ্চিত।

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ক্রমেই আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হচ্ছে। বহুজাতিক কোম্পানীগুলো চায়, আমরিকার অর্থনীতি যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই থাকুক। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে শ্বেতাঙ্গদের ওপর। বর্তমান অবস্থা হচ্ছে, আমেরিকার বৈদেশিক ঋণ দাঁড়িয়েছে ৪.৩ কোটি ডলার। অর্থনীতি ও আইন বিশেষজ্ঞরা বলেন, আমেরিকার অর্থনৈতিক দুরবস্থা কোনো আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব নয়।[৪] হ্যাঁ, যদি জাতীয় কোনো দুর্ঘটনা পেশ হয় তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেই জাতীয় দুর্ঘটনা হলো, নিজের হাতেই নিজের নাক কাটা। সেটা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার নাটকের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। একে বুনিয়াদ বানিয়ে আমেরিকা দক্ষিণ ও মধ্য-এশিয়ার ওপর কবজা করার জন্য আফগানিস্তান ও ইরাককে বলির পাঁঠা বানানোর পর ইরানের ওপর স্বীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

---

৪. সাম্প্রতিককালে মার্কিন অর্থনীতির দুর্দিন আরো চরম আকার ধারণ করেছে। সে দেশের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশও শেষ পর্যন্ত এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগী ধনী দেশগুলোর অর্থনীতিতে একের পর এক বিপর্যয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামগ্রিক ব্যর্থতাই স্পষ্ট করে তুলেছে। এসব দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট চরম আকার ধারণ করায় দেউলিয়া হয়ে পড়ছে একের পর এক বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক, বীমা, লিজিং, গৃহায়ন খাতসহ পুরো মার্কিন অর্থনীতিই এখন পতনের মুখে। আর সেই ঢেউ লেগেছে ইউরোপ, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার পুঁজিবাদী দেশগুলোতে। তথাকথিত অবাধ মুক্তবাজার ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদ যে কোন দেশের অর্থনীতির স্থিতিশীল সমাধান নয়–সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে তা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের ভূমিকা সঙ্কুচিত করে ব্যক্তিখাতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে অর্থনীতিকে শক্ত ভিত্তির ওপর ওপর দাঁড় করানোর পুঁজিবাদী ফর্মূলা যে কতোটা ভঙ্গুর– মার্কিন মুল্লুকে একের পর এক বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাও এখন প্রমাণিত।

গত কয়েক বছর ধরেই বিশ্ব পুঁজিবাদের রক্ষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে একের পর এক সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে। ছোট-বড় অনেক সঙ্কট মিলিয়ে তৈরি হয়েছে চরম অরাজক পরিস্থিতি। করপোরেট কেলেঙ্কারি, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি এবং গৃহায়ন খাতে চরম বিপর্যয় মিলিয়ে 'মহামন্দা'র মুখে পড়েছে মার্কিন অর্থনীতি। আর মন্দার ধাক্কায় দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে একের পর এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বিনিয়োগকারী ব্যাংক লিম্যান ব্রাদার্স দেউলিয়া হয়ে গেছে। গৃহঋণ বাজারে ধস নামার ফলে লিম্যান ব্রাদার্সের কোটি কোটি ডলার ক্ষতি হয়। এতে কোম্পানীটি নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে। দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাংক মেরিল লিনচ দেউলিয়াত্ব থেকে বাঁচতে ব্যাংক অব আমেরিকার দ্বারস্থ হয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় পাঁচটি ব্যাংকের মধ্যে তিনটি বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। একই অবস্থার মুখে পড়েছে বিশ্বের বৃহত্তম বীমা কোম্পানী এধাইজি। সর্বশেষ ফটকাবাজির আর্থিক দানব গোল্ডম্যান স্যাক্স ও মর্গ্যান স্ট্যানলি বিনিয়োগ ব্যাংকের স্ট্যাটাস পরিবর্তন করে হোল্ডিং কোম্পানীতে পরিণত হয়েছে।

সারা দুনিয়ার মতো যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মন্দা ও প্রবৃদ্ধির নিম্নগতির প্রভাব পড়েছে সে দেশের খেটে খাওয়া মানুষের ওপর। কারণ মন্দার কারণে একের পর এক শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো অন্য দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিরা কিনে নিচ্ছে। সব মিলিয়ে কাজ হারাচ্ছে হাজার হাজার আমেরিকান শ্রমিক। বাড়ছে বেকারত্ব। শুধু চলতি বছরের ৯ মাসেই প্রায় ৫ লাখ মার্কিন নাগরিক বেকার হয়ে গেছেন বলে পরিসংখ্যানে দেখা গেছে। ১৯২৯ সালের মহামন্দার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এতো বড় অর্থনৈতিক সঙ্কট আর কখনো দেখা যায়নি বলে মত দিয়েছেন বিশ্লেষকরা। এসব কিছু বলে দিচ্ছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। তার গমন পথের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে।–অনুবাদক

www.pathagar.com

আমেরিকার ভয়ের আরেকটি বড় কারণ হলো, শুধু ইউরোপেই নয়; বরং গোটা আমেরিকায় ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইহুদী লবি মুসলমানদের বিরুদ্ধে এ জন্য ধারাবাহিক প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে যে, স্বয়ং ইহুদীদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক পর্যায়ে তাদের প্রতি মার্কিনীদের ঘৃণা ও দূরত্ব বাড়ছে। আমেরিকায় বসবাসরত মুসলমানদের সাথে মার্কিনীদের যোগাযোগ ও লেনদেনের কারণে খৃস্টানদের সামনে ইসলামের বাস্তবতা ও সৌন্দর্য সুস্পষ্ট হচ্ছে। ইহুদীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই মর্মে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে আসছে, হযরত ঈসা (আ.) পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার তখনই আগমন করবেন যখন সকল ইহুদী তাদের আসল মাতৃভূমি ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন করবে। আর হযরত ঈসা (আ.) প্রকৃতপক্ষে ইহুদী বংশেরই লোক। আল্লাহর রহমত ততদিন আমেরিকার ওপর বর্ষিত হতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত আমেরিকা ইহুদীদের সাহায্য সমর্থন করতে থাকবে।

উপসাগরীয় যুদ্ধে যেসব মার্কিন সেনা অংশ নিয়েছিল, পরবর্তীতে তারা সৌদি আরবে কিংবা কুয়েতে অবস্থান করছে তাদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেছে। মার্কিন সমাজে এর অসাধারণ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পড়ছে। ইহুদীরা তাদের ঐতিহ্যগত হিংসা-বিদ্বেষ ও ইসলাম বিরোধিতার চেতনা কাজে লাগিয়ে প্রোপাগান্ডা আরো তীব্র করে দিয়েছে এবং মিডিয়ার মাধ্যমে সাধারণ মার্কিনীদের এই ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছে যে, প্রাচ্য থেকে আসন্ন বিপদ খুব কাছে। আজ-কালের মধ্যেই বড় ধরনের কোন হামলা হতে পারে। অতএব ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পরিবেশ তৈরির জন্য ধারাবাহিক সংবাদ আসতে থাকে এবং সরকারী বেসরকারী স্থাপনায় হামলার আশংকা প্রকাশ করা হতে থাকে। প্রাণপন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইহুদী লবি ওকলাহোমা ষড়যন্ত্রকে আরবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়নি। এ ব্যর্থতা তাদের হিংসার আগুন আরো বেশি তেজ করে দিয়েছে। সিনেমা, টিভি, রেডিও ও সংবাদপত্রে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে অব্যাহত ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। পাশ্চাত্যে বসবাসরত মুসলানদের প্রতিনিয়ত আতংকগ্রস্ত করে তোলা হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ইহুদী লবি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে হামলার পরিকল্পনা তৈরি করে, যাতে এক তীরে দুই পাখি শিকার করা যায়। প্রথম শিকার মুসলিম উম্মাহ আর দ্বিতীয় শিকার আমেরিকা তথা ইহুদীদের পুরাতন শত্রু খৃস্টান জাতি। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে, তাদের দুই আজন্ম শত্রু মুসলমান ও খৃস্টানদের থেকে ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

ঠান্ডা লড়াইয়ের পরিসমাপ্তির পর পশ্চিমা মিডিয়া, গবেষক, চিন্তাবিদ ও নীতিনির্ধারক সংস্থাগুলোর মুখে মুখে সর্বদা একই আলোচনা শুরু হয়, কমিউনিজমের পর পশ্চিমাদের সামনে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ পলিটিক্যাল ইসলাম (Political Islam)। 'সভ্যতার দ্বন্দ্ব' তত্ত্বটি মৌলিকভাবে বার্নার্ড লুইস (Bernerd Lewis)-এর আবিষ্কার, যা স্যামুলেয় হান্টিংটন-এর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই তত্ত্বটির ফলে পশ্চিমা গবেষক ও চিন্তাবিদদের মন-মস্তিষ্কে একথা ছেয়ে গেছে, ইসলাম ও পশ্চিমাদের মাঝে দ্বন্দ্ব–সংঘাত অনিবার্য। আফগানিস্তান ও ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আক্রমণ, ধ্বংসলীলা ও জবর দখলের ঘটনা একই প্রেক্ষাপটে হয়েছে।

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক বিষয়ক যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে দু'টি গ্রন্থ অতি গুরুত্বপূর্ণ। এক. আমেরিকা এন্ড পলিটিক্যাল ইসলাম (America and Political Islam), লেখক-গ্যারজেস। দুই. পলিটিক্যাল ইসলাম এন্ড দি ইউনাইটেড স্টেট (Political Islam and the United State), লেখক-পিন্টো।

উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে ইসলাম সম্পর্কে মার্কিন শাসকদের দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। এক শ্রেণীর ধারণা ইসলাম যুদ্ধংদেহী। অপর শ্রেণীর ধারণা ইসলাম সমঝোতাপ্রিয়।

যারা ইসলামকে যুদ্ধংদেহী মনে করেন তারা প্রকৃতিগতভাবেই ইসলামকে একনায়কতন্ত্রপ্রিয়, কট্টরপন্থী, গণতন্ত্রবিরোধী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিপন্থী পায়। ফলে অনিবার্যভাবেই ইসলাম পাশ্চাত্য ও ইসরাঈলের আজন্ম শত্রু। এই শ্রেণীর আমেরিকান নীতি নির্ধারকদের সিদ্ধান্ত হলো, প্রতিটি পর্যায়ে ইসলামকে প্রতিরোধ করা হবে এবং ইসলামী দেশগুলোর সেসব সরকারকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করা হবে, যারা পশ্চিমের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট। তারা যতই ডিক্টেটর ও একনায়কতন্ত্রী হোক না কেন, তাদের অবশ্যই টিকিয়ে রাখতে হবে। তাদের ধারণা, মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে যদি ইসলামী নেতৃত্ব রাষ্ট্র ক্ষমতায় চলে আসে তাহলে আল্লাহর নামে গণতন্ত্র দাফন হয়ে যাবে। অন্য ভাষায় ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে পাশ্চাত্যের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে। অপরদিকে যারা ইসলামকে সমঝোতাপ্রিয় মনে করেন তারা ইসলামকে কোনো ধরনের বিপদ আখ্যা দিতে সংশয় পোষণ করেন। তাদের বিশ্বাস, রাজনৈতিক ইসলাম মূলতঃ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঔপনিবেশিক যুগের রাজনৈতিক বঞ্চনার ফসল। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম গণতন্ত্র বিরোধী নয়; বরং গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই তারা মুসলিম দেশগুলোতে গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য পাশ্চাত্যের নাক গলানো নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং মুসলিম দেশগুলো নিয়ে পাশ্চাত্যের দ্বি-মুখী নীতির কঠোর সমালোচনা করেন।

গ্রন্থদ্বয়ের লেখকের ধারণা, আমেরিকার বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গির উৎস বিভিন্ন। লেখকদ্বয় আমেরিকার প্রচলিত কালচারে প্রভাবিত। তাই তাদের মতে, ইসলাম একটি বিদ্বেষী ও শত্রুতামূলক কালচার এবং মুসলমানরা ধর্মীয় কট্টরপন্থী, কঠোর গণতন্ত্র বিরোধী, সন্ত্রাসী, অবিশ্বস্ত এবং ক্রুসেড যুদ্ধসমূহের পর থেকে ইউরোপ ও ইসলামের পারস্পরিক কর্মের উত্তরাধিকার।

প্রথম গ্রন্থের লেখক গ্যারজেস তার গ্রন্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম সম্পর্কে জনগণের মতামত জরিপকারী অনেক জাতীয় জরিপের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেসব জরিপ মতে, ৩৬ শতাংশ মার্কিনী ইসলামকে আমেরিকার জন্য 'একটি কঠিন বিপদ' মনে করে। যেসব জরিপের তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার বেশিরভাগই ইসরাঈলী লবিগুলোর পরিচালিত। গ্যারজেস তার গ্রন্থে ইসরাঈল ও তার মিত্রদের সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ করেছেন তা অতি সংক্ষিপ্ত ও সংশয়পূর্ণ। তার বিশ্লেষণ দ্বারা এ আশংকাও নাকচ করে দেয়া যায় না যে, তিনি ইসরাঈলী লবির প্রতিক্রিয়াকে আরো রঙ চড়িয়ে উপস্থাপন করেছেন।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে অপর গ্রন্থের লেখক পিন্টোর বিশ্লেষণ বিস্তারিত ও খোলাখুলি। তিনি বিস্তারিতভাবে বলেছেন, কিভাবে ইসরাঈল ও তার লবিগুলো ইসলাম সম্পর্কে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি পলিসি তৈরি করে। তারা আমেরিকার ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করে যাতে আমেরিকার উন্নতি ও কর্ম স্বাধীনতা প্রভাবিত হয়। লেখক বিশ্লেষণ করে দলীল-প্রমাণের আলোকে বলেছেন, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পর থেকে ইসরাঈল আমেরিকার জন্য ইসলামকে আগামীর বিপদ ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থাপন করার প্রয়াস চালিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে সফলকাম হয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন পাশ্চাত্যপন্থী সরকারও আমেরিকার ইসলাম বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবকে শক্তিশালী করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। যেমন–আলজেরিয়া, মিসর, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, জর্ডান ও পাকিস্তান। এসব দেশের সরকারগুলো সর্বদা মার্কিন নেতৃত্বকে পাশ্চাত্যের আসন্ন বিপদ ইসলামী মৌলবাদ সম্পর্কে অবহিত করতে ব্যতিব্যস্ত থাকে। পাশাপাশি এই কল্পিত বিপদ নির্মূল করার জন্য তারা আমেরিকার দক্ষিণ হস্তের ভূমিকা পালন করে।

গ্যারজেস তার গ্রন্থে বলেছেন, ক্লিন্টন প্রশাসন ইসলামের যুদ্ধংদেহী শ্রেণী ও সমঝোতাপ্রিয় শ্রেণীর মাঝে সমন্বয় সাধন এবং ভারসাম্য সৃষ্টির অতি দুর্বল প্রয়াস চালিয়েছিল। তারা ইসলামপন্থীদের সাথে কথাও বলেছে, কিন্তু আলজেরিয়া, মিসর, তুরস্ক, ইরান ও সুদান সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ও নিজেদের একা হয়ে পড়ার ভয়ে আমেরিকা আর সামনে অগ্রসর হয়নি। অপরদিকে খোদ ইসরাঈলী লবি এই উদ্যোগকে নিজেদের জন্য বিপদ মনে করে বসে। তাও এমন ভয়ানক বিপদ যে, একে চিরতরে নির্মূল করার জন্য তারা পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার নাটক সেই পরিকল্পনারই বাস্তবায়ন। কারণ, মার্কিন পলিসি মেকার ইহুদীদের বিশ্বাস ছিল এবং এখনো আছে, যদি মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামপন্থীরা ক্ষমতায় এসে যায় তাহলে তারা ইসরাঈলকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে তেলের অস্ত্র প্রয়োগ করবে। তেলের পয়সা দিয়ে ভয়ানক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরি করবে, যাতে ইসরাঈল ভয়াবহ বিপদ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। (দেখুন, মাসিক তরজুমানুল কুরআন, লাহোর, মার্চ-২০০০ সংখ্যা, নিবন্ধ–আমেরিকা এবং ইসলামী আন্দোলনসমূহ)

এই বিপদের ওপর বাঁধ নির্মাণ, বরং তার উৎস পুরোপুরি শুষ্ক করে দেয়ার জন্য ইহুদীরা যে পরিকল্পনা তৈরি করেছে, সেটা তারা মার্কিন শক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। ইহুদীদের একমাত্র ভয় ও বিপদ হলো ইসলামী ফান্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদ। এজন্য ইহুদীরা আমেরিকা ও তার মাধ্যমে গোটা দুনিয়ার মন-মস্তিষ্কে ও মগজে একথা ঢুকিয়ে দিয়েছে, শান্তি ও নিরাপত্তাপ্রিয় পৃথিবীর আসল বিপদ ও ভয়ের কারণ হলো ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ। যতদিন পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের দীনী শিক্ষা অর্জন করতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের থেকে মৌলবাদীই তৈরি হতে থাকবে, যারা মার্কিন কালচার তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ঘৃণা করবে। এই ঘৃণা বিদ্বেষের মূল উৎস

www.pathagar.com

কুরআন। এই কুরআন পড়া দ্বারা তাদের সন্ত্রাসী মনোভাব এবং ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে শত্রুতার চেতনা সৃষ্টি হয়। ইহুদীদের এই ইসলাম বিদ্বেষী প্রচার-প্রোপাগান্ডা গোটা দুনিয়ায় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, ইসলামী দেশগুলোও আজ তা দ্বারা প্রভাবিত।[৫] সুতরাং ইহুদীদের ভয় হলো যতদিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ কুরআন পড়তে থাকবে ততদিন পর্যন্ত গোটা দুনিয়ার জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ অব্যাহত থাকবে। ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার এই প্রাচীর স্থায়ীভাবে গুঁড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। আর এটা তখনই সম্ভব যখন মুসলমানদের দীনী শিক্ষার প্রবাহিত ঝরনা শুষ্ক করে দেয়া হবে। তাদের দীনী শিক্ষার এই মৌলিক বাধাকে নির্মূল করে দিলেই ইসলামের সর্বশেষ দুর্গ দীন ইসলামকে নির্মূল করা সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বপ্রথম ইহুদীরা মিসর ও ইসরাঈলের মাঝে সমঝোতা করায়। অতঃপর উভয় দেশের মধ্যকার সম্পর্ক দৃঢ় ও সুসংহত করার লক্ষ্যে একতরফা মিসরের নিকট দাবী করল, মিসরের শিক্ষা সিলেবাস থেকে এমন সব মৌলিক দীনী আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক শিক্ষা বাদ দিতে হবে, যা উভয় দেশের মধ্যকার সম্পর্ক মজবুত ও সুসংহত হওয়ার পথে অন্তরায়। সাবেক ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী মানাহেম বেগান মিসর সফরকালে মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট আনওয়ার সাদাতকে বলেছিলেন, ইসরাঈল ও মিসরের মধ্যকার সুসম্পর্ক কিভাবে মজবুত ও সুসংহত হবে, অথচ মিসরী নাগরিক কুরআনের আয়াত পড়ছে যাতে ইসরাঈলের নিন্দা করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, 'বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির, তাদের দাউদ ও মারইয়ামতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালংঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল।'

আনওয়ার সাদাত সাথে সাথে মিসরের শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন, সিলেবাসের ওপর পুনর্দৃষ্টি দেয়া হোক এবং এ জন্য একটি কমিটিও গঠন করে দেন, আমেরিকা, ইসরাইল ও মিসরের শিক্ষাবিদদের যে কমিটির সদস্য করা হয়েছে। তাদের কাজ বর্তমান সিলেবাস পর্যালোচনা করে একটি সুপারিশ পেশ করবে, যার আলোকে এমন একটি নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করা হবে যা হবে সেক্যুলার- ধর্মহীন। মুসলিম বিশ্বের দীনী শিক্ষা নির্মূল করার জন্য আমেরিকা মুসলিম বিশ্বকে সাহায্য দিতে শর্তারোপ করল, যেসব মুসলিম ও আরব দেশ তাদের শিক্ষা সিলেবাস পরিবর্তন করে যুগের চাহিদার সাথে সমন্বয় করবে তাদেরই কেবল সাহায্য দেয়া হবে। সেমতে মিসর এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলে তাকে ১৯৮১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ১৮৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্য কেবল শিক্ষার উন্নয়নের জন্যই দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ১৮০ মিলিয়ন ডলার বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য, ৬০ মিলিয়ন ডলার নারী শিক্ষা উন্নয়নের জন্য এবং ৫২ লাখ ডলার

৫. কিছু আরব দেশের ইসলাম বিদ্বেষ এ পর্যায়ে এসে পৌছেছে যে, অন্য দেশ থেকে আগত কোনো ব্যক্তির নিকট যদি কুরআন শরীফের কোনো কপি পাওয়া যায় তাহলে একথা বলে তা জব্দ করে নেয়া হয়, এ গ্রন্থ পড়লে সন্ত্রাসী মনোভাব সৃষ্টি হয়। এমনকি এখন তো দাড়ি রাখাও অপরাধ হয়ে গেছে। দাড়িওয়ালা কোনো ব্যক্তি সেসব দেশে প্রবেশ করলেই তাকে সন্ত্রাসী বলে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

নারীদের কল্যাণ ও চিকিৎসা খাতে দেয়া হয়েছে। মিসর ছাড়া পাকিস্তান এবং ভারতকে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ের জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয়া হয়েছে। ইয়ামান ও জর্ডান স্বীকার করেছে, শিক্ষা খাতের উন্নয়নের নামে ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড–আই.এম.এফ থেকে তাদের বার্ষিক সাহায্য দেয়া হয়। মিসরের এক মন্ত্রী ড. আমর মূসাও সিলেবাস পরিবর্তন সমর্থন করে বলেন, এখন সময় এসেছে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর, যাতেকরে আরব-ইসরাঈলের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণ নির্মূল হয়ে যায়।'

তেলআবিবে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তাতে মিসরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোস্তফা খলীল এবং জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব ড. বুট্রোস ঘালি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেমিনারের বিষয় ছিল 'আরব-ইসরাঈল সম্পর্কের স্থায়িত্বে কুরআনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া'। উক্ত সেমিনারে ইসরাঈলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মানাহেম বেগান পরিষ্কার দাবী করেন, 'ওই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেয়া হোক যেখানে কুরআন পড়ানো হয়।'

শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসরাঈল ও আমেরিকার বিধি-নিষেধ মিসর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় উভয় সিলেবাসে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি.আই.এ-এর পরিচালক ও মার্কিন কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল শায়খুল আযহারের সাথে সাক্ষাত শেষে যৌথ বিবৃতিতে বলেন, আল আযহারের সিলেবাসে সংস্কার এবং যুগ চাহিদার সাথে এর সমন্বয়ের কাজ চলছে। পাকিস্তানে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ নাস্তিক কামাল পাশা আতাতুর্কের ভূমিকা পালনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এ জন্যই তার প্রতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পূর্ণ সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। পাকিস্তানের শিক্ষা সিলেবাসে পরিবর্তন আনার জন্য আগা খাঁ বোর্ড এবং সকল পরীক্ষা আগা খাঁ ইউনিভার্সিটির নিকট সোপর্দ করা হয়েছে। পাকিস্তানে খৃস্টান মিশনারী পরিচালিত এফ সি কলেজ ইউনিভার্সিটির সনদ পেয়ে গেছে, যেটা আমেরিকান ইউনিভার্সিটির সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। (দৈনিক জং, মার্চ-২০০৪)

ভারতে তো স্বাধীনতার পর থেকেই মুসলমানদের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছাঁচে ঢালার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চলছে। আমেরিকা ও ইসরাঈলের সহযোগিতায় সেখানে শারীরিক ও সাংস্কৃতিক বংশহত্যা চলছে। ভারতের মাদরাসাগুলোকে সন্ত্রাসের আড্ডাখানা প্রমাণ করার জন্য ভারতীয় মিডিয়া ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে। ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানকার মিডিয়া উলঙ্গ হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা না দেয়ার সবক প্রদানকারীদের অবস্থা হচ্ছে, খোদ আমেরিকা, ইসরাঈল ও ভারতের শিক্ষা কারিকুলাম সম্পূর্ণ ধর্মীয় গোঁড়ামিপনা ও মুসলিম দুশমনীর ওপর প্রণীত। উদাহরণস্বরূপ সন্ত্রাসীদের সবচে' বড় শয়তান ইসরাঈলের শিক্ষা কারিকুলাম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করলে জানা যায়, তাদের সিলেবাসের ৪২ জায়গায় আরবদের চোর, ডাকাত ও বদমাইশ, বলা হয়েছে। ৭০ জায়গায় সন্ত্রাসী, ৩০ জায়গায় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, ৭০ জায়গায় হত্যাকারী, ২৭ জায়গায়

www.pathagar.com

মানবতার শিকারী, ৩১ জায়গায় বিমান অপহরণকারী, ১৪১ জায়গায় লুণ্ঠনকারী ও খিয়ানতকারী, ৭০ জায়গায় গাছপালা ও ফসল বিনষ্টকারী এবং ১৮১ জায়গায় পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী আখ্যা দেয়া হয়েছে। এক ইসরাঈলী প্রফেসর কৌহিন-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় হিব্রু ভাষার এমন এক পুস্তক পর্যালোচনা করে বলেন, সাধারণত ৭৫% ইহুদী শিশুদের শৈশবকালেই এই বিশ্বাস জন্মে যে, আরবরা হত্যাকারী ও শিশু অপহরণকারী। ভারতের হিন্দু শিশুদেরও মুসলমানদের সম্পর্কে কমবেশি একই প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। তারা প্রতিটি মুসলমান সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করে, মুসলমানরা নিজেদের কাছে ছুরি রাখে এবং হিন্দুদের হত্যা করে। আমেরিকা তার আসন্ন এ সকল বিপদ অংকুরেই নির্মূল করার জন্য নিজের নাক কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[৬]

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি যদি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এর পেছনে এমন কিছু ঘটনা রয়েছে যার ভিত্তিতে হামলাকারীরা তাদের শত্রুদের নির্মূলের জন্য খোদ নিজেদের হাতে নিজেদের নাক কেটেছিল। আমেরিকার সৃষ্টি ইসরাঈল তার পদাঙ্ক অনুসরণকারী দেশগুলোকে সর্বদা একই কৌশল বাতলে চলেছে। ভারতও কয়েকবার তার নিজের হাতে নিজের নাক সফলভাবে কেটেছে। এটা ভিন্ন কথা, এই বাণিজ্যে শুধু গুজরাত ট্রাজেডি ছাড়া তার আশানুরূপ মুনাফা অর্জিত হয়নি।

১১ই সেপ্টেম্বরের নাটক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠন ও মিলিশিয়ার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞগণ ওয়াশিংটন ও পেন্টাগনের ওপর হামলার ধরন দেখে সাথে সাথে এ কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, 'এর পেছনে আল কায়দা ও ওসামা বিন লাদেনের হাত রয়েছে', কিন্তু ইহুদী নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব মিডিয়া এ ধরনের কোনো বক্তব্য বিবৃতি ও

৬. আরবী ভাষায় একটি বিখ্যাত প্রবাদ আছে, যার সারমর্ম হচ্ছে, 'কাসির যে নিজের নাক নিজেই কেটেছে, নিশ্চয়ই এর কোনো একটা কারণ তো আছে।' এ প্রবাদের পটভূমি হচ্ছে, এক বাদশাহ আরেক বাদশাহর ওপর হামলা চালিয়ে তাকে পরাজিত করে। বিজয়ী বাদশাহ বিজিত বাদশাহ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশে তার উপদেষ্টাদের পরামর্শ চায়। উপদেষ্টারা সবাই প্রতিশোধ গ্রহণের চক্করে না পড়ার পরামর্শ দেয়, কিন্তু এক প্রাজ্ঞ বুদ্ধিমান উযীর একাকিত্বে পরামর্শ দিল, আমি আপনাকে দুশমনের ওপর হামলা না করার পরামর্শ দিয়েছি, এ অভিযোগে ভরা দরবারে আপনি আমাকে অপমান করবেন। অতঃপর আমার নাক কান কেটে এমন এক জায়গায় আমাকে ফেলে রাখবেন, যেখান দিয়ে দুশমনের কাফেলা পথ অতিক্রম করে। অতএব দুশমনের কাফেলা সেখান দিয়ে পথ অতিক্রমকালে দেখতে পেল, যে ব্যক্তি বাদশাহর দরবারে অতি প্রিয়জন ছিল, তার নাক কান কেটে ফেলা হয়েছে। নিজের হাতে নাক কান কাটা ব্যক্তির সাথে কী আচরণ করা যায়, বাদশাহ তার উপদেষ্টাদের কাছে পরামর্শ চাইলে সবাই পরামর্শ দিল, তার সাথে সহমর্মিতার আচরণ করা হোক। এক উযীর বিরোধীতা করে বলল, বাদশাহর এমন ব্যক্তি থেকে সতর্ক থাকা উচিত, যে নিজের নাক কান নিজেই কেটেছে, অবশ্যই এর কোনো একটা কারণ আছে। বাদশাহ তার বিরোধীতা সত্ত্বেও নাক কান কাটা ব্যক্তিকে নিজের প্রিয়জন বানিয়ে নিলেন। শেষ পর্যন্ত সে ধোকা দিয়ে গোপনে পালিয়ে গিয়ে তার বাদশাহর কাছে সকল রহস্য ফাঁস করে দিল। অতঃপর বাদশাহ অতর্কিত হামলা চালিয়ে দুশমনকে নির্মূল করে দিলেন।

www.pathagar.com

কোনো তদন্ত রিপোর্টই বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ হতে দেয়নি। অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ, গবেষক ও সাংবাদিক বাস্তবতার আলোকে বার বার একথা বলেছেন, ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার জন্য যে অসাধারণ দক্ষতা, উপকরণ ও মেধা প্রতিভা দরকার, ওসামা বিন লাদেন ও আল-কায়দার নিকট তা নেই, কিন্তু এ চিৎকার নিরব-নিভৃত মরু সাহারায় অসহায়ের রোদন ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রবাদ আছে, দরবেশের চিৎকার কে শোনে।

দুনিয়ার সকল মানুষের বিশেষ করে মুসলমানদের সেসব ফরাসী ও মার্কিন স্কলার গবেষকদের শুকরিয়া আদায় করা উচিত, যাঁরা সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে এমন সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণ একত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন, যেগুলো দ্বারা আলোকিত দিবসের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্মরণকালের এই ভয়াবহ হামলার পেছনে আর কারো নয়, খোদ মার্কিনী এবং ইহুদীদেরই হাত রয়েছে। যেমন–২০০৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বরের টাইমস অফ ইন্ডিয়া লন্ডন থেকে প্রকাশিত দৈনিক অবজার্ভারের বরাত দিয়ে লেখেছে, ৭৫ জন মার্কিন গবেষক, চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীর বর্ণনার আলোকে একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়, এই নাটক হোয়াইট হাউসের তৈরি। আমেরিকার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ৭৫ জন প্রফেসর পাঁচ বছরব্যাপী অনুসন্ধানের পর যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, এ দুর্ঘটনা এমন একটি ষড়যন্ত্র, যাতে মার্কিন গোঁড়া রাজনীতিক, শাসক ও প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন শামিল রয়েছে। এর উদ্দেশ্য প্রথমে আফগানিস্তান, অতঃপর ইরাক, সর্বশেষ ইরানের ওপর হামলার বৈধতা সরবরাহ করা যাতে ইসলামী বিশ্বকে সহজেই পদানত করা যায়।

এই বাস্তবতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে এক মার্কিন বিত্তশালী জিমি ওয়াল্টার দশ লাখ ডলারের পুরষ্কার ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, কেউ যদি এটা প্রমাণ করতে পারে, ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলায় বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়নি, তাহলে তাকে দশ লাখ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে। জিমি ওয়াল্টার দাবী করেন, বিল্ডিং ভাঙ্গার কারণ বিমানের আঘাত নয়; বরং বিল্ডিংয়ের ভেতরে শক্তিশালী বিস্ফোরক দ্রব্য রাখা ছিল। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার মাত্র ষাট সেকেন্ডে বিধ্বস্ত হয়েছে। কোনো সাংবাদিককে বিল্ডিংয়ের ধ্বংসাবশেষের কাছে যেতে দেয়া হয়নি। মাত্র তিন দিনে সকল ধ্বংসাবশেষ সেখান থেকে দূরে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই হামলার পর পাশ্চাত্যের সকল মিডিয়া মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে এবং মার্কিন সরকার আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রোপাগান্ডা শুরু করে দেয়। যে ব্যক্তিই ইহুদী লবির এ ভয়ানক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস করেছে, সমগ্র পাশ্চাত্য মিডিয়া তার বিরুদ্ধেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে; বরং অসাধারণ দ্রুততার সাথে বুশ প্রশাসনের সকল মেশিনারী তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা গলা টিপে হত্যা করেছে। এত শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমা মিডিয়া সেই একই পুরাতন রাগিনী অব্যাহত রেখেছে– নাইন-ইলেভেনের পেছনে আল-কায়দা ও তার নেতা ওসামা বিন লাদেনের হাত রয়েছে। ১১ই সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ার ধ্বংস নাটক যে স্বয়ং আমেরিকার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, এ সম্পর্কে আমরা পাকিস্তানের করাচী থেকে প্রকাশিত দৈনিক জাসারত' পত্রিকার সমীক্ষা রিপোর্ট এখানে পেশ করছি।

www.pathagar.com

১১ই সেপ্টেম্বরের নাটক খোদ আমেরিকার তৈরি

মার্কিন ইউনিভার্সিটির এক বিখ্যাত অধ্যাপক ড. স্টিভেন জোন্সকে বাধ্যতামূলক অবসর দিয়ে দেয়া হয়েছে। তাঁর 'ধপরাধ', তিনি প্রমাণ করেছেন, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভবন শুধু বিমানের আঘাতে আগুন লাগায় ধ্বংস হতে পারে না; বরং এটা তখনই সম্ভব যখন ভেতর থেকে কোনো বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। প্রফেসর স্টিভেন দলীল-প্রমাণের আলোকে এ সত্য প্রমাণ করে দিয়েছেন, বাস্তবে এমনই হয়েছে, কিন্তু মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন প্রবক্তা তারই এক প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীর গবেষণা ও বিশ্লেষণ হজম করতে পারেনি। ফলে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি এ সংবাদও এসেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমবেশি ৩০ শতাংশ লোক মনে করে, ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পেছনে খোদ আমেরিকান সরকারের হাত রয়েছে। এসব প্রেক্ষিত ও ঘটনাবলী থেকে অনুমিত হয়, ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য মেধা মননের আরেকটি গভীর ষড়যন্ত্র এবং সভ্যতাসমূহের সে চূড়ান্ত সংঘাত, যা সূচিত হয়েছিল ক্রুসেড যুদ্ধ থেকে। এর মাঝের দীর্ঘ দুইশ' বছরের ঔপনিবেশিক যুগ তার বড় নিদর্শন। আবার ক্রুসেড যুদ্ধের নতুন শিরোনামে ইসলামী বিশ্বের পরিধিকে সংকীর্ণ করে তোলা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা মিডিয়ার শক্তিশালী অপপ্রচার সত্ত্বেও যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ মনে করে, ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পেছনে মার্কিন নির্বাহী বিভাগের হাত রয়েছে, তাহলে এটা সাধারণ কথা নয়। কারণ মার্কিন নাগরিকরা স্বচক্ষে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। এত বড় ব্যর্থতা সত্ত্বেও দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি এবং এ ঘটনার জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকেও তার পদ থেকে অপসারণ করা হয়নি। অথচ এত বড় ঘটনার পর তো শত শত ব্যক্তির অপসারিত হওয়ার কথা ছিল।

মার্কিনীরা আরো দেখেছে, কিভাবে বুশ প্রশাসন এই ঘটনার পর ভয়কে পলিসিতে রূপান্তর করে শুধু আমেরিকাতেই নয়; বরং সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের মুসলমানদের কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে। বুশ প্রশাসনের দৃষ্টিতে মার্কিন প্রফেসরের গবেষণা ভুল, কিন্তু তার জবাবী গবেষণাও তো পেশ করা যেত, কিন্তু তা না করে উল্টো প্রফেসরের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর পরিষ্কার অর্থ হলো, মার্কিন সরকার ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে একটি 'পবিত্র আকীদা'র মর্যাদা দিয়েছে। যেমনিভাবে পাশ্চাত্যে হলোকাস্ট সম্পর্কে কোনো কথা বলা যায় না, তদ্রূপ ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার ব্যাপারেও কোনো প্রশ্ন তোলা যেতে পারে না। এ পরিস্থিতি মার্কিন সরকারের দুর্বল অবস্থানের দর্পণ। প্রাণহানির দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ১১ই সেপ্টেম্বর একটি অতি সাধারণ ঘটনা ছিল। কারণ ১১ই সেপ্টেম্বরে যে পরিমাণ লোক হতাহত হয়েছে, সে পরিমাণ মুসলমান তো আমেরিকা ও তার জোট বাহিনী এক সপ্তাহেই হত্যা করে। আমেরিকা, বৃটেন ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশ ইরাকের ওপর যে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, তার করণে শুধু এক বছরে দশ লাখ লোক খাদ্য ও ওষুধের অভাবে মারা গেছে। তার মধ্যে পাঁচ লাখ শিশুও অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়া এই দশ লাখ লোকের ধ্বংস হওয়ার

www.pathagar.com

কথা কোনো দিনই উল্লেখ করেনি। অবশ্য তারা শুধু আড়াই কিংবা পৌনে তিন হাজার লোকের কথা গোটা দুনিয়ার মনস্তত্ত্বের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার আড়ালে আমেরিকা ও তার মিত্র জোট দিনরাত ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের দুর্ভাগ্য, এ ষড়যন্ত্রে মুসলিম বিশ্বের কোনো কোনো শাসকও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এখন তো সরাসরি মুসলমানদের দীন ও আকীদা এ ষড়যন্ত্রের কবলে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে গোটা ইসলামী বিশ্ব অস্থির চঞ্চল, কিন্তু এখন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ এই আগ্রাসনের সামনে প্রতিরোধ প্রাচীর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়নি। মুসলিম উম্মাহর এখন প্রয়োজন এই ষড়যন্ত্রকে তার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহাসিক ও সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকে বুঝা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও কার্যত সর্বদিক দিয়ে তার মোকাবেলা করা। পাঁচ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে এ বাস্তবতাও মুসলিম উম্মাহর সামনে উন্মোচিত হয়েছে যে, মুসলিম উম্মাহর আসল সমস্যা আমেরিকা ও পাশ্চাত্য নয়; বরং তাদের আসল সমস্যা পাশ্চাত্যের দোসর, দালাল, উচ্ছিষ্টভোগী, সুবিধাভোগী, তল্পীবাহক, ক্রীড়নক মুসলিম শাসকবর্গ, যাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য মুসলিম উম্মাহর আকীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ পদদলিত করছে। এই শয়তান শাসকবর্গ যদি না থাকত তাহলে পাশ্চাত্যের প্রতিটি চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়ার ক্ষমতা মুসলিম উম্মাহর পূর্ণ মাত্রায়ই রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর কোনো কিছুরই কমতি নেই। যে দিন মুসলিম উম্মাহ আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের দেশীয় এজেন্টদের কবল থেকে মুক্তি পাবে, সেদিন হবে মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত স্বাধীনতার দিন। খ্যাতিমান ফরাসী লেখক ও প্রসিদ্ধ গবেষক ড. ট্রি মিশন-এর 'ভয়ানক মিথ্যা, ভয়ানক ফ্রড' নামে একটি গ্রন্থ সম্প্রতি বাজারে এসেছে। বাজারে আসার মাত্র দুই ঘন্টার মাথায় তার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। উক্ত গ্রন্থে লেখক যেসব দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তার আলোকে যে কেউ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার ব্যাপারে আমেরিকা ও পশ্চিমা মিডিয়া যে প্রোপাগান্ডা করেছে এবং করে যাচ্ছে, তার শতভাগই মিথ্যা।

১১ই সেপ্টেম্বরের উদ্দেশ্য

ইতিহাসের সবচে' বড় মিথ্যা বা ১১ই সেপ্টেম্বর নাটকের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, ভূ-পৃষ্ঠকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ থেকে মুক্ত করা। এ কারণেই পাশ্চাত্য এ যুদ্ধের নাম দিয়েছে ক্রুসেড যুদ্ধ। এ আগ্রাসনের মূল টার্গেট দীনী মাদরাসাগুলো, যা মুসলিম উম্মাহর সর্বশেষ দুর্গ; শক্তি ও অর্থের বলে এই দুর্গ গুঁড়িয়ে দেবার নিরন্তর প্রয়াস চলছে।

এই উদ্দেশ্যের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে, ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার আড়ালে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ প্রোপাগান্ডার পরিবেশ তৈরি করা, যার পুরো দায়িত্ব নিয়েছে ইহুদী মিডিয়া। যা পরিচালিত হচ্ছে সম্পূর্ণ পেন্টাগনের তত্ত্বাবধানে, কিন্তু মুসলিম উম্মাহর পক্ষে বিপক্ষে উভয় ধরনের সংবাদ পরিকল্পিতভাবে গোটা বিশ্বের সামনে প্রচার করা হচ্ছে। এই প্রচারণায় আল-কায়দা, তালেবান ও তাদের আধ্যাত্মিক নেতা ওসামা বিন লাদেনকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে। মিডিয়াতে কখনো তাদের প্রশংসাও করা হচ্ছে, কিন্তু 'কথা সত্য মতলব খারাপ' প্রবাদ অনুযায়ী তাদের প্রশংসার আড়ালে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন প্রজ্বলিত করা

www.pathagar.com

হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ইউরোপ, আমেরিকা এবং তাদের কৌশলগত মিত্র ভারত ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে তাদের গোপন ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা কোন রাখঢাক ছাড়াই প্রকাশ্যে উন্মোচিত করে দিয়েছে। একথাই পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানে অলংকারপূর্ণ ভাষায় ঘোষিত হয়েছে, 'শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখ ফুটেই বের হয়ে যায়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশি জঘন্য।'

১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার যে প্রতিক্রিয়া আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশে হয়েছে, তা সেসব বক্তৃতা-বিবৃতি দ্বারাই অনুমান করা যায়, যেসব বক্তৃতা-বিবৃতিতে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে কঠোর ঘৃণা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, ক্রোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহা প্রকাশ পেয়েছে।

০১. মানবতার শত্রু মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এই ঘটনাকে 'war on Civilaization–'সভ্যতার পক্ষে লড়াই' আখ্যা দিয়েছেন এবং কার্যত তিনি বিশ্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করার জঘন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এক. পাশ্চাত্য বিশ্ব, তথাকথিত সভ্য দুনিয়া। দুই. অন্যান্য বিশ্ব, ওদের ভাষায় যা অসভ্য ও বর্বর।

০২. সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনী ও মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামসফেল্ড কোন রাখঢাক ছাড়াই বলেছেন, আমাদের টার্গেট সেসব দেশকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যারা সন্ত্রাসের বিকাশ ঘটাচ্ছে।

০৩. সাবেক সেক্রেটারী অফ স্টেট ডিপার্টমেন্ট লরেন্স এ্যাগেল বার্গ বলেন, এ ধরনের লোকদের সাথে লড়াইয়ের সূচনার এও একটা পদ্ধতি হতে পারে যে, প্রথমে তাদের কিছু লোককে নিঃশেষ করে দিতে হবে।

০৪. মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক পন্ডিত এবং ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, চিলি আর না জানি কত দেশের লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নিষ্পাপ গণহত্যার নায়ক হেনরী কিসিঞ্জার বলেন, '১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পেছনে বিন-লাদেনের হাত আছে যদিও এর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই, কিন্তু তথাপি তার জড়িত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ সে আমেরিকার বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এ জন্য আমাদের তার গোটা নেটওয়ার্কই নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। এমনকি মুসলিম বিশ্বের যেখানে যেখানে তার সমর্থক রয়েছে তাদেরও গুঁড়িয়ে দিতে হবে। আমি আশা করি, মার্কিন প্রশাসন এ বিষয়টি শেষ পর্যায়ে পৌঁছাবে। যেমন পার্ল হার্ভারের বিষয়টি শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এক কথায় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এই গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। এ লড়াইয়ে যদি বিশ্বের অন্যান্য দেশ আমেরিকাকে সমর্থন সহযোগিতা না করে তাহলে আমেরিকাকে একাই এ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে এবং এর জন্য কোন পরামর্শ ও মতৈক্যের প্রয়োজন নেই।'

ওপরে যা কিছু উল্লিখিত হয়েছে তা তো আমেরিকার বড় দায়িত্বশীল এবং বুদ্ধিজীবীদের বক্তৃতা-বিবৃতির ধরন, সর্বসাধারণ পর্যায়ে যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, নিম্নোক্ত উদাহরণসমূহ থেকে সেটা জানা যাবে।

০৫. ওয়াশিংটন পোস্টে জি রচ লোরি লেখেন, '১১ই সেপ্টেম্বরে আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য আমরা যদি দামেশক, তেহরান বা অন্য কোন মুসলিম দেশের কিছুও

www.pathagar.com

ধ্বংস করতে পারি তাহলে কিছুটা হলেও এর সমাধান হবে। কোনো দেরি ছাড়াই পাশ্চাত্যের উচিত, এই 'হারামীদের' হত্যা করা, চোখে গুলি মারা, টুকরো টুকরো করে দেয়া এবং বিষ দিয়ে হত্যা করা।'

০৬. নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ডেইলী নিউজে এক লেখিকার বক্তব্য, এখন এটা তদন্তের সময় নেই, এ ঘটনার সাথে ঠিক কোন্ কোন্ ব্যক্তি জড়িত; বরং দ্রুত তাদের নেতাদের হত্যা করা উচিত। আমরা হিটলার ও তার উচ্চ পদস্থ অফিসারদের খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে প্রচলিত বিধি-নিষেধের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিনি; বরং আমরা জার্মানীর শহরসমূহের ওপর কার্পেট বোমা বর্ষণ এবং তাদের নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করেছি। সেটাও যুদ্ধ ছিল, এটাও যুদ্ধ।

০৭. মার্কিন রাজনৈতিক পলিসির মুখপাত্র ন্যাশনাল রিভিউ'র এক সাংবাদিক রিচার ডেলোরী আরেকটু অগ্রসর হয়ে লেখেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন দেরি ছাড়া এখনই মক্কা মদীনার ওপর হামলা করা উচিত।

১১ই সেপ্টেম্বরের পর প্রোপাগান্ডা ও গুজবকে ভিত্তি বানিয়ে সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিতভাবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মার্কিন স্বার্থে আঘাত আসার সন্দেহ সংশয় প্রকাশ করা হতে থাকে। ওসামা বিন লাদেনকে ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্ব আখ্যা দেয়ার জন্য নিত্যনতুন ধরন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনা উপন্যাসের মতো বার বার ধরন পাল্টিয়ে প্রকাশ করা হয়। কখনো বলা হয়, আফগানিস্তানে বসে সে হাজার মাইল দূর থেকে মার্কিন স্বার্থে আঘাত হানতে সক্ষম। কখনো বলা হয়, তার নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কখনো বলা হয়, তার সংগঠন আল-কায়দা এত শক্তিশালী ও সুসংগঠিত যে, ওরা মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওপরও হামলা করতে সক্ষম। কখনো বলা হয়, মার্কিন পারমাণবিক স্থাপনায় আঘাত হানার মতো সক্ষমতা তার সংগঠনের রয়েছে। কখনো বলা হয়, ওসামা বিন লাদেনের নিকট পারমাণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র রয়েছে। কখনো বলা হয়, ওসামাকে গ্রেফতার করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামসফেল্ড তার অক্ষমতা প্রকাশ করে স্বীকার করেছেন, আমরা ওসামাকে কখনো গ্রেফতার করতে পারব না। এসব সংবাদ প্রচার প্রসারের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, যাতে একদিকে মার্কিন শত্রুরা আত্মতৃপ্তি ও আত্মপ্রশান্তিতে থাকে যে, আফগানিস্তানে কার্পেট বোমা বর্ষণ করলেও কোন সমস্যা নেই। আল-কায়দা ও তালেবান এর চেয়েও বেশি শক্তিশালী। অপরদিকে মার্কিন জনগণও যাতে বুঝে, আফগান শিশু, নারী ও অসুস্থরা আক্রান্ত হলেও শত্রু বিরাট শক্তিশালী।

আফগানিস্তানে হামলার আড়ালে ফিলিস্তিনে ইসরাঈলী গণহত্যা ধামাচাপা দেয়াও এর একটা উদ্দেশ্য ছিল। সে সময় এ্যানথ্রাকসের সংবাদ এমন নাটকীয়ভাবে প্রচার করা হয়, যাতে মার্কিন জনগণ ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার গভীরে না পৌঁছতে পারে এবং তদন্তের কোন দাবীও না ওঠে। ওসামা বিন লাদেনের পারমাণবিক শক্তি অর্জন করার ভিত্তিহীন সংবাদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একাধারে দুই মাস পর্যন্ত প্রচার করা হয়, যাতে

www.pathagar.com

একে ভিত্তি বানিয়ে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের আণবিক শক্তি এবং তার ধ্বংসকারিতার ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। অপরদিকে সেসব ব্যক্তির দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়, যারা পাকিস্তানের আণবিক শক্তি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। যাতে তাদের যে কোনো সুযোগে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়া যায়।[৭]

১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে পুঁজি করে ইউরোপ-আমেরিকায় বিশেষভাবে এবং গোটা বিশ্বে সাধারণভাবে কর্মতৎপর ও সক্রিয় মুসলিম দাঈ, দীন প্রচারক ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের গ্রেফতার, সক্রিয় ইসলামী সংগঠন-সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে লেখাপড়ারত মুসলিম ছাত্রদের সেসব দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা, কিংবা তাদের গ্রেফতার করে জেলে নিক্ষেপ করাও উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তারা দ্বিতীয় বার সেসব দেশে যাওয়ার আর কল্পনাও না করে। এই ঘটনাকে বুনিয়াদ বানিয়ে মুসলমানদের অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস করে দেয়া, অপরদিকে উপসাগরীয় দেশগুলোকে এই পয়গাম দেয়া, যদি তারা ওসামার মতো লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করে তাহলে তাদেরও পরিণাম হবে আফগানিস্তান এবং ইরাকের মতো।

১১ই সেপ্টেম্বরের নাটকের আরেকটি মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করে মধ্য-এশিয়ার কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলও দখল করা। কারণ এসব অঞ্চল উপসাগরীয় দেশসমূহ থেকেও বেশি মূল্যবান প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোল, স্বর্ণ, রৌপ্য, ইস্পাত, মূল্যবান ধাতব পদার্থ ও খনিজ সম্পদে ভরপুর। এর মৌলিক ফায়দা এই হবে, উপসাগরীয় দেশগুলো পেট্রোলকে আর অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করতে পারবে না। দ্বিতীয় ফায়দা হবে, মধ্য-এশিয়ার মুসলমানদের দীনী চেতনা ও জাগরণের ওপর বাঁধ নির্মাণ করা। রাশিয়া ও চীন উভয় দেশ এ ক্ষেত্রে আমেরিকার সাথে রয়েছে। আফগানিস্তান দখল করার আরেকটি মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার দীনী মাদরাসাগুলো চিরকালের জন্য নির্মূল করে দেয়া, যাতে তালেবানদের মতো আর কেউ আমেরিকার জন্য বিপদ হতে না পারে। আফগান মুজাহিদদের সাথে আমেরিকার সেনাবাহিনী যে জঘন্যতম অমানবিক আচরণ করছে, তা এই ভয়াবহ মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের একটি দিক, যার উদ্দেশ্য গোটা ইসলামী বিশ্বকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা এবং অভ্যন্তরীণভাবে তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া। ভারতের মুসলমানদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা সৃষ্টির জন্য গুজরাটে স্মরণকালের ভয়াবহ মুসলিম নিধন চালানো হয়েছে, যাতে ভারতের মুসলমানরা আর কখনো কোমর সোজা করে দাঁড়াতে না পারে। আমেরিকা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে এই মনস্তাত্ত্বিক লড়াই দীর্ঘ দিন জিইয়ে রাখতে চায়। এ জন্য মিডিয়ায় বার বার ওসামা বিন লাদেন ও তালেবানদের খবর

৭. ১৯৫০ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যান্ড, মিসর, ইরাক, ইরান, লিবিয়া, পাকিস্তান ও ভারতের আধুনিক সমরাস্ত্র নির্মাণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষতার সাথে কাজ করেছেন, এমন মুসলিম বিজ্ঞানীকে ইসরাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ নানা কৌশলে হত্যা করেছে। এসব মুসলিম বিজ্ঞানী পারমাণবিক বোমা, মিজাইল বিধ্বংসী রাডার, রণতরী নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্পে অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে কাজ করেছেন। (দেখুন, আল বা'সুল ইসলামী, লাখনৌ, রবিউল আউয়াল ও রবিউস সানী সংখ্যা, ১৮২৩ হিজরী)

www.pathagar.com

ফলাও করে প্রকাশ করা হচ্ছে, যাতে চলমান এই যুদ্ধের বৈধতা অব্যাহত থাকে। এক কথায় ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে নির্মূল করার জন্য আজ যত কিছু করা হচ্ছে এবং করা হবে, তার বৈধতার মূল পুঁজি ও বুনিয়াদ হলো ১১ই সেপ্টেম্বরের নাটক। এ জন্যই এ নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। ১১ই সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার নাটক ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে নয়া ক্রুসেডের সূচনা।

কিন্তু এত কিছু করা সত্ত্বেও তিক্ত বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ দীন ইসলাম একটি চিরন্তন দীন। এ দীন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। শত চেষ্টা করেও কেউ এ দীন নির্মূল করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা নিজে এর হেফাযতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমিই এই দীন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণ করব'। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই দীন হেফাযতের প্রতিশ্রুতি না থাকত, তাহলে স্পেনেই এই দীন এবং তার অনুসারী মুসলমানরা দাফন হয়ে যেত কিংবা তাতারী আগ্রাসনের পর এই দীন আর জীবন্ত থাকত না। কারণ ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে তাতারী আগ্রাসনের চেয়ে বড় আর কোনো প্রচ ঝড় সৃষ্টি হয়নি। তাতারীদের মধ্যে পাহাড়কে স্বীয় জায়গা থেকে হটিয়ে দেয়ার শক্তি বিদ্যমান ছিল। শিক্ষিত সমাজ অবশ্যই জানেন, হিংস্র মঙ্গোলিয়ান তথা তাতারী সম্প্রদায় ইসলামী বিশ্বের ওপর হায়েনার ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এমন শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যার প্রতিরোধ ছিল প্রায় অসম্ভব। যে সময় তারা ইসলামী বিশ্বের ওপর হামলা করে সে সময় পূর্ণ শক্তিতে বলীয়ান ছিল। তাদের নিকট হাজার বছরের লালিত শক্তি সংরক্ষিত ছিল, যা ব্যবহার করার সুযোগ তাদের ইতোপূর্বে সৃষ্টি হয়নি। সে শক্তির মোকাবেলা সহজ ছিল না। ইসলামী বিশ্বের ওপর হামলা চালিয়ে তারা রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল, ইসলামী শৌর্য-বীর্যের প্রদীপ নির্বাপিত করে দিয়েছিল। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে লাঞ্ছিত করেছিল। ইসলামী শক্তি তাতারীদের প্রলয়ংকরী প্লাবনের সামনে পিছু হটতে শুরু করে। ইসলামী রাষ্ট্রগুলো একের পর এক পরাজয়ের শিকার হতে থাকে। মুসলিম উম্মাহ স্বীকার করে নেয়, তাতারীদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ও শক্তি তাদের নেই। কোনো শক্তিই তাদের সামনে প্রতিরোধ প্রাচীর দাঁড় করাতে সক্ষম নয়। এমনকি সে সময় এ কথা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, কেউ যদি বলে, তাতারীরা অমুক যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছে তাহলে সে মিথ্যুক। তাতারিরা পরাজয় বরণ করেছে–এটা কল্পনাও করা যেত না। হিংস্র তাতারী জাতি পিছু হটবে–এটা অসম্ভব। বিবেক এটা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। তাতারী ভীতি গোটা ইসলামী বিশ্বে ছেয়ে গিয়েছিল। এমন ভয়ানক ভীতি, যার অভিজ্ঞতা সাধারণত কোনো মানুষ অর্জন করেনি, কিন্তু এতদসত্ত্বেও শেষ ফল কি দাঁড়াল? যে ইসলাম বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের কাছে পরাজয় বরণ করেছিল, যার অনুসারীরা তাদের প্রচন্ড হামলায় পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল, সে ইসলাম তার বিজয়ী জাতিকে জয় করে নিল, কিন্তু ইসলামের তার বিজয়ী জাতিকে জয় করা কিভাবে সম্ভব হলো। এ বিজয় তরবারির জোরে হয়নি। কারণ, মুসলমানদের তরবারি তো তাতারীদের তরবারির সামনে ভোতা হয়ে গিয়েছিল। নিরাশ হয়ে গিয়েছিল তারা জীবন সংগ্রাম থেকে। তাদের এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল,

www.pathagar.com

তাতারীদের মোকাবেলায় আর কিছু করা সম্ভব নয়। তবে কী ছিল সে শক্তি? যে শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল। সে শক্তি ছিল অলৌকিক দীন ইসলাম। যা ছিল চিরন্তন, চিরস্থায়ী, সার্বজনীন, সুন্দর, মনোরম, হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক এক জীবনব্যবস্থা, এক জীবনপদ্ধতি। এই দীনের অলৌকিক যাদুতে আচ্ছন্ন হয়েই তারা শেষ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর কাছে পরাজয় বরণ করে। কারণ, তাতারীরা ছিল অসভ্য, বর্বর। সভ্যতার কোন স্পর্শই ছিল না তাদের জীবনে। তারা ছিল মানব আকৃতিতে হিংস্র হায়েনা। পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। সেই জাতি ইসলামের যাদুতে আচ্ছন্ন হয়ে দুনিয়ার সংকীর্ণ সরুপথ থেকে পৃথিবীর প্রশস্ত ও বিস্তৃত মহাসড়কে প্রবেশ করল। ঠিক একই অবস্থা হবে বর্তমান পাশ্চাত্য শক্তিরও। সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন তারাও ইসলামের যাদুতে আচ্ছন্ন হবে। পাশ্চাত্য আজ জীবন সংগ্রাম থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছে। হতাশ হয়ে পড়েছে তাদের সভ্যতা থেকে। এখন তাদের একটি নতুন সভ্যতার প্রয়োজন, যে সভ্যতা তাদের মনে প্রশান্তি দান করবে। নিয়ে যাবে দুনিয়ার সংকীর্ণ সরু পথ থেকে প্রশস্ত ও বিস্তৃত মহাসড়কে। আমেরিকা ও পাশ্চাত্য শক্তি আজ যে উত্তাল তরঙ্গের মতো ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এর কি প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পড়েছে, মার্কিন বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সৌজন্যে এখানে আমরা তার কিছু চিত্র তুলে ধরছি।

১১ই সেপ্টেম্বরের তুফানের পর এর নায়করাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজ মার্কিন অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামরিক শক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হতে চলেছে। ১১ই সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকা মুদ্রাস্ফীতি থেকে বাঁচতে তিন বার নিজের সংরক্ষিত মুদ্রা ভান্ডারের অবমূল্যায়ন করেছে। অর্থনৈতিক এই দুরবস্থা আমেরিকা থেকে সুদূর জাপান, তাইওয়ান, মেক্সিকো ও ব্রাজিল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকার সাধারণ আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে যে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে, একে তারা কৌশলগত অস্থিরতা বলে অভিহিত করে চলেছে। ২০০১ সালের ২৯ আগস্ট পর্যন্ত আমেরিকা তার উৎপাদনের হার শতকরা ৭ শতাংশ বলেছিল। যখন এ হার প্রকৃতপক্ষে শূন্যের কোঠায় এসে গিয়েছিল। ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এ হার নেতিবাচক পর্যায়ে চলে গেছে। এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে সেসব অঞ্চলে বেকারত্বের হার দ্রুত বাড়ছে। ১১ই সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকায় দশ লাখের বেশি লোককে চাকুরী থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে। বড় বড় কোম্পানী আরো কর্মচারী ছাটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমেরিকার ইলেকট্রনিক শিল্পে বহির্বিশ্বের অর্ডার ৩.২ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য শিল্প দ্রব্য উৎপাদনেও বিরাট ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কৃত্রিমভাবে বহাল রাখা হচ্ছে। ২০০০ সালের অক্টোবর থেকে ২০০১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের বেকারত্বের হার সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ গোল্ডমিন স্যাক্স ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ২০০২ জানুয়ারী পর্যন্ত বেকারত্বের হার আরো প্রবৃদ্ধি ঘটবে। আরেক অর্থনীতিবিদ মর্গান স্ট্যানলের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক আমেরিকার বার্ষিক বাণিজ্য ২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সমগ্র দুনিয়ার স্টক মার্কেটগুলো বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। ১৪শ' বছর পূর্বের কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী আজ একুশ শতকে এসে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হচ্ছে এভাবে, ইহুদী এবং তার মিত্র শক্তি নিজেই

নিজের ঘর ধ্বংস ও বরবাদ করছে। আমেরিকার রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি যেভাবে দাফন হয়ে যাচ্ছে, তা আল্লাহ্ পাকের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

পক্ষান্তরে ইউরোপ-আমেরিকায় বসবাসরত মুসলমানদের যে উপকার হয়েছে, তা সুদূরপ্রসারী। তাদের সবচে' বড় যে ফায়দা হয়েছে সেটি হলো, তাদের মধ্যে নতুনভাবে ইসলামের অনুভূতি জেগেছে। ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা মুসলমানদের মাঝে তাদের ধর্মের দিকে ফিরে আসার নতুন চেতনা সৃষ্টি করেছে। আগে যারা নিজেদের মুসলমান পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করত, এখন তারা মুসলমান পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। যারা নামায ও ইসলামের পরিচায়ক বিষয়াবলী থেকে উদাসীন ছিল এখন তারা দাড়ি রাখছে, ইসলামী লেবাস পরছে এবং মসজিদে যাওয়া শুরু করেছে। প্রতিটি মসজিদে নামাযীর সংখ্যা বাড়ছে। এমনকি মাঠ সংকীর্ণ হওয়ার কারণে ঈদের নামায কয়েক জামাআতে আদায় করতে হয়েছে।

একদিকে মুসলমানদের মধ্যে কুরআন ও দীনী কিতাব পড়ার আগ্রহ বাড়ছে, অপরদিকে মার্কিনী এবং ইউরোপিয়ানরাও টিভিতে ইসলামের আলোচনা শুনে কুরআন, ইসলামী ইতিহাস ও দীনী কিতাব ক্রয় করতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু আমেরিকাতেই ইসলাম সম্পর্কিত বই পুস্তক ক্রয়ের হার ত্রিশ শতাংশ বেড়েছে। তন্মধ্যে কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ এত ব্যাপকভাবে ক্রয় করা হয়েছে, যাতে লাইব্রেরীগুলোর স্টকই খতম হয়ে গেছে। এক পত্রিকা লেখেছে, এক মাসের মধ্যে ৫০ হাজার কুরআন শরীফ বিক্রি হয়েছে। মার্কিন নিউজ এজেন্সীগুলো সংবাদ দিয়েছে, ১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে কুরআন শরীফ সবচে বেশি বিক্রীত গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। এর পাশাপাশি মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারগুলোতে অমুসলিমদের আসা-যাওয়া এবং ইসলাম সম্পর্কে জানার প্রবণতা এ পরিমাণ বেড়েছে, যা বিগত ত্রিশ বছরেও হয়নি। কিছু কিছু ইসলামিক সেন্টারের দায়িত্বশীলরা বলেছেন, প্রতিদিন ইসলাম সম্পর্কে টিভি ও সংবাদপত্রকে আমাদের কমপক্ষে আট দশটা সাক্ষাতকার দিতে হয়েছে। এ ধারাবাহিকতা ক্রমেই বাড়ছে। মুসলমানরাও প্রচার মাধ্যমগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি করে চলেছে। মসজিদে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী ১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ৩০ হাজার মার্কিনী ইসলাম গ্রহণ করেছে। ২০০৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের সংবাদ অনুযায়ী আমেরিকায় ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও ইসলামের এমন পরিচিতি সৃষ্টি করতে পারত না, যেমন ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর ইসলাম যতটুকু পরিচিতি লাভ করেছে। সেখানকার মুসলমানদের অমুসলিম প্রতিবেশীরা ইতোপূর্বে তাদের সাথে পরিচিত হওয়া বা তাদের খোঁজ-খবর রাখার চিন্তাও করত না, কিন্তু এই ঘটনার পর অমুসলিম প্রতিবেশীরা মুসলমানদের খোঁজ-খবর নেয়া ও তাদের সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করছে। তারা মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করছে। গির্জা ঘরে মুসলমানদের দাওয়াত দিচ্ছে, ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করছে এবং কুরআনের অনুবাদ কপি তালাশ করছে। এসবের পর যখন তাদের নিকট ইসলামের সত্যতা ফুটে ওঠছে, তখন সাথে সাথে তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিচ্ছে।

১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় মার্কিন মুসলমানদের এক ফায়দা এও হয়েছে, মিডিয়া তাদের বক্তৃতা-বিবৃতিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। নতুবা এর পূর্বে তাদের কেউ পাত্তা দিত না। রাজনৈতিক দলগুলোও এখন মুসলমানদের গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। মার্কিন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃবর্গ মুসলমানদের সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত তাদের তোয়াজ করছে। বুশ স্বীকার করেছেন, ১১ই সেপ্টেম্বরের পর ইহুদী সংগঠনগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমার নিকট এত ফ্যাক্সবার্তা পাঠিয়েছে যে, আমি এসব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। বিশেষ করে মার্কিন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী (ইহুদী) এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করেছে।

১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার আরেকটি বড় ফায়দা হলো, মুসলমানদের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্বের প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। তারা নিরাশার পরিবর্তে দৃঢ়তার পথ গ্রহণ করেছে। তাদের দীনী ও দাওয়াতী সংগঠনগুলোকে আরো সক্রিয় করে তুলেছে। দীনী কাজের জন্য বিরাট ফান্ড সরবরাহ করছে। ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন কিতাব মানুষের মাঝে বিতরণ করছে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ পত্রিকা ইউ.এস.এ টুডে লিখেছে, ৯/১১-এর ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম সম্পর্কে অসাধারণ আগ্রহ বেড়েছে। সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণী সবাই আমেরিকায় বসবাসরত মুসলমানদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। ইসলাম সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী ক্রয় করে স্টাডি শুরু করেছে। এই পত্রিকা ১৭ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লেখেছে, এক সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন মার্কিন লাইব্রেরীতে ইসলাম সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর স্টক শেষ হয়ে গেছে। কুরআন শরীফ বিক্রয়ে সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। এমনিভবে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা হাজার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। নিউইয়র্ক টাইমস ২৩ই অক্টোবর সংখ্যায় লেখেছে, সমুদ্রের ধারাবাহিক উত্তাল তরঙ্গের মতো হাজারো মার্কিনী আমেরিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ইউ.এস.এ টুডে ১৭ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লেখেছে, এতদিন পর্যন্ত মার্কিনীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলমানদের থেকে আলাদা হয়ে জীবন যাপন করত, কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা তাদের ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ ও মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে বাধ্য করেছে। এর মৌলিক কারণ হলো, ১১ই সেপ্টেম্বরের প্রলংকরী ঘটনায় মার্কিনীদের মস্তিষ্কে এই প্রশ্ন সৃষ্টি করে দিয়েছে, ইহুদী মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা যদি সঠিক হয় তাহলে এক ব্যক্তির মধ্যে এত বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করার শক্তি কিভাবে এলো। তার পেছনে কোন্ শক্তি আছে। তার ধর্ম কি তাকে এত বড় ত্যাগ স্বীকারের মতো যোগ্যতা সৃষ্টিতে এখনো সক্ষম?

দ্বিতীয় মৌলিক কারণ হলো, ৭০ শতাংশ মার্কিনীর মতে, মার্কিন মিডিয়ার সংবাদে ভারসাম্যহীনতা ও পক্ষপাতিত্ব পাওয়া যায়। ৫৫ শতাংশ মার্কিনী মার্কিন মিডিয়ার সংবাদকে মনগড়া ও বানোয়াট মনে করে। যেমন পেন্টাগনের অদৃশ্য নির্দেশে উপসাগরীয় যুদ্ধের একতরফা সংবাদ পরিবেশন করে সি.এন.এন গোটা বিশ্বে মার্কিন মিডিয়ার ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছে এবং মার্কিন মিডিয়াকে কলঙ্কিত করেছে। খোদ

www.pathagar.com

আমরিকার সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ আমেরিকার এই নতুন পলিসির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া বিষয়ক এই পলিসির কারণে মার্কিনীরা ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ওসামা ও তার ধর্মপন্থী মুসলমানদের বিরোধী প্রোপাগান্ডায় কোনো বিরূপ প্রভাব গ্রহণ করেনি। তবে সাময়িকভাবে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। এরপর যখন মার্কিন সরকার প্রত্যাশা অনুযায়ী মিডিয়ায় মনগড়া, বানোয়াট ও জাল দলীল-দস্তাবেজ জারি করা শুরু করে, তখন সর্বপ্রথম খোদ মার্কিন সাংবাদিকরাই এসব দলীল-দস্তাবেজ মিথ্যা, ধোকা, প্রতারণা ও বানোয়াট আখ্যায়িত করে। আইন বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীরা তো এর প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেননি, কিন্তু ইহুদীরা তাদের হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও শত্রুতার ঝাল মেটাতে এটাকেই মোক্ষম সময় মনে করে। ফলে তারা মুসলমানদের ইবাদতকেন্দ্রগুলোকে টার্গেট বানায়। মুসলিম নারীদের চলাফেরা পর্যন্ত সংকীর্ণ করে তোলে। মিথ্যা ভিত্তিহীন সংবাদের ভিত্তিতে মুসলমানদের গ্রেফতার করায়। অথচ স্বয়ং দু ইহুদীকে এক মসজিদ ধ্বংস করার অপরাধে বোমাসহ গ্রেফতার করা হয়েছে। মার্কিনীদের সামনে যখনই প্রকৃত বিষয়টা সুস্পষ্ট এবং ইহুদী ষড়যন্ত্রের পর্দা উন্মোচিত হলো, তখন তারা মুসলমানদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। মসজিদসমূহের সামনে গিয়ে নামাযী মুসলমানদের ফুলের মালা দিয়েছে এবং নিজেদের ভুল ধারণা ও ভুল বোঝাবুঝির জন্য ক্ষমা চেয়েছে। গির্জার দায়িত্বশীলরা ইসলামের পরিচয় বর্ণনার জন্য মুসলমানদের আহবান করেছে। ইসলাম ও ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অতঃপর তাদের সামনে যখন ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষামালা সুস্পষ্ট হয়ে গেল তখন তারা সত্য কথা গ্রহণ করতে মোটেও দেরি করেনি; বরং তারা বিভিন্ন লাইব্রেরীতে গিয়ে ইসলাম সম্পর্কে কিতাবাদি সংগ্রহ শুরু করে দেয়।

সেমতে মাত্র চার দিনের ভেতর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল লাইব্রেরীর ইসলাম বিষয়ক গ্রন্থাবলীর স্টক খতম হয়ে যায়। বিপুলভাবে কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ বিক্রি হতে লাগল। প্রকাশকরা ছেপেই কূল পায় না। অপরদিকে ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াও ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং সাক্ষাতকার প্রকাশ শুরু করে। ফলে মার্কিন নীতিনির্ধারকরা চিন্তায় পড়ে গেল, এফ.বি.আই তার বুনিয়াদী উদ্দেশে ব্যর্থ হয়ে গেছে! এখন আমেরিকান সরকার স্বয়ং তাদের নাগরিকদের স্বাধীনতার ওপরই বহু বিধি নিষেধ আরোপ করছে, যা সম্পূর্ণ অবৈধ। হোক না তারা আমেরিকায় অভিবাসী মুসলমান।

এ পরিস্থিতি ইহুদী প্রোপাগান্ডার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে; বরং যেসব মার্কিনী পূর্ব থেকেই ইহুদীদের সাথে শত্রুতা রাখত, তাদের শত্রুতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ তারাও এখন বলছে, ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পেছনে জালেম ইহুদীদের হাত রয়েছে, কিন্তু যেহেতু মার্কিন মিডিয়ার ওপর তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে, এজন্য মার্কিনীদের ইহুদী বিদ্বেষের সংবাদ ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়, কিন্তু কতদিন সত্য চাপা দিয়ে রাখা যাবে। একদিন না একদিন তার বিস্ফোরণ হবেই। সেদিন অবশ্যই সত্য তার স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করবে। নিজেদের দুষ্কর্মের হিসাব দিতে হবে এবং নিজেদের খোঁড়া গর্তে পড়তেই হবে।

www.pathagar.com

এখন পাশ্চাত্যে বসবাসরত মুসলমানদের উচিত সেখানে ইসলামের দাওয়াতকে আরো সক্রিয় ও গতিশীল করা। আর এই দাওয়াত তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন স্বয়ং মুসলমানরা তাদের জীবনকে অমুসলিমদের সামনে ইসলামের বাস্তব নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করবে। মুসলমানদের বাস্তব ইসলামী জীবন দেখেই দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেবে। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভূ-খ ইসলামের প্রহরীদের ভূ-খ হয়ে যাবে। ইসলামী ইতিহাস বলে, দেবালয় থেকেই কাবার প্রহরী বের হয়ে আসে। আগামীতেও বের হয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। ঈমানদাররা এ পৃথিবীতে সূর্যের মতো জীবন যাপন করবে। কারণ আল্লাহ তাআলাই বলেছেন, আমিই এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই একে সংরক্ষণ করব। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। শত নিরাশার মাঝেও আশার সূর্য উঁকি মারে। অল্প কয়েক বছর আগের কথা, রাশিয়ার মতো পরাশক্তি আফগানিস্তানে এসে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আমেরিকার পূর্বাভাসেও দেখা যাচ্ছে, ইরাক এবং আফগানিস্তানে আমেরিকার কবর রচিত হবে।

আলোচ্য কথাগুলো ২০০৫ সালে লেখা হয়েছিল। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি হচ্ছে, আমেরিকা ইরাক ও আফগানিস্তানের চোরাবালি থেকে বের হবার নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছে। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার পিছু হটা, আফগানিস্তানে তালেবানদের নতুনভাবে উত্থান এবং আরব বিশ্বে আমেরিকার দোসর, দালাল, তল্পীবাহক ও তার স্বার্থ সংরক্ষণকারী সরকারগুলোর বিদায় ঘন্টা বেজে ওঠা অনিবার্য। কারণ সত্য সমাগত মিথ্যা দূরীভূত–এটা আল্লাহ পাকের চিরন্তন ফয়সালা। এ পর্যন্ত যাকিছু ঘটে গেছে তা আমাদের বদ আমলের ফল, যার কারণে ক্রুসেডাররা এতদিন সময় পেয়েছে। একদিকে দুনিয়ার উন্নত জাতি-গোষ্ঠী, যারা তাদের সকল বস্তুগত উপকরণ ও শক্তি নিয়ে জুলুম, নির্যাতন ও পাশবিকতার সকল রেকর্ড ভাঙতে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, অপরদিকে অসহায়, নিরীহ, দুর্বল ও নিরস্ত্র লোক, যারা কোনো সরকার কিংবা দল ও সংগঠনের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, পেশ করেছে জান-মালের নযরানা। দুর্বল ঈমানের লোকদের যখন আল্লাহ তাআলা এমন অসাধারণ সাহায্য করেছেন, তাহলে ঈমান শক্তিশালী হলে কি পরিমাণ গায়েবী সাহায্য আসতো। আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনের রশ্মি প্রজ্বলিত করেই ছাড়বেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

নতুন বিশ্বব্যবস্থা : বৈশিষ্ট্য, উপকরণ ও উদ্দেশ্য

পূর্বাভাস

দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর পরই বিশ্বের সর্বত্র এমন একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হয়, যার থাকবে নিজস্ব কিছু নীতিমালা ও আইন-কানুন। থাকবে একটি নিজস্ব সীমারেখা। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের জন্যই এসব নীতিমালা, আইন-কানুন ও সীমারেখা মেনে চলা আবশ্যকীয় হবে। চাই তা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ধর্ম, আকীদা-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং চরিত্র ও মূল্যবোধের সাথে সংঘর্ষপূর্ণই হোক না কেন। প্রয়োজনে এই নতুন বিশ্বব্যবস্থার নির্ধারিত নীতিমালা ও আইন-কানুনকে গোটা বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিতে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতেও কুণ্ঠা বোধ করা হবে না।

নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষাপট ও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করলে যে বাস্তবতা ফুটে ওঠে সেটি হলো, এই নতুন বিশ্বব্যবস্থার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, জায়নবাদী নীতিমালা, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা এবং যে কোনো মূল্যে তার প্রাধান্য ও আধিপত্য বিস্তার করা। চাই নতুন বিশ্বব্যবস্থার স্বপ্নদ্রষ্টা চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা এ বাস্তবতা অনুভব করুন আর নাই করুন, কিন্তু বাস্তবতা এটাই। সাথে সাথে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জায়নবাদী বুদ্ধিজীবীরাই সর্বপ্রথম তাদের দস্তাবেজেই নতুন বিশ্বব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা ও রূপরেখা পেশ করেছে, বরং তাতেই নতুন বিশ্বব্যবস্থার বীজ বপন করা হয়েছে। নতুন বিশ্বব্যবস্থা বর্তমান অত্যুন্নত অবস্থায় উন্নীত করতে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থায় রূপ দিতে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ওই সকল সংগঠন-সংস্থাই মৌলিক ও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে, যেসব সংগঠন-সংস্থা ইউরোপ-আমেরিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একথাও আর গোপন নেই যে, মানবাধিকার ও সংস্কৃতির নামে যেসব বেসরকারী সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান আজ গোটা বিশ্বে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের সবারই নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে জায়নবাদীদের আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে। এক কথায়, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ সব সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান গোটা বিশ্বব্যবস্থাকে একটি জায়নবাদী কাঠামোয় ঢালার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে কাউন্সিল অফ ফরেন রিলেশন্স (C F R)-এর সাথে। এই কাউন্সিল অফ ফরেন রিলেশন্স-(সি.এফ.আর)-এর আওতায় আন্তর্জাতিক জায়নবাদী সংগঠন, মার্কিন গির্জা সংগঠন, আন্তর্জাতিক গির্জা সংগঠন এবং এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য অসংখ্য সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। এসব সংগঠন-সংস্থা ছাড়াও মানবাধিকারের নামে কাজ করে

www.pathagar.com

যাচ্ছে আরো বহু সংগঠন, যারা জায়নবাদী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের রাজনীতিবিদদের বিপুল সংখ্যক উল্লিখিত সংগঠন সংস্থাগুলোর সাথে ওতপ্রতভাবে জড়িত। তারা যখনই ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করেন, তখনই তারা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ ও চিন্তা-চেতনা এমনভাবে বাস্তবায়ন শুরু করেন, যাতে সামনে অগ্রসর হয়ে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায়, যে বিশ্বব্যবস্থায় জায়নবাদী গোষ্ঠী ও তাদের অনুসারীদের একক কর্তৃত্ব আধিপত্য থাকবে। এ নতুন বিশ্বব্যবস্থার পরিকল্পনা ও রূপরেখা তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় যখন সবেমাত্র সাদাসিধাভাবে লীগ অফ নেশন অস্তিত্ব লাভ করেছে। এরপর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীতে এই জাতিসংঘকে মূলকেন্দ্র করেই জায়নবাদী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদরা আন্তর্জাতিক সরকারের স্বপ্ন দেখা শুরু করে। শুধু তাই নয়; বরং আন্তর্জাতিক সরকারের রূপরেখা ও পরিকল্পনাকে বাস্তবতার লেবাস পরানোর জন্য সম্ভাব্য সকল শক্তি এবং প্রচেষ্টা কাজে লাগাতে শুরু করে। তাদের এ পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক অবকাঠামোর সাথে সংঘর্ষপূর্ণই হোক না কেন, এতে তাদের কিছুই আসে যায় না।

এখন প্রশ্ন, এই নতুন বিশ্বব্যবস্থা কি? কিইবা এর রূপরেখা? আর এই রূপরেখা বাস্তবায়নের জন্য এ পর্যন্ত কি ধরনের প্রয়াস চালানো হয়েছে। দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র ও জাতিগোষ্ঠীকে সহজেই এ পরিকল্পনা মানানোর জন্য এবং কোনো অবস্থাতেই যেন তারা এর বিরোধিতা না করে, এর জন্য কি প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে, সেই কর্মতৎপর শক্তিই বা কি, যার বলে বলীয়ান হয়ে এ উদ্দেশ্য অর্জনের পথে তারা ধাবমান? আর এ সব প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ যে নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে তার ফায়দাই বা কারা ভোগ করবে? বক্ষমান গ্রন্থে আপনার এসব প্রশ্নের জবাব পাবেন।

পাশ্চাত্য মিডিয়া প্রকৃতপক্ষে এই আন্তর্জাতিক সরকার গঠন ও বিনির্মাণে মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যে একটি কার্যকরী শক্তিশালী উপাদান এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রীয় স্তম্ভগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় স্তম্ভ, যার মাধ্যমে নতুন বিশ্বব্যবস্থা কায়েম করা হচ্ছে।

এ নতুন বিশ্বব্যবস্থার নাম দেয়া হয়েছে 'গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন।'[১] মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে গ্লোবালাইজেশনের অর্থ মার্কিনাইজেশন ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য বিভিন্নভাবে পুরো বিশ্বের সকল বিষয়ের ওপর পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা, যার প্রথম ভাগে থাকবে আমেরিকা।

এ ব্যবস্থার অধীনে বিশ্বের সকল অর্থনৈতিক সেক্টরে বহুজাতিক কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্য করার অনুমতি থাকবে এবং এর সকল আইন-কানুন ও নীতিমালা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই প্রণয়ন করবে। মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বিশ্বব্যাপী সুদৃঢ় করতে

---

১. ১৯৯১ সালে মার্কিন সরকার সর্বপ্রথম 'নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডার' নামে এর পরিকল্পনা পেশ করে, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর 'গ্লোবালাইজেশন' পরিভাষা সর্বত্র প্রসার লাভ করে। যার একমাত্র উদ্দেশ্য তৃতীয় বিশ্বকে মার্কিনী রঙে রঙিন করা।

www.pathagar.com

মিডিয়া, সংবাদ মাধ্যম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যোগাযোগ মাধ্যমকে শক্তিশালী করা, ছবি ও চলচ্চিত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটানো এবং কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইটের দ্রুত বিকাশ ঘটানোর সুদূরপ্রসারী কৌশল হাতে নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সংক্ষেপে বিশ্বকে এমন একটি আন্তর্জাতিক সমাজে রূপান্তরিত করা হচ্ছে, যে সমাজে একই রকম নীতিমালা, নিয়ম-পদ্ধতি ও মূল্যবোধের কর্তৃত্ব চলবে। নিয়মনীতি ও মূল্যবোধের এই একতা এতই ব্যাপক হবে, যাতে নিজেদের জাতীয় পরিচয়, স্বাতন্ত্র্য, মূল্যবোধ, বৈশিষ্ট্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তাহযীব-তামাদ্দুন বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীর তাবৎ মানুষ ম্যাকডোনাল্ড খাওয়া, কোকাকোলা ও পেপসি পান করা, জিন্স পরিধান করা এবং মার্কেটিং রুচি অভ্যাসের ক্ষেত্রে এক অভিন্ন হয়ে যাবে।[২] স্রোত যেভাবে চলছে তাতে মনে হচ্ছে, বিশ্বের তাবৎ মানুষ অতি দ্রুত একই অভিরুচি, অভ্যাস ও কালচার গ্রহণের পথে ধাবমান। তাদের দৃঢ় সংকল্প, অবিচল আস্থা ও ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছে আন্তর্জাতিক এই একতা ও অভিন্নতা অনিবার্যভাবেই সৃষ্টি হবে। যারা সহজেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নেবে তাদের সাথে ভাল আচরণ করা হবে আর যারা সহজে গ্রহণ করবে না; বরং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, তাদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে বাস্তবায়ন করা হবে। মার্কিন বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি বলেন, বিশ্বের ওপর মার্কিন ব্যবস্থা তথা ইহুদী ব্যবস্থার নেতৃত্ব কর্তৃত্ব অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া আমাদের নিকট অন্য কোনো জিনিস মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, আর না আমরা কোনো চ্যালেঞ্জের সাথে আপোস করতে প্রস্তুত। বিশেষ করে অনৈক্য, অনিষ্ট ও ফিতনা-ফাসাদের আন্তর্জাতিক উৎস তথা জাতিপূজা, দেশপূজা, ইসলামী মৌলবাদ, সন্ত্রাস ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব কোনো মূল্যেই বরদাশত করা হবে না।

উল্লেখ্য, মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাধান্য ও আধিপত্যের ফলে অন্যান্য জাতির স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য নির্মূল হয়ে যাবে। এ ঘোষণা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দেয়া হচ্ছে। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর বাস্তবায়ন ঘটানো হচ্ছে গ্যাট চুক্তির মাধ্যমে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্যবাজার দখল করে নেয়ার জন্য বড় বড় কোম্পানীকে খোলাখুলি ছাড় দেয়া হয়েছে। অর্থনীতিবিদ টনি ক্লার্ক-এর বিশ্লেষণ মতে, গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের ফায়দা কেবল বড় বড় কোম্পানীগুলোর মালিকদেরই হবে। তাই দেখা যায়, বিশ্ব অর্থনীতির ৭৪ শতাংশ আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশ ৫০০ বড় বড় কোম্পানীর দখলে রয়েছে। তন্মধ্যে আমেরিকার রয়েছে ১৫৩টি কোম্পানী, ইউরোপের রয়েছে ১৫৫টি আর জাপানের রয়েছে ১৪১টি। আর বিশ্বের অন্যান্য দেশের কেবল এক শতাংশ কোম্পানী পুরো বিশ্বের বিদেশী বিনিয়োগের ৫০ শতাংশের মালিক।

---

২. বর্তমানে প্রাচ্যের দেশসমূহ চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যেরই পদাঙ্কই অনুসরণ করে চলেছে। পাশ্চাত্যের দেশসমূহে যে হারে এবং যে ধরনের চারিত্রিক ও নৈতিক অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, সে ধরনের অপরাধই কিছু কম হারে প্রাচ্যের দেশসমূহে সংঘটিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রাচ্যের দেশসমূহ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় মার্কিন গ্লোবালাইজেশন তথা বিশ্বায়ন ব্যবস্থার মধ্যেই ঢুকে পড়ছে। এছাড়াও বিশ্বায়ন ব্যবস্থা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সভ্যতা-সংস্কৃতিসহ সর্বক্ষেত্রেই তার দুর্দান্ত থাবা বিস্তার করে চলেছে।

www.pathagar.com

বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের ধারণা, এসব কোম্পানীর ব্যাপকতা ও বিস্তৃতির অনুমান না পুঁজি দ্বারা সম্ভব আর না উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা সম্ভব; বরং তার অনুমান আমদানী দ্বারা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জেনারেল মোটর্স কোম্পানী, যার আমদানী ১৬৮ মিলিয়ন ডলারের উর্ধ্বে আই.ব.বি. কোম্পানী, যা ৬০টি বড় বড় কোম্পানী পরস্পরে একীভূত হয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ কোম্পানী তৃতীয় বিশ্বের ১৩০টি এবং ইউরোপের ৪০টি কোম্পানীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে। শুধু মিসর একাই এ কোম্পানীতে একশ' মিলিয়ন ডলারের পুঁজি বিনিয়োগ করেছে, কিন্তু এর ফায়দা পুরোটাই হচ্ছে আই.বি.বি কোম্পানীর। এভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলো অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্রমেই আমেরিকার গোলামে পরিণত হচ্ছে।

বড় বড় কোম্পানীর মুখপাত্র মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমগুলো বিভিন্ন দেশ জাতির সমস্যাগুলোকে অত্যন্ত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করে জাতির সামনে উপস্থাপন করে আবার এসব সমস্যা সৃষ্টিকারীদেরকেই তার মুক্তিদাতা হিসেবে তুলে ধরে। মিডিয়া বলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোকে রক্ষা করেছে, অথচ বাস্তবতা হলো, সে ওয়াল স্ট্রীটের সেসব মার্কিনীদের রক্ষা করেছে যারা মেক্সিকোতে তাদের কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করত।

মিডিয়া ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে খাদ্য ঘাটতির মায়াকান্না কাঁদে, কিন্তু একবারও সে একথা বলে না, কারকিল কোম্পানী আন্তর্জাতিক খাদ্য দ্রব্যের ওপর সর্প হয়ে বসে আছে এবং হাজার হাজার মাইল দূর থেকে বসে সে এসব খাদ্য-দ্রব্য রফতানী করে, যাতে এসব খাদ্য-দ্রব্য আবার তাদের অংশেই পড়ে যারা পূর্ব থেকে বদহজমের শিকার। অথচ স্বয়ং এসব খাদ্য-দ্রব্য উৎপাদনকারী দেশের জনগণ ক্ষুধায় মরছে। যে টেকনোলজির কথা মিডিয়া বলে, তার ফায়দা কার হচ্ছে? এর ফায়দা হচ্ছে নিউইয়র্ক, জেনেভা ও লন্ডনের সেসব ব্যবসায়ীর, যারা বিশ্বের সকল উপকরণের ওপর কবজা করে বসে আছে। আর এদিকে সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে, ৬৫ শতাংশ আন্তর্জাতিক মিডিয়ার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলদারিত্ব রয়েছে, কিন্তু মিডিয়া একথা কখনোই বলেনি, বিশ্বব্যাংক ও বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানী এশিয়ান টাইগার্সখ্যাত মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের অর্থনীতি ধ্বংসে কি ভূমিকা পালন করেছে? যাতে তাদেরও গোলাম বানানো যায় এবং তাদের অবস্থা এমন করুণ ও শোচনীয় বানিয়ে দেয়া যায়, যাতে তারা সেসব দেশের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে যাবে যারা পাশ্চাত্যের প্রভুদের সাথে টক্কর দেয়ার সামান্যও চিন্তা করে।

প্রশ্ন হলো, বিশ্বায়ন কি পৃথিবীর পুনর্গঠনে সফলকাম হবে? বিশ্ব কি আমেরিকার নেতৃত্ব মেনে নেবে? বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও জাতিগোষ্ঠী কি তাদের নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্যবোধ পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত হবে? আর যদি এমনটি জোরপূর্বক করা হয় তাহলে সেটা কতদিন চলবে? এ ধরনের আরো অসংখ্য প্রশ্ন রয়েছে যার উত্তর অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

নতুন বিশ্বব্যবস্থা

জায়নবাদী চিন্তাবিদরা প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে তাদের দস্তাবেজে আন্তর্জাতিক সরকারের রূপরেখা পেশ করে,[৩] কিন্তু এই আন্তর্জাতিক সরকারের রূপরেখা বাস্তবে রূপদান এবং এর জন্য পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত প্রয়াস প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল থেকে শুরু হয় যখন অতি গোপনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন-এর রাজনৈতিক উপদেষ্টা কর্নেল মান্ডিল হাউস তার বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় লীগ অফ নেশনের অবকাঠামো তৈরি করেন। মান্ডিল হাউস তার পরিকল্পনা ও রূপরেখা সর্বপ্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্টের সামনে পেশ করেন, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সাংবিধানিকভাবে কেবল মার্কিন সিনেটেরই রয়েছে। সেমতে মার্কিন সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য একথা বলে লীগ অফ নেশনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেন যে, মার্কিনীরা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো সংগঠনের অধীন থাকতে পারে না। এভাবে লীগ অফ নেশনের পরিকল্পনা বাস্তব রূপ লাভের পূর্বেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ইহুদীবাদী মস্তিষ্ক প্রথমেই হোঁচট খায়। যদিও সে সময় মার্কিন সিনেটে লীগ অফ নেশনের প্রস্তাব পাশ হয়নি, কিন্তু নামে মাত্র হলেও তার একটি অস্তিত্ব অবশ্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেদিন পরিকল্পনাকারীদের ভালভাবেই অনুমান হয়ে গিয়েছিল, যে পরিকল্পনা সরাসরি কোনো দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে, সে পরিকল্পনায় সফলকাম হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো এ ধরনের সংগঠনের অধীনে কোনোভাবেই আসবে না। এর মৌলিক কারণ হলো, মার্কিন সংবিধান আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন মার্কিন সিনেট ও অধঃস্তন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করে রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিডিয়ার যে স্বাধীনতা রয়েছে এবং মার্কিন সিনেটের সদস্যরা যে স্বাধীনতার সাথে বিভিন্ন বিলের ওপর আলোচনা-পর্যালোচনা করেন, সে ভিত্তিতে মার্কিন সিনেট লীগ অফ নেশন প্রস্তাবের ওপর বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা ছাড়াই তা পাস করে দেবে-সেটা অসম্ভব ছিল। অপরদিকে মার্কিন সংবিধান সে দেশের নাগরিকদের আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের কাছে অস্ত্র রাখার অনুমতি ও স্বাধীনতা প্রদান করেছে। এ অবস্থায় মার্কিন উচ্চ ক্ষমতাকে অন্য কোনো সংগঠনের অধীন করে দেয়ায় বড় ধরনের বিপদ লুক্কায়িত থাকতে পারে। এ পরিস্থিতি উপলব্ধি করে পরিকল্পনাকারীরা তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য 'ধীরে চলা'র নীতি গ্রহণ করে। পরবর্তী ধাপে তারা নিম্নবর্ণিত উপকরণ ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে।

মার্কিন সরকারের সকল সেক্টরে অনুপ্রবেশের পরিকল্পনা

মার্কিন সিনেটে লীগ অফ নেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাস করাতে ব্যর্থ হওয়ার পর ষড়যন্ত্রকারী ইহুদী মস্তিষ্ক এ পর্যায়ে মার্কিন সরকারের সকল সেক্টরে অনুপ্রবেশের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যাতে তারা মার্কিন সিনেটের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার

৩. ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের প্রসিদ্ধ শহর 'ব্রাসেলসে ইহুদী পন্ডিত ও চিন্তাবিদদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ১৯টি অধ্যায় সম্বলিত এক দস্তাবেজ প্রণয়ন করা হয়, যা ইতোমধ্যেই জনসম্মুখে চলে এসেছে। সেই দস্তাবেজের ১১তম ও ১৯তম অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক সরকারের পরিকল্পনা এবং রূপরেখা পেশ করা হয়েছে। ১২তম অধ্যায়ে মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যম দখল করার পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে এবং ১৬তম অধ্যায়ে শিক্ষার মাধ্যমে মগজ ধোলাইয়ের পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে, কিন্তু এখন সেটা অস্বীকার করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

করতে পারে এবং ভবিষ্যতে যে কোনো ধরনের প্রস্তাব পাস করাতে যেন হোঁচট খেতে না হয়। এ পরিকল্পনার আওতায় তারা সরকারের মৌলিক তিনটি স্তম্ভ এবং কেন্দ্র ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া, সংবাদ মাধ্যম, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির কেন্দ্রগুলোকেও টার্গেট করে। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্নেল মান্ডিল হাউস অতি গোপনে তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আমেরিকার পরিবর্তে লন্ডনে গিয়ে সলা পরামর্শ করেন। সেই পরামর্শ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'আন্তর্জাতিক বিষয়ক মার্কিন সংস্থা' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেমতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কর্নেল মান্ডিল হাউস মার্কিন প্রেসিডেন্টের সহায়তায় এ ধরনের একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে ১৯২১ সালে এই সংস্থার নাম পরিবর্তন করে 'Council of Foreign Relation-C.F.R' (পররাষ্ট্র সম্পর্ক কাউন্সিল) রাখা হয়। এই সংস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তার অধীনে আরো অসংখ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় এবং প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে সেগুলোকে 'কাউন্সিল অফ ফরেন রিলেশন' সংস্থার অধীনে রাখা হয়। সেসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'বিজনেস কাউন্সিল, এশিয়ান ইনস্টিটিউট, আটলান্টিক কমিটি, ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিস্ট ও ট্রি টেরিয়াল কমিশন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সি.এফ.আর অস্তিত্ব লাভের পর পরই তার মুখপত্র 'ফরেন এ্যাফেয়ার্স (Foreign Affairs)'-এর প্রকাশনা শুরু হয়। সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার আওতায় সি.এফ.আর-এর শক্তিধর সদস্যরা, যাদের সকলেই ছিল নিরেট ইহুদী–তারা মার্কিন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বড় বড় পদ, ট্যাক্সমুক্ত সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, মার্কিন মিডিয়া, ব্যাংক, বীমা, ইন্স্যুরেন্স, কোম্পানী, ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান পার্টি এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক অন্যান্য কেন্দ্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। তারা ডেল কার্নেগী, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, রকফেলার ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক টাইমস, নিউজউইক এবং মার্কিন সকল টিভি স্টেশনের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কালক্রমে অবস্থা এ পর্যায়ে এসে দাঁড়াল যে, যে জাতি মুহাজির হয়ে ১৮৪৮ সালে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় আমেরিকায় এসেছিল এবং যাদের জনসংখ্যার হার শতকরা ২.৯ শতাংশ, সে জাতি আজ বিশাল আমেরিকার ৯৭ শতাংশ জনগণের ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব করছে। [৪]

৪. ১৯৯৭ সালের একটি জরিপ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীদের কল্পনাহীন প্রভাব-প্রতিপত্তি সহজেই অনুমান করা যায়। এ জরিপ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোটিপতি ইহুদীদের হার শতকরা ২৫ শতাংশ, জুতা শিল্পে শতকরা ৩৪ শতাংশ, পানীয় শিল্পে শতকারা ৫০ শতাংশ, পোশাক ও ফ্যাশন শিল্পে শতকরা ১০০ শতাংশ, পেট্রোলিয়াম শিল্পে শতকরা ৯৮ শতাংশ, শিক্ষার ক্ষেত্রে শতকরা ২০ শতাংশ, মার্কিন ইউনিভার্সিটিগুলোতে ইহুদী শিক্ষকের হার শতকরা ৫০ শতাংশ, হার্ভার্ডের মত বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানে ইহুদী শিক্ষকের হার শতকরা ৭৫ শতাংশ, মেডিসিন শিল্পে শতকরা ২৫ শতাংশ, ল' কলেজে শিক্ষকের হার শতকরা ৩৮ শতাংশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডাক্তার ও আইনজীবীদের হার শতকরা ৩৮ শতাংশ। আর মিডিয়া তো তাদের একচ্ছত্র দখলেই রয়েছে। শুধু 'নিউ হাউস ফ্যামিলী' নামে একটি ইহুদী পরিবারের করায়ত্বেই ৪৮টি দৈনিক, ২০টি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, ১৮২টি রেডিও স্টেশন, ১৪০টি টিভি ক্যাবল এবং ১৭৩৫টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকা বিক্রি হয় ৬০ মিলিয়ন কপি। এসবই ইহুদী মালিকানা পত্রিকা। অপরদিকে মার্কিন নির্বাচনে ইহুদী ভোটারদের ভোটের হার শতকরা ৯২ শতাংশ, অথচ সামগ্রিকভাবে গোটা জাতির ভোটের হার শতকরা ৫৪ শতাংশ। আর আমেরিকায় বসবাসরত মুসলমানদের ভোটের হার কেবল শতকরা ২৮ শতাংশ। এগুলোও আবার ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও আরব বিশ্ব থেকে আগত মুসলমানদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট থেকে শুরু করে রোনাল্ড রিগান পর্যন্ত নয় জন মার্কিন প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা জন মেকলে বলেন, আমাদের যখনই মার্কিন প্রশাসনের জন্য কোন লোকের প্রয়োজন পড়ে, তখনই আমরা নিউইয়র্কে অবস্থিত সি.এফ.আর-এর কেন্দ্রীয় দফতরের সাথে যোগাযোগ করি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সি.এফ.আর-এর অসাধারণ ও সীমাহীন প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে। তার অনুমান এভাবে করা যেতে পারে, ১৯৫২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান দু'টি দল থেকেই 'প্রেসিডেন্ট পদে' যত লোককেই মনোনয়ন দেয়া হয়েছে, তাদের সবারই সি.এফ.আর-এর সাথে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সি.এফ.আর-এর সাথে সুগভীর ও সুনিবিড় সম্পর্ক ছাড়া কেউ-ই এ পদে মনোনয়ন লাভ করতে সক্ষম হন না। শুধু প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান এর ব্যতিক্রম ছিলেন । তিনি সি.এফ.আর-এর সদস্য ছিলেন না, কিন্তু তাকে বাধ্য করা হয় জর্জ বুশকে তার ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন দিতে। যিনি সি.এফ.আর-এর একজন সক্রিয় ও প্রসিদ্ধ সদস্য ছিলেন। মি. রোনাল্ড রিগান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার প্রথম মাসেই তার ওপর আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়, যাতে তার ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। রিগান সরকারের সদস্য সংখ্যা ছিল তিনশ' তের জন। তাদের সকলেই ছিল সি.এফ.আর-এর সক্রিয় সদস্য। মি. বিল ক্লিন্টন যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তখন তিনি সি.এফ.আর-এর প্রেসিডেন্ট মি. ওয়ার্ন ক্রিস্টোফারকে তার সরকার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গ নির্বাচন করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। সে হিসেবে তার সরকারের সকল লোকবলই ছিল সি.এফ.আর-এর সক্রিয় ও চৌকস সদস্য। সি.এফ.আর-এর মুখপাত্র ফরেন এ্যাফেয়ার্সেরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসাধারণ জনপ্রিয়তা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে। মার্কিন নৌবাহিনীর কমান্ডার এ্যাডমিরাল ওয়ার্ড-এর বক্তব্য ও সাক্ষ্যই তার প্রভাব-প্রতিপত্তি অনুমানের জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেন, ফরেন এ্যাফেয়ার্সের নিবন্ধগুলো পড়লে ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতির কর্মকৌশল কি হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। ফরেন এ্যাফেয়ার্স যদি কোনো প্রস্তাব দ্বিতীয়বার প্রকাশ করে তাহলে সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলো সেটা এমনভাবে বাস্তবায়ন করে, যেন তা এক 'সর্বজন স্বীকৃত বাস্তবতা'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পূর্বে ১৯৩৯ সালে সি.এফ.আর একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করে। প্রস্তাবটি ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সৃষ্ট সমস্যা সংকটগুলো নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার জন্য এখন থেকেই একটি কমিটি গঠন করা হোক। সি.এফ.আর-এর এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির কাজে সাহায্য করার জন্য মার্কিন সরকার সি.এফ.আর-এর নিকট বিশেষজ্ঞদের সরবরাহের জন্য আবেদন করে। সেমতে মাত্র একজন সদস্য ছাড়া কমিটির সকল সদস্যই ছিল সি.এফ.আর-এর সক্রিয়, মেধাবী বিশেষজ্ঞ ও চৌকস সদস্য। অতঃপর ইহুদী ষড়যন্ত্র অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন এই কমিটির কার্যসীমা আরো ব্যাপক করে দেয়া হয়। এক কথায়, এই কমিটি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে 'উপদেষ্টা পরিষদ' হিসেবে কাজ করতে থাকে।

www.pathagar.com

১৯৪১ সালের ১৪ই আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সেই চুক্তিতে একটি 'নতুন বিশ্বব্যবস্থা ও স্থায়ী শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা'র আহবান জানানো হয়।

১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী ২৬টি মিত্র দেশ মিলে জাতিসংঘ চার্টারে স্বাক্ষর করে। সেসব দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের দস্তখতে জারি হওয়া চুক্তির সত্যায়ন করে। সে সময় থেকেই 'জাতিসংঘ' পরিভাষার ব্যবহার শুরু হয়, কিন্তু আমেরিকাই একমাত্র দেশ, যে এই সংস্থাকে 'জাতিসংঘে'র পরিবর্তে 'মিত্র সংঘ' আখ্যা দিয়েছে।

১৯৪৩ সালের জানুয়ারীতে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'কার্ডিল হিলে'র সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যার সকল সদস্যই ছিল সি.এফ.আর-এর সক্রিয় সদস্য। এই কমিটিই জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা প্রস্তাবের একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সামনে পেশ করে, যা ১৯৪৪ সালের ১৫ জানুয়ারীতে মার্কিন জনগণের সামনে 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠার নিয়মতান্ত্রিক ঘোষণা করে। বিশ্ব মানচিত্রে অস্তিত্ব লাভ করে বিশ্বকে শাসন করার ইহুদীবাদী মস্তিষ্কের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন 'জাতিসংঘ'।

১৯৫৪ সালে সানফ্রান্সিসকোতে জাতিসংঘ চার্টারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়। এই চার্টারে ৫০টি দেশ স্বাক্ষর করে। উক্ত চার্টারে সদস্য দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু এর সপ্তম ধারায় আবার উল্লেখ করা হয়েছে, প্রয়োজন পড়লে নিরাপত্তা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সামরিক কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে। এই সামরিক কাউন্সিল তখনই তার ভূমিকা পালন করবে যখন জাতিসংঘ কোনো দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। ধারা ৩৩-এর অধীনে জাতিসংঘের স্বতন্ত্র নিরাপত্তা বাহিনী গঠন করার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতিসংঘের এই চার্টার প্রণয়ন কমিটিতে যেহেতু সি.এফ.আর-এর সদস্য সংখ্যাই বেশী ছিল, সেহেতু এর ধারাগুলো সব খুব সহজে মঞ্জুর হয়ে যায়। এতে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। এভাবেই ইহুদী মস্তিষ্কের পরিকল্পিত 'আন্তর্জাতিক সরকার' গঠনের প্রথম প্রতিষ্ঠান কিংবা মাধ্যম তাদের দখলে চলে আসে।

বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সূচনা

১৯৬০ সালে যখব চুম্বে ঘোষণা দিল, কটেংগা প্রদেশ কংগো থেকে অবশ্যই স্বাধীন হবে। এ ঘোষণার কিছুদিন পরই চুম্বেকে হত্যা করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদ সর্বপ্রথম জাতিসংঘ বাহিনী কংগোতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কংগোতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা বাহিনী হাজারো নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করে। তারা কটেংগার নিরীহ নিরপরাধ জনগণের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। সেখানের যোগাযোগ কেন্দ্রগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হয়, যাতে বহির্বিশ্বের সাথে কোনো যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। হাসপাতাল এবং স্কুলগুলোও ধ্বংস করে দেয়া হয়। কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের সূচনা এখান থেকেই হয়, কিন্তু ব্যাপক আকারে হস্ত ক্ষেপ শুরু হয় উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে। নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৯১ সালের এপ্রিলে

www.pathagar.com

একটি প্রস্তাব পাস করে ইরাকের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে জাতিসংঘকে সম্পূর্ণ ছাড় দিয়ে দেয়া হয় যে, জাতিসংঘের কর্মকর্তারা কোনো অনুমতি ছাড়াই যে কোনো সময় ইরাকের অভ্যন্তরে অনুসন্ধান চালাতে পারবে এবং বিধ্বংসী কোনো অস্ত্র পাওয়া গেলে তা ধ্বংসও করতে পারবে। এমনিভাবে জাতিসংঘ ইরাকের খাদ্য-শস্য আমদানী-রফতানী এবং পেট্রোল বিক্রয়ের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। মনগড়া আইন প্রণয়ন করে জাতিসংঘ নিজের ইচ্ছামত ইরাকের অর্থনীতি, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতির ওপর পাহারা বসিয়ে দেয়। কোনো আপত্তি-অভিযোগ ছাড়াই ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তাব পাস করে। এভাবেই জাতিসংঘ বিশ্বের সকল দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার দরোজা খুলে দেয়। একই খেল বসনিয়া, হাইতি এবং সোমালিয়াতেও খেলা হয়। আংশিকভাবে লিবিয়া, কম্বোডিয়া, লাইবেরিয়া, নাইজেরিয়া, সুদান এবং রাঙ্গোলায়ও একই নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।[৫] অতঃপর ১৯৯২ সালের জুন মাসে জাতিসংঘের মহাসচিব বুট্রোস ঘালির রিপোর্ট 'শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত প্রস্তাব' জাতিসংঘের জেনারেল এ্যাসেম্বলীতে পেশ করেন। উক্ত রিপোর্টে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সকল দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিষয় আইনী মর্যাদা দেয়ার আহবান জানানো হয়। বৃহৎ শক্তিগুলো সবাই এ প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহণ করে নেয়। মহাসচিব তার প্রস্তাবে জাতিসংঘের কার্যসীমা আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করার আবেদন জানান। তিনি বলেন, পারিবারিক একতা বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষার জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, এইডস, ক্ষুধা, দারিদ্র ও দূর্ভিক্ষ নির্মূল করা, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রেও জাতিসংঘের ভূমিকা থাকা উচিত। কারণ, এ বিষয়গুলো এত সঙ্গীন এবং তার সীমা এত ব্যাপক বিস্তৃত যে, কোনো দেশের একার পক্ষে তার সীমিত উপকরণ দিয়ে এর মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

বিশ্বের সরকারগুলোর মূল ক্ষমতা জাতিসংঘের নিকট হস্তান্তর করা

ধীরে ধীরে জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোর তরফ থেকে বিভিন্ন দেশের ওপর এমন আইন চাপিয়ে দিতে লাগল, সেসব দেশ তাদের নিজেদের বিষয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবার পরিবর্তে সিদ্ধান্ত দেবে জাতিসংঘ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি ও জনসন-এর শাসনামলে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের সহকারী মি. রিচার্ড গার্ডনার বলেছিলেন, যদি আমাদের নতুন বিশ্বব্যবস্থার ইমারত নির্মাণ করতে হয়, তাহলে তার ভিত্তি ওঠাতে হবে একেবারে নীচ থেকে, ওপর থেকে নয়। আমাদের উচিত কোনো দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও তার প্রভাব-প্রতিপত্তির পরওয়া না করা। এ ক্ষেত্রে যে দেশই হঠকারিতা প্রদর্শন করবে সে দেশকে দমন করতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ না করা। এ ছাড়া আমরা শুধু তোষামদ, খোশামদ ও কারো অনুসরণ করে নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারব না। এ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, ফরেন এ্যাফেয়ার্সের এক প্রবন্ধকার, যা এপ্রিল ১৯৪৭ সালে ফরেন এ্যাফেয়ার্সের এক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর পরই খুব সাদাসিধাভাবে নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে সাধারণ

---

৫. কসোভোতে মুসলমানদের বংশ নিধনের নতুন পদ্ধতি ন্যাটো বাহিনীর তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করা হয়।

www.pathagar.com

মূলনীতির মতো তা খুব সহজেই মেনে নেয়া হয়। প্রস্তাব পেশ করার সময় নামকা ওয়াস্তে একথারও উল্লেখ করে দেয়া হয়, এ প্রস্তাবের বাস্তবায়ন জরুরী নয়। অতঃপর একটি আন্তর্জাতিক দস্তাবেজ তৈরি করে জাতিসংঘের প্লাটফরম থেকে তা মঞ্জুর করিয়ে নেয়া হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জাতিসংঘ ও তার অধঃস্তন সংগঠনগুলোকে কোনো কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দিয়ে দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৮২ সালে আমেরিকা 'গণহত্যা বিষয়ক আইন'-এ স্বাক্ষর করেছিল। এই আইনের আওতায় হেগের আন্তর্জাতিক আদালতকে এই স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল যে, যদি কোনো দেশকে গণহত্যা ও সাধারণ হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত পাওয়া যায় তাহলে তার বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা চালানো হবে। হুবহু একই অবস্থা 'পরিবেশ সংরক্ষণ ও শিশু অধিকার' সংক্রান্ত আইনের। ১৯৮৯ ও ১৯৯৪ সালে এ আইনের খসড়ায় দস্তখত করে জাতিসংঘ থেকে পাস করানো হয়। 'গ্যাট' চুক্তির আকারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন সকল দেশের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়।[৬] এভাবে ক্রমশঃ বিভিন্ন দেশের সরকার সর্বোচ্চ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতা চলে যাচ্ছে জাতিসংঘের হাতে। এখন সেসব দেশ নিজের অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতেও নিজেকে অক্ষম মনে করছে। তারা তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর কাছে ধর্না দিতে হচ্ছে। জাতিসংঘের এক কমিটি মার্কিন প্রদেশ ওরিগান-এর একটি আইনকে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে রুজু করা ছাড়াই প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল। এ আইনটি ছিল পরিবেশ সংক্রান্ত। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো আইন কেবল সুপ্রিম কোর্টই প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে। শিশু সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভার্জিনিয়া প্রদেশের এক পার্লামেন্ট সদস্য বলেন, জাতিসংঘ আইন তো পাস করল, কিন্তু মার্কিন সমাজে তা বাস্তবায়ন করার জন্য মার্কিন সিনেটকে এ আইনের সার্বিক দিক আলোচনা পর্যালোচনার সুযোগ দেয়নি। সমস্যা হবে তখন যখন মার্কিন আদালত জাতিসংঘ প্রণীত আইনের ফলাফলের সম্মুখীন হবে।

জাতিসংঘকে আন্তর্জাতিক সরকারের মর্যাদাদান

জাতিসংঘের মহাসচিব ড. বুট্রোস ঘালি তার 'শান্তি প্রস্তাব' রিপোর্টে যথারীতি দাবী করেছেন, জাতিসংঘকে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করার ক্ষমতা

---

৬. বাহ্যিকভাবে আমেরিকার নামে ইহুদী গোষ্ঠীই এই চুক্তির সকল সুযোগ-সুবিধা ও ফায়দা ভোগ করবে। কারণ মার্কিন ব্যাবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ইহুদী গোষ্ঠীরই একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে। এই চুক্তির আওতায় বিশ্বের সকল দেশ কৃষি উৎপাদনে জাতিসংঘের আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি মেনে চলতে বাধ্য হবে। জাতিসংঘ যদি দাবী করে, অমুক অমুক কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ও মানদন্ড এমন হবে, তাহলে সে দেশ এই দাবী বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হবে। এতে তার বস্তুগত যতই লোকসান গুনতে হোক না কেন। উদাহরণস্বরূপ ইসরাঈল ও মিসরের কৃষি ও বাণিজ্য চুক্তির আওতায় ইসরাঈল তুলা ও তরকারির বীজ সরবরাহ করে, যা ছিল অতি নিম্নমানের। এর ফলে মিসরের কৃষকদের বিপুল পরিমাণ আর্থিক লোকসান গুনতে হয়েছে; বরং তাদের কৃষি ভূমিও বরবাদ হয়ে গেছে। বাণিজ্য ক্ষেত্রে ঠিক একই চুক্তি ভারত ও অন্যান্য দেশের মাঝে করানোর জোর প্রয়াস চলছে। অপরদিকে বৈদেশিক ঋণ থেকে মুক্তি দেয়ার মুখরোচক কথা বলে ভারতের বড় বড় কারখানা ও কোম্পানীগুলো ক্রয় করে নেয়া হচ্ছে।

www.pathagar.com

প্রদান করা হোক। সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক লেনদেন, পেট্রোল উৎপাদন ও অস্ত্রের রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি বাবদ অর্থ উসুল করা হবে, যাতে জাতিসংঘের এত বড় সচিবালয় ও তার ক্রমবর্ধমান খরচের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের যোগান দেয়া যায়। কারণ বিভিন্ন সদস্য দেশের কাছ থেকে চাঁদা উসুল করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এখন আমরা এসব চাঁদার ওপর ভরসা করতে পারি না। ধীরে ধীরে ৭ নং ধারার আওতায় জাতিসংঘের স্থায়ী শান্তিবাহিনী গঠন করার প্রয়াস চালানো হোক।

১৯৬১ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর 'যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে মুক্তি' শীর্ষক বিশ্লেষণধর্মী এক রিপোর্ট তৈরি করে মার্কিন সরকারের সামনে পেশ করে। উক্ত রিপোর্টকে ভিত্তি করে মার্কিন কংগ্রেস 'আইন ৮৭-২৯৭' সরকারীভাবে পাস করে। যার শিরোনাম ছিল 'অস্ত্র সংকোচন আইন'। এ আইন অনুযায়ী আমেরিকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, শান্তিপূর্ণ বিশ্বে মানববিধ্বংসী অস্ত্রগুলো ধীরে ধীরে সুপরিকল্পিতভাবে তিন স্তরে নির্মূল করা হবে।

০১. প্রথম স্তরে অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা হবে এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তির পরিবেশ তৈরি করা হবে।

০২. দ্বিতীয় স্তরে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে শান্তি বাহিনী গঠন করা হবে।

০৩. তৃতীয় স্তরে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত উপায়ে খুব দ্রুত সকল দেশকে বিধ্বংসী অস্ত্র থেকে মুক্ত করা হবে, যাতে কোন দেশ সামরিক দিক দিয়ে জাতিসংঘের সশস্ত্র বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করতে না পারে।

ইরাক ও যুগোশ্লাভিয়া প্রজাতন্ত্রকে যেভাবে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র থেকে বঞ্চিত করে হত্যা করা হয়েছে তা এই আইনের বাস্তব পদক্ষেপ। এই আইন অনুযায়ী সকল দেশকে কেবল সেসব অস্ত্রশস্ত্রই রাখার অনুমতি থাকবে যা অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন। পুলিশ বাহিনীকে অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য দমন করার জন্য ভারী অস্ত্রে সজ্জিত করা হবে।

৯০-এর দশকের পর থেকে জাতিসংঘ শান্তিবাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১ লাখে উন্নীত হয়েছে। ২০শে মার্চ ১৯৬২ সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে প্রতিরক্ষা পর্যালোচনা বিভাগ রিপোর্ট নং ৭ প্রস্তুত করে। মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রশ্ন করেছিল, এমন পরিবেশ কিভাবে সৃষ্টি করা যায় যেখানে জাতিসংঘ তার যোগ্যতা ও শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারবে। এ প্রশ্নের উত্তর প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রস্তুত করেছিল। তাতে সরাসরি বলা হয়, যে সকল দেশের ওপর জাতিসংঘ তার আধিপত্য ও দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এবং তার অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলো সেসব দেশের সকল সেক্টরে পূর্ণ জেঁকে বসতে চায়, সেসব দেশকে জাতিসংঘের সকল প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়া অত্যাবশ্যক করতে হবে এবং জাতিসংঘের সকল প্রতিষ্ঠানের কাছে পূর্ণাঙ্গ সামরিক শক্তি থাকতে হবে। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আমাদের জাতিসংঘের চার্টারে সামান্য পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গোটা বিশ্বে স্বাধীনভাবে তার সকল দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে পারে।

www.pathagar.com

জাতিসংঘে যেসব দেশ শক্তিশালী ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে, তারাই অস্ত্র সংকোচনের তত্ত্বাবধান, শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক অনৈক্য-দ্বন্দ দূরীকরণ ও ট্যাক্স উসুল করার জন্য যথেষ্ট। এসবের জন্য জাতিসংঘের প্রয়োজন নেই। আমরা এমন জাতিসংঘের কথা বলছি, যার নিকট পাঁচ লাখ সৈন্যের এমন বাহিনী থাকবে, যারা অত্যাধুনিক আণবিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত হবে। পঞ্চাশ থেকে একশ' পর্যন্ত রাসায়নিক ও আণবিক সমরাস্ত্র থাকবে এবং সকল সরকারের তিনটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তার নিকট থাকবে। আন্তর্জাতিক আদালতের ফয়সালা সে-ই বাস্তবায়ন করবে। নিঃসন্দেহে আমরা সাধারণ রাষ্ট্র সরকারের কথা বলছি। এ প্রস্তাবকে বুনিয়াদ বানিয়ে বৃহৎ শক্তিগুলোর অস্ত্রত্যাগ সংক্রান্ত অসংখ্য চুক্তি হয়েছে। আণবিক অস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে। রাশিয়ার সাথে অস্ত্র পরিত্যাগের সবচে' বড় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। যে চুক্তির আওতায় রাশিয়াকে অন্ততঃ পক্ষে আণবিক অস্ত্র থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘের অফিসাররা সামরিক প্রশিক্ষণ দেখাশোনা করে।

বহুকাল ধরে মার্কিন মিডিয়ায় এ ধরনের প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখে মানসিকতা প্রস্তুত করা হচ্ছে যে, আমেরিকা বর্তমানে বিশ্বের সবচে' বৃহৎ দেশ। কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে এই দেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালন কঠিন হয়ে পড়েছে। এজন্য আমেরিকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া দরকার। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সীমিত করে দেয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে মার্কিন সংবিধানে স্বাধীন মত প্রকাশ ও ব্যক্তিগত অস্ত্র রাখার অধিকার দেয়া হয়েছে। এখন সেসব অধিকার নির্মূল করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে মার্কিন সংবিধানে সংশোধনী আনার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত হয়নি। যদি দুই তৃতীয়াংশ স্টেট এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে পুরাতন সংবিধানের পরিবর্তে নতুন সংবিধান রচনার সেই পুরাতন দাবী আবার যিন্দা করা সম্ভব। তখন ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকার পরিবর্তে নিউ স্টেট অফ আমেরিকা নাম দেয়া হবে। স্টেটের সংখ্যা হ্রাস করে তাকে অর্ধ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হ্রাস করার পরিবর্তে তার বাস্তবায়ন ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি ও বর্তমান সাংবিধানিক অধিকার বিলুপ্ত করা হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা মোতাবেক ইহুদী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ধারাবাহিক এ ধরনের গ্রন্থ লেখা এবং বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রদান করা হচ্ছে। যাতে বলা হচ্ছে, আমেরিকা একটি যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে অনৈক্য ও দ্বন্দের শিকার হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির উপদেষ্টা আর্থার সেলেংগার রচিত গ্রন্থ 'আমেরিকার অনৈক্যে' একথা বলা হয়েছে। এমনিভাবে জন ক্যানন–যিনি অনেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ছিলেন, তিনি স্বীয় গ্রন্থে প্রস্তাব পেশ করেছেন, আমেরিকার ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র কমিটি গঠন করা উচিত।

www.pathagar.com

নতুন গ্রুপ

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রুশ ও যুগোশ্লাভিয়া ঐক্যবদ্ধ দেশরূপে আবির্ভূত হয় পরবর্তীতে ইউরোপীয় দেশগুলোর মাঝে একতা, সহযোগিতা ও ঐক্যের নতুন রূপ সামনে আসে। এই ঐক্য সর্বপ্রথম ইউরোপীয় যৌথ বাজারের রূপ ধারন করে অতঃপর পর্যায়ক্রমে এ ঐক্যই ইউরোপীয় পার্লামেন্টের রূপ ধারণ করে। এরপর কাস্টম ও সীমান্ত আইন বিলুপ্ত হয়। এখন ইউরোপীয় দেশসমূহের মাঝে একক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও একক মুদ্রা চালু হয়েছে। একই অবস্থা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিক মহাদেশের মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে। যে কমিটি উভয় মহাদেশের মাঝে অনুষ্ঠিত চুক্তি বাস্ত বায়নের তত্ত্বাবধান করবে, সে কমিটিই পরবর্তীতে পার্লামেন্টের রূপ ধারণ কবরে। পর্যায়ক্রমে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের পদাঙ্ক অনুসরণে ঐক্যবদ্ধ মার্কিন পার্লামেন্ট অস্তিত্ব লাভ হবে।

সম্ভবত একই অবস্থা বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্য সাগরীয় দেশসমূহে অবলম্বন করা হচ্ছে। জর্ডান ও ইসরাঈলের মাঝে ঢিলেঢালা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ঐক্যের উদ্দেশ্য উভয় দেশের মাঝে কাস্টম ও পাসপোর্ট ব্যবস্থা নির্মূল করা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাবাত, ওমান ও কায়রোতে 'অর্থনীতি' শিরোনামে যে ষষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মৌলিক উদ্দেশ্য, ইসরাঈলী পণ্যের জন্য সকল আরব দেশের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া।

বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মগজ ধোলাইয়ের প্রস্তুতি

একবার আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী (A B C)-এর এক প্রতিনিধি জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব ড. বুট্রোস ঘালিকে সোমালিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। জবাবে ড. ঘালি বলেন, সোমালিয়ায় মার্কিন সৈন্য প্রেরণ এ কারণেই সম্ভব হয়েছিল যে, এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একাধারে দীর্ঘ দশ মাস মিডিয়া ও গণমাধ্যমকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম। এর দ্বারা ড. ঘালি বুঝাতে চেয়েছেন, সোমালিয়ায় মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ বিশ্ববাসীর সামনে গ্রহণীয় বানাবার জন্য সর্বপ্রথম মিডিয়ার মাধ্যমে সোমালিয়ায় ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের কাহিনী দুনিয়াবাসীর কাছে ভয়াবহ আকার বানিয়ে পেশ করা হয়েছিল। ড. ঘালি বলেন, আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে কেবল এ সংবাদ ও চিত্রই পেশ করতে লাগলাম যে, সোমালিয়ার জনগণ ক্ষুধা, দারিদ্র ও রোগ শোকে মৃত্যু বরণ করছে। টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলো ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ সোমালী জনগণের এমন করুণ ও মজলুম চিত্র দুনিয়াবসীর সামনে পেশ করতে থাকে যাতে বিশ্ববাসী বুঝে, এই মরুভুমিতে না পানি আছে, না খাবার আছে, না মাথা গোঁজার ঠাই আছে, আর না আছে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানকার জনগণ সকল মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত। যদি কোথাও থেকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা আসে তাও আবার অসভ্য ও জংলী মানুষগুলো সেগুলো নিয়ে পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এভাবে অব্যাহত প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে আগ্রাসনের পরিবেশ তৈরি হয়ে গেলে বিশ্ববাসীর বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল যে, সেখানে বিদেশী হস্তক্ষেপ ছাড়া জনগণকে রক্ষার আর কোন পথ নেই। আর আমেরিকা এ উদ্দেশ্যেই মিডিয়ার মাধ্যমে অব্যাহত প্রোপাগান্ডা চালিয়ে আসছিল। এখন কারো

www.pathagar.com

পরামর্শ ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেখানে সামরিক হস্তক্ষেপের একটি সুবর্ণ সুযোগ হাতে আসল। যে সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোমালিয়ার ওপর সামরিক আগ্রাসন চালায়। পরিস্থিতির আলোকে এখন আর কারো একথা বলার প্রয়োজন হল না, সেখানে সামরিক আগ্রাসনের আসল কারণ ও সমস্যা কি? আসল উদ্দেশ্য পর্দার অন্তরালেই রয়ে গেল। গোটা বিশ্ব এই চিত্তাকর্ষক মনোরম দৃশ্য দেখতে লাগল, মার্কিন সৈন্য মুক্তিদূত হয়ে নিজেদের জীবনবাজি রেখে স্ত্রী-পুত্র সব ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে সোমালী জনগণের জন্য স্কন্ধে ত্রাণের বোঝা বহণ করে এদিক সেদিক দৌড়াচ্ছে। মার্কিন বাহিনী কর্তৃক বিদেশী সাহায্য ও ত্রাণের সুষম বন্টনের কারণেই ক্ষুধার্ত ও মুমূর্ষু সোমালী জনগণ সুস্থ সবল হয়ে ওঠছে। তাদের শরীরে মার্কিন পোশাক দেখা যায়। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই মূল্যবান সহযোগিতা মনে-প্রাণে গ্রহণ ও মূল্যায়ন করছে। সোমালী জনগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবদরদী পলিসির প্রশংসায় পঞ্চমূখর। প্রতিটি সোমালী জনগণই চাচ্ছিল মার্কিন সৈন্য আমাদের এখানে থেকে যাক। উপসাগরীয় যুদ্ধে ঠিক একই নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। শুধু মার্কিন জনগণই নয়; বরং গোটা বিশ্বাবাসীর সামনে সাদ্দামের জুলুম-অত্যাচারের চিত্র সুবিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছিল, কিন্তু এ নাটক মঞ্চায়নের পূর্বে সাদ্দামের মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করানো হয়েছে। তাদের স্বার্থে সাদ্দামকে ব্যবহার করা হয়েছে। সে ছিল তাদের ক্রীড়নক। এ নাটকে কুয়েতকে কুরবানীর বকরী বানানো হয়েছে। সাদ্দাম ও জর্জিয়ার খৃস্টান প্রচারক তারেক আজীজকে তাদের ক্রীড়নক বানানো হয়েছে। এই তারেক আজীজই ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী হয়ে আমেরিকার নাকি ইসরাঈলের প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছিলেন–তা কারো বোধগোম্য হচ্ছিল না।[৭]

---

৭. খুব তাড়াতাড়িই উপসাগরীয় যুদ্ধের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়। এই যুদ্ধ ছিল সাদ্দাম হুসাইনের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ এবং জাতিসংঘের বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একটি সক্রিয় ও শক্তিশালী হাতিয়ার; বরং ইরাককেই নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বানানো হয়েছে। যখনই ইরাকের আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে তখনই একে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে জায়নবাদী গোষ্ঠী আরব বিশ্বের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আরবদের বিভ্রান্ত করা ও তাদের দৃষ্টিকে প্রকৃত বিষয় থেকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার এবং তাদের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের জন্য সাদ্দাম হুসাইনকে উসকে দিয়ে তার মাধ্যমে বিভিন্ন আরব দেশে সামরিক হামলা চালানো হয়েছে, যাতে দূর্বল ও সাদা মনের আরব মানুষগুলো আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের মার্কিন জায়নবাদীদের ক্রোড়ে সঁপে দেয়। উপসাগরীয় যুদ্ধ বিষয়ে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো অধ্যয়ন করলে জানা যায়, জাতিসংঘের যাদুকররা গোটা বিশ্বকে চরম বোকা বানিয়েছে। এই কৃত্রিম যুদ্ধের রিপোর্টকারী হাজার হাজার সাংবাদিক তাদের তীব্র মেধা ও চাতুর্য সত্ত্বেও গোলক ধাঁধায় পড়ে একেবারে বোকা ও নির্বোধ বনে গেছে। দীর্ঘ দিন পর তারা জানতে পারে, শুধু সিএনএনকেই কেন বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে এই যুদ্ধের রিপোর্ট করার জন্য একচ্ছত্র আধিপত্য দেয়া হয়েছিল। লাগাতার মার্কিন ধ্বংসাত্মক বোমাবর্ষণের পরও কিভাবে ইরাক পূর্বে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় এবং সাদ্দাম হুসাইনের মতো ভয়ানক শত্রু জীবিত থেকে যায়? পাকিস্তানের লাহোর থেকে প্রকাশিত তরজুমানুল কুরআনের সম্পাদক প্রফেসর খোরশিদ আহমদ তার এক সম্পাদকীয়তে মধ্যপ্রাচ্যে সক্রিয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দানবীয়তা ও তার ষড়যন্ত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন, মধ্যপ্রাচ্য একটি দর্পণ, যার মধ্যে গোটা মুসলিম উম্মাহর ট্রাজেডির দেখা যেতে পারে। আমেরিকা, পশ্চিমা জাতি-গোষ্ঠী, জাতিসংঘ, ইসরাঈল, আরব বিশ্বের শাসকবর্গ, তুরস্কের বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার, ইরাকের শাসকগোষ্ঠী ও সাদ্দাম হুসাইন–এগুলো সব একই নাটকের বিভিন্ন চরিত্র।

www.pathagar.com

নতুন বিশ্বব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

জাতিসংঘ যদি নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রধান কেন্দ্র হয়ে থাকে, প্রয়োজন পড়লেই যে তার সংবিধান ও চার্টার পরিবর্তন করতে দ্বিধা করে না, তাহলে এর উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, প্রত্যাশিত আন্তর্জাতিক সরকার ব্যবস্থা কোনো নিয়ম-নীতির অধীন হবে না এবং তার প্রধান বা সুপ্রিমো সীমাহীন ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক ডিক্টেটর হিসেবে আবির্ভূত হবে। যেমন জাতিসংঘের ভূমিকা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট বুঝে আসে। এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

০১. চীন যখন কোরিয়ার বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালায়, তখন জাতিসংঘ সঙ্গে সঙ্গে চীনের বিরুদ্ধে পাল্টা পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং চীনকে 'শান্তির জন্য হুমকি' আখ্যায়িত করে, কিন্তু দু-মুখো জাতিসংঘ পরক্ষণেই আবার চীনা বর্বরতার পুরস্কার এভাবে দিল যে, চীনকে জাতিসংঘের শুধু সদস্যই করে নেয়নি, বরং নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো ক্ষমতাও প্রদান করে। অথচ জাতিসংঘ চার্টারে সুস্পষ্টভাবে একথা উল্লেখ আছে, শান্তির জন্য হুমকি কোনো দেশ জাতিসংঘের সদস্য হতে পারবে না।

০২. নিরাপত্তা পরিষদের কাজ প্রস্তাব পাস করা। সেমতে সে অসংখ্য অগণিত প্রস্তাব পাশ করে থাকে, কিন্তু বাস্তবায়ন করে কেবল সেগুলোই, যেগুলো তার পছন্দনীয় ও স্বার্থের পক্ষে হয়। ইসরাঈলের বিরুদ্ধে অসংখ্য অগণিত প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে, কিন্তু এই সন্ত্রাসী ও বর্বর দেশটির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ এ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি; বরং ইসরাঈলের দাবীর ওপর জাতিসংঘ বেশ কিছু প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সন্ত্রাসী ইসরাঈল ফিলিস্তিন ও লেবাননের ওপর সর্বদা বোমা বর্ষণ করে আসছে। ইরাকের আণবিক স্থাপনার ওপর বোমাবর্ষণ করেছে। এরপরও তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি, কিন্তু লিবিয়া ও সুদানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে যখন প্রস্তাব ওঠে, তখন লকার-বি বিমান ধ্বংসে লিবিয়ার জড়িত থাকার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও জাতিসংঘ গায়ের জোরে লিবিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ প্রস্তাব পাস করে। এমনকি তার বিরুদ্ধে আকাশ নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তও জারি করা হয়। ইরাকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রস্তাব পাস করে তা খুব ত্বড়িৎ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সুদান এবং আফগানিস্তানের সাথেও একই আচরণ করা হচ্ছে।

---

৭. যুদ্ধের ভাঙ্গা-গড়ার চিত্র তার একটি অংশ। শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাতে শিথিলতা আনা, দাবী ও দলীল-প্রমাণ, প্রকৃত সংকল্প ও ষড়যন্ত্র, হুমকি-ধমকি, প্রতারণা ধোকাবাজি, ওয়াদা খেলাফী–সবই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের ডায়ালগ মাত্র। আরেকটু অগ্রসর হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের পটভূমি ও তার আগ্রাসী থাবার বিস্তারিত বর্ণনা দেবার পর বর্তমান ট্রাজেডি থেকে প্রফেসর খোরশিদ আহমদ এই ফল বের করেছেন, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তৃত ইসলামী অঞ্চল জুড়ে বিরাজিত চলমান দ্বন্দ্ব সংঘাত, উত্তেজনা অস্থিতিশীলতা কখনো প্রশমিত হবে না। ক্রমশঃ তা বৃদ্ধি পাবে।' সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা বার্জেনেস্কী ও মার্কিন জাতীয় দৈনিক নিউজউইকের বরাতে প্রফেসর খোরশিদের সমর্থনে দলীল-প্রমাণও পেশ করা হয়েছে। নিউজউইক লেখেছে, 'যদি সাদ্দাম হুসাইন না থাকত তাহলে আমাদেরকে আরেকজন সাদ্দাম হুসাইন আবিষ্কার করতে হত।' নিউজউইকের এ উদ্ধৃতিই মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টি খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে আমেরিকার পলিসি নিউজউইকের এ উদ্ধৃতি দ্বারাই সুস্পষ্ট হয়ে যায়। (সূত্র ঃ নিউজউইক–১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬)

www.pathagar.com

গোটা বিশ্বের প্রায় সকল দেশই জাতিসংঘের জেনারেল এ্যাসেম্বলী–সাধারণ পরিষদের সদস্য, কিন্তু তার পাসকৃত প্রস্তাবের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। অথচ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য মাত্র ১৫টি দেশ, কিন্তু তার পাসকৃত প্রস্তাবে পুরো বিশ্বে ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়। কারণ নিরাপত্তা পরিষদের পাসকৃত প্রস্তাব বাস্তবায়ন খুবই জরুরী। আবার নিরাপত্তা পরিষদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা হচ্ছে, সকল প্রস্তাব পরিষদের চার স্থায়ী সদস্যের পক্ষ থেকেই কেবল পাস করা হয়। আর বাকী সদস্যরা তাদের কথামতো কাজ করবে।

০৩. উপসাগরীয় যুদ্ধে যেসব দেশ অংশ নিয়েছিল, সকলেই জাতিসংঘের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধভাবে ইরাকের বিরুদ্ধে ময়দানে আবির্ভূত হয়েছিল। জাতিসংঘ সনদ ও তার সাথে যুদ্ধে অংশীদার দেশগুলোর সংবিধানে একথা লিপিবদ্ধ আছে, যুদ্ধের সময় বিদ্যুৎ, পানি, হাসপাতাল ইত্যাদিকে টার্গেট বানানো যাবে না, কিন্তু জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সকল দেশ এসব মৌলিক স্থাপনাকে টার্গেট বানিয়েছে। বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গায়ের জোরে ইরাকের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক আবরোধ আরোপ করেছিল। এমনকি খাদ্য-শস্য ও ওষুধ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ইরাকের ওপর সামরিক বিমান উড্ডয়নের আকাশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

এসব থেকে সুস্পষ্ট অনুমিত হয়, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে যে আন্তর্জাতিক সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে যাচ্ছে, তা কোনো নিয়ম-কানুন ও তত্ত্বাবধায়কের অনুগত হবে না। এমনিভাবে না কোনো রাষ্ট্রেরও এই সাহস বা অধিকার থাকবে যে, সে এই আন্তর্জাতিক সরকার বা জাতিসংঘকে তার কোনো অন্যায় অপরাধ ও আইন লংঘনের কারণে সতর্ক করবে বা শাসাবে। একথার সমর্থন জাতিসংঘের নীতিনির্ধারকদের বক্তৃতা-বিবৃতি থেকেই পাওয়া যায়, যা তারা বিভিন্ন সময় দিয়ে থাকেন।

ইহুদী পুঁজিপতি ডেভিড রকফেলার ১৯৭৩ সালে একবার চীন সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে সাংস্কৃতিক বিপ্লবে লাখো মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, কিন্তু রকফেলার এসব কিছু পেছনে ঠেলে চীনের খুব প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে যত ক্ষতিই হোক না কেন এবং তাতে তাদের যত মূল্যই দিতে হোক না কেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই, এ বিপ্লব চাইনিজদের ভেতর উচ্চতর মানবিক যোগ্যতা ও প্রতিভার জন্ম দিয়েছে। এখন তারা পূর্বের তুলনায় আরো ভালভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করতে সক্ষমতা রাখে; বরং এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব গোটা সমাজব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টিতে নজীরবিহীন সফলতা অর্জন করেছে। মাও-এর নেতৃত্বে যে বিপ্লব এসেছে তা মানবেতিহাসের সবচে' সফলতম বিপ্লব।

নিউইয়র্ক টাইমস চীনের উন্নতি অগ্রগতির ওপর সমীক্ষা মন্তব্য করতে গিয়ে ১৯৬১ সালের ১৯ই আগস্টের এক নিবন্ধে লেখেছে, কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিরুদ্ধে যে কোনো বিদ্রোহ নির্মূল করা আমাদের মৌলিক কর্তব্য। কারণ কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যদি কোন পাল্টা বিপ্লব আসে তাহলে এর অর্থ ধ্বংস ও বরবাদী ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিজমকে শক্তিশালী ও সুসংহত করা আমাদের উপকারে আসবে। কমিউনিজম

www.pathagar.com

ব্যবস্থার সাথে জাতিসংঘের কোন কোন স্বার্থ ও ফায়দা সংশ্লিষ্ট রয়েছে, তার বিররণ দিতে গিয়ে জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ কমিটি 'শান্তির অন্বেষা' নামক এক রিপোর্টে লেখেছে, আমরা রাশিয়ার গোপন পুলিশকে ধন্যবাদ জানাই, যার এক ইশারাতেই দুইশ' মিলিয়ন লোককে গ্রেফতার করা সম্ভব। অতএব কমিউনিজম ব্যবস্থাকে পতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন এই ব্যবস্থার প্রতি আমাদের অব্যাহত সমর্থন জানানো। কারণ কমিউনিজম দ্বারা আমাদের পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক সরকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

৭ই এপ্রিল ১৯৭০ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব লজ এঞ্জেলেস টাইমস পত্রিকার এক নিবন্ধে রাশিয়ান নেতা লেলিনের খুব প্রশংসা করে বলেন, মি. লেলিন রাশিয়ায় যেভাবে শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা জাতিসংঘের জন্য এক আদর্শ নমুনা। জাতিসংঘ মহাসচিব এক বার্তায় ইউনেস্কোকে লেখেন, লেলিন অত্যন্ত উজ্জ্বল চিন্তাধারার অধিকারী এবং জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আধুনিক যুগে তার চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান রয়েছে। আর পরিবর্তন, সংশোধন ও আন্তর্জাতিক সরকার প্রতিষ্ঠা আলোচনা-পর্যালোচনা ও মস্তিষ্ক ধোলাই ইত্যাদি বিষয়ের বাস্তব নমুনা তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোকেও আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে হবে। নিম্নের আলোচলা দ্বারা বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

০১. জর্জ বুশের শাসনামলে মার্কিন নাগরিকদের আইনী ও অর্থনৈতিকভাবে একই সূতায় গ্রথিত করার জন্য আইনের একটি খসড়া অনুমোদন করা হয়। উক্ত আইনের অধীনে অর্থনৈতিক অপরাধগুলো নিয়ন্ত্রণ আনতে সমগ্র দেশে একশ' কম্পিউটার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেগুলোর সরাসরি সকল মার্কিন ব্যাংক, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কাস্টম বিভাগ, পরিসংখ্যান ব্যুরো, এফ বি আই সদর দফতর, রিয়েল স্টেট, জমিজমা ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান এবং লাইফ ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান মার্কিন নাগরিকদের সাথে যে লেনদেনই করুক, তার সব কিছু প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় ইউনিটে পাঠিয়ে দেবে। প্রত্যেক মার্কিন নাগরিকের জন্য একটি নম্বর বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। সেই নম্বরের ভিত্তিতে তার সাথে সকল লেনদেন করা হয়। এই নম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ব্যাংক, কাস্টমস, সেলস ট্যাক্স একং ইনকাম ট্যাক্সের দফতরে বিদ্যমান থাকবে। এই নম্বরে কম্পিউটারে উক্ত ব্যক্তির বিস্ত ারিত অবস্থা, অর্থনৈতিক পজিশন, ডাক্তারী রিপোর্ট; নৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থা এবং জন্ম ইতিহাসের আংশিক ডাটা আকারে একত্রিত থাকে। প্রয়োজনে কম্পিউটারের বোতাম টিপ দিলেই প্রত্যাশিত ব্যক্তির জীবনের পুরো ইতিহাস মুহূর্তে সামনে চলে আসে।

০২. ইউরোপ ও আমেরিকায় সকল সড়ক, মহাসড়ক, অলিগলি ইত্যাদিতে এমন সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হচ্ছে, যা চব্বিশ ঘন্টা সেখান দিয়ে অতিক্রমকারী লোকদের নড়াচড়া, কথাবার্তা ও আওয়াজ সংরক্ষণ করে রাখে।

০৩. ব্যাংকসমূহে একাউন্ট হোল্ডারদের এমন প্রশ্নও করা হয় যে, আপনি কি এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানেন, যারা বেআইনীভাবে দেশের বাইরে ডলার পাচার করে। অন্য

কথায়, নতুন বিশ্বব্যবস্থায় লোকদের এককে অপরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরিতে বাধ্য করা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল ব্যাংকের ফরম নম্বর ৮৩০০ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

০৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেটসমূহের ওপর অত্যন্ত সুক্ষ্ম আকৃতির একটি ইলেকট্রনিক নম্বর থাকে। খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই কেবল তা বোঝা যায়। এ ধরনের নম্বর চতুষ্পদ জানোয়ারগুলোর চামড়ার নীচেও লাগিয়ে দেয়া হয়। প্রয়োজন পড়লে কম্পিউটারে উক্ত নম্বর দেখে জানা যায়, ওই নম্বরের জানোয়ার কোন পালে আছে। এই অভিজ্ঞতা মানুষের ক্ষেত্রেও অর্জন করা হচ্ছে। নিকট ভবিষ্যতে মার্কিন বিশেষজ্ঞদের এই প্রত্যাশা রয়েছে, জন্মের সাথে সাথেই শিশুর চামড়ার কোনো এক জায়গায় ওই ইলেকট্রনিক নম্বরটি লাগিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর ওই নম্বর কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হবে। প্রয়োজনের সময় কম্পিউটার থেকে নম্বর নিয়ে সিগনালের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ব্যক্তির উপস্থিতি অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

০৫. এমনভিাবে এ অভিজ্ঞতাও অর্জন করা হচ্ছে, ধাতব মুদ্রা বা নোট ব্যবস্থা নির্মূল করে ক্রয় বিক্রয়ের সকল বিষয় ওই ইলেকট্রনিক নম্বরের অধীন করে দেয়া হবে। আপনি যদি কোনো দোকান থেকে কোনো বস্তু ক্রয় করতে চান অথবা কাউকে কোনো পয়সা দিতে বা পাঠাতে চান, তাহলে আপনার আর্থিক লেনদেনের জন্য যে নম্বর বরাদ্দ হয়েছে, সেই নম্বরের মাধ্যমে আপনি অন্যকে টাকা দিতে পারবেন। এসব ক্ষেত্রে আপনার আর্থিক লেনদেনের ওপর কেন্দ্রীয় অফিসের পুরোপরি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। যেখান থেকে আপনার এ নম্বর বরাদ্দ হয়েছে সেই দফতর যখন ইচ্ছা আপনার জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ব্যবহারের ওপর নিশেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে। এমতাবস্থায় আপনি না কোনো কিছু খেতে পারবেন আর না কাউকে কোনো ফ্লাট ভাড়া দিতে পারবেন। বর্তমানে ব্যাংকসমূহের ইস্যুকৃত ক্রেডিট কার্ড তার প্রাথমিক নমুনা মাত্র।

মানব বসতি ও নৈতিক মূল্যবোধ

মানব বসতি বৃদ্ধির ব্যাপারে নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রবক্তা ও স্বপ্নদ্রষ্টাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, জনসংখ্যা সীমিত হওয়া উচিত। অপরদিকে বিশ্বযুদ্ধের পর প্রসিদ্ধ বৃটিশ দার্শনিক বার্টা রাসেল মানবতার ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে এই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিলেন যে, পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষ যদি জীবন থেকে হাত ধুয়ে বসে তাতে কি হয়েছে? এই সংখ্যা তো নিতান্তই নগণ্য। প্রত্যেক দিন বিশ্বের জনসংখ্যায় পাঁচ লাখ আশি হাজার শিশুর প্রবৃদ্ধি ঘটছে। যুদ্ধ তার কাজ পুরো করতে পারেনি। এখন জনসংখ্যা কম করার জন্য রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন, যাতে বিশ্ব অপ্রয়োজনীয় মানব শূন্য হয়ে পড়ে এবং এই ভূ-পৃষ্ঠে কেবল স্বাধীন ও সচ্ছল সমৃদ্ধশালী মানুষই থাকতে পারবে। সেমতে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বৈজ্ঞানিকরা এইডস প্রসারের ইনজেকশন আবিষ্কার করেছে, আফ্রিকার দেশগুলোতে যার পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

১৯৬০ সালে পল আর্চ নামক এক লেখক 'জনসংখ্যার বোমা' নামক গ্রন্থে লেখেন, এই সময় জনসংখ্যার বোমা পুরো দুনিয়া ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমরা তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। ক্যান্সারতুল্য ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সকল নিদর্শন চিহ্নিত করত আমাদের

www.pathagar.com

কিছু না কিছু করতেই হবে। প্রয়োজনে ক্যান্সারতুল্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির রোগ অপারেশনের জন্য আমাদের বর্বরতা ও জংলী মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে। আমাদের প্রয়োজনের তাগিদেই এমন অমানবিক কা করতে হবে।

বিশ্ব ব্যাংকের চেয়ারম্যান রবার্ট ম্যাকনামারা ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে এক ভাষণে বলেছিলেন, জনসংখ্যা প্রতিরোধ করার দু'টি পদ্ধতি আমাদের কাছে রয়েছে। প্রথম পদ্ধতি হলো, অসাধারণ দ্রুতগতিতে যে জন্ম হার বাড়ছে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, মৃত্যুর হারে আরো বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। এ দুই পদ্ধতি ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের আর কোন পদ্ধতি নেই। এই আণবিক যুগে যুদ্ধই একমাত্র চূড়ান্ত পদ্ধতি, যার মাধ্যমে খুব দ্রুততার সাথে স্বল্প সময়ে জনসংখ্যার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা সম্ভব। ক্ষুধা, দারিদ্র ও অসুখের কারণে মানুষ প্রাকৃতিকভাবে মৃত্যু বরণ করে, কিন্তু এর গতিবেগ খুবই ধীর। এভাবের ধীর গতিতে জনসংখ্যার ওপর নিয়ন্ত্রণলাভ অসম্ভব।

১৯৭৪ সালে কিসিঞ্জার, জর্জ বুশ এবং বার্নাট ক্রাফটের সমন্বয়ে গঠিত এক কমিটি বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ব্যাপারে একটি রিপোর্ট তৈরি করে। সেটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিষয়ক রিপোর্ট। এ রিপোর্টকে জরিপ-২০০ বলা হয়। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছিল এমন ১৩টি দেশ রয়েছে, যেগুলো তার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে মার্কিন স্বর্থের জন্য বিপজ্জনক। তন্মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মিসর, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, মেক্সিকো, ব্রাজিল, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ইথওপিয়া এবং কলম্বো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব দেশের ওপর চতুর্দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করা জরুরী, যাতে তারা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এর জন্য গর্ভ প্রতিরোধ উপকরণ ব্যবহার ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যা সংকট নিরসনে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে, বিশেষ করে পরিবার পকিল্পনার বিরুদ্ধে যেসব আওয়াজ ওঠছে, তা কঠোর হস্তে নির্মূল করতে হবে।[৮] এ জরিপের পরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট গোটা বিশ্বে জনসংখ্যা হ্রাস করার পলিসি বাস্তবায়ন করার মিশন গ্রহণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের পরিবার পরিকল্পনা নীতিকে খুব পছন্দের দৃষ্টিতে দেখছে, যেখানে একটি পরিবারের জন্য একটি সন্তানই যথেষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে। জিমি কার্টারের সরকার তার রিপোর্ট ২০০০-এ আহবান জানিয়েছে, গোটা বিশ্বের জনসংখ্যা কেবল দুই বিলিয়ন হওয়া উচিত।

---

৮. উল্লিখিত দেশগুলোতে বিশেষভাবে এবং ইসলামী বিশ্বে সাধারণভাবে জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য দু'টি পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে। এক. রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় ভিত্তিতে মারামারি, হানাহানি ও রক্তপাতের ধারাবাহিকতা চালু করা। দুই. বংশ, গোত্র ও দেশের ভিত্তিতে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেয়া। পশ্চিমা মিডিয়া এই আগুন প্রজ্বলিত করতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, শ্রীলংকা, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মিসর, সিরিয়া এবং ভারতের পাঞ্জাব, কাশ্মীর, আসাম ও নাগাল্যান্ড সেসব অঞ্চল, যেখানকার জনগণ পশ্চিমা দেশগুলো থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে ভ্রাতৃহত্যার মাধ্যমে নতুন বিশ্বব্যবস্থার বুনিয়াদ মজুবত ও সুসংহত করছে। আফ্রিকা মহাদেশের নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, সুদান, বুরুন্ডি, রুওয়ান্ডা ও জায়ার এবং ইউরোপের বসনিয়া, চেচনিয়া, আলবেনিয়া ও কসোভো ইত্যাদি দেশগুলোতে বিভিন্ন গণহত্যায় সরাসরি পশ্চিমা দেশগুলো অংশ নিচ্ছে।

www.pathagar.com

১৯৯৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন জাতিসংঘে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, বিশ্বের অধিবাসীদের আমরা তখনই সুস্থ ও সচ্ছল দেখতে পাব, যখন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা সম্ভব হবে। আমরা আগামী অর্ধশতাব্দীর ভেতর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে বরদাশত করতে পারি না। জর্জ অরবেল নামক এক মার্কিন লেখক ১৯৮৪ সালে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি এমন এক বিশ্বের পরিকল্পনা পেশ করেন, যে বিশ্বে শিশু জন্মের ওপর সকল সরকারের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। শিশু জন্মদান কর্ম সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত কিছু পুরুষ ও মহিলা থাকবে। অবশিষ্ট নারী পুরুষকে জোরপূর্বক ইনজেকশনের মাধ্যমে বন্ধ্যা বানিয়ে দেয়া হবে। লেখকের পেশকৃত এ পরিকল্পনা থেকে সহজেই অনুমিত হয়, আগামী যে বিশ্বব্যবস্থা আমাদের মাথার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে, তার ধরন ও স্বরূপ কি হবে? যেমন চীন, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ডে এই পরিকল্পনা এভাবে বাস্তবে রূপ দেয়া হয়েছে যে, চীনে ২৮%, শ্রীলংকায় ২৫% এবং থাইল্যান্ডে ২২% বিবাহিত নারীদের ইনজেকশনের মাধ্যমে চিরকালের জন্য বন্ধ্যা বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এই কাজ ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আঞ্জাম দেয়া হয়েছে। এতে করে উল্লিখিত তিনটি দেশের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত 'জনসংখ্যা সমস্যা' শীর্ষক সম্মেলনে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল, তাতে একথার ওপর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, এখনো পর্যন্ত জনসংখ্যার ওপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণলাভ হচ্ছে না। এ জন্য সকল দেশের উচিত ২০১৫ সাল পর্যন্ত এইডসের মতো ঘাতক ব্যাধি থেকে বাঁচা ও পরিবারকে সীমিত করার জন্য গর্ভ প্রতিরোধক যাবতীয় উপকরণ ব্যবহার অত্যাবশ্যক হওয়ার ঘোষণা দেয়া। খাদ্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে এমন মৌলিক পরিবর্তন আনা, যার প্রভাব সরাসরি জনসংখ্যার ওপর পতিত হবে। বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে গর্ভ প্রতিরোধক যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ করা এবং নিরাপদ স্বাধীন যৌন সম্পর্কের সুযোগ প্রদান করা। কায়রোর জনসংখ্যা শীর্ষক সম্মেলনে পরিবার সীমিত রাখার যে দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল, তন্মধ্যে একটি প্রমাণ এও ছিল, আমাদের এই যমীন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম নয়, আর না প্রত্যেককে মোটর, এয়ারকন্ডিশন রুম, টিভি, ভিসিআর, রেডিও, ফোন ইত্যাদি সরবরাহ করতে সক্ষম। ১৯৯২ সালে 'রিওডি জেনেরো'-তে পরিবেশ সংক্রান্ত এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন সমাপ্তির পর কমিটির চেয়ারম্যান মরিস স্ট্রাং এক বিবৃতিতে বলেন, আমাদের জীবন মান অনেক উন্নত। প্রত্যেক ব্যক্তিই এয়ারকন্ডিশন রুম এবং কার মাইক্রোর মালিক হতে চায়। সকলেই মাছ গোশত খেতে চায়। সকলেই যদি এসব জিনিসের মালিক হয়েও যায়, তাহলে পরিবেশ আরো বেশী দূষিত হবে। আমরা তো এমন পৃথিবী চাই যেখানে পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকবে। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নবায়ন প্রয়োজন। এই নতুন অর্থ ব্যবস্থা রূপায়ণের প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির এক সক্রিয় সদস্য লেস্টার ব্রাডন ১৯৭২ সালে মুদ্রিত স্বীয় গ্রন্থ 'বাধা বিপত্তিহীন পৃথিবী'-তে লেখেছিলেন, বিশ্বকে দূষণমুক্ত

www.pathagar.com

পরিবেশ উপহার দেয়ার জন্য একটি নতুন অর্থব্যবস্থার রূপায়ণ প্রয়োজন, যার সাফল্যের জন্য আমাদেরকে পরিবার পরিকল্পনা এবং জন্ম ও জীবন পদ্ধতির মধ্যেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে।

১৯৭২ সালে লেস্টার ব্রাউন শিশু জন্ম ও পরিবার গঠন সম্পর্কে যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, তার জন্য কিভাবে পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে, কিভাবে মস্তিষ্ক প্রস্তুত করা হচ্ছে, নিম্নের আলোচনা থেকে সহজেই তা অনুমান করা যায়। ১৯৮৯ সালের ২০শে নভেম্বর 'শিশু অধিকার সংক্রান্ত' এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে অনেকগুলো প্রস্তাব পাস করা হয়। অতঃপর ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নিউইয়র্কে এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সত্তরটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ অংশ নিয়েছিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত একষট্টিটি দেশের প্রতিনিধিরা 'শিশু অধিকার' সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলীর ওপর দস্তখতও করেছেন।

উক্ত সম্মেলনের প্রণীত দস্তাবেজের ৫৪ নং ধারাটি ছিল শিশুদের কোলে নেয়া, তাদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, তাদের সাথে পিতা-মাতার আচরণ, মায়ের সুস্থতা, শিশুদের স্বাধীনতা এবং তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক অধিকার সংক্রান্ত। এই ধারার ০১ নং উপধারায় বলা হয়েছে, পিতা-মাতা শিশুদের নির্ধারিত কোনো ধর্মের শিক্ষা বা উপদেশ দিতে পারবে না। এই উপধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, পিতা-মাতা শিশুদের দীন ধর্ম, নৈতিকতা ও বিবেকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেবে। তাদের চিন্তাধারার ওপর কোন হস্ত ক্ষেপ করবে না। তারা যে ধর্ম ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে। ৩১ নং উপধারায় বলা হয়েছে, শিশুদের যে কোনো ধরনের বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন পড়ার স্বাধীনতা থাকা উচিত। যদি তারা নগ্ন, অশ্লীল ও যৌন বিষয়ক বই-পুস্তক ও ছবি কিনতে চায় বা নিজের কাছে রাখতে চায়, অথবা তারা শয়তান তাগুতের পূজা করতে চায়, তাহলে এটা তাদের মৌলিক অধিকার। এসব ক্ষেত্রে পিতা-মাতার হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার থাকবে না। এসব অশ্লীল কাজগুলো যদি তারা লেখনী কিংবা মুখে আঞ্জাম দিতে চায়, অশ্লীল বই-পুস্তক ও ছবি ছাপতে চায়, টিভি, ভিসিআর, রেডিও এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে এগুলো অন্যের নিকট পৌঁছাতে চায়, তাহলে তাদের সেই স্বাধীনতা থাকা উচিত। ২৮ নং উপধারায় বলা হয়েছে, একটি উন্নত সমাজে স্বাধীন নিরাপদ যৌন সম্পর্ক, এ সম্পর্কীয় তথ্যাবলী, উপকরণ এবং যৌন সংক্রান্ত শিক্ষা-প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ থাকা উচিত। ছেলেরা অথবা মেয়েরা যদি অবৈধ গর্ভ বিনষ্ট করতে কিংবা বাকী রাখতে চায়, তাহলে এই সুযোগও তাদের থাকা উচিত। সমাজে এমন সন্তান এবং অবিবাহিত মেয়েদের ঠিক সে মর্যাদাই হওয়া উচিত, যে মর্যাদা অন্যরা পেয়ে থাকে। শিশুদের সাথে যদি পিতা-মাতা তাদের মর্জির বিপরীত কোনো আচরণ করে, তাহলে তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ পিতা-মাতাকে গ্রেফতার করতে পারবে। দুষ্টুমি ও অসদাচণের জন্য শিশুকে পেটানো ছাড়াও নির্ধারিত কোনো ধর্মের জন্য তাদের বাধ্য করাও এ ধারার অন্তর্ভুক্ত। এসব ক্ষেত্রে পিতা-মাতার হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার থাকবে না। ফরাসী পার্লামেন্ট এ প্রসঙ্গে আইন প্রণয়ন করে অবিবাহিত মা ও তাদের অবৈধ শিশুদের সকল অধিকার প্রদান করেছে।

www.pathagar.com

আধুনিক যুগের আন্দোলন

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইহুদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সবচে' প্রাচীন সংগঠন ফ্রি-মিশন আন্দোলন। গোটা বিশ্বে এই সংগঠনের কর্মতৎপরতা রয়েছে। মানব সমাজের সকল শ্রেণীর প্রত্যেক নামী-দামী ও নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ এই সংগঠনের সদস্য। এই সংগঠন তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সাংগঠনিক ও আন্দোলনের রূপ দেয়ার জন্য 'আধুনিক যুগের আন্দোলন' নাম ধারণ করেছে। এই সংগঠনের রয়েছে নিজস্ব পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, ক্যাসেট-সংগীত এবং সাংস্কৃতিক ও আইনী প্রতিষ্ঠান। দু'কথায় যদি এই সংগঠনের সারমর্ম বর্ণনা করতে চান তাহলে বলতে হবে, এই সংগঠন বা আন্দোলনের মৌলিক উদ্দেশ্য নতুন ধর্মের রূপদান, যে ধর্মে শয়তানের পূজা করা হবে, স্বাধীন যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে, যৌনতা ও নেশাকে আইনী মর্যাদা দিয়ে ব্যাপক করা যাবে, বর্বর জংলী পশুর মতো জীবন যাপন করা যাবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি অগ্রগতি এবং সকল সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যুদ্ধের আহ্বান জানানো যাবে।

ফ্রি-মিশন আন্দোলনের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত যে কোনো পুস্তক-পুস্তিকার পাতা ওল্টালেই এ আন্দোলনের উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ এক নজরে সামনে চলে আসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে ফ্রি-মিশন আন্দোলনের নেতা জেনারেল আলবার্ট বাইক এক ভাষণে বলেছিলেন, প্রত্যেক ফ্রি-মিশন ক্লাব শয়তানের উপাসনালয় এবং তার শিক্ষা দীনী শিক্ষার মতো। এই আন্দোলনের প্রাথমিক নিদর্শনসমূহ তখন জনসম্মুখে আসে যখন ১৯৯২ সালে লন্ডনে ইবলিস ট্রাস্ট (Lacifer Truste) নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এলস বেইলে নামক এক মহিলা। এ আন্দোলনটি একমাত্র বেসরকারী সংগঠন, জাতিসংঘে যার উপাসনালয় বিদ্যমান রয়েছে।

১৯৪৩ সালে আলবার্ট হোফম্যান L.S.D নামক নেশা সৃষ্টিকারী ট্যাবলেট আবিষ্কার করেন, যা মানুষের মেযাজ, বিবেক ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে। ১৯৫০ সালে 'মডার্ন এজ' নামক এক পত্রিকা লেখেছিল, মার্কিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমন প্রজন্ম তৈরিতে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, যারা নতুন ধর্মের অনুসারীদের সেনাবাহিনী এবং এই নতুন ধর্মের প্রতিনিধি হবে। এই সেনাবাহিনী দ্বারাই নতুন বিশ্বে নব প্রভাতের সূর্য উদিত হবে। ১৯৫৫ সালে এক ইহুদী কোম্পানী রান্ডা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ-এর আবেদনে মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের ওপর নেশাদ্রব্যের প্রতিক্রিয়ার পরীক্ষা চালিয়েছিল। আলবার্ট হোফম্যান ও এলডস হাকসলে এই পরীক্ষা ও গবেষণার তত্ত্বাবধান এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

এই এলডস সেই লেখক, যিনি 'সাহস ও বীরত্বে পরিপূর্ণ বিশ্ব' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি নেশাদ্রব্য ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, নেশাদ্রব্য ব্যবহারে মানুষ অনেক সমস্যা ও সংকট থেকে মুক্তি পায়।[৯] ১৯৬৭ সালে

৯. সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় শহর জেনেভার একটি বিনোদন কেন্দ্র শুধু নেশাদ্রব্য ব্যবহারকারীদের জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। এই বিশেষ অঞ্চলে সরকারের পক্ষ থেকে নিয়মতান্ত্রিক নেশার ইনজেকশন সরকারী ব্যয়ে লাগানো হয়। সূত্র : সাপ্তাহিক আল মুজতামা, কুয়েত।

www.pathagar.com

ব্যাপকভাবে গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র ও নেশাদ্রব্যের ব্যবহার শুরু হয়। এমন এমন রেকর্ড ও এ্যালবাম মার্কেটে নিয়ে আসা হয়, যাতে শয়তানকে পবিত্র মনে করার প্রতি উদ্বুদ্ধ ও আহবান করা হয়েছে।

১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত নেশাজাত ট্যাবলেট মারিজুয়ানা ও অন্যান্য নেশাদ্রব্য ব্যাপক করার আহবান জানানো হয়। ব্যাপকভাবে এমন চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়, যাতে ব্যাপকভাবে নেশাদ্রব্য ব্যবহার করার প্রতি আহবান জানানো হয়। ১৯৮১ সালে এই উদ্দেশে একটি টিভি স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যাতে বিশেষভাবে নর্তকী, নেশাদ্রব্য ব্যবহারকারী নারী-পুরুষ ও তাদের যৌন মেলামেশার অশ্লীল দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়। এ টিভি স্টেশন থেকে প্রচার করা হতে থাকে, যৌন আন্দোলন আজ চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গেছে। প্রকাশ্যে দাবী করা হচ্ছে, নারী-পুরুষকে স্বাধীনভাবে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ দেয়া হোক। নারীদের পারস্পরিক বিবাহ কিংবা বিবাহ ছাড়াই যৌন সম্পর্কের অনুমতি থাকা উচিত। বিষয়টি নিয়ে এ পরিমাণ প্রোপাগান্ডা চলানো হয় যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন সেনাবাহিনীর মধ্যে এর অনুমতি দানের জন্য খসড়া আইন পর্যন্ত উপস্থাপন করেছিলেন। ১৯৯১ এর ১২ মে নিউইয়র্ক টাইমসের মতো পত্রিকাগুলো লেখেছে, কিছু কিছু লোক শয়তানের পূজাকে আধুনিক যুগের উন্মাদনা আখ্যা দিয়েছে। তারা বলে, আমরা পুনরায় মূর্তি পূজার যুগে ফিরে যাচ্ছি। যদিও শয়তানের পূজার কথা একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়, কিন্তু এ ধরনের চিন্তাধারা ও আন্দোলন সম্মান সহানুভূতির দাবী রাখে।[১০] ১৯৮১ সালে চার্চ অফ ইংল্যান্ডের প্রধান রবার্ট উইন্স এক বিবৃতিতে শয়তানের পূজার আন্দোলনকারীদের দাবীর প্রতি গুরুত্বের সাথে চিন্তা করার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা এ আন্দোলনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত প্রোগ্রামগুলো গির্জা ঘরে চালাতে পারি।

১৯৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী মিসেস গোসলিন এ্যালডার্স এক বিবৃতিতে দাবী করেন, সকল নেশাদ্রব্য আইনী বৈধতা দেয়া হোক। নিউইয়র্ক শহরে ওই সব লোকের আইনী অধিকার স্বীকার করা হয়েছে, যারা সমকামিতায় লিপ্ত। এ ধরনের সমকামী নারী পুরুষের ক্ষেত্রে বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়ন করা হবে।

১০. কায়রো পুলিশ গত কয়েক বছর পূর্বে শয়তানের পূজারী একটি দলের সন্ধান লাভ করে। সেই দলে মিসরী সমাজের উচ্চ শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রী ও ব্যবসায়ীসহ চলচ্চিত্র জগতের নামী-দামী তারকা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সন্তান-সন্ততিদের পাওয়া গেছে। কয়েক বছর পূর্বে কায়রো পুলিশ কিছু কোরিয়ান নওজোয়ানকে গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তারা মিসরীদের মাঝে এমন লিফলেট বিতরণ করছিল, যাতে অতি সত্বর হযরত ঈসার আগমন ও কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়েছে।

শয়তানকে পবিত্র মনে করা ও তার ইবাদত করা এবং স্বাধীন যৌন সম্পর্ক স্থাপনের খোলাখুলি আহবান জানানোর অভিযোগে গত কয়েক বছর পূর্বে কায়রো পুলিশ কায়রোস্থ মার্কিন ইউনিভার্সিটির কয়েকজন মেধাবী ছাত্র এবং ছয় জন ছাত্রীকে গ্রেফতার করে। তদন্তে সেসব ছাত্র-ছাত্রী স্বীকার করেছে, তারা শয়তানের ইবাদত করে। কারণ শয়তানই একমাত্র সত্তা, যে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করেছে। শয়তানই মানুষকে আন্দোলিত রাখার মতো শক্তি রাখে এবং স্বাধীন যৌন সম্পর্ক স্থাপন ও নেশাদ্রব্য ব্যবহারের অবাধ সুযোগ দেয়। এই আন্দোলনের সদর দফতর আমেরিকায় অবস্থিত।

www.pathagar.com

শিকাগোতে যে আন্তর্জাতিক ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যদিও এটিকে আন্ত র্জাতিক ধর্ম সম্মেলনের নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের কোনো প্রস্তাবে অথবা দলীল-দস্তাবেজে 'আল্লাহ' নাম নেই। উক্ত সম্মেলনে শিশুদের সাথে সম্পর্কিত যেসব ফিল্ম ও টিভি প্রোগ্রাম উপস্থাপন করা হয়েছিল, তা অনেক বেশি পরিমাণে সমগ্র বিশ্বের শিশুদের মাঝে ফ্রি বন্টন করা হয়েছে। চলমান কার্টুন এবং ভিডিও গেমসে শয়তান, তারকা, নক্ষত্র এবং জীব জন্তুর সম্মান মর্যাদা ও পূজার দৃশ্য সম্বলিত প্রোগ্রাম থাকে। আরব বিশ্বের টিভি চ্যানেলগুলো শিশুদের সে প্রোগ্রামই দেখায় যেগুলো আমেরিকায় তৈরি হয়। আরব বিশ্বে অমুসলিম দুতাবাসগুলোর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্কুলগুলোতে চকলেটের আকৃতিতে নেশাদ্রব্য, নগ্ন ছবির এ্যালবাম, উলঙ্গ ফিল্মের ভিসিডি শিশুদের মাঝে ফ্রি বিতরণ করা হয়।

নতুন বিশ্বব্যবস্থার অন্তরালে ক্রিয়াশীল সংগঠন-সংস্থাসমূহ

নতুন বিশ্বব্যবস্থার রূপদানের নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা ও পরিকল্পিত প্রয়াস ১৭১৭ সালে শুরু হয়। ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৭) অন্তরালে এই আন্দোলনই নীতি নির্ধারক শক্তি হিসেবে কর্মতৎপর ছিল। এটি ছিল মূলত ফ্রি-মিশন আন্দোলন, যার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিবৃত্তিক পথ প্রদর্শনকারীদের মধ্যে জেনারেল আলবার্ট বাইক, স্মিথ এ্যাডা, কালমার্কস, নাজী দর্শনের জনক কার্ল আর্থার, ইটালির লুঈসাব মিজালী প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্কুল অফ বোন্স নামক সংগঠন সর্বপ্রথম আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রি-মিশনের তত্ত্বাবধানে কর্মরত সকল সংগঠন সংস্থার মধ্যে এসবি নামক সংগঠন সবচে' বেশী গোপনীয়, কিন্তু অসাধারণ শক্তিশালী ও সক্রিয়

১০. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তার শাখা-প্রশাখা রয়েছে। সেসব নওজোয়ানের বয়স ১৬ থেকে ২৫-এর মাঝামাঝি। তাদের বক্তব্য, ২৫ বছর বয়সে শয়তানের পূজারীদের অধিকহারে মদ, নেশা ও নারী ব্যবহারের কারণে মরে যাওয়া উচিত। এরপরও যদি কেউ না মরে তাহলে তাকে কোনোভাবে হত্যা করে দেয়া উচিত। এই শয়তানী সংগঠনের কর্মীরা যখন শয়তানের পূজার জন্য একত্রিত হয়, তখন তারা সবাই কালো লেবাস পরিধান করে। সে লেবাসের ওপর শয়তানের চিহ্ন ও তার ছবির ছাপ থাকে। গলায় বিশেষ ধরনের শেকল ও মালা ঝুলানো থাকে। পূজার সময় মুর্দারের মাথার হাড় সামনে রাখা হয়। বাদ্যের সুর মূর্ছনায় সম্মিলিত উত্তাল নৃত্য চলতে থাকে। চারদিকে আগরবাতি ও লোবান জ্বালানো হয়। তীব্র নেশাদার বুটিকস ও মদের অবাধ ব্যবহার চলতে থাকে। অতঃপর কোন যুবতী যদি যৌনতার আহবান জানায় তাহলে তার বুক ও চেহারার ওপর শূকর, কুকুর ও বিড়ালের তাজা রক্ত মেখে দেয়া হয়। শয়তান যে তার নযরানা কবুল করেছে এটা তার নিদর্শন। এরপর সম্মিলিতভাবে সকলেই ইচ্ছামত যৌনতায় মেতে ওঠে। তাদের আকীদা হচ্ছে, মদ ও নারীর অধিক ব্যবহার দ্বারাই শয়তান রাজি হয়। শয়তানের রাজি সন্তুষ্টি তখনই পূর্ণতায় পৌছে, যখন মদ ও নারীর অধিক ব্যবহারের কারণে সে তার জীবন থেকে হাত ধুয়ে বসে। মিসরী পুলিশ মামুলী তদন্তের পর একথা বলে তাদের ছেড়ে দিয়েছে, এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িতদের শাস্তি কোনো আইনের গণ্ডিতে পড়ে না।

এই ফ্রি-মিশন আন্দোলনের অধীনে K ও P নামে দু'টি গোপন দল থাকে, যারা গোটা বিশ্বে সি.আই.এ ও মোসাদের সহযোগিতায় রাজনৈতিক, সামাজিক, শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এবং লেখক ও সাংবাদিকদের সঠিক সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার প্রচেষ্টা চালায় এবং হত্যা ও সন্ত্রাসী কর্মকা র মাধ্যমে স্থিতিশীল সুসংহত দেশগুলোতে অস্থিরতা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। (সূত্র : সাপ্তাহিক আল মুজতামা, কুয়েত)

www.pathagar.com

সংগঠন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিম লে এই সংগঠনের অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে। যার প্রসিদ্ধ সদস্যদের মধ্যে জর্জ বুশ সিনিয়র, জুনিয়র, তার পিতা ব্রাস্কট বুশ (যিনি হিটলারকে সহযোগিতা করেছিলেন) এবং জর্জ বুশের সাংবাদিক পুত্র উইলিয়াম বুকলে উল্লেখযোগ্য। নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা আন্দোলন শুরুর দিন থেকে যেসব সংস্থা এ আন্দোলনের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে রকফেলার ফাউন্ডেশন, ডেল কার্নেগী ফাউন্ডেশন ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব সংস্থা সেবা সংস্থার লেবেল লাগিয়ে ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। মার্কিন সিনেট ১৯৫২ সালে প্রস্তাব-১৬৫ এর মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করে, যার উদ্দেশ্য ছিল এ জরিপ চালানো যে, এসব সংস্থার অর্থ কোথাও মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যয় হচ্ছে না তো। উপরোল্লিখিত তিনটি সংস্থা ছাড়াও আরো ১৯টি সংস্থা সংগঠন ইহুদী পরিকল্পনা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য গোটা ইউরোপ ও আমেরিকায় সক্রিয় রয়েছে। এদের মধ্যে সকল সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট, কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলোর একটি অপরটি থেকে আলাদা মনে হয়। যেমন World Cityzenry ও Panned Parent Hood সংস্থা দু'টির দায়িত্ব হলো, পরিবার পরিকল্পনা, মানবাধিকার, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নতি-অগ্রগতির তত্ত্বাবধান করা। এই সংস্থা দু'টির অধীনে চব্বিশটি শাখা সংস্থা স্ব স্ব পরিসরে কর্মতৎপর রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করছে 'Rhodes Scholar Ship' নামক প্রতিষ্ঠান। এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ ও হীরা খনির মালিক ইহুদী সেশল রাহুডস। তার নামে রাহুড এশিয়া নামক একটি শহরও রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বিশ্বের সকল ইউনিভার্সিটি থেকে প্রখর মেধাবী ছাত্রদের মূল্যবান স্কলারশিপ দিয়ে ইংল্যান্ডের নামী-দামী ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো। লেখাপড়া শেষ করার পর তাদের স্বীয় উদ্দেশ্য বাস্ত বায়নের জন্য ব্যবহার করা। যেসব নামী-দামী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এ সংস্থার স্কলারশিপ নিয়ে লেখাপড়া করেছেন, তাদের মধ্যে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন, সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম ফেলব্রাইট, ডেন রস্কি, ফেরাঙ্গ গিজ, হাওয়ার্ড, স্মিথ হামবল ব্রাডলে প্রমুখ।

ফ্যাবিয়ান সোসাইটি (Fabian Society) নামক একটি প্রতিষ্ঠান রোমক জেনারেল কোন্টার ফেবারস মেক্সিমোস-এর নামে ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কোন্টার ফেবারস মেক্সিমোস রোমের সেই জেনারেল ছিলেন, যিনি শত্রুকে বড় বড় যুদ্ধের পরিবর্তে ছোট ছোট যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করার পক্ষে ছিলেন। এ জন্য এই প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রামে কেঁচোর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীতে এর মনোগ্রাম পরিবর্তন করে ছাগলের চামড়া পরিহিত বাঘের ছবি সম্বলিত মনোগ্রাম নির্ধারণ করা হয়। এ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতার নাম সিডনী উফ। এর মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল, কমিউনিস্টদের সমর্থন সহযোগিতা প্রদান করা, কিন্তু তারা কঠোরতার পলিসি গ্রহণ করেনি। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিক এইচ, জে উইলসন এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। জর্জ আর্বেল ১৯৯৪ সালে রচিত স্বীয় গ্রন্থে লেখেন, আমাদের উদ্দেশ্য সরাসরি রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন করা, এটাকে মাধ্যম বানানো নয়। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

করতে গিয়ে তিনি লেখেন, আমরা এমন বিপ্লব সৃষ্টি করি না, যা ডিক্টেটরশিপকে সমর্থন করে; বরং এমন বিপ্লবের পরিবেশ তৈরি করি, যা ডিক্টেটরশিপ জন্ম দেয়। আরব বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানগণ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

লন্ডন ইকোনোমিক্স স্কুল

রকফেলার ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় মি. সিডিনোব 'লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিক্স' নামের প্রতিষ্ঠানটি এ উদ্দেশে স্থাপন করেন যে, এতে বিভিন্ন দেশের শাসক, রাষ্ট্রপ্রধান ও শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সন্তানরা সমাজতন্ত্রের শিক্ষা লাভ করবে। এই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে রবার্ট কেনেডে, ডেভিড রকফেলার, ভারতে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ডেনিসেল মোনহান এবং কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট মোকনিয়াটা উল্লেখযোগ্য।

মার্কিন গির্জা সংগঠন

১৯০৮ সালে হেনরী ফোর্ড এবং রোসগান্স রকফেলার ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় 'মার্কিন গির্জা সংগঠন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪২ সালে এই প্রতিষ্ঠান এমন কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিল, যেসব প্রস্তাবে এমন একটি বিশ্বব্যবস্থার রূপরেখা বিদ্যমান ছিল, যার সামরিক বাহিনী সকল দেশের ওপর কর্তৃত্ব করবে। এই বিশ্বব্যবস্থা এমন একটি অর্থব্যবস্থা রূপায়ণ করবে, যা বিশ্ব ব্যাংকের অধীন হবে। ১৯৪৮ সালের ২৩ আগস্ট এ সংগঠনের নামকরণ করা হয় 'বিশ্ব গির্জা সংস্থা'। এটি নবরূপে প্রতিষ্ঠার পর যেসব নতুন উদ্দেশ্য সামনে আসে, তন্মধ্যে একটি মনোহারি উদ্দেশ্য ছিল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নির্মূল করে একটি নতুন অর্থব্যবস্থা প্রণয়ন করা। মার্কিন গির্জা সংস্থা নাম ধারণ করে মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে সংগঠনটি খৃস্টান বিশেষতঃ মার্কিনীদের সাথে প্রতারণা করেছে। নাম ধারণ করেছে মার্কিন গির্জা সংস্থা, কিন্তু উদ্দেশ্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নির্মূল করা।[১১]

পররাষ্ট্র সম্পর্ক কমিটি (C.F.R)

'কাউন্সিল অফ ফরেন রিলেশন্স' (C.F.R) নামের এই প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি রাখা হয় ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন রাহুড সেশাল ও তার বন্ধু-বান্ধব। প্রতিষ্ঠার সময় এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য খুব গোপন রাখা হয়। ১৯২১ সালে রোতিশলেড ব্যাংকের মার্কিন প্রতিনিধি মি. জে. আর মর্গান, জন রকফেলার, বার্নার্ড বারুখ (একাধিক মার্কিন প্রেসিডেন্টের ইহুদী উপদেষ্টা), পল ওয়ারবার্গ. জেকবশেপ এবং অটোকাহান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ এই প্রতিষ্ঠানে বিপুল আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন। এটা তখনকার কথা যখন লীগ অফ নেশনের প্রতিষ্ঠার

১১. ইউরোপ-আমেরিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গির্জাগুলোর ওপর সংগঠনটির একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে। এটি খৃস্টবাদের লেবাস পরে ভেটিকান সিটির ওপরও দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের ক্ষমতা এত অসাধারণ যে, রোমের পোপ জন পলের সভাপতিত্বে ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খৃস্ট সম্মেলন ইহুদীদের হযরত ঈসা হত্যার অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস দিয়েছে।

www.pathagar.com

পরিকল্পনা ধুলোয় মিশে গিয়েছিল। সি.এফ.আর-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন-এর উপদেষ্টা কর্নেল এ্যাডওয়ার্ড মান্ডিল হাউস, মার্কিন সাংবাদিক ওয়াটার ল্যাম্পম্যান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফাস্টার ডেলিস, সি.আই.এ-এর সাবেক ডাইরেক্টর এলিন ডালস এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান হার্টার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সি.এফ.আর-এর তত্ত্বাবধানেই প্রকাশিত হয় বহুল প্রচারিত মার্কিন পত্রিকা ফরেন এ্যাফেয়ার্স। এই পত্রিকার এক সংখ্যায় গবেষণাধর্মী একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে উল্লেখ আছে, নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। সি.এফ.আর-এর উদ্দেশ্যের আরো ব্যাখ্যা দিয়ে মার্কিন এ্যাডমিরাল জাসটিরোর বলেন, সি.এফ.আর-এ কর্মরত এক শক্তিশালী গ্রুপের মৌলিক উদ্দেশ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নির্মূল করে এমন একটি বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যার একটি অংশ হবে আমেরিকা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অস্ত্রমুক্ত একটি বিশ্বব্যবস্থার অধীন করে দেয়া।

মার্কিন প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সহকারী জন মেকলে বলেন, আমাদের যখনই মার্কিন প্রশাসনের জন্য কোন লোকের প্রয়োজন হয় তখনই আমরা সর্বপ্রথম সি.এফ.আর-এর কর্মকর্তাদের তালিকা দেখি এবং সঙ্গে সঙ্গে নিউইয়র্কে অবস্থিত সি.এফ.আর-এর কেন্দ্রীয় দফতরের সাথে যোগাযোগ করি। কারণ তাদের নিকট সব ধরনের বিশেষজ্ঞ রয়েছে। মূলতঃ মার্কিন প্রশাসন পরিচালনা ও তার নিয়ন্ত্রক সকল ব্যক্তিবর্গ সি.এফ.আর-এর সক্রিয় সদস্য, যারা ইহুদী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কর্মতৎপর। নিম্নের কিছু উদাহরণ থেকে একথা সহজেই অনুমান করা যায়।

০১. জাতিসংঘ গঠনে সহযোগিতার জন্য মার্কিন প্রশাসন ৪৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিল। উক্ত কমিটির সদস্যদের মধ্যে জন ফাস্টার ডালস, নেলসন রকফেলার ও এ্যাডলাঈ ষ্টিউনসন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৪৭ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির সকলেই ছিলেন সি.এফ.আর-এর সক্রিয় সদস্য।

০২. মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানের বিভিন্ন দফতরে কর্মরত ৩১৩ কর্মকর্তার সকলেই ছিলেন সি.এফ.আর-এর সক্রিয় সদস্য। একই অবস্থা জর্জ বুশের দফতরেরও। যেখানে ৩৮৭ জন্য কর্মকর্তা এই প্রতিষ্ঠান থেকেই নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন। ১৯৯২ সালে সি.এফ.আর-এর সদস্য সংখ্যা ২৯০-এ উন্নীত হয়। ১৯২১ সাল থেকে এ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮ জন অর্থমন্ত্রীর ১২ জনই ছিলেন সি.এফ.আর-এর সদস্য। এমনিভাবে ১৬ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে ১২ জনই ছিলেন সি.এফ.আর-এর সদস্য। ১৯৪৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৫ জন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মধ্যে ৯ জনই ছিলেন সি.এফ.আর-এর সদস্য। একই অবস্থা সি.আই.এ'রও। সি.আই.এ'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ১১ জন ডাইরেক্টরের মধ্যে ৯ জনই ছিলেন সি.এফ.আর-এর সদস্য। এখন পরিস্থিতি এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ ও

www.pathagar.com

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং নিরাপত্তা বিষয়ক সকল প্রতিষ্ঠান সি.এফ.আর-এর জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।

১৯৫২ সাল থেকে (১৯৬৪ সাল ছাড়া) এ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উভয় রাজনৈতিক দলের যত প্রার্থী প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, সকলেরই সি.এফ.আর-এর সাথে ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

মার্কিন মিডিয়ার সকল উল্লেখযোগ্য ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সি.এফ.আর-এর সদস্য দ্বারা ছেয়ে গেছে। যেমন কলম্বো ব্রডকাস্টিং সিস্টেম (C.B.S), ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কোম্পানী (N.B.C), কেন্দ্রীয় টিভি স্টেশন ইত্যাদি। এমনিভাবে মার্কিন সংবাদ সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেস, জাতীয় পত্রিকাগুলোর মধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের মধ্যে টাইম নিউজউইক ইত্যাদিতে সি.এফ.আর-এর সদস্যদের একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে, তারাই এসব সংবাদপত্রের নীতিনির্ধারক।

১৯৭২ সালে ডেভিড রকফেলার-এর বাসভবনে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে গোটা আমেরিকা থেকে নির্বাচিত মাত্র ৮ জন সদস্য অংশ গ্রহণ করেন। যাদের সবারই নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক ছিল সি.এফ.আর-এর সাথে, বাকী সদস্যরা ছিলেন ইউরোপ ও জাপানের। সে বৈঠকেই 'ট্রিলিটারা কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেগনো বার্জেনসকিও ছিলেন। উক্ত বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি ও প্রশস্ত করার, প্রচার মাধ্যমের ক্ষমতা সীমিত করার এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক সহযোগিতা হ্রাস করার আহবান জানানো হয়। উক্ত সংস্থার টিসি সদস্যদের মধ্যে Exxon, Mobil standard, Shell, Philips, B.R Bankk, Bank of Amrika, C.N.N, A.B.S, R.C.A, I.T.T, Sony, Goodyear ইত্যাদি কোম্পানীসমূহের সদস্য ও ডাইরেক্টররাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

মার্কিন লেখক বার্জানসকি স্বীয় গ্রন্থ 'দুই যুগের মাঝে' লেখেন, মার্ক্সিজম মানুষের অভ্যন্তরের ওপর বাহ্যিক দিককে এবং ঈমানের ওপর বিবেককে বিজয় দানের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের সংস্থা টিসি ইউরোপ, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থার ছাঁচে ঢালতে চায়। এই সংস্থার এক তৃতীয়াংশ সদস্য জাপানী, এক তৃতীয়াংশ ইউরোপীয় ও এক তৃতীয়াংশ মার্কিনী। এদের সবার মৌলিক উদ্দেশ্য এক অভিন্ন। কারণ এ সকল সদস্যের সবাই সি.এফ.আর-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। উল্লিখিত সংস্থা ছাড়াও এমন দুই ডজনেরও বেশি সংস্থা ইহুদী স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। যেমন বেনাই বার্ট, এ্যাপেক, এ.ডি, ইত্যাদি। এরা নির্বাচনের সময় কর্ম কৌশল নির্ধারণ করে থাকে।[১২]

১২. বিস্তারিত জানতে দেখুন, লি ও ব্রাইন লিখিত 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদী সংগঠন'। এ গ্রন্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মতৎপর ইহুদী সংগঠনগুলোর বিস্তারিত পরিচিতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মকা উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদীরা মার্কিন প্রশাসনে কিভাবে জেঁকে বসে আছে তা জানতে দেখুন, মার্কিন কংগ্রেসের সাবেক সদস্য পল ফাভলের গ্রন্থ-'ইহুদী যাঁতাকল'।

www.pathagar.com

নতুন বিশ্বব্যবস্থা : রূপরেখা ও কর্মপদ্ধতি

(পশ্চিমা রাজনীতিক, চিন্তাবিদ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দস্তাবেজের উদ্ধৃতিক্রমে)

নতুন বিশ্বব্যবস্থার রূপরেখা ও মানচিত্র এমনি এমনিই অস্তিত্ব লাভ করেনি, আর না কোন চিন্তা-ফিকির ছাড়াই এ পরিকল্পনা ও রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে; বরং এই বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্বেই এর জন্য বিরাট পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। জায়নিস্ট প্রটোকলে তার রূপরেখা ও রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। অতঃপর তা বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ, মাধ্যম ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বস্তুগত সম্পদে ভরপুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষাস্থল নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে বসে বিভিন্ন ইহুদী গ্রুপ ঐক্যবদ্ধভাবে এই রূপরেখায় আরো রং প্রলেপ শুরু করে। পরবর্তীতে এর মৌলিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য যুগের চাহিদা, পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সময়ের বাস্তবতার আলোকে এর উপকরণ, মাধ্যম ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে আংশিক পরিবর্তন সাধন করা হয়। নিম্নলিখিত বক্তৃতা-বিবৃতির আলোকে সহজেই অনুমিত হয়, নতুন বিশ্বব্যবস্থার রূপরেখা ও মানচিত্র কেমন হবে? এবং এ বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কি ভূমিকা রয়েছে?

নতুন বিশ্বব্যবস্থার রাজনৈতিক অবকাঠামো

আমরা মানবেতিহাসের এমন এক স্পর্শকাতর ও চূড়ান্ত স্তরে এসে উপনীত হয়েছি, যে স্তরের মূল কথা হলো, এমন একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা গঠন ও বিনির্মাণ করা হবে, যার মধ্যে সকল দেশের কৃত্রিম সীমানা নির্মূল করে দেয়া হবে। সেসব দেশের স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক পরিচয় মুছে ফেলা হবে। (মানবাধিকারের দস্তাবেজ থেকে)

০১. ১৯৮৭ সালের ১২ই মে সিনিয়র জর্জ বুশ তার এক ভাষণে বলেন, নিকট ভবিষ্যতে এমন একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করবে, যে ব্যবস্থায় সকল জাতি-গোষ্ঠী একে অপরের সাথে একীভূত হয়ে যাবে। অতঃপর উপসাগরীয় যুদ্ধ পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এ নতুন বিশ্বব্যবস্থার অবকাঠামোর ঘোষণা দেয়া হয়।

০২. ১৯৯১ সালে প্রকাশিত এবং রোম ক্লাবের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, গোটা বিশ্বের ব্যবস্থাপনা জাতিসংঘের হাতে তুলে দেয়া একান্ত জরুরী।

০৩. 'ট্রাজেডি ও আকাঙ্খা' নামক গ্রন্থের লেখক রোটিগেল বলেন, অতি সত্বর ব্যক্তিস্বাধীনতা সীমিত হয়ে যাবে। কারণ একক ব্যক্তির কোনো গুরুত্ব নেই।

নতুন বিশ্বব্যবস্থার গোড়াপত্তনে জাতিসংঘের ভূমিকা

০১. জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব ড. বুট্রোস ঘালি ১৯৯৭ সালে তার রচিত 'আন্তর্জাতিক সরকার' নামক গ্রন্থে লেখেন, জাতিসংঘ এক হিসেবে নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম ইট।

www.pathagar.com

০২. রকফেলার ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত 'মার্কিন পররাষ্ট্র রাজনীতি' গ্রন্থে উল্লেখ আছে. নিকট ভবিষ্যতে যে নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, তার প্রধান স্তম্ভ জাতিসংঘ।

০৩. ১৯৬২ সালের মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট ও প্রস্তাবে উল্লেখ আছে, যে সব দেশকে জাতিসংঘ তার শক্তি সামর্থ দিয়ে পদানত করতে সক্ষম, সেসব দেশের শাসন ক্ষমতা পরিচালনার জন্য জাতিসংঘের অধীনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং জাতিসংঘের অধীনে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনীও গঠন করা হবে। যাতে এসব অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের সামরিক শক্তিও অর্জিত থাকে এবং সে তার মর্জি অন্য দেশের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সংবিধানে সামান্য পরিবর্তন আনতে হবে। এভাবে একটি আন্তর্জাতিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এ আন্তর্জাতিক সরকার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য নতুন বিশ্বব্যবস্থা, যা আমরা গঠন করতে চাই।

০৪. ১৯৯১ সালের জানুয়ারী তারিখে প্রদত্ত ভাষণে সিনিয়ন জর্জ বুশ বলেন, আমাদের সামনে বর্তমানে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে–আমাদের জন্য এবং আগামী প্রজন্মের জন্যও। বাস্তবিকই আমাদের একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা বাস্তবে রূপদানের সুবর্ণ সুযোগ অর্জিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় জাতিসংঘ ব্যাপক শক্তির অধিকারী হবে এবং জাতিসংঘ বিশ্বের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় তার মৌলিক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

০৫. 'পাশ্চাত্যের অস্থিরতা' নামক গ্রন্থে লেখক জেমস ওয়ারবার্গ লেখেন, আমরা এমন এক নাযুকতম সময় অতিবাহিত করছি, যে সময়ে আমরা একটি পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র থেকে একটি আন্তর্জাতিক সরকারের ক্ষমতার দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছি।

০৬. সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর নাতনী এডথ রুজভেল্ট ১৯৯৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর প্রদত্ত তার ভাষণে বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, হেরি ট্রুমেন, জেনারেল আইজেন হাওয়ার এবং জন. এফ কেনেডির যুগ থেকে নিয়ে সকল মার্কিন সরকারের বিশ্বাস ছিল, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে লড়াই করার সবচে' উত্তম পন্থা হলো এমন একটি আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যার নেতৃত্ব দেবে স্বয়ং সমাজতন্ত্রের নেতৃবর্গ। এর ফল দাঁড়িয়েছে, আন্তর্জাতিক সরকার ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিকশিত ও সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে মার্কিন কর্তত্ব জাতিসংঘের কাছে ন্যস্ত করে দেয়া হয়।

০৭. ১৯৬২ সালের ২০ মার্চ প্রকাশিত মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে উল্লেখ আছে, বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর যে ক্ষমতা আছে, তা আন্তর্জাতিক সরকারের নিকট ন্যস্ত করে দেয়া উচিত।

০৮. ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে ফরেন এ্যাফেয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি এবং জনসন-এর সহকারী রিচার্ড গার্ডনার লেখেন, আন্তর্জাতিক সরকার প্রতিষ্ঠার সবচে' উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, আমরা উঁচু পর্যায় থেকে কাজ শুরু করার পরিবর্তে একেবারে নীচ থেকে এ সরকার বিনির্মাণের কাজ শুরু করব। তা এভাবে যে, পর্যায়ক্রমে সকল রাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

সরকারের নিকট সোপর্দ করে দেব। আধিপত্য অর্জন করার জন্য এটি যুদ্ধ-লড়াই থেকেও বেশি প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী এবং দ্রুত ফলপ্রসূ।

০৯. ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাসে মিখাইল গর্বাচেভ তার এক ভাষণে বলেন, বর্তমান যুগের পরিবেশ দূষণ একটি মহা সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের আন্তর্জাতিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। এ সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনে আমাদের কিছু কঠিন ও ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, কিন্তু তা তো করতেই হবে।

১০. ১৯৯১ সালের ১৪ই আগস্ট নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়েছে, বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের দায়িত্বহীন ক্ষমতা প্রয়োগ ও আচরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা প্রয়োজন। আর এটা আন্তর্জাতিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া সম্ভব নয়। যেমনিভাবে আন্তর্জাতিক আদালত বিভিন্ন সরকারের হিসাব নিকাশ নেয়, তেমনিভাবে আমরাও সকল দেশকে একই গতিতে নিয়ে আসতে চাই।

১১. ১৯৯৩ সালের ৩১ জানুয়ারী জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রদত্ত ভাষণে সাবেক মহাসচিব ড. বুট্রোস ঘালি বলেন, দেশের ক্ষমতা, দেশপ্রেম এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মর্মার্থে পরিবর্তন চলে আসছে। সংকীর্ণ ও সীমিত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ স্থায়ী জীবনের পথে বাধা হতে পারে। এজন্য সকল দেশকে একে অপরের ওপর ভরসা করতে হবে এবং নিজ নিজ সীমান্ত চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে।

১২. ১৯৯৩ সালের ১২ এপ্রিল জর্জ বুশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশটি দেশের নেতৃবর্গের এক বৈঠক থেকে জারিকৃত যৌথ ঘোষণায় বলা হয়, জাতিসংঘের সংবিধানে পরিবর্তন আনতে হবে। সেই পরিবর্তন হলো, জাতিসংঘ সদস্য দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়েও হস্তক্ষেপ করবে। কারণ বিভিন্ন দেশ প্রকাশ্যে মানবাধিকার লংঘন করছে। আর এটাকে তারা অভ্যন্তরীণ বিষয় বলছে। সভ্য সমাজ এই মানবাধিকার লংঘন বরদাশত করতে পারে না। এ বিবৃতি জাতিসংঘ থেকে জারি করা হয়েছে।

১৩. ১৯৯৩ সালের ৩রা মে দৈনিক লস এঞ্জেলেস টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, খুব ধীরে ধীরে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আস্তে আস্তে তাদের হাত থেকে বের হয়ে জাতিসংঘের হাতে চলে যাচ্ছে। যুগোশ্লাভিয়ার গৃহযুদ্ধ আমাদের এই সুযোগ সরবরাহ করেছে।

জাতিসংঘের সামরিক শক্তি

০১. ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বুলেটিনে প্রকাশিত হয়েছে, দ্বিতীয় পর্যায়ে ধীরে ধীরে জাতিসংঘের অধীনে আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী গঠন করা হবে। তৃতীয় পর্যায়ে অত্যন্ত সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে অতি দ্রুত সকল দেশকে রাসায়নিক সমরাস্ত্র থেকে বঞ্চিত করা হবে। তখন আর কোনো দেশের পক্ষে জাতিসংঘের শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব হবে না।

০২. ১৯৯৫ সালের ৫ই জানুয়ারী দৈনিক লস এঞ্জেলেস টাইমসে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে প্রবন্ধকার ব্রেড এবং জি. বিরোয়েটজ লেখেন, সকল দেশকে শক্তিশালী সমরাস্ত্র থেকে বঞ্চিত করার স্বপ্ন একদিন বাস্তবে রূপ লাভ করবে।

www.pathagar.com

০৩. ১৯৯২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী দৈনিক লস এঞ্জেলেস টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে নিবন্ধকার নর মানকিমেস্টার লেখেন, নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী গঠন করা প্রয়োজন। এতে জাতিসংঘের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে। এ সেনাবাহিনীকে আন্তর্জাতিক পুলিশের মর্যাদা দান করা হবে, যার মাধ্যমে জাতিসংঘ তার ইচ্ছা, সংকল্প ও কার্যক্রম সহজেই অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হবে।

০৪. মার্কিন এক সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহকারী জোশেফনায়ে ১৯৯২ সালের ২ রা ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্ক টাইমসের এক নিবন্ধে লেখেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, সে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে এমন একটি সেনাবাহিনী গঠন করবে, যার মাধ্যমে জাতিসংঘ তার কার্যক্রম খুব সহজেই বাস্তবায়ন করতে পারবে। এই বাহিনীর সংখ্যা প্রথম স্তরে ৬০ হাজার এবং তা বারটি দেশের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

০৫. ১৯৯২ সালের ১১ মে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, যদি বাস্তবিকই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে এর জন্য না লাল বাহিনীর, আর না মার্কিন বাহিনীর প্রয়োজন আছে; বরং এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন দেশের সমন্বয়ে গঠিত নীল হ্যাট লাগানো আন্তর্জাতিক শান্তিবাহিনী। এ শান্তিবাহিনীই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। *(সূত্র : সি.এফ.আর-এর মুখপত্র ফরেন এ্যাফেয়ার্স–১৯৯২)*

নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

০১. ১৯৭৫ সালের ১৮ই এপ্রিল মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার তার এক বক্তৃতায় বলেন, আমরা একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করতে যাচ্ছি, এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই প্রধান ভূমিকা থাকবে।

২. মার্কিন পত্রিকা আমেরিকান ওপেনিয়ন-এর ১৯৭২ সালের জানুয়ারী সংখ্যার ৩১তম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা কর্নেল এ্যাডওয়ার্ড মান্ডিল হাউস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই আশায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত, এমনকি বাধ্য করেছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলে পরবর্তীতে খুব সহজেই একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

০৩. মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিনিয়র জর্জ বুশ ১৯৯০ সালের ১১ অক্টোবর জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, আগামী ২০০০ সালের সূচনা হবে প্রকৃতপক্ষে নতুন সহস্রাব্দের ইতিহাসে এক বিপ্লবী পরিবর্তন।

০৪. মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিনিয়ন জর্জ বুশ ১৯৮৯ সালের ১৬মার্চ এক ভাষণে বলেন, আগামী ১১ বছরের মধ্যে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করবে। আমরা এর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি?

০৫. ১৯৪০ সালে হিটলার তার এক ভাষণে বলেছিলেন, দেশ পূজারীরা আগামীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করবে।

www.pathagar.com

০৬. ১৯৫০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেম্স ওয়ারবার্গ মার্কিন সিনেটে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, আমরা চাই বা না চাই, একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অনিবার্য প্রয়োজন। এখন কথা শুধু এতটুকু, এটি জোরপূর্বক প্রতিষ্ঠা করা হবে নাকি স্বেচ্ছায়।

০৭. প্রফেসর হার্স ১৯৫৩ সালে লিখিত তার গ্রন্থ 'বিশ্ব গণতন্ত্রের মৌলিক উপাদানে' লেখেন, নতুন বিশ্বব্যবস্থা অনিবার্যভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে। সম্ভবত সেটি বিশ্ব রাজতন্ত্রের আকারে হতে পারে, যা মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখে। এই নতুন বিশ্বব্যবস্থা সে দেশই প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হবে অথবা এই বিশ্বব্যবস্থা জাতিসংঘকে ধীরে ধীরে শক্তিশালী করার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

০৮. নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার ১৯৯২ সালের ২৭ শে জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ যদি দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তাহলে অবশ্যই গোটা বিশ্বে প্রস্তাবিত নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এর জন্য তাকে ১৯৯৩ এবং ১৯৯৪ সালে জরুরী অর্থনৈতিক অবস্থা ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজনই পড়ুক না কেন।

(সূত্র : সি.এফ.আর-এর মুখপত্র ফরেন এ্যাফেয়ার্স–১৯৯২)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

পশ্চিমা মিডিয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইহুদী মিডিয়া ও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের প্রসিদ্ধ শহর 'ব্রাসেলসে' হার্টিজেলের নেতৃত্বে তিনশ' ইহুদী বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকের একটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে গোটা বিশ্বের ওপর ইহুদীদের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই পুস্তিকাকারে বিশ্ববাসীর সামনে চলে এসেছে, তাতে ১৯টি প্রটোকল রয়েছে। এই পরিকল্পনাকে 'ইহুদী বুদ্ধিজীবীদের দস্তাবেজ'ও বলা হয়। প্ল্যান-পরিকল্পনা তৈরিতে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ত্রিশটি ইহুদী সংগঠনের তিনশ' মেধাবী ও চৌকস সদস্য অংশ নেয়। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, গোটা বিশ্বের ওপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যেমনিভাবে স্বর্ণভা ার দখল করা জরুরী, তেমনিভাবে প্রচার মাধ্যমের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাও মৌলিক কর্তব্য। উল্লিখিত সম্মেলনে গৃহীত দ্বাদশতম দস্তাবেজে সাংবাদিকতার অসাধারণ গুরুত্ব ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে।

গোটা বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যেমনিভাবে স্বর্ণভা ার দখল করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তেমনিভাবে প্রচার মাধ্যমকেও আমাদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দ্বিতীয় মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভাবতে হবে। আমরা মিডিয়ার অবাধ্য ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তার বাগডোর স্বীয় কবজায় রাখবো। আমরা আমাদের শত্রুদের হাতে এমন কোনো কার্যকর ও শক্তিশালী সংবাদপত্র থাকতে দেব না, যার মাধ্যমে তারা তাদের মতামত সক্রিয়ভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারে। আর না আমরা তাদের এমন যোগ্য হতে দেব, যাতে তারা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোনো সংবাদ সমাজ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। আমরা এমন আইন প্রণয়ন করব, যাতে কোনো প্রকাশক বা প্রেস মালিক আমাদের অনুমতি ছাড়া কোনো বিষয় ছাপতে পারবে না। এভাবেই আমরা আমাদের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র কিংবা শত্রুতামূলক প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে অবগত হয়ে যাব।

আমাদের আয়ত্তে এমন সংবাদপত্র ও প্রকাশনা থাকবে, যা বিভিন্ন গ্রুপ, দল, পার্টি ও সম্প্রদায়কে সমর্থন দেবে। এসব দল, পার্টি ও সম্প্রদায় গণতন্ত্রের প্রবক্তা কিংবা বিপ্লব সমর্থক হোক। এমনকি আমরা এমন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতাও করব, যা অনৈক্য, বিপথগামিতা, যৌন সুড়সুড়ি, নৈতিক অবক্ষয়, স্বৈরাচারী রাষ্ট্র ও জালেম স্বৈর শাসকদের প্রতিরোধ ও সমর্থন করবে। আমরা যখন যেখানে ইচ্ছা জাতিগোষ্ঠীসমূহের

www.pathagar.com

চেতনা উত্তেজিত করব আবার যখন ভাল মনে করব তখন ঠাণ্ডা করে দেব। এর জন্য সত্য মিথ্যা উভয়েরই আশ্রয় নেব। আমরা এমনভাবে সংবাদগুলো উপস্থাপন করব, যাতে জাতি-গোষ্ঠী ও সরকারসমূহ তা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। বিরাট ধুমধাম ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়া থেকে খুব সতর্কতা অবলম্বন করব। আমাদের লিটারেচার ও সংবাদপত্রগুলো হিন্দুদের দেবী বিষ্ণুর মতো হবে, যার শত শত হাত রয়েছে। আমাদের প্রেস-প্রকাশনার মৌলিক কাজ হবে, বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও কলামের মাধ্যমে জনমত গঠন করা। আমরা ইহুদীরা এমন সম্পাদক, পরিচালক, সাংবাদিক ও রিপোর্টারদের সাহস যোগাবো এবং উৎসাহ দেব, যারা হবে দুশ্চরিত্র এবং যাদের অতীত অপকর্ম ও দুষ্কর্মের রেকর্ড রয়েছে। ঠিক একই পদ্ধতি গ্রহণ করব দুশ্চরিত্র রাজনীতিক লীডার ও স্বৈরাচারী শাসকদের ক্ষেত্রেও।

এদের আমরা খুব কভারেজ দিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে হিরো বানিয়ে উপস্থাপন করব, কিন্তু আমরা যখন উপলব্ধি করতে পারব, তারা আমাদের হাত থেকে বের হয়ে যাবার চেষ্টা করছে, তখন আমরা তাদের এমন শিক্ষা দেব যা অন্যদের জন্যও শিক্ষণীয় হবে। আমরা সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে ইহুদী প্রচার মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণ করব। আমরা বিশ্ববাসীকে যে রঙ দেখাব, তাদের তাই দেখতে হবে। অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদগুলো অসাধারণ গুরুত্বের সাথে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করব, যাতে পাঠকের মেধা মনন প্রস্তুত হয়ে সেও অপরাধীর সহমর্মী হয়।

ইহুদীরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য অসাধারণ মেধার সাথে বিভিন্ন ময়দানে বিচরণ শুরু করে। সর্বপ্রথম তারা প্রচার মাধ্যমের আশ্রয় নিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে তাদের বৈশিষ্ট্য (লাঞ্ছনা, বদস্বভাব, লোভ-লালসা, কঠোর হৃদয়, অনিষ্টকারিতা, মানবতার সাথে শত্রুতা ইত্যাদি) পরিবর্তন, নিজেদের মজলুম অত্যাচারিত প্রমাণ করা এবং নিজেদের সকল জাতীয় বৈশিষ্ট্য আরবদের মাথায় চাপিয়ে দেয়ার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়েছে। অন্য কথায়, ইহুদী মিডিয়া স্বীয় জাতির কুৎসিত চেহারা প্লাস্টিক সার্জারীর মাধ্যমে সুন্দর বানাতে নিজেদের সম্ভাব্য সকল শক্তি সামর্থ ব্যয় করেছে। এটি কোনো সাধারণ কাজ ছিল না।

কারণ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইহুদীদের প্রতারণা, ধোকাবাজি, মানবতার সাথে শত্রুতা, অনিষ্টকারিতা ও ষড়যন্ত্রের দাস্তানে ইসলামী, খৃস্টীয় ও মানবেতিহাস ভরপুর হয়ে আছে। সুতরাং প্লাস্টিক সার্জারী ছাড়া ইহুদীদের উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব ছিল না। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইহুদীরা তাদের পরিকল্পনায় তেমন একটা সফলতা অর্জন করতে পারেনি, কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যের অতি নিকটে পৌঁছে দিয়েছে। আরব বিশ্বের হৃৎপিণ্ডে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কারণ, সর্বপ্রথম তারা ইউরোপীয় ও মার্কিন জাতির দৃষ্টিতে নিজেদের একটি মজলুম নির্যাতিত জাতি হিসেবে প্রমাণ করতে সফল হয়েছে। অপর দিকে তাদের সকল জাতীয় বৈশিষ্ট্য আরব ও মুসলমানদের মাথায় চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা

প্রচার মাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক তেমনি, যেমন বন্দুক ও তার গুলির সম্পর্ক। যদি গুলি বের না হয় তাহলে বন্দুকের অস্তিত্ব নিষ্ফল। ইহুদীরা সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সাথে সাথে সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠার দিকেও মনোনিবেশ করেছে। এটা এমন এক মৌলিক মাধ্যম, যা ব্যবহার করে তারা নিজেদের ইচ্ছামাফিক কাজ করতে পারে। জায়নিস্ট প্রটোকলের ১২তম অধ্যায়ের এই কথাগুলো আপনি অভিনিবেশ সহকারে পড়ুন। তাতে বলা হয়েছে, আমাদের মঞ্জুরী ছাড়া কোনো সাধারণ সংবাদও সমাজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। এটি নিশ্চিত করার জন্য আমাদের ইহুদীদের জন্য জরুরী, সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা। যার মৌলিক কাজ হবে গোটা বিশ্বের আনাচ কানাচ থেকে বিভিন্ন সংবাদ একত্রিত করা। আর তখনই আমরা একথার গ্যারান্টি দিতে পারব, আমাদের মঞ্জুরী ছাড়া কোনো নগণ্য সংবাদও প্রচারিত হবে না। এ কথাগুলো পড়ার পর কয়েকটি প্রসিদ্ধ সংবাদ সংস্থার কাহিনী খুব সংক্ষেপে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন।

রয়টার

বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টারের অসাধারণ পরিচিতি ও সুনাম রয়েছে। বিশ্বের বেশির ভাগ, বরং সকল সংবাদপত্র ও টিভি এই সংবাদ সংস্থার ওপর নির্ভর করে থাকে। এমনকি বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা এবং রেডিও মন্ট কার্লোও ৯০ শতাংশ সংবাদ এই সংস্থা থেকে সংগ্রহ করে থাকে। এই সংবাদ সংস্থার স্থপতি জুলিয়াস রয়টার ১৮১৬ সালে জার্মানীর এক ইহুদী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তার কর্মজীবনের সূচনা করেন জার্মানীর এক ব্যাংকে। ব্যাংকে চাকরীকালে চাকুরীর মাঝে জুলিসের মাথায় একবার চিন্তা আসল, জার্মানীতে বিদ্যমান বিভিন্ন ব্যাংক, বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সংক্রান্ত সংবাদ সরবরাহ করার জন্য যদি একটি সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে বিষয়টি কেমন হয়? এ বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার পর জুলিয়াস চাকুরী থেকে ইস্তেফা দেন। এখন থেকে তিনি বিভিন্ন ব্যাংক ও ব্যবসায়ী সংগঠনকে অর্থনৈতিক সংবাদ সরবরাহ শুরু করেন। এক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। তিনি তার এই এজন্সীর কার্যক্রমের পরিধি জার্মানী থেকে ব্রাসেলস অতঃপর প্যারিস এবং ১৯৫১ সালে লন্ডন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। টেলিফোন ও টেলিগ্রামের আবিষ্কারে অর্থনৈতিক সংবাদের পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংবাদগুলোও সংবাদপত্রের নিকট পৌঁছাতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হন। পর্যায়ক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মান, লন্ডন এবং ইউরোপীয় দেশগুলো ছাড়িয়ে এশিয়া ও অন্যান্য মহাদেশ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি ও প্রেস রয়টারের সংবাদগুলো অত্যন্ত চড়ামূল্যে ক্রয় করতে শুরু করে। রয়টার ১৮৫৮ সালে সংবাদ সরবরাহে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে। এমনকি এক ঘন্টার মধ্যে তৃতীয় নেপোলিয়নের ভাষণ বৃটিশ সংবাদপত্রগুলোকে সরবরাহ করতে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দেয়। মার্কিন গৃহযুদ্ধের সংবাদগুলোও রয়টার অত্যন্ত অসাধারণ

দ্রুততার সাথে মিডিয়া পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম হয়। ১৮৫৭ সালে রয়টার সংবাদ সংস্থার মালিককে বৃটিশ নাগরিত্ব দান করা হয়। বৃটিশ রাণী তাকে এক বিরাট খেতাবে ভূষিত করেন। গোটা বিশ্বের মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমগুলো এই ইহুদী সংস্থার প্রেরিত সংবাদ ও মতামতকে ওহী, বরং এর চেয়েও বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।[১]

এসোসিয়েটেড প্রেস

১৮৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি বড় বড় দৈনিক পত্রিকা মিলে এসোসিয়েটেড প্রেস নামে এই সংবাদ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করে। ১৯ শতকে এসে এই সংবাদ সংস্থাটি এমন আন্তর্জাতিক কোম্পানীর মর্যাদা লাভ করে, যা আমেরিকা মহাদেশ থেকে প্রকাশিত সকল সংবাদপত্রসহ বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যমকে সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। এই সংবাদ সংস্থায় ৯০ শতাংশ পুঁজি বিনিয়োগকারী হলো ইহুদীরা।[২]

ইউনাইটেড প্রেস

১৯০৭ সালে দুই মার্কিন ইহুদী পুঁজিপতি স্ক্রাইপস এবং হার্ভার্ড মিলে ইউনাইটেড প্রেস নামে একটি সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এর দু'বছর পর ১৯০৯ সালে উইলিয়াম হ্যারেস্ট নামক এক খৃস্টান পুঁজিপতি ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস নামে একটি সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস পরবর্তীতে একটি বিশ্বজোড়া প্রচার সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, যার শাখা-প্রশাখা গাছের ডাল-পালার ন্যায় বিশ্বাব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। উইলিয়াম হ্যারেস্ট নিজে যদিও একজন খৃস্টান, কিন্তু তিনি বিয়ে করেন এক বড় ইহুদী পুঁজিপতির মেয়েকে। উইলিয়াম হ্যারেস্টের পর ডেভিস হ্যারেস্ট ও প্যাট্রেসিয়া হ্যারেস্টসহ তার গোটা পরিবার ইহুদী পরিবারে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ১৯৫০ সালে ইউনাইটেড প্রেস ও ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস পরস্পরে একীভূত হয়ে নিউইয়র্ক টাইমসের মালিকানায় চলে আসে, যা একটি ইহুদী

---

১. রয়টারে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা সর্বমোট ২ হাজার ৮৪ জন। যার মধ্যে এক হাজার সম্পাদক, সাংবাদিক ও রিপোর্টার রয়েছে। এই নিউজ এজেন্সীর অর্ধেকের বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃটেনের বাইরে অন্যান্য দেশে কাজ করে। ৭৫টি সংবাদ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫০টি দেশের পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও রেডিও-টিভি কোম্পানীকে দৈনিক ১৫ লাখ শব্দ সম্বলিত সংবাদ ও নিবন্ধ প্রেরণ করা হয়, যা ৪৮টি ভাষায় প্রকাশিত হয়।

২. ১৯৮৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই নিউজ এজেন্সীর সাথে ১ হাজার ৩ শ' দৈনিক, ৩ হাজার ৭ শ' ৮৮টি রেডিও এবং টিভি জড়িত রয়েছে। এটি শুধু আমেরিকায়। আমেরিকার বাইরে এই এজেন্সীর সাথে ১১ হাজার ৯ শ' ২৭টি দৈনিক পত্রিকা এবং রেডিও টিভি জড়িত রয়েছে। স্যাটেলাইট ও অন্যান্য মাধ্যমে দৈনিক সতের মিলিয়ন অর্থাৎ ১ কোটি ১৭ লাখ শব্দ সম্বলিত সংবাদ ও নিবন্ধ মিডিয়াকে সরবরাহ করা হয়। এ সংবাদ সংস্থার অর্থনীতি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিশেষ বিভাগ রয়েছে। সেখান থেকে গোটা বিশ্বে ৮ হাজার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তাজা সংবাদ সরবরাহ করা হয়। এসব সংবাদের মূল্য অসাধারণ চড়া। শুধু আমেরিকাতেই এই নিউজ এজেন্সীর ১ শ' ১৭টি দফতর রয়েছে। আর আমেরিকার বাইরে ৮১টি সংবাদ কেন্দ্র রয়েছে, সেখানে ৫ শ' ৬৯ জন সাংবাদিক ও রিপোর্টার কর্মরত রয়েছেন। তার মধ্যে ৮১ জন সাংবাদিক আমেরিকার। এজেন্সীতে কর্মরত সম্পাদক ও সাংবাদিকের সংখ্যা ২ হাজার ৫ শ'। এই কোম্পানীর শতভাগ মালিকানা ইহুদীদের এবং ৯৫% কর্মকর্তা-কর্মচারী ইহুদী।

www.pathagar.com

মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। ১৯৮২ সালে এসব প্রতিষ্ঠানের সবগুলোকে মিডিয়া নিউজ করপোরেশনের অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হয়।[৩]

ফরাসী নিউজ এজেন্সী

ফরাসী নিউজ এজেন্সীকে বলা হয় 'এজেন্সী অফ ফ্রান্স প্রেস সংক্ষেপে এএফপি। ১৮৩৫ সালে ফ্রান্সের এক ইহুদী পরিবার হাওয়াজ 'হাওয়াজ এজেন্সী' নামে এক সংবাদ সংস্থার গোড়াপত্তন করে, যা পরবর্তীতে এজন্সী অফ ফ্রান্স প্রেস (এএফপি) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ফ্রান্সে যদিও ইহুদীদের সংখ্যা মাত্র সাত লাখ, কিন্তু সেখান থেকে প্রকাশিত পঁচাশি শতাংশ সংবাদ পত্র ও ম্যাগাজিনের ওপর ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক সংবাদপত্র লোফিগারো, ডেইলি এক্সপ্রেস, লোকুইডিয়ান, ফ্রান্সওয়ার, নও-দোকায় ছাড়াও নারী সমাজে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন ফ্যামিলী ওয়ার্কার (যার প্রচার সংখ্যা পনের লাখ) ইত্যাদি সংবাদ পত্রের মালিক প্রসিদ্ধ বৃটিশ ইহুদী পুঁজিপতি জেমসগোল্ড স্মিথসহ অন্যান্য ইহুদী পুঁজিপতিগণ, যাকে পরবর্তীতে ফ্রান্সের নাগরিত্ব প্রদান করা হয়। এসব ইহুদী মিডিয়াই ফ্রান্স সরকারের পলিসি নির্ধারণ করে থাকে।[৪]

বৃটিশ সংবাদ মাধ্যম

বৃটেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ইহুদীদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য অনেক সুপ্রাচীন। এই সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন ডিজরেইলী এবং বৃটিশ সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ একই সময়ে একই সাথে ইহুদী ছিলেন। এতেই বৃটেনে ইহুদীদের কর্তৃত্ব এবং অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা সহজেই অনুমান করা যায়। আর সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের জগতে রাজত্ব তো অনেক দূরের কথা। এ ময়দানে অন্যের অংশীদারিত্ব ছাড়াই দীর্ঘকাল থেকে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য রয়েছে। তারা

---

৩. মিডিয়া নিউজ করপোরেশন সরবরাহকৃত সংবাদের খরিদ্দারদের সংখ্যা ৭ হাজার ৭৯ জন। তন্মধ্যে ২ হাজার ২ শ' ৪৬ জন (সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি স্টেশন) আমেরিকার বাইরের। এই কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থার আওতাধীনে আরো ত্রিশটি সংবাদ সংস্থা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (ইউপিআই)-এর সাথে জড়িয়ে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১ হাজার ১ শ' ৩৪টি সংবাদপত্র ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এবং ৩ হাজার ৬ শ' ৯৯টি রেডিও ও টিভি স্টেশন। পৃথিবীব্যাপী এই এজেন্সীর ১ শ' ৭৭টি কেন্দ্র রয়েছে। শুধু আমেরিকাতেই তার ৯৬টি দফতর রয়েছে। ইউপিআই-এর কর্মচারী-কর্মকর্তাদের সংখ্যা ১ হাজার ৮ শ' ৩৩ জন, যার মধ্যে রয়েছে ১ হাজার ২ শ' ৪৫ জন সম্পাদক, রিপোর্টার ও ক্যামেরাম্যান। এই এজেন্সীর ৫ শ' ৭৮ জন সাংবাদিক আমেরিকার বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নিয়োজিত রয়েছেন।

৪. এজেন্সী অফ ফ্রান্স প্রেস (এএফপি)-কে ১৯৫৭ সালে নতুনভাবে পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠনের পর এএফপি'র কার্যপরিধি ফ্রান্সের বাইরেও ছড়িয়ে দেয়া হয়। বর্তমানে ৮ শ' ৮২ জন সাংবাদিক এর সাথে জড়িত আছেন। তন্মধ্যে ৩ শ' ৩০ জন ফ্রান্সের বাইরে রিপোর্টার হিসেবে কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন। ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে ৮০ জন রিপোর্টার কাজ করেন। এই নিউজ এজেন্সীর আওতাধীনে আরো ৩০টি নিউজ এজেন্সী কাজ করে। ১ শ' ৮২ টি দেশে ১২ হাজার খরিদ্দার রয়েছে। আর যেসব সংবাদপত্র, রেডিও ও টিভি স্টেশন এই সংস্থা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে, তাদের সংখ্যা ৪ শ'। এখান থেকে দৈনিক ৩৩ লাখ ৫০ হাজার শব্দ সম্বলিত সংবাদ ১ শ' ৮২টি দেশে প্রেরণ করা হয়। সেসব দেশে ৪২টি ভাষায় অনুবাদ হওয়ার পর তা প্রচার করা হয়। এমনিভাবে সংবাদের পাশাপাশি ক্রেতাদের দৈনিক ৫০টি ফটোও সরবরাহ করা হয়।

www.pathagar.com

সমগ্র বিশ্বকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ঘোরাতে পারে। ধারাবাহিক তিন দশক ধরেই বিবিসি ওয়ার্ল্ডের প্রধান ইহুদী নিয়োগ হয়ে আসছে। স্টার টিভি যখন থেকে পৃথিবীর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে, তখন থেকে ইহুদীদের প্রোপাগান্ডা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। লন্ডন টাইমস সেসব আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রের একটি, যার সম্পাদকীয়, মন্তব্য, কার্টুন ও সংবাদ যে কোনো বৃটিশ সরকার পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট। এই পত্রিকা ১৭৮০ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছিল। যদিও পত্রিকাটি থমসন ইন্টারন্যাশনালের মালিকানায় প্রকাশিত হচ্ছিল, কিন্তু প্রসিদ্ধ ইহুদী পুঁজিপতি রোডশেল্ড প্রথম পর্যায়ে বিজ্ঞাপন ও পরবর্তী পর্যায়ে পছন্দমতো সম্পাদক ও ইহুদী সাংবাদিকদের মাধ্যমে পত্রিকাটিকে কবজা করে নেয়। থমসন ইন্টারন্যাশনালের মালিকানার যুগে ইহুদী কর্মচারীদের হার বিশ শতাংশ ছিল, কিন্তু আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে টাইমসকে কৃত্রিম অর্থনৈতিক সংকটে ফেলে এর বিরুদ্ধে খুব প্রোপাগান্ডা চালানো হয়। টাইমসে ইহুদী কর্মচারীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা পঁচিশ শতাংশ বৃদ্ধি করার জোর দাবী করা হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাবীর মুখে থমসন এই বলে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা দেন যে, পত্রিকাটি এ অর্থনৈতিক বোঝা বহন করতে সক্ষম নয়। এ ঘোষণায় বৃটেনে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। এই সুযোগে অস্ট্রেলিয়ার প্রসিদ্ধ ইহুদী পুঁজিপতি রবার্ট মারদুখ 'মুক্তিদূত' হয়ে আবির্ভূত হন।[৫]

মি. রবার্ট লন্ডন টাইমস-এর বার্ষিক লোকসান নয় মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান পাউন্ড পরিশোধ করে পুরো সংবাদপত্র ক্রয় করার সংকল্প ব্যক্ত করেন। এই ঘোষণার সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে এ মুক্তিদূতের প্রশংসা শুরু হয়ে যায়। পরিশেষে এই ইহুদী পুঁজিপতি পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন ডলার দিয়ে এই প্রাচীন পত্রিকাটি ক্রয় করে নেন। সানডে টাইমস ক্রয় করার পর এবার মি. রবার্ট ফ্লিন্ট স্ট্রীট সম্পূর্ণ কবজা করে নেন, যেখান থেকে লন্ডনের সব সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। লন্ডন টাইমস ও সানডে টাইমস ক্রয় করার পর রবার্টের বিজয়ের পরিধি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে লাগল। এর পর তিনি লন্ডনের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন সান, নিউজ অফ দি ওয়ার্ল্ড, সিটি ম্যাগাজিন এবং উইক এন্ড-এর মতো জনপ্রিয় ম্যাগাজিনগুলোর ওপরও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এসব ম্যাগাজিন অশ্লীলতার মুখপত্র হিসেবে সংখ্যায় চল্লিশ থেকে

---

৫. রবার্ট মারদুখ অস্ট্রেলিয়ার ধনাঢ্য এক ইহুদী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। রবার্টকে সে সময়কার আন্তর্জাতিক মিডিয়া রাজত্বে 'মহারাজা বা মিডিয়া মোগল' মনে করা হয়। 'আসল, দেখল ও বিজয় করে নিল'–প্রসিদ্ধ এই প্রবাদের প্রতীক ছিলেন তিনি। তিনি আন্তর্জাতিক মিডিয়ার একজন বিশেষজ্ঞ ও নিউজ করপোরেশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৯৯ সালে তার সমুদয় সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮২ মিলিয়ন ডলার। বিগত এক বছরের আমদানী ছিল সাড়ে ৬৮ মিলিয়ন ডলার। তার অধীনে পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ কর্মরত রয়েছে। রবার্ট ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া–এ চারটি মহাদেশে ১ শ' ২৫টি দৈনিকের মালিক। প্রতি সপ্তাহে যার চারশ' কোটি কপি প্রকাশিত হয়। শুধু লন্ডন টাইমস, সানডে টাইমস ও সানবার্ট–এর পাঠক সংখ্যাই এক কোটি। ১৯৮৯ সালে রবার্ট ফোকাস নেটওয়ার্ক নামক সংস্থাটি কিনে নেন। এ ছাড়াও তিনি স্কাই টেলিভিশন কোম্পানী ও স্টার টিভির সিংহভাগ শেয়ারের মালিক। স্কাইয়ের মূল্য পাঁচশ' মিলিয়ন এবং স্টার টিভির অংশের মূল্য আনুমানিক পাঁচ মিলিয়ন ডলার। অস্ট্রেলিয়া, বৃটেন ও আমেরিকার দৈনিক সংবাদের আশি শতাংশ এবং রোববারে প্রকাশিত ম্যাগাজিন ও বিশেষ ক্রোড়পত্রের ষাট শতাংশের মালিক মি. রবার্ট।

www.pathagar.com

পঞ্চাশ লাখ প্রকাশিত হয়। শুধু সান-এর প্রচার সংখ্যাই চল্লিশ লাখ। উপরোল্লিখিত সব সংবাদ মাধ্যম ছাড়াও বৃটেন থেকে প্রকাশিত নিম্নবর্ণিত সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনেও ইহুদীদের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ডেইলী এক্সপ্রেস, নিউজ ক্র্যানিকল, ডেইলী মেইল, ডেইলী হেরাল্ড, মানচস্টার গার্ডিয়ান, ইয়র্ক শায়ার পোস্ট, ইভেনিং স্ট্যার্ন্ডাড, ইভেনিং নিউজ অবজার্ভার, সানডে রিভিউ, সানডে এক্সপ্রেস, সানডে ক্র্যানিকল, জনপল, দি সানডে পিপলস, সানডে ড্যামপাচ, দি স্ক্যাচ, দি এ্যাম্বাস্যাডার, দি জিওগ্রাফিক ইত্যাদি। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বৃটেনের পনেরটি দৈনিকের পরিপূর্ণ মালিকানা ইহুদীদের। এগুলোর দৈনিক প্রচার সংখ্যা তেত্রিশ মিলিয়ন, যেখানে প্রকৃত বৃটিশ নাগরিকের সংখ্যা পঞ্চাশ মিলিয়ন।

মার্কিন মিডিয়া

মার্কিন জনমত গঠনে মার্কিন মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ভূমিকার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। যে কোনো বিষয়ে অতিদ্রুত জনমত সৃষ্টি হয়ে যায়। এর মৌলিক কারণ হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে কোনো ব্যক্তির সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, রেডিও স্টেশন ও টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সব ধরনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে। মার্কিন আইন অনুযায়ী যে কোনো ব্যক্তি সংবাদপত্র বের করতে এবং জনসাধারণ পর্যন্ত যে কোনোভাবে নিজের বক্তব্য পৌঁছাতে পারে। এই স্বাধীনতার কারণে মিডিয়ার ওপর মার্কিন সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আলোচ্য কথাগুলো সামনে রেখে যদি মার্কিন মিডিয়া সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটে ওঠে।

০১. মার্কিন মিডিয়ার ওপর হয় কোনো প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের অথবা কোনো শিল্প পরিবারের অথবা কোনো কোম্পানীর কিংবা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত আছে, যার ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

০২. মার্কিন মিডিয়ার মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, আন্তর্জাতিক কোনো ইস্যু নিয়ে মার্কিন রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করা, যে কোন মূল্যে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া, খৃস্টবাদ ও ইহুদীবাদের শিক্ষার প্রচার প্রসার ঘটানো, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির ওকালতি এবং সহায়তা করা, ক্ষমতার মসনদে রিপাবলিকান পার্টি আসীন হোক আর ডেমোক্রেটিক পার্টিই আসীন হোক, এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

০৩. মার্কিন মিডিয়ায় সবচে' বেশি প্রাধান্য দেয়া হয় বিজ্ঞাপনকে, যার মাধ্যমে কোটি কোটি ডলার আমদানী হয় এবং অভাবনীয় মুনাফা অর্জিত হয়।

০৪. কিছু কিছু সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও টিভি স্টেশনের বিশেষ কিছু ইস্যুতে নিজস্ব মতামত থাকে। সেই মতামত মিডিয়ার মাধ্যমে সম্পাদকীয়, মন্তব্য ও বিশ্লেষণ দ্বারা যে কোনো মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সে মতামতের ব্যাপারে সরকার, জনগণ ও বেশির ভাগ পাঠকের দ্বিমতই থাকুক না কেন। প্রকাশ থাকে যে, সম্পাদনা পরিষদ ও মালিক পক্ষের মতামত অনুযায়ীই তারা সংবাদ প্রকাশ করে থাকে।

www.pathagar.com

আমরা মার্কিন মিডিয়াকে ছয় ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

০১. দৈনিক পত্র-পত্রিকা ও সংবাদ সংস্থা

০২. ম্যাগাজিন, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষান্মাষিক পত্রিকা

০৩. টেলিভিশন

০৪. রেডিও

০৫. ডাক বিভাগের মাধ্যমে বিতরণকৃত লিটারেচার

০৬. কোম্পানীসমূহের বুলেটিন ও প্রকাশনা

নিম্নে আমরা মার্কিন মিডিয়ার উল্লিখিত ছয় প্রকারের প্রতিটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে প্রয়োজনীয় কিছু আলোচনা পেশ করব।

মার্কিন দৈনিক পত্র-পত্রিকা

মার্কিন দৈনিক পত্র-পত্রিকা দুই ধরনের।

এক. ওই সব দৈনিক, যেগুলো সেসব শহর ও স্টেটের সমস্যা সংকটের প্রতিনিধিত্ব করে, যেসব শহর ও স্টেট থেকে তা প্রকাশিত হয়।

দুই. ওই সব দৈনিক, যেগুলো জাতীয় সমস্যার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সমস্যা সংকট সম্পর্কেও সংবাদ, নিবন্ধ এবং সম্পাদকীয় লেখে।

সর্বসাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ হাজার ৬ শ' ৭৬টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিশেষ ম্যাগাজিনের কারণে রবিবার দিন বিভিন্ন পত্রিকা ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বেশি বিলি হয়।

আমেরিকার অডিট ব্যুরো অফ সার্কুলেশনের সাম্প্রতিক রিপোর্ট মতে, গোটা আমেরিকায় পঞ্চাশটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এমন রয়েছে, যেগুলো বিপুল পরিমাণে বিলি হয়।

যেসব মার্কিন শহর থেকে এসব দৈনিক প্রকাশিত হয়, সেসব শহরের নাম- ডেট্রয়েট, সানফ্রান্সিসকো, মায়ামি, বাল্টিমোর, ফিলাডলফিয়া, হোস্টন, কিউল্যান্ড, কানসাস সিটি, ডিনফর, মিলওয়াকি, লং আইল্যান্ড, ভিনেকসি নিউ আয়ারল্যান্ড ছাড়াও নিউইয়র্ক, ওয়াশিংন্ট, লস এঞ্জেলেস, শিকাগো এবং বোস্টন সেসব কেন্দ্রীয় শহর, যেখানে বিপুলসংখ্যক ইহুদী বসবাস করে। এসব শহরেই খৃস্টানদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাবলিগী সংস্থা ও ইহুদীদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রয়েছে। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে রয়েছে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ শহরগুলোতেই সরকারী ভি.আই.পি লোকেরা বসবাস করেন, যার কারণে পত্রিকার সাংবাদিক ও প্রতিনিধিদের পক্ষে সরকারী অফিসার, মার্কিন সিনেটের সদস্য, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা খুবই সহজ হয়। খুব সহজেই এখানে বসে আমেরিকার আন্তর্জাতিক রাজনীতির গোপন-প্রকাশ্য সব কিছু জনসম্মুখে তুলে ধরা যায়।

www.pathagar.com

বোস্টন শহর থেকে প্রকাশিত মার্কিন দৈনিক 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' এমন এক সংবাদপত্র, যা মার্কিন গির্জার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। এ দৈনিকটি আরব বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে এবং আরব বিশ্ব সম্পর্কে ভারসাম্যপূর্ণ অভিমত পোষণ করে। বেশির ভাগ সময় পত্রিকাটি ইসরাঈলী পলিসির সমলোচনা ও নিন্দা করে।

'হেরাল্ড ট্রিউবন' তৃতীয় দৈনিক সংবাদপত্র, যা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা সংকট সম্পর্কে অত্যন্ত সুচিন্তিত অভিমত পোষণ করে। পত্রিকাটি মধ্যপন্থা ও ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি প্রতিটি বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ এতে অত্যন্ত নিরপেক্ষতার সাথে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। এ বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি পত্রিকাটি মার্কিন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল, রাষ্ট্রদূত ও বড় বড় শিল্পপতিদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখে। এ কারণে হেরাল্ড ট্রিউবনের সংবাদ, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, মন্তব্য, প্রবন্ধ-নিবন্ধকে অত্যন্ত সম্মান ও গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখা হয়। বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার আলোচনা আমরা শুরুতেই করেছি।

মার্কিন সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্র-পত্রিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষান্মাষিক পত্র-পত্রিকাগুলোকে আমরা চার ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

০১. সাধারণ রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকা ও বিশ্লেষণমূলক ম্যাগাজিন।

০২. বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান-গবেষণামূলক মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষান্মাষিক ম্যাগাজিন।

০৩. সামাজিক ও নারী বিষয়ক ম্যাগাজিন, আর্ট, লিটারেচার, ফিল্ম, যৌন বিষয়ক ম্যাগাজিন।

০৪. কৃষি, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, অর্থনীতি, খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক পত্র-পত্রিকা।

দৈনিক পত্রিকার তুলনায় সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলোর ধরন-আকৃতি, গবেষণা-আলোচনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং সাক্ষাতকার ও রিপোর্ট ইত্যাদি দিক দিয়ে ব্যতিক্রমী হয়ে থাকে। এখানে আমরা সাধারণ পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলোর আলোচনা করব না, যা কমবেশি সবখানেই পাওয়া যায়। এখানে শুধু সেসব পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনেরই আলোচনা করব, যা তুলনামূলক ব্যতিক্রমী এবং যা শুধু মার্কিন জনমতই নয়; বরং আন্তর্জাতিক জনমতের ওপরেও প্রভাব সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে, সেগুলো হল-

ক. এখানে সেসব পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের তালিকা পেশ করা হবে, যেগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যের অধিকারী এবং বিপুল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেসব পত্রিকা হল–:

০১. ওয়ার্ল্ড প্রেস রিভিউ (মাসিক) : এ পত্রিকাটি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করে।

www.pathagar.com

০২. ওয়ার্ল্ড ভিউ (মাসিক) : এ পত্রিকাটি প্রতিমাসে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তিন থেকে পাঁচটি জ্ঞান-গবেষণামূলক নিবন্ধ লেখায় এবং গোটা দুনিয়া হতে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের তালিকা প্রকাশ করে।

০৩. নিউ রিপাবলিক (সাপ্তাহিক) : এ পত্রিকাটি মার্কিন সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সংকট নিয়ে লেখে এবং ইহুদীদের দৃষ্টিভঙ্গির ওকালতি করে।

০৪. এক্সিকিউটিভ ইন্টেলিজেন্স ভিউ (সাপ্তাহিক) : এ পত্রিকাটি বামপন্থীদের মুখপাত্র এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর এক নম্বর শত্রু।

০৫. স্ট্র্যাটেজি উইক (সাপ্তাহিক) : মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন সমস্যা-সংকট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে।

০৬. আমেরিকান জায়নিস্ট (দ্বিমাসিক) : এ পত্রিকাটি মার্কিন জায়নবাদী সংগঠনের মুখপত্র।

০৭. দি প্যালেন ট্রুথ (মাসিক) : এটি মার্কিন গির্জা সংগঠনের মুখপত্র। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা-সংকট, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সংকট নিয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে। প্রতিমাসে এ পত্রিকাটির পঞ্চাশ লাখ কপি ফ্রি বিতরণ করা হয়।

০৮. ওয়াশিংটন রিপোর্ট (মাসিক) : এ পত্রিকাটি ১৯৮২ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। সাধারণভাবে এটি মধ্যপ্রাচ্য ও আমেরিকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ মতামত ও গুরুত্বপূর্ণ দলীল-দস্তাবেজ প্রকাশ করে। আরব বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সংকট নিয়েও পত্রিকাটি সহযোগিতা সহমর্মিতা পোষণ করে। এটি মার্কিন ওয়াকফের পক্ষ হতে প্রকাশিত হয়।

০৯. ওয়ার্ল্ড মনিটর (মাসিক) : এ দৈনিক ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর পাবলিকেশন্সের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়।

১০. মিডলইস্ট ইনসাইট (দ্বিমাসিক) : এ পত্রিকাটি মধ্যপ্রাচ্য, ইসলামী সংগঠন-সংস্থা, ইসলামী দল ও তাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে। কখনো কখনো এতে আরবদের দৃষ্টিভঙ্গিও স্থান পায়, কিন্তু ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে এ পত্রিকার মতামত ও মন্তব্যকে আমরা নিরপেক্ষ বলতে পারি না।

উল্লিখিত পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন-সাময়িকী ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরো হাজার হাজার পত্র-পত্রিকা বের হয়।

খ. এখানে সেসব গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের তালিকা পেশ করা হবে, যেগুলো সংখ্যায় মাত্র কয়েকশ' থেকে বেশি প্রকাশিত হয় না, কিন্তু সেগুলো কোন গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয়, বুদ্ধিজীবী ফোরাম এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। সেসব সংস্থা সংগঠনের মধ্যে রয়েছে মিডলইস্ট ইনস্টিটিউট, ব্রোকিংস ইনস্টিটিউট, ডেল কার্নেগী ইনস্টিটিউট, হাওয়ার্ড ইনস্টিটিউট,

www.pathagar.com

ইউ.এস.পি ফাউন্ডেশন, স্টেনিভ ফোর্ড, জন হকিংস, জর্জ টাউন কলম্বো ইত্যাদি। এ ছাড়া কংগ্রেস, মার্কিন খৃস্টান ও ইহুদী সংগঠন এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এসব পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাগাজিনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো :

০১. ফরেন ব্রডকাস্টিং ইনফরমেশন সার্ভিস (ত্রৈমাসিক) : এটি দৈনন্দিন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংঘটিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী প্রকাশ করে।

০২. ফরেন পলিসি (ত্রৈমাসিক) : ডেল কার্নেগী ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে এটি প্রকাশিত হয়। এতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা-সংকট নিয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

০৩. ফরেন এ্যাফেয়ার্স (বছরে পাঁচ বার প্রকাশিত হয়) : মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে যোগাযোগ কমিটির পক্ষ থেকে এটি প্রকাশিত হয়। শীর্ষ রাষ্ট্রদূত ও সাবেক রাষ্ট্রদূতরা এতে কলাম লেখেন।

০৪. ডিফেন্স এন্ড ফরেন এ্যাফেয়ার্স (মাসিক) : আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কৌশল বিষয়ক এ পত্রিকাটি কোয়েলী কোম্পানীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়।

০৫. মিডলইস্ট জার্নাল (ত্রৈমাসিক) : ওয়াশিংটনের মিডলইস্ট ইনস্টিটিউট-এর পক্ষ থেকে এটি প্রকাশিত হয়। ইরানী বিপ্লবের পর ইসলামী আন্দোলন, দীনী সংগঠন, মিসর, পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান, সিরিয়া ও তুরস্কে দীনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

০৬. জার্নাল অফ সাউথ এশিয়া এন্ড মিডলইস্ট স্টাডিজ (ত্রৈমাসিক) : মার্কিন-পাকিস্তান যোগাযোগ কমিটির পক্ষ থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

০৭. জার্নাল অফ রিলিজন্স (মাসিক) : শিকাগো ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে নিরেট ধর্মীয় বিষয়ে এটি প্রকাশিত হয়। এতে অন্যান্য ধর্মের সাথে খৃস্টবাদের সম্পর্ক ও দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হয়।

০৮. ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স জার্নাল (মাসিক) : আমেরিকার সবচে' বড় খৃস্টান প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একমাত্র খৃস্টবাদ প্রচার-প্রসারের জন্য এটি প্রকাশিত হয়।

০৯. কমেন্টারী : আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা সংকট সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নেতৃবর্গ, সম্পাদক ও ভাষ্যকারদের কলাম নিয়ে এটি ইহুদীদের আন্তর্জাতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়।

১০. মুসলিম ওয়ার্ল্ড : ১৯১১ সাল থেকে এটি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এতে ইসলামী আন্দোলন, সংগঠন, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্ এবং অতীত ও বর্তমানে খৃস্টবাদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এ ছাড়াও ইহুদী এবং খৃস্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে শত শত ম্যাগাজিন ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

গ. টেলিভিশন : জনমত গঠনে টেলিভিশনের ভূমিকা ও গুরুত্ব সর্বশীর্ষে। গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেলিভিশনের পাঁচটি বড় বড় কোম্পানী রয়েছে। যারা শত শত টিভি স্টেশন স্থাপন করে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাদের অনুষ্ঠানমালা শুধু আমেরিকাতেই নয়; বরং সমগ্র বিশ্বে প্রচার করে। এসব টিভি কোম্পানীর মালিকও ইহুদী পুঁজিপতিরা।

পাঁচটি বড় বড় টেলিভিশন কোম্পানী হচ্ছে-:

০১. আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী (এ.বি.সি), মালিক-লেওনার্ড জনসন

০২. ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কোম্পানী (এনবিসি), মালিক-আলফার্ড স্যালোরম্যান

০৩. ক্যাবল নিউজ নেটওয়ার্ক (সি.এন.এন), মালিক-নিউ হাউজ ফ্যামিলী

০৪. কলম্বো ব্রডকাস্টিং কোম্পানী (সি.বি.সি), মালিক-উইলিয়াম বেইলী

০৫. পাবলিক ব্রডকাস্টিং সার্ভিস (পি.বি.এস) মালিক-এক প্রভাবশালী ইহুদী

শেষোক্ত কোম্পানীটি শিক্ষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্কিন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এটির পৃষ্ঠপোষকতা করে। এসব টেলিভিশন কোম্পানী দিনরাত তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে যেভাবে জনমতের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে, তার অনুমান এভাবে করা যায়, এ.বি.এস. কোম্পানী দৈনিক ত্রিশ ঘন্টা, সি.বি.এস. কোম্পানী দৈনিক পঁচিশ ঘন্টা, এন.বি.সি. কোম্পানী দৈনিক বিশ ঘন্টা এবং সি.এন.এন. দৈনিক চব্বিশ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে।

ঘ. রেডিও স্টেশন : টিভি কোম্পানীগুলে যেভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদের অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করে এবং জনগণের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে, ঠিক সেভাবে না হলেও রেডিও স্টেশনগুলো এসব টিভি কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে হাজার হাজার চ্যানেলের মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের শক্তিশালী হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করে।

ঙ. ডাক বিভাগ : মিডিয়ার অন্যান্য বিভাগের মতো ডাক বিভাগও অত্যন্ত সক্রিয়। এর মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালানো হয়। এ ময়দানে ইহুদী লবি অত্যন্ত সক্রিয় ও কর্মতৎপর। কোনো বিশেষ বিষয় কিংবা বিশেষ শিল্পের বিকাশ ঘটানো, নির্বাচনের সময় জনমত গঠন এবং কোনো বিশেষ ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো বিশেষ বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন আদায়ের জন্য ডাক বিভাগের মাধ্যমে কার্ড ও ফরম ফোল্ডার পাঠানো হয়। এভাবে সরাসরি জীবনের বিভিন্ন ময়দানের সাথে সম্পৃক্তদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে উদ্দেশ্য অর্জনে ডাক বিভাগকে ব্যবহার করা হয়।

ইরানী বিপ্লবের পর থেকে পশ্চিমা মিডিয়া ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে ধারাবাহিক এই ধারণা দিয়ে যাচ্ছে, ইসলাম কট্টর পন্থার প্রসার করে। তারা পশ্চিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিপ্লবের জন্য কঠোরতা এবং শক্তির আশ্রয় নেয়।

কোম্পানীর বুলেটিন ও প্রচারপত্র

কোম্পানীর বুলেটিন ও প্রচারপত্রগুলোতে কর্মসংস্থান, শূন্যপদ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন অর্থনৈতিক তথ্যাদি থাকে।

www.pathagar.com

প্রোপাগান্ডা ও বিজ্ঞাপন : কোনো পত্রিকা কিংবা টিভি কোম্পানীর সফলতা ব্যর্থতা নির্ভর করে তার বিজ্ঞাপনের ওপর। সে কতটি বিজ্ঞাপন পায় এবং তার বিজ্ঞাপনে লোক কি পরিমাণ প্রভাবিত হয়। মার্কিন টিভি ও পত্রিকাগুলো কোটি কোটি ডলার শুধু বিজ্ঞাপন থেকেই উপার্জন করে। শুধু ১৯৮২ সালেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং টিভি ও রেডিওতে ৫৫ কোটি ডলারের বিজ্ঞাপন প্রকাশ পেয়েছিল। আর আজ প্রয়োজনের পরিধি অনেক বিস্তৃত। তাহলে এখন প্রতি বছর কি পরিমাণ অর্থমূল্যের বিজ্ঞাপন পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টিভিতে প্রকাশ পায়।

প্রসিদ্ধ মার্কিন পত্রিকাসমূহের প্রচার সংখ্যা

০১. দৈনিক ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল (নিউইয়র্ক), প্রচার সংখ্যা–৭,৭৫,০৮৬।
০২. দৈনিক নিউইয়র্ক ডেইলী নিউজ (নিউইয়র্ক), প্রচার সংখ্যা–৭,৮১,৭৯৬।
০৩. দৈনিক লস এঞ্জেলেস টাইমস (লস এঞ্জেলেস), প্রচার সংখ্যা–১১,৬৪,৩৮৮।
০৪. দৈনিক নিউইয়র্ক টাইমস (নিউইয়র্ক), প্রচার সংখ্যা–১২,০১,৯৭৭।
০৫. দৈনিক শিকাগো ট্রাইবন (শিকাগো), প্রচার সংখ্যা–৭,৩৩,৭৭৫।
০৬. দৈনিক নিউইয়র্ক পোস্ট (নিউইয়র্ক), প্রচার সংখ্যা–৪,৭০,৯৮৭।
০৭. দৈনিক শিকাগো সান টাইমস (শিকাগো), প্রচার সংখ্যা–৫,৩০,৮৫৬।
০৮. দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্ট (ওয়াশিংটন), প্রচার সংখ্যা–৮,৪৬,৬৩৫।
০৯. দৈনিক বোস্টন গ্লোব (বোস্টন), প্রচার সংখ্যা–৫,০৫,৭৪৪।
১০. মাসিক রিডার্স ডাইজেস্ট, প্রচার সংখ্যা–১,৬২,৬৯,৬৩৬।
১১. মাসিক ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, প্রচার সংখ্যা–৯৭,৬৩,৪০৬।
১২. সাপ্তাহিক টাইম, প্রচার সংখ্যা ৪০,৭৩,৫৩০।
১৩. সাপ্তাহিক নিউজউইক, প্রচার সংখ্যা–৩০,২৪,৭৭৭।
১৪. সাপ্তাহিক ইউএস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট, প্রচার সংখ্যা–২২,৩৬,০০৯।

মার্কিন মিডিয়ার ওপর ইহুদী আধিপত্যের দাস্তান

আমেরিকা মহাদেশের ওপর ইহুদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তারিত বিবরণ প্রসিদ্ধ মার্কিন লেখক হেনরী ফোর্ড স্বরচিত 'ইহুদীদের থেকে মানবতার শংকা' নামক গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। এই হেনরী ফোর্ড সে ব্যক্তি, যিনি ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোটর তৈরি শিল্পের বিকাশ ঘটান। তার নির্মিত ফোর্ড মোটর গাড়ী গুণগত মানসম্পন্ন হওয়ার কারণে গোটা বিশ্বে অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। হেনরী ফোর্ড যখন তার কোম্পানীর উন্নতি, অগ্রগতি ও বিকশিত হওয়ার রাস্তায় পদে পদে ইহুদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা বাধাগ্রস্ত ও ধোকা-প্রতারণার সম্মুখীন হতে লাগলেন, তখন অনেকটা বাধ্য হয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ স্কলার ও গবেষকদের সহায়তায় আমেরিকা মহাদেশে ইহুদীদের অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণ-উপকরণ, অর্থনৈতিক পলিসি এবং অ-ইহুদীদের সাথে তাদের আচরণ ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে

www.pathagar.com

বিস্তারিত একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। এ কাজের জন্য তিনি সে সময় বিশ লক্ষ ডলার ব্যয় করেন। প্রতিবেদন তৈরি হওয়ার পর ফোর্ডের কোম্পানীর মুখপত্র 'ডেরবন ইন্ডিপেন্ডেন্ডে' যখনই প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়, সাথে সাথে ইহুদীদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। চতুর্দিক থেকে ফোর্ডের ওপর চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। ইহুদীদের প্রভাবাধীন সংবাদপত্রের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের তুফান সৃষ্টি করা হয়, এমনকি হত্যার হুমকি পর্যন্ত দেয়া হয়। বাধ্য হয়ে ফোর্ড গবেষণামূলক এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা বন্ধ করে দেন, কিন্তু পরে সেই প্রতিবেদন গ্রন্থাকারে বাজারে আসে। এ গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে ইহুদীরা সবগুলো কপি ক্রয় করে বিনষ্ট করে ফেলে। গ্রন্থের যেসব কপি বিভিন্ন লাইব্রেরীতে ছিল, তারা সেগুলোও অতি চতুরতার সাথে চুরি করে বিনষ্ট করে ফেলে, কিন্তু প্রসিদ্ধ মার্কিন সাংবাদিক ও ফোর্ডের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জেরাল্ড কে স্মিথ-এর কাছে এ গ্রন্থের দুটি কপি সংরক্ষিত ছিল, যা ফোর্ড সৌজন্য হিসেবে তাকে দিয়েছিলেন। ফোর্ড তাকে ওসিয়ত করেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর গ্রন্থটি অবশ্যই প্রকাশিত হওয়া উচিত, যাতে আমেরিকা ও বিশ্ব মানবতা ইহুদীদের ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক হতে পারে। এই গ্রন্থ পরবর্তীতে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এর আরবী অনুবাদ 'আল ইহুদী আল আলমী' নামে বৈরুত থেকে ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের ষোলটি কেন্দ্রীয় শিরোনাম থেকে নির্বাচিত কিছু শিরোনাম নিম্নে তুলে ধরা হলো।

০১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীদের আগমনের পটভূমি
০২. ইহুদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তির গোপন অধ্যায়
০৩. ইহুদীরা মজলুম, না জালেম, না স্বৈরাচারী?
০৪. ইহুদীরাও কি একটি জাতি বা গোষ্ঠী?
০৫. জায়নবাদী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের শিক্ষা-দীক্ষার পর্যালোচনা
০৬. ইহুদীরা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিভাবে প্রয়োগ করে?
০৭. মার্কিন রাজনীতিতে ইহুদীদের কর্তৃত্ব
০৮. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীতের সাথে ইহুদী সঙ্গীত
০৯. মার্কিন সমাজে মদ, জুয়া ও চারিত্রিক অধঃপতনের পৃষ্ঠপোষক ইহুদীরা
১০. ধন-সম্পদের ওপর ইহুদীদের কর্তৃত্ব মানবতার জন্য সবচে' বড় বিপদ
১১. মার্কিন মিডিয়ার ওপর ইহুদীদের কর্তত্ব ও আধিপত্য

ফোর্ড মার্কিন সমাজের ওপর ইহুদীদের অসাধারণ থাবা এবং তাদের ব্যাপক প্রভাব-প্রতিপত্তির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, মার্কিন সমাজের যেখানেই নৈতিক অধঃপতন ও ধ্বংস বিশৃংখলা পাওয়া যাবে, তার অন্তরালে ইহুদীদের হাত রয়েছে। মদ, জুয়া, বদকাজ, ঘুষ, যৌন ও আর্থিক ক্রাইম, হত্যা, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস, ডাকাতি, রাহাজানি, জাতি-গোষ্ঠীসমূহের মাঝে রক্তপাত সৃষ্টি, লড়াই যুদ্ধ বাধানো, বিধ্বংসী সমরাস্ত্র নির্মাণ, মোটকথা সকল অনৈতিক ও মানবতাবিরোধী কর্মকান্ডে ইহুদীদের অংশ গ্রহণ শতকরা আশি থেকে নব্বই ভাগ। ফোর্ড মার্কিন চলচ্চিত্র ও সংবাদপত্র শিল্পের পর্যালোচনা

www.pathagar.com

করতে গিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে লেখেন, ১৮৮৫ সালের পূর্বে এ ময়দানের সাথে ইহুদীদের দূরতমও কোনো সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু ইহুদীদের আগমণের সাথে সাথেই চলচ্চিত্র, মিডিয়া ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ওপর তাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। তারা অর্থের সাহায্যে সকল ময়দানে আধিপত্য বিস্তার করে ফেলে। ১৮৮৫ সালের পূর্বে মার্কিন সমাজে নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বদকাজের অস্তিত্ব ছিল অতি নগণ্য। কিন্তু ইহুদী জাতি নাটক, গ্রামোফোন, টেপ রেকর্ডার এবং পরবর্তীতে চলচ্চিত্র ও সংবাদপত্র শিল্পের মাধ্যমে মার্কিন সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ১৮৯৪ সালে যখন এক সমালোচক স্বীয় পত্রিকায় চলচ্চিত্র শিল্পের ওপর ইহুদীদের একচেটিয়া ইজারাদারী এবং নাটক ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নৈতিকতার ধ্বসে অনৈতিকতার বিস্তার ও বিকাশ ঘটানোর ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করেন, তখন ইহুদীরা উত্তেজিত হয়ে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। এই ঘটনায় ইহুদী পুঁজিপতিরা উক্ত পত্রিকায় তাদের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত পত্রিকা মালিক সেই সমালোচককে চাকরি থেকে বিদায় করে ইহুদীদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এরপরই ইহুদীরা আবার সংশ্লিষ্ট পত্রিকাটিতে তাদের বিজ্ঞাপন চালু করে।

একই অবস্থা হয়েছিল সে সময়ের প্রসিদ্ধ দৈনিক নিউইয়র্ক হেরাল্ডের। হেরাল্ডের সম্পাদক জেমস গর্ডন প্রাণপন চেষ্টায় তার পত্রিকাটিকে ইহুদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও চাপ থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সুচতুর প্রতারক ইহুদীরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তার ও তার পত্রিকার মুখ বন্ধ করে দেয়। মালিকের ইন্তেকালের পর পত্রিকাটি ইহুদীদের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের সামনে টিকতে না পেরে বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে একটি মর্মান্তিক কাহিনী রয়েছে।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো, মি. জেমস গর্ডন ইহুদীদের প্রতি বিশেষ কোনো বিদ্বেষ শত্রুতা পোষণ করতেন না। সাধারণ সংবাদপত্রের মতো ইহুদীরা এই পত্রিকাতেও বিজ্ঞাপন দিত। আর একটি পত্রিকার মূল আমদানীই হলো বিজ্ঞাপন। একবার এক প্রভাবশালী ইহুদী পুঁজিপতি অনৈতিক কর্ম ও হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। অপরাধীর নাম উল্লেখ করে এই ঘটনার সংবাদ যখন পত্রিকার রিপোর্টার পত্রিকা সম্পাদকের কাছে পেশ করেন, তখন সম্পাদক পত্রিকার মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, অপরাধীর নাম উল্লেখ করে পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হবে কি না? ঘটনাটি ছাপা না হতেই সংবাদ বিদ্যুৎ গতিতে ইহুদী লবিতে ছড়িয়ে পড়ে। নিউইয়র্কের ইহুদীরা জানতে পারল, সংবাদটি হেরাল্ড পত্রিকায় আগামীকাল ছাপা হবে। আর কি! চতুর্দিক থেকে সম্পাদকের নিকট টেলিফোন আসা শুরু হলো। ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দলও পত্রিকা অফিসে উপস্থিত হয়, যাতে সংবাদটি পত্রিকায় ছাপা না হয়, কিন্তু জেমস তাদের সামনে মাথানত করতে অস্বীকার করেন। সংবাদ ছাপা হলো। দ্বিতীয় দিন থেকে ইহুদীরা লক্ষ লক্ষ ডলারের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়। মি. জেমস হিম্মত হারালেন না। তিনি অ-ইহুদী পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের সাথে যোগাযোগ করে পাঁচ বছর পর্যন্ত তাদের বিজ্ঞাপন জেমসের পত্রিকায় ছাপা হবে মর্মে একা চুক্তিতে উপনীত হন। আমেরিকার অ-ইহুদীরা

www.pathagar.com

এ চুক্তিতে বিরাট খুশি হল। কারণ ইহুদী পুঁজিপতিদের মোকাবেলায় কোনো পত্রিকা তাদের বিজ্ঞাপন তেমন একটা গুরুত্ব দিত না। এ চুক্তির ফলে ইহুদী লবিতে হৈ চৈ পড়ে গেল। ইহুদীরা জোর প্রচেষ্টা চালাল যেন জেমস এই চুক্তি বাতিল করে তাদের থেকে বিজ্ঞাপনের দ্বিগুণ মূল্য নেয়, কিন্তু জেমস এত লোভনীয় অফার সত্ত্বেও তাদের কাছে মাথানত করলেন না। যদিও জেমস এই লড়াইয়ে বিজয় লাভ করেছিলেন, কিন্তু কয়েক বছর পর আমেরিকার এক পুঁজিপতি ইহুদী এ্যাডলফ উচ নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকাটি ক্রয় করে নিয়ে পানির মতো পুঁজি ঢেলে পত্রিকাটিকে একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করেন। যার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল, যে কোনো মূল্যে ইহুদী স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের সেবা করা। ১৯১৯ সালে জেমস ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের পর ইহুদীরা তার পত্রিকাটি ক্রয় করার চেষ্টা করে। এজন্য তারা আবার বিজ্ঞাপন দেয়া বন্ধ করে দেয়, কিন্তু জেমসের ছেলেরা ইহুদীদের কাছে বিক্রয় করার পরিবর্তে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়াই পছন্দ করলেন। এভাবে টাইমস হেরাল্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পরই ইহুদীরা মিডিয়ার ওপর তাদের মজবুত থাবা প্রতিষ্ঠা করে। তাদের চিন্তা ছিল মিডিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেই পুরো বিশ্বে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা সম্ভব।

আমাদের সামনে মার্কিন চলচ্চিত্র সংস্থা, মার্কিন সংবাদ সংস্থা, রেডিও স্টেশন, টিভি কোম্পানী, বিজ্ঞাপনী এজেন্সী, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন সম্পর্কে যে রিপোর্ট রয়েছে তা থেকে জানা যায়, এসব সংস্থার নব্বই শতাংশের ওপর ইহুদীদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব রয়েছে। মিডিয়াতে পুঁজি বিনিয়োগ থেকে শুরু করে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ পর্যন্ত সর্বদিক দিয়ে তাদের আধিপত্য রয়েছে। হলিউড গোটা দুনিয়ায় চলচ্চিত্র নির্মাণের সবচে' বড় প্রতিষ্ঠান। পুরো বিশ্বে এখান থেকেই চলচ্চিত্র রফতানী হয়। এসব চলচ্চিত্রের কথা বাদ দিয়ে তাবৎ সিনেমা কোম্পানীর মালিক ইহুদীরা। উদাহরণস্বরূপ নিম্নবর্ণিত সিনেমা কোম্পানীগুলোর মালিক ইহুদী।

০১. ফোকাস কোম্পানী, মালিক–উইলিয়াম ফোকাস।

০২. গোল্ডেন কোম্পানী, মালিক–স্যামুয়েল গোল্ডেন।

০৩. মেট্রো কোম্পানী, মালিক–মুইস মাইবার।

০৪. ওয়ার্নার ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, মালিক–হারনী ওয়ার্নার।

০৫. পেরামাউন্ট কোম্পানী, মালিক–বড কিন্স

ইহুদীরা এসব কোম্পানীর শুধু মালিকই নয়; বরং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, গীতিকার, সুরকার, সঙ্গীতশিল্পী, ক্যামেরাম্যান ও পরিচালক সকলেই ইহুদী। ইহুদীদের এই একচ্ছত্র ইজারাদারীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১৯৩৮ সালে ইন্ডিপেন্ডেন্ড ক্রিশ্চিয়ান নিউজ পত্রিকার সম্পাদক লেখেন, কারো অংশীদারিত্ব ছাড়াই মার্কিন চলচ্চিত্র শিল্পে একচেটিয়া মালিকানা ইহুদীদের। এই শিল্পে কর্মরত সকলেই হয় ইহুদী, না হয় ইহুদী ফ্যাক্টরীতে তৈরি। এসব ইহুদী মালিকানাধীন চলচ্চিত্র কোম্পানীর চলচ্চিত্র শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই নয়; বরং গোটা বিশ্বেই সাপ্লাই হয়।

www.pathagar.com

ফোর্ড ইহুদীদের অধীনে নির্মিত চলচ্চিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন, চলচ্চিত্রে অভিনয় শিল্প এবং সমাজ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সংকটের চিত্রায়নের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই; বরং এসব সিনেমা দ্বারা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, ষোল থেকে আঠার বছর বয়সী যুবক-যুবতীদের মন-মস্তিষ্ক কিভাবে বরবাদ করা যায়। এ জন্য তারা যৌন চেতনার বিকাশ ও মার্কিন সমাজের চারিত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংসের পেছনে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে। ফোর্ড লেখেন, তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য অধিকতর আর্থিক মুনাফা অর্জন করা, এর পাশাপাশি অ-ইহুদীদের ধ্বংস ও বরবাদীর উপকরণ সরবরাহ করা। ফোর্ড আরো লেখেন, ইহুদী প্রতারকরা তাদের শিল্পকে বিকশিত করার জন্য সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করে। ইহুদীদের চালবাজি হলো, চলচ্চিত্র নির্মাণের পূর্বে তারা প্রসাধনী ও ফ্যাশন সামগ্রী তৈরি করে এগুলো সমাজের বুকে ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা তৈরি করে, যাতে সিনেমার দর্শকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ফ্যাশন ও জীবনপদ্ধতি দেখে মার্কেট থেকে সেসব প্রসাধনী ফ্যাশন সামগ্রী ক্রয় করে। এভাবেই পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক শুধু মার্কিন সমাজই নয়; বরং গোটা মানব সমাজই ইহুদীদের ইশারা-ইঙ্গিতে চলতে বাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে তারা ইহুদী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ফ্যাশন ও জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করাই সময়ের সবচে' বড় দাবী ও চাহিদা মনে করে।

মার্কিন চলচ্চিত্রে কর্মরত প্রসিদ্ধ ইহুদী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কয়েকজনের নাম এখানে প্রদত্ত হলো। অভিনেতাদের মধ্যে মেইল ব্রুকস, উডলি এ্যালেন, বব হোব, জেরলী মোকস, ফ্রাঙ্ক সিনাট্রা, বেইলী ওয়েল্ড, নীল সাইমন, কেরোনিয়ার, লেকি রোনি, জ্যাক লেমন, ক্রেয়ার্ক ডগলাসি, টনি কেরাটসি, গেরলি গ্রান্ট, জ্যাক নিকলস, বিন আযের, ওয়াল্টার মেথার, জর্জ সেগাল, পেয়ার্ট রনিওলাড, জেনহো ক্যাম্পন, জেমস কেইন, অস্টন, হোফম্যান, রিচার্ড হ্যারেস, রিচার্ড বেনজা এবং উডলি স্টাইগার প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর অভিনেত্রীদের মধ্যে এলিজাবেথ টেইলর, আন বেংকার অফ্‌ট, বারবারা স্টাইসেন্ড, মেরি মেকার, সুজান আম্বাক, সেইলি কিলারম্যান, উডমেন কেন্টন, গ্রান্ডম্যান চ্যাপলেন প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আরো কমপক্ষে পঞ্চাশের উর্ধ্বে ইহুদী অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম চলচ্চিত্র জগতে প্রসিদ্ধ আছে।[৬] নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণের পর যখন টেলিভিশন ও তার কোম্পানী অস্তিত্ব লাভ করল, তখন সেখানেও ইহুদী বেনিয়ারা সবচে' অগ্রগামী হয়ে রইল। বর্তমানে আমেরিকার সব টিভি কোম্পানীর ওপর ইহুদীদের একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে। গোটা আমেরিকায় সাতশ' থেকে এগারশ' পর্যন্ত টিভি চ্যানেল রয়েছে, সবই এবিসি, সিবিএস ও সিএনএন এর অধীন। এসব টিভি কোম্পানীর সবগুলোর মালিকই ইহুদী। যেমন– এবিসি টিভি

৬. প্রসিদ্ধ মার্কিন পত্রিকা ইন্ডিপেন্ডেন্ড ক্রিশ্চিয়ান নিউজ ১৯৩০ সালে মার্কিন সিনেমা জগতে ইহুদীদের আধিপত্য সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখেছে, হলিউড নতুন যুগের 'সাদূম'। সাদূম ওই অঞ্চল, প্রকৃতি বিরোধী অনৈতিক কর্মকান্ডের কারণে যা উল্টে দেয়া হয়েছিল এবং উল্টে দেয়ার পূর্বে সেখানে পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল। হলিউড সকল অন্যায়, অনৈতিকতা ও অকল্যাণের কেন্দ্র। গোটা বিশ্বে এখান থেকেই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা ও অপরাধমূলক কর্মকা সুন্দর মোড়কে সুন্দর সুন্দর পরিভাষায় প্রসার করা হচ্ছে। ফলে পুরুষদের পুরুষত্ব ও নারীদের নারীত্ব বিদায় নিচ্ছে। অপরাধী ও বদকার তৈরির এ কারখানা অতি দ্রুত বন্ধ করে দেয়া উচিত।

www.pathagar.com

চ্যানেলের মালিক লিওনার্ড জনসন (ইহুদী), সিবিএস-এর মালিক ইউলিয়া বেলে (ইহুদী), এনবিসির মালিক আলফ্রেড স্যালোরম্যান (ইহুদী), সিএনএন-এর মালিক নিউ হাউস ফ্যামেলী (ইহুদী)।

এসব টিভি কোম্পানী ছাড়াও টিভি সিরিজ নির্মাণ করে সাপ্লাইকারী দু'টি মার্কিন বড় কোম্পানী ক্যানন ও এটিভি'র মালিকও ইহুদী পুঁজিপতিরা। যারা টিভি সিরিজ তৈরি করে গোটা বিশ্বে সাপ্লাই করে থাকে। শুধু মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেই এই কোম্পানী দু'টির বিয়াল্লিশটি ব্রাঞ্চ রয়েছে। এসব ব্রাঞ্চের মাধ্যমে কোম্পানী দু'টি ব্লু ফিল্ম তৈরি করে প্রাইভেট ও সাধারণ সিনেমা হলগুলোতে সরবরাহ করে। যেগুলো আমেরিকা, লন্ডন ও প্যারিসে তৈরি করা হয়।

রেন্ডাম হাউস একটি বিশাল প্রকাশনা কোম্পানী। তার প্রকাশনার গন্ডি শুধু আমেরিকাতেই নয়; বরং তিনটি মহাদেশেই ছড়িয়ে আছে। এমন কোনো গ্রন্থ যা ইহুদীদের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে, তা আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত রেন্ডাম হাউসের অধীনে কাজ করে–কোনো প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অনুমতি না দেবে। প্রসিদ্ধ ফরাসী চিন্তাবিদ জারুদীর বিভিন্ন গ্রন্থ তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে প্রকাশকরা ছাপানোর জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর যখন তিনি ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে গ্রন্থ লেখা শুরু করলেন, তখন অ-ইহুদী প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত তার গ্রন্থ ছাপতে রাজি হয়নি, এমনকি জারুদীর প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের লাইব্রেরীগুলো তাদের প্রতিষ্ঠানে বিক্রি করতে অস্বীকার করে। রেন্ডাম হাউস ছাড়াও ইহুদী মালিকানাধীন আরো দশটি বড় বড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও এডভার্টাইজিং কোম্পানী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টিভি ও সিনেমায় বিজ্ঞাপন তৈরি ও তা প্রচারের কাজ করে। এসব বিজ্ঞাপনের নমুনা আমরা সামনে আলোচনা করব। মার্কিন সংবাদ মাধ্যমের ওপর ইহুদী আধিপত্যের অনুমান আমরা এভাবে করতে পারি, সাম্প্রতিক তথ্যমতে শুধু মার্কিন প্রসিদ্ধ কোম্পানী নিউ হাউস গ্রুপই ৪৮টি মার্কিন দৈনিক ও ২০টি প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিকের মালিক। এছাড়াও সিএনএন-এর মতো প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক টিভি কোম্পানী এবং ১১০টি রেডিও স্টেশনের ওপর নিউ হাউস পরিবারের ইজারাদারী রয়েছে।[৭] প্রসিদ্ধ পত্রিকাসমূহের মধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক পোস্ট, ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল, নিউজউইক, টাইম, বিজনেসউইক, শিকাগো টাইমস, শিকাগো সান টাইমস, নিউইয়র্ক ম্যাগাজিন এবং রিডার ডাইজেস্টের ওপর রবার্ট মারদুখ, উইলিয়াম হেরাস্ট, নিউ হাউস, এডলফ উচ এবং থমসন গ্রুপের মতো ইহুদী পুঁজিপতিদের আধিপত্য রয়েছে। এসব পত্রিকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৯০% ইহুদী। এসব পত্রিকা বিলি করার জন্য গোটা বিশ্বেই

---

৭. টেড টার্নার নিউ হাউস গ্রুপের পক্ষ থেকে ১৯৮০ সালে বিশ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে সিএনএন প্রতিষ্ঠা করেন। পাঁচ বছর কঠিন বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার পরই তার মুনাফা আসা শুরু হয়। বর্তমানে সিএনএন-এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৭টি এবং বহির্বিশ্বে ১৮টি সংবাদ কেন্দ্র রয়েছে। তার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা ১৮০০। গোটা বিশ্বের ১৪২টি দেশের ১৮ মিলিয়ন পরিবার ২৪ ঘন্টা সিএনএন-এর অনুষ্ঠানামালা উপভোগ করে।

www.pathagar.com

১৭৪৫টি এজেন্সী ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তার সবগুলোর ওপর ইহুদীদের কবজা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে গোটা আমেরিকায় ১৪০টি টিভি চ্যানেল ইহুদী মালিকানায় রয়েছে। অপরদিকে ৬৫ মিলিয়নের উর্ধ্বে যেসব মার্কিন দৈনিক বিলি হয়, তার ৬২ মিলিয়নের মালিক ইহুদীরা। অথচ আমেরিকায় ইহুদীদের জনসংখ্যার হার শুধু ২.৯ শতাংশ।

মার্কিন মিডিয়া সম্পর্কে খোদ মার্কিনীদের অভিমত

মার্কিন মিডিয়া সম্পর্কে অধিকাংশ মার্কিনীর অভিমত ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মার্কিন দৈনিক লস এঞ্জেলেস টাইমস-এর এক জনমত জরিপ থেকে জানা যায়। ১৯৯৩ সালে এঞ্জেলেস টাইমসের পক্ষ থেকে এই জরিপ পরিচালনা করা হয়েছিল।

০১. ৪০ শতাংশ মার্কিনীর অভিযোগ, মিডিয়া মালিকরা মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনাই জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে।

০২. ৪৫ শতাংশ মার্কিনীর মন্তব্য হলো, সংবাদপত্র শিরোনাম এবং তার সংবাদের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই।

০৩. ৬৫ শতাংশ মার্কিনীর বক্তব্য হলো, মার্কিন মিডিয়া ধনাঢ্য ও সম্পদশালীদের প্রভাব-প্রতিপত্তির সমর্থন করে, স্বয়ং মার্কিন সরকারও তাদের অন্তর্ভুক্ত।

০৪. ৬৫ শতাংশ মার্কিনীর মন্তব্য হলো, মার্কিন মিডিয়ার সংবাদে ভারসাম্যহীনতা ও পক্ষপাতিত্ব পাওয়া যায়।

০৫. ৪২ শতাংশ মার্কিনীর বক্তব্য হলো, মার্কিন মিডিয়ার বেশির ভাগ সংবাদ মনগড়া বানোয়াট।

০৬. ৬২ শতাংশ মার্কিনীর বক্তব্য হলো, বেশির ভাগ মার্কিন মিডিয়া নগ্নতা অশ্লীলতা প্রসারের কাজে লিপ্ত।

০৭. ৫৩ শতাংশ মার্কিন সংবাদ সি.বি.এস, এন.বি.এস. ও এ.বি.এস থেকে সংগ্রহ করা হয়।

০৮. ১৮ শতাংশ সংবাদ সি.এন.এন. থেকে সংগ্রহ করা হয়, যা ১৯৯৯ সালে ৮৮ শতাংশে উন্নীত হয়। আর ১০ শতাংশ সংবাদ রেডিও এবং ৩০ শতাংশ সংবাদ টিভি থেকে সংগ্রহ করা হয়।

আন্তর্জাতিক ইহুদী সংবাদ মাধ্যম

ইহুদী বুদ্ধিজীবীরা তাদের দ্বাদশতম প্রটোকলে সাহিত্য সাংবাদিকতার ওপর অসাধারণ গুরুত্বারোপ করে দাবী করেছিল, আমাদের সরকারগুলোর প্রচেষ্টা হবে মিডিয়ার ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। যদি অ-ইহুদীরা দশটি পত্রিকা বের করে তাহলে আমরা তার মোকাবেলায় ত্রিশটি পত্রিকা বের করব। লোকদের একথা স্বীকার করতে হবে, আমরা ইহুদীরাই মিডিয়ার একক মালিক। মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা অ-ইহুদীদের এমন জালে আটকে দেব, যার কল্পনাও তারা করতে পারবে না। ইহুদী মিডিয়ার রাজত্ব শুধু

www.pathagar.com

ইউরোপ, আমেরিকা ও ফ্রান্স পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নেই; বরং দুনিয়ার সকল দেশ ও মহাদেশের রাজধানী, প্রসিদ্ধ অ-প্রসিদ্ধ সকল শহরেও তার রাজত্ব কর্তৃত্ব ছড়িয়ে আছে। এটি তাদের ১২তম দস্তাবেজের বাস্তবে রূপ। নিম্নে আমরা গোটা দুনিয়ার ইহুদী সংবাদ মাধ্যমের একটি সংক্ষিপ্ত জরিপ পেশ করছি। এই জরিপ দশ বছর পূর্বে করা হয়েছিল। মিডিয়ার মধ্যে টিভি, রেডিও, সিনেমা ও নাটক বাদ দিয়ে আমরা শুধু নিউজ এজেন্সী, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক ও বার্ষিক পত্র-পত্রিকাগুলোর কথাই আলোচনা করব। এসব পত্র-পত্রিকা ইংরেজি, আরবী, উর্দূ, হিব্রু, ফ্রান্স, জার্মান, পর্তুগাল, স্প্যানিশ, রুশ এবং ইউরোপিয়ান ও আফ্রিকান স্থানীয় ভাষায় বের হয়।

গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সর্বমোট ১,৭৫৬টি দৈনিক এবং ৬৬৮টি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়। মাসিক, পাক্ষিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক ও বার্ষিক পত্র-পত্রিকা এর বাইরে। যেদিকে আমরা ইতোপূর্বে মোটামুটি ইঙ্গিত দিয়েছি। নিউইর্য়ক পোস্ট, শিকাগো সান টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল, ডেইলী নিউজ, সান টাইমস, স্টার লেজার, নিউইর্য়ক টাইমস, এ্যারোজোনা নিউজ, টাইম, নিউজউইক এবং রিডার ডাইজেস্টের মতো দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকাগুলো আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও মর্যাদা রাখে। এগুলো ইংরেজিতে প্রকাশিত এবং গোটা বিশ্বে পঠিত হয়।

নিম্নে আমরা কেবল সেসব দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পত্র-পত্রিকার একটি সংক্ষিপ্ত জরিপ পেশ করব, যেগুলো সরাসরি ইহুদীদের মালিকানা ও তত্ত্বধানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইংরেজি ভাষা ছাড়া সেসব দেশের নিজস্ব ভাষা ও অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত হয়।[৮]

আমেরিকা : নিউজ এজেন্সী–১২টি, দৈনিক–১১টি, সাপ্তাহিক–১১১টি, পাক্ষিক–১১৬টি, মাসিক–১৬০টি, ত্রৈমাসিক–৬০টি এবং ষান্মাসিক ও বার্ষিক–১৪০টি, সর্বমোট–৬১০টি।

অস্ট্রেলিয়া : দৈনিক–২টি, সাপ্তাহিক–৮টি, মাসিক–৩টি, সর্বমোট–১৩টি।

বেলজিয়াম : দৈনিক–৩টি, ত্রৈ-দৈনিক–২টি, সাপ্তাহিক–৪টি এবং মাসিক–৩টি, সর্বমোট–১২টি।

বুলগেরিয়া : দৈনিক–১টি, সাপ্তাহিক–২টি এবং মাসিক–১টি, সর্বমোট–৪টি।

চেকোশ্লেভাকিয়া : দৈনিক–১টি, সাপ্তাহিক–২টি, মাসিক–২টি, সর্বমোট–৫টি।

ডেনমার্ক : দৈনিক–২টি, সাপ্তাহিক–৩টি, মাসিক–৩টি, ষান্মাসিক–২টি ও বার্ষিক–২টি, সর্বমোট–১২টি।

৮. ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, শুধু একটি ইহুদী পরিবার নিউ হাউস ফ্যামিলী গ্রুপই ৪৮টি দৈনিক এবং ২০টি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকার মালিক। যেগুলো উত্তর আমেরিকার ৮৯টি শহর থেকে শুধু স্বদেশী ও হিব্রু ভাষার প্রকাশিত হয়। এর দ্বারাই বিশ্বব্যাপী ইহুদীদের মিডিয়ার শক্তি সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

www.pathagar.com

ফ্রান্স : নিউজ এজেন্সী–৩টি, দৈনিক–৮টি, সাপ্তাহিক–১৪টি, পাক্ষিক–৯টি, মাসিক–২০টি, ত্রৈমাসিক–৪টি, ষান্মাসিক–৮টি ও অনিয়মিত–১৪টি, সর্বমোট–৮০টি ।

হল্যান্ড : দৈনিক–১টি, সাপ্তাহিক–৪টি, মাসিক–২টি, সর্বমোট–৭টি ।

জার্মানী : দৈনিক–২টি, সাপ্তাহিক–৩টি, ত্রৈমাসিক–২টি, মাসিক–৪টি, পাক্ষিক–২টি, সর্বমোট–১৩টি ।

বৃটেন : নিউজ এজেন্সী–৮টি, দৈনিক–১০টি, সাপ্তাহিক–১৮টি, পাক্ষিক–৬টি, মাসিক–১৫টি, দ্বিমাসিক–১২টি, ত্রৈমাসিক–১৬টি, ষান্মাসিক–১৪টি, বার্ষিক–৮টি, সর্বমোট–১০৭টি ।

তুরস্ক : সাপ্তাহিক–৮টি, মাসিক–২টি, সর্বমোট–১০টি ।

গ্রীস : দৈনিক–৩টি, সাপ্তাহিক–২টি, পাক্ষিক–৩টি, মাসিক–২টি, সর্বমোট–১০টি ।

ইটালি : দৈনিক–২টি, সাপ্তাহিক–২টি, পাক্ষিক–২টি, সর্বমোট–৬টি ।

হাঙ্গেরী : দৈনিক–২টি, সাপ্তাহিক–২টি, মাসিক–৪টি, সর্বমোট–৮টি ।

নরওয়ে : দৈনিক–৩টি, সাপ্তাহিক–৪টি, পাক্ষিক–৩টি, মাসিক–৪টি, সর্বমোট–১৪টি ।

পোল্যান্ড : দৈনিক–৩টি, সাপ্তাহিক–৬টি, ত্রৈ-দৈনিক–২টি, মাসিক–৪টি, ত্রৈমাসিক–৬টি, সর্বমোট–২১টি ।

ইরান : মাত্র সাপ্তাহিক–১টি ।

রুমানিয়া : দৈনিক–২টি, সাপ্তাহিক–৪টি, পাক্ষিক–২টি, মাসিক–৩টি, ষান্মাসিক–২টি, সর্বমোট–১৩টি ।

রাশিয়া : দৈনিক–৬টি, সাপ্তাহিক–৮টি, ত্রৈ-দৈনিক–৪টি, সর্বমোট–১৮টি ।

সুইডেন : দৈনিক–২টি, ত্রৈ-দৈনিক–২টি, সাপ্তাহিক–৪টি, মাসিক–৫টি, সর্বমোট–১৩টি ।

সুইজারল্যান্ড : দৈনিক–২টি, সাপ্তাহিক–৪টি, মাসিক–৪টি, ত্রৈমাসিক–৬টি, পাক্ষিক–৪টি, সর্বমোট–২০টি ।

কানাডা : নিউজ এজেন্সী–২টি, দৈনিক–৬টি, সাপ্তাহিক–১৪টি, পাক্ষিক–২টি, মাসিক–১৩টি, সর্বমোট–৩৭টি ।

যুগোশ্লাভিয়া : সাপ্তাহিক–৪টি, মাসিক–২টি, সর্বমোট–৬টি ।

আলজেরিয়া : সাপ্তাহিক–২টি, মাসিক–৩টি, বার্ষিক–৪টি, সর্বমোট–৯টি ।

কেনিয়া : সাপ্তাহিক–২টি, মাসিক–৩টি, সর্বমোট–৫টি ।

মরক্কো : সাপ্তাহিক–২টি, মাসিক–২টি, বার্ষিক–৪টি, সর্বমোট–৮টি ।

www.pathagar.com

দক্ষিণ আফ্রিকা : নিউজ এজেন্সী–২টি, দৈনিক–১টি, সাপ্তাহিক–৮টি, পাক্ষিক–৪টি, মাসিক–২২টি, দ্বিমাসিক–৬টি, অনিয়মিত–৪টি, বার্ষিক–৪টি, সর্বমোট–৫১টি ।

ভারত : পাক্ষিক–১টি, মাসিক–৩টি, সর্বমোট–৪টি ।

ইসরাঈল : নিউজ এজেন্সী–৩টি, দৈনিক–২৮টি, ত্রৈ-দৈনিক–২২টি, সাপ্তাহিক–৮২টি, পাক্ষিক–২৭টি, মাসিক–১১০টি, দ্বিমাসিক–৬টি, ত্রৈমাসিক–৪২টি, অনিয়মিত–৮৮টি, বার্ষিক–৩৪টি, সর্বমোট–৪৪২টি ।

ফিলিপাইন : দৈনিক–২টি, সাপ্তাহিক–২টি, মাসিক–৩টি, ত্রৈমাসিক–২টি, সর্বমোট–৯টি ।

সিংগাপুর : দৈনিক–২টি, সাপ্তাহিক–৪টি, মাসিক–২টি, ত্রৈমাসিক–২টি, সর্বমোট–১০টি ।

নিউজিল্যান্ড : নিউজ এজেন্সী–৪টি, দৈনিক–৮টি, সাপ্তাহিক–১০টি, মাসিক–২২টি, ত্রৈমাসিক–৬টি, সর্বমোট–৫৫টি ।

আমেরিকা ও বৃটেন থেকে যেসব পত্রিকা বের হয় তার বেশির ভাগের ওপরই ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। যেগুলোর ওপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ নেই সেগুলোর ওপর বিজ্ঞাপনের চাপ রয়েছে। দুই বছর পূর্বে ৬০টি মার্কিন দৈনিক বিশ্লেষণ করে যে ফলাফল সামনে আসে তাহলো, ৪৮টি পত্রিকায় দৈনন্দিন সামগ্রিকভাবে তিন থেকে সাত কলাম পর্যন্ত ইহুদী প্রোপাগান্ডার জন্য ওয়াকফ থাকে আর ৮টি দৈনিক ইহুদীদের সম্পর্কে যেকোনো সংবাদ, বিশ্লেষণ, ছবি, সম্পাদকীয়, মন্তব্য, মতামত ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ কোনো কাটছাঁট ছাড়াই প্রকাশ করে। অথচ এগুলো ইহুদীদের প্রত্যক্ষ মালিকানাধীন নয়; বরং তারা ইহুদী বিজ্ঞাপনের চাপে এমনটি করতে বাধ্য হয়। এই হলো সংক্ষিপ্তভাবে এক নজরে আন্তর্জাতিক ইহুদী মিডিয়া ও সংবাদ মাধ্যম।

খৃস্টীয় সমাজ ধ্বংসে ইহুদী মিডিয়ার ভূমিকা

কুরআনুল কারীম ও ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায়, ইহুদীদের আল্লাহ তাআলা অসাধারণ নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন, কিন্তু যখন তারা সেই নিয়ামতের অবমূল্যায়ন করল তখন আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে নেতৃত্বের বাগডোর ছিনিয়ে নিলেন। এই জাতি আল্লাহর প্রেরিত অসংখ্য নবী-রাসূলকে হত্যা করেছে। কিতাবুল্লাহর মধ্যে রদবদল করেছে। কঠিন অপরাধের ফলস্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাদের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত করেন। আর সেসব রোগই ইহুদীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। যেমন কাপুরুষতা, অপরাধপ্রবণ মস্তিষ্ক, পাষাণ হৃদয়, অকৃতজ্ঞতা, মিথ্যা, অপরাধপ্রবণতা, প্রতারণা, সম্পদের পূজা, হারামখোরী, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করা, খেয়ানত, অহংকার, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, সুদখোরী এবং লাঞ্ছনা অপদস্থতা–এগুলো তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত

www.pathagar.com

হয়েছে। এসব কুৎসিত দাগগুলো ধোয়ার জন্য ইহুদীরা প্রথমে খৃস্টানদের, অতঃপর মুসলমানদের, এরপর গোটা মানবতাকে টার্গেট করে।

'তালমূদ' ইহুদীদের একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব। এটি অধ্যয়ন করলে ইহুদীদের মানবতার বিরুদ্ধে শত্রুতা ও প্রকৃতিবিরোধী কর্মকা রে অনুমান হয়। আল্লাহ তাআলা, ফিরিশতা ও নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে ইহুদীদের যেসব আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে, তা লেখতে গেলে মানবতার ললাট ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। যমীন বিদীর্ণ হওয়া ও আসমান ফেটে যাওয়ার আশংকা হয়। আলোচ্য সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে এ সবের আলোচনার কোনো সুযোগ নেই। আর এটা আমার আলোচ্য বিষয়ও নয়। আমি তো শুধু সংক্ষেপে এদিকে ইঙ্গিত করব যে, পশ্চিমা কিংবা খৃস্টীয় সমাজের ধ্বংস এবং বরবাদীর কারণ ও উপকরণ কি? এক্ষেত্রে ইহুদীদের কি পরিমাণ সফলতা অর্জিত হয়েছে, আর এই বরবাদী ও ধ্বংসকারিতার প্রভাব ইসলামী সমাজে কি পরিমাণ পড়েছে এবং কি ভয়াবহ ফলাফল সামনে এসেছে?

খৃস্টানদের সম্পর্কে ইহুদীদের আকীদা ও সংকল্প

খৃস্টান ধর্ম যত প্রাচীন, খৃস্টানদের সাথে ইহুদীদের দ্বন্দ্ব-শত্রুতাও তত প্রাচীন। ইহুদীদের ওপর এই অপবাদ আরোপ করা হতে থাকে যে, তারাই হযরত ঈসা (আ.)-কে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। ইহুদীদের সীমাহীন চাপের মুখে তাদের ললাটে সেঁটে থাকা এই কুৎসিত দাগ বিশ শতকের ষাটের দশকে রোমের পোপ চিরতরে ধুয়ে মুছে দেবার ঘোষণা দেন এবং তাদের এই অপরাধ থেকে বেকসুর খালাস দেন। খৃস্টজগত ইহুদীদের কুৎসিত দাগ ধুয়ে মুছে দেবার ঘোষণা দিলেও কিন্তু খৃস্টানদের সম্পর্কে ইহুদীদের আকীদা-বিশ্বাস সেভাবেই রয়ে গেছে, যা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। আর সেগুলো বাস্তবায়নকে তারা নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে রেখেছে। ইহুদীদের তালমূদ গ্রন্থ থেকে খৃস্টানদের সম্পর্কে ইহুদীদের আকীদা-বিশ্বাসের নির্বাচিত কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

০১. প্রত্যেক ইহুদীর অবশ্য কর্তব্য হলো, তারা দিনে কমপক্ষে তিন বার খৃস্টানদের অভিশাপ দেবে। এই প্রার্থনা করবে, হে আল্লাহ! খৃস্টানদের নিস্তনাবুদ করে দাও।

০২. খৃস্টানদের হত্যা করা প্রত্যেক ইহুদীর মৌলিক কর্তব্য। যদি তারা খৃস্টানদের হত্যা করতে না পারে, তাহলে তাদের হত্যার উপকরণ, কমপক্ষে ধ্বংসের উপকরণ সরবরাহ করবে।

০৩. খৃস্টানদের হত্যা করা ইহুদীদের একটি মৌলিক দায়িত্ব, যার বাস্তবায়ন প্রত্যেক ইহুদীর অত্যাবশ্যক কর্তব্য।

০৪. খৃস্টানদের হত্যা করা ইহুদীদের একটি অন্যতম কীর্তি, যে কীর্তির বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা হত্যাকারীকে ভরপুর প্রতিদান দেবেন।

www.pathagar.com

০৫. খৃস্টানরা ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। যদি তারা ইহুদী ধর্ম গ্রহণ না করে তাহলে তারা আল্লাহ ও ইহুদীদের শত্রু।

০৬. খৃস্টানদের সাথে কৃত চুক্তি পালন করা ইহুদীদের জন্য মোটেই জরুরী নয়।

০৭. খৃস্টানদের গির্জা অপবিত্রতার কেন্দ্র। আর গির্জার মুখপাত্ররা ঘেউ ঘেউকারী কুত্তার ন্যায়।

০৮. ইহুদীদের উচিত তারা খৃস্টানদের সাথে বিবেকশূন্য, নির্বোধ এবং নিকৃষ্ট জানোয়ারের মতো আচরণ করবে।

০৯. খৃস্টানদের গির্জা ঘর পথভ্রষ্টতার কেন্দ্র এবং মূর্তিপূজার আড্ডা। তাদের ধ্বংস করা প্রত্যেক ইহুদীর মৌলিক দায়িত্ব।

১০. ইহুদীদের জন্য মিথ্যা শপথ করা ও মিথা সাক্ষ্য দেয়া জায়েয, যাতে তারা অ-ইহুদীদের ক্ষতি করতে পারে।

১১. ইহুদীরা আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত জাতি আর অ-ইহুদীরা জানোয়ারের থেকেও নিকৃষ্ট।

১২. আমাদের ইহুদীদের আল্লাহ তাআলা খেদমতের জন্য দু'ধরনের জানোয়ার দান করেছেন। এক প্রকার হল গাধা, কুকুর, শূকর ও বিভিন্ন প্রকারের পাখি, অপরটি হল খৃস্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ।

১৩. মানুষ ও জানোয়ারের মধ্যে যে পার্থক্য ইহুদী আর অ-ইহুদীদের মাঝে সেই পার্থক্য। অ-ইহুদীরা কুকুর শূকর থেকেও নিকৃষ্ট। ইহুদীদের সামনে যদি ক্ষুধার্ত কুকুর আর অ-ইহুদী বসে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে কুকুর উত্তম।

আলোচ্য বিষয়গুলো হলো ইহুদীদের আকীদা-বিশ্বাসের সার-সংক্ষেপ, যা খৃস্টানদের সম্পর্কে তারা পোষণ করে থাকে। এসব আকীদা-বিশ্বাস বাস্তবায়ন করা ইহুদীদের মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, যাতে একদিকে তাদের কুৎসিত অবয়ব ও অপরাধমূলক কর্মকা র ওপর পর্দা পড়ে, অপরদিকে গোটা মানবতা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায়। এ ক্ষেত্রে তারা প্রথম টার্গেট বানিয়েছে খৃস্টানদের। ইঞ্জিলে রদবদল করা, খৃস্ট ধর্মের পুরো কাঠামো পরিবর্তন করে ফেলা এবং খৃস্টজগতের গতি বিপরীতমুখে ফিরিয়ে দেবার কীর্তি ইহুদীরাই আঞ্জাম দিয়েছিল। ইসলামের আগমণ খৃষ্টানদের অনেকটা ধর্মের দিকে ধাবিত করেছিল। ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে বিকৃত খৃস্ট ধর্মের পরাজয়ে খৃস্টীয় সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল ডারউইন ও ফ্রয়েড সেটুকু সম্পন্ন করে দেয়। কাল মার্কস খৃস্টীয় তাবুতে (কফিন) সর্বশেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে। এই তিন ইহুদী প্রতারকের চিন্তা-চেতনা ও দর্শনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকেই ইহুদী মিডিয়া নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে। ইহুদীরা খৃস্ট সমাজকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য যেসব উপায়-উপকরণ কাজে লাগিয়েছে, তার মধ্যে সাহিত্য, চলচ্চিত্র, নাটক, শিক্ষা-দীক্ষা, সংবাদ মাধ্যম এবং পরবর্তীতে ইলেকট্রিক মিডিয়া উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বৃটেনের উর্বর ভুমিকে ইহুদীরা তাদের কর্মতৎপরতার কেন্দ্রভুমি বানিয়েছে। তারা অতি পরিকল্পিতভাবে নাটক, গান ও অশ্লীল উপন্যাসের মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের ওপর আগ্রাসন চালিয়েছে এবং তাদের পথভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে। পশ্চিমা নাটক বিশ্লেষণ করলে জানা যায়, এ বিশ্ব ভূ-খন্ড ও তাতে বিদ্যমান মানব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি অনর্থক। পৃথিবী ও মানবের মাঝে যৌক্তিক কোনো সম্পর্ক ও যোগাযোগ নেই। আর না এই সৃষ্টির কোনো স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক আছে। প্রসিদ্ধ নাট্যকার টি উইলিয়ামস তার নাটকসমূহে প্রকাশ্যে নতুন যুগের বিভিন্ন রোগ ও দৈহিক সমস্যা দূর করার জন্য স্বাধীন যৌন সম্পর্কের আহবান জানিয়েছেন। তিনি লেখেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মাঝে স্বাধীন যৌন সম্পর্কের সুযোগ সৃষ্টি না হবে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতায় পৌছতে পারবে না। টি. উইলিয়ামস তার প্রসিদ্ধ নাটকে লেখেন, স্বাধীনভাবে যৌন পিপাসা ও প্রবৃত্তির চাহিদা নিবারণের মাধ্যমেই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর ও সুখকর হতে পারে। ব্যক্তি ও সমাজের স্বাধীনতার উদ্দ্যেশই যৌন স্বাধীনতা। এটাই আমাদের নাটকের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। এমনিভাবে আরেক প্রসিদ্ধ নাট্যকার জন ওয়েটিং 'শয়তান' নামক এক নাটকে রাজনৈতিক উত্থান, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সম্পদ-প্রাচুর্য, সমরাস্ত্র ও স্বাধীন যৌন সম্পর্ক সফল জীবনের জন্য আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন। প্রসিদ্ধ বৃটিশ নাট্যকার গোলেজ কুপার তার এক নাটকে সমাজে ইজ্জত, সম্মান, অর্থ-বিত্ত, যশ-খ্যাতি ও জীবন মান উন্নত করার জন্য অনৈতিক কুকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার জোরদার ওকালতি করেছেন এবং একে দর্শন বানিয়ে জ্ঞানগত ও মনস্তাত্ত্বিক দলীল-প্রমাণের আলোকে উপস্থাপন করেছেন। অন্যান্য পশ্চিমা নাট্যকার যেমন আলবেরকামী, স্লাক্রো, বারোল্ড পেন্টার, আর্থার এডামস, ইউজে অনীল মানব মস্তিষ্কে স্রষ্টা সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় এবং মানুষ সম্পর্কে হতাশা, নিরাশা ও ব্যর্থতার অনুভূতি সৃষ্টি করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

মার্কিন সমাজে এ ধরনের নাটক মঞ্চস্থকারী অভিনেতা-অভিনেত্রী ও তারকা-শিল্পীদের প্রায় সকলেই ইহুদী। হেনরী ফোর্ডের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাটক ও চলচ্চিত্র শিল্পের ওপর ইহুদীদের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ঘন্টার পর ঘন্টা যখন মার্কিন নওজোয়ানরা যৌন উত্তেজক দৃশ্য, গান, নগ্ন শরীরের নৃত্য, চিত্তহারী ড্যান্স, ছলনাময়ী অঙ্গভঙ্গি এবং নাইট ক্লাবে নগ্ন নাচ-গান প্রত্যক্ষ করে, তখন তাদের শরীরে আগুন লেগে যায়। তারা জানোয়ারের মতো মদের বোতল হাতে অলিতে গলিতে নারীদের পেছনে ছুটতে থাকে। সংবাদ মাধ্যম, উপন্যাস ও বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে এ কাজে তাদের আরো বেশি করে উদ্বুদ্ধ করা হয়। যখন এসব নাটক ও চলচ্চিত্রের চাহিদা ফ্রান্স, বৃটেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে আসতে লাগল, তখন সুচতুর ইহুদীরা বাণিজ্যিক উদ্দেশে এসব নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয়কারীদের প্রস্তুত করে সেসব দেশে পাঠানো শুরু করে। একই অবস্থা চলচ্চিত্র অঙ্গনের। অশ্লীল গান-বাজনার সয়লাব ভালো ভালো ঘরকে প্রভাবিত

www.pathagar.com

করে। হেনরী ফোর্ডের বক্তব্য অনুযায়ী মার্কিনসমাজ ব্যবস্থা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা অবশিষ্ট চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধ, সাধারণ ধর্মীয় অনুভূতি, সামাজিক বন্ধন ও গির্জার নিয়ন্ত্রণ নির্মূল করে দেয়। কোনো বিবেকবান মানুষ যদি ইহুদীদের এই অনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিবাদ বা সমালোচনা করার সাহস দেখায় তাহলে মিডিয়ার শক্তি দিয়ে তাকে সমাজে সম্পূর্ণ কোণঠাঁসা করে তার বিবেকের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়।

মার্কিন নাটকের প্রসিদ্ধ সমালোচক বেরিসন গীরি ১৮৯৭ সালে স্বরচিত গ্রন্থ 'ড্রামেটিক মিরর'-এ মার্কিন নাটকের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো, মার্কিন নাটকের ওপর সেই গোষ্ঠী থাবা বিস্তার করে আছে, যাদের জন্ম ও লালন-পালন সঠিক পদ্ধতিতে হয়নি। যাদের জাতীয় ইতিহাস লাঞ্ছনা-গঞ্জনায়, অপমান-অপদস্থতায় ভরপুর। এই গোষ্ঠী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ী ও ইজ্জত বিক্রিকারী। এরা উন্নত শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্যের রুচিবোধ এবং সজীব চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। যেসব লোক বর্তমানে নাটক-ড্রামার ওপর ইজারাদারী প্রতিষ্ঠা করে আছে, তারা এই শিল্পে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর যোগ্যও নয়। তাদের গোটা ইতিহাস লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর অপমান-অপদস্থতার ইতিহাস। অধিকাংশ অবস্থায় তাদের জীবনটাই অপরাধপ্রবণ। ফলে নাটকেও তাদের অভিনয়, কর্মকা অপরাধপ্রবণ, যা অবিকল তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিবিম্ব।

একজন খৃস্টান লেখকের কলম দিয়ে এ ধরনের সমালোচনা পুরো ইহুদী সংবাদ মাধ্যমে ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়। এই সমালোচনার পর ইহুদী পুঁজিপতিরা একদিকে নাট্যাঙ্গনের ওপর পূর্ণ ইজারাদারী প্রতিষ্ঠা করে নেয়, অপরদিকে ইহুদী মিডিয়ার সমালোচকের বিরুদ্ধে তুফান দাঁড় করিয়ে দেয়। ইহুদী সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো মি. বেরিসনের গ্রন্থ 'ড্রামেটিক মিরর' নিজেদের প্রতিষ্ঠানে রাখতে অস্বীকৃতি জানায়। নাটক নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রতিষ্ঠানে এই সমালোচকের গ্রন্থের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অপরদিকে ইহুদীরা সমালোচকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে যে, তার সমালোচনায় তাদের নাটকের ওপর প্রভাব পড়েছে। আদালত সমালোচকের দশ লাখ টাকা জরিমানা করে। এই ঘটনার পর তারা নাকট, চলচ্চিত্র ও সাহিত্য সমালোচকদের অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে তাদের মুখ বন্ধ করে দেয় এবং তাদের সকল লেখাকে ইহুদী সংবাদপত্রে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
মিডিয়ার ভূমিকার ব্যাপারে ইহুদীদের সংকল্প

মিডিয়ার ভূমিকা

০১. বর্তমান যুগে মিডিয়ার ভূমিকা কি? মিডিয়া হয় সেসব চেতনাকে উত্তেজিত করে, যা আমাদের উদ্দেশ্য অর্জনে জরুরী কিংবা অন্য জাতিগোষ্ঠীর স্বার্থসর্বস্ব উদ্দেশ্যের সেবা করে।

০২. আমাদের অনুমতি ছাড়া কোনো সংবাদ সর্বসাধারণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। আজকালও এ উদ্দেশ্য এভাবেই অর্জিত হয়ে চলেছে, যেহেতু সবধরনের সংবাদ সংবাদ সংস্থাগুলোর মাধ্যমেই অর্জিত হয় এবং দুনিয়ার সকল সংবাদ সংবাদ সংস্থার অফিসেই জমা হয়। যখন সংবাদ সংস্থাগুলো আমাদের মালিকানা ও কর্তত্বে থাকবে তখন কেবল সেসব সংবাদই প্রকাশিত হবে যেগুলোর আমরা নির্দেশ দেব।

০৩. সাহিত্য সাংবাদিকতা সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এর মাধ্যমে যত সহজে মানুষের মগজ ধোলাই করা যায়, অন্য মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। এ জন্য বেশির ভাগ সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন আমরা আমাদের মালিকানায় ও আয়ত্তে রাখব। এসব প্রচার মাধ্যম ব্যক্তিমালিকানার প্রেসের নেতিবাচক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নির্মূল ও জনমতের ওপর প্রভাব সৃষ্টিতে এক শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে আমাদের হাতে থাকবে। জনসাধারণকে যদি আমরা দশটি ম্যাগাজিন চালু করার অনুমতি দেই তাহলে আমাদের লোকদের ক্ষেত্রে এ অনুমতি থাকবে ত্রিশটির। যত ম্যাগাজিনই আমরা ছাপব তার হার থাকবে এটাই। তবে জনসাধারণকে সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে পড়তে দেয়া যাবে না। জনসাধারণের দৃষ্টিতে আমাদের বিশ্বস্ততা নির্ভরযোগ্যতা বহাল ও অটুট রাখার জন্য আমরা যেসব সংবাদপত্র প্রকাশ করব তা বহ্যিক দৃষ্টিতে আমাদের বিরোধী হবে। এভাবে আমাদের বিরোধীরাও কোনো সংশয় ছাড়াই আমাদের অনুসারী হয়ে যাবে।

প্রথম সারির ম্যাগাজিন ও সংবাদ পত্রগুলো হবে সরকারী ধরনের, যেগুলো আমাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। তাই এগুলোর প্রভাব-প্রতিক্রিয়াও তুলনামূলক কম হবে। দ্বিতীয় সারির পত্রিকাগুলো হবে আধা-সরকারী ধরনের, যেগুলোর কাজ নিরপেক্ষ লোকদের দৃষ্টি নিজের দিকে নিবদ্ধ করা। তৃতীয় সারির সংবাদপত্রগুলো আমরা আমাদের বিরোধিতা করার জন্যই চালু করব। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারা সম্পূর্ণরূপে আমাদের কর্মকৌশলের কঠোর বিরোধিতা করবে। এতে করে আমাদের চিরশত্রুরা এসব সংবাদপত্রের এ কৃত্রিম বিরোধিতাকে নিজেদের হৃদয়ের আওয়াজ মনে করে

www.pathagar.com

র মনের কথা খুলে বলবে। আমাদের এসব সংবাদপত্র হবে হিন্দুদের দেবতা ঞুর মত, যার শত শত হাত থাকে। প্রয়োজনমতো প্রতিটি হাতের প্রতিটি আঙ্গুল জনমতের এক একটি বিভাগের ওপর রাখা থাকবে। যখনই ধমনীর গতিবেগ দ্রুত হবে তখনই এ হাত জনমতের রোখ আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিকে ফিরিয়ে দেবে। আমাদের বিরোধীদের নিকট যেহেতু সংবাদপত্র থাকবে না, যার মাধ্যমে তারা তাদের চেতনা ও মতামত পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে, সেহেতু আমরা সংবাদপত্রকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে বিজয় অর্জন করব। (জায়নিষ্ট প্রটোকলের নির্বাচিত অংশ)

মিডিয়ার সংজ্ঞা

মিডিয়া মানে গণমাধ্যম। বই পুস্তক, পত্র পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা সবই গণমাধ্যম। অন্য কথায় যা অবলম্বন করে কোনো তথ্য, ধারণা, শিক্ষা, বিনোদন ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছানো যায়, তা-ই মিডিয়া। মিডিয়া প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে অন্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং তার চাল-চলন পরিবর্তন করা যায়। প্রোপাগান্ডার মধ্যে নির্ধারিত চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা এমনভাবে প্রসার করা হয়, যা দ্বারা অন্যের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, চাল-চলন ও আচার-আচরণ প্রভাবিত হয়।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে প্রোপাগান্ডা চালানো হয় তার মাধ্যমে কোনো বিশেষ সরকারের পলিসি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে কোনো প্রতিষ্ঠান, সরকার ও দেশের নাগরিক পর্যন্ত স্থানান্তর করা হয়, কিন্তু প্রোপাগান্ডার কাজ যারা করে তাদের জাতীয়তা কী, সে দিকে দৃষ্টি দেয়া হয় না।

মিডিয়া বিশেষজ্ঞগণ এ বাস্তবতা অবশ্যই স্বীকার করেন যে, সরকারের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও বিন্যাসে মিডিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। মিডিয়া ছাড়াও যেসব মাধ্যম পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে তার মধ্যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ভৌগোলিক অবস্থান, জনবসতি, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির পাশাপাশি দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাবও শামিল রয়েছে। তেমনিভাবে সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা যোগ্যতাও এ ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। অতঃপর পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের মোক্ষম মাধ্যম মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থা সামনে রেখে এমন প্রোপাগান্ডা চালানো হয়, যাতে অবাস্তব ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, বাতিল আকীদা এবং দৃষ্টিভঙ্গি অন্যের হৃদয় ও মন-মস্তিষ্কে ভালভাবে প্রোথিত করে দেয়া হয়। অতঃপর তাদের থেকে সে সময় কাজ নেয়া হয় যখন কোনো বিপদ বিপর্যয় দেখা দেয় এবং এ সময় সে দেশের সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শক্তি, জনমতের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, বৈশিষ্ট্য, প্রোপাগান্ডার উপকরণ ও মাধ্যম সব মিলিয়ে একে অপরকে প্রভাবিত করে। এর ফল দাঁড়ায়, পরিস্থিতি সম্পর্কে আরো অধিক অনুসন্ধান তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। আর এ সময়েই ব্যক্তি ও দলের মন মস্তিষ্ক তৈরি ও তার ওপর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব জানা যায়। কারণ বিপর্যয়ের অবস্থায় শিক্ষিত শ্রেণীর মানসিক ও মেধাগত অনুভূতি বৃদ্ধি পায়। এ সময় সে প্রোপাগান্ডার আশ্রয় নিতে বাধ্য

www.pathagar.com

হয়। এভাবে প্রোপাগান্ডার সফলতায় সর্বোত্তম জাতীয় ও অর্থনৈতিক শক্তি এবং কর্মতৎপর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা একে অপরের সাথে শিকলের ন্যায় জুড়ে থাকে। এটাও এক বাস্তবতা যে, প্রোপাগান্ডার সফলতা বিফলতা নির্ভর করে প্রোপাগান্ডাকারী ও প্রোপাগান্ডার পরিকল্পনাকারী মেধা মননের যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রতিভার ওপর। প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুতা ও ঘৃণার অগ্নি তেজ করা, বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব বাকী রাখা, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করা এবং শত্রুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে নির্মূল করা, এসব কিছু নির্ভর করে প্রোপাগান্ডার পরিকল্পনা তৈরি, রাজনৈতিক ও জাতীয় উদ্দেশ্যের সাথে তার সমন্বয় সংযোগ সাধন, প্রোপাগান্ডা বাস্তবায়নের ধরন ও তার ধারাবাহিকতা রক্ষ করা এবং ভবিষ্যতে নতুন পরিকল্পনা তৈরি ইত্যাদির ওপর। প্রোপাগান্ডাকে সফল বানানোর জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক দল, নেতৃবর্গ, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, জনগণের সাথে সম্পর্ক সংযোগ এবং সংশ্লিষ্ট দেশের প্রভাবশালী ও প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা জরুরী।

পশ্চিমা মিডিয়ার পলিসি

আলোচ্য ভূমিকার পর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের মাঝে সম্পর্ক সহযোগিতার ক্ষেত্রে পশ্চিমা মিডিয়ার ভূমিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়, তাদের মৌলিক পলিসি সম্পূর্ণ তাদের জাতীয় স্বার্থের অধীন। যে কোনো সংবাদ, তা যতই নগণ্য কিংবা গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, এমনকি কোনো ছবি এবং কার্টুন পর্যন্ত পশ্চিমা মিডিয়ার মালিকদের ধর্মীয় ও জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধি হয়।

যখন থেকে ইহুদীরা মিডিয়াকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ সাব্যস্ত করেছে এবং তার ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে, তখন থেকে একতরফা ট্রাফিক নীতির ভিত্তিতে ইহুদী চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাস গোটা বিশ্বে প্রসার করা হচ্ছে। অন্য ভাষায় আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, বর্তমান বিশ্বে ৯৫% মিডিয়ার ওপর ইহুদীদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এর মাধ্যমে তারা গোটা দুনিয়ার মন মস্তিষ্ক গঠন ও মগজ ধোলাইয়ের কাজ করছে। যে দিকে তাদের ইচ্ছা জনমত সে দিকেই মোড় নেয়। ইহুদীদের পছন্দই গোটা দুনিয়ার পছন্দ, তাদের রুচিই গোটা বিশ্বের রুচি। যাদের তারা অপছন্দ ও ঘৃণা করে এবং টার্গেট বানায়, গোটা দুনিয়া তাদের ঘৃণা ও অপছন্দ করে এবং তাদের অস্তিত্ব নির্মূল করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করে। ইহুদী মস্তিষ্ক থেকে বের হওয়া ধ্যান-ধারণা চিন্তা-চেতনার সম্পর্ক তাহযীব-তামাদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে হোক কিংবা রাজনীতি, অর্থনীতি ও জীবন মানের সাথে হোক কিংবা ফ্যাশন ও লেবাস পোশাকের চাকচিক্যের সাথে হোক, এক কথায় তার সম্পর্ক যে কোনো কিছুর সাথে হোক না কেন, গোটা সভ্য পৃথিবী তার পেছনে উন্মাদের মতো ঝুঁকে পড়ে এবং তার ওপর আমল করা নিজেদের দীন ও ঈমান মনে করে। কেন এই অবস্থা? সহজ কথায় এর উত্তর হলো, মিডিয়া ও অর্থনীতির মতো দু'টি মজবুত শক্তিশালী স্তম্ভের ওপর ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের সুদৃঢ় ইমারত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

www.pathagar.com

পশ্চিমা নিউজ এজেন্সীগুলোর রিপোর্টিং পদ্ধতি

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের মাঝে বোঝাপড়া, যোগাযোগ ও সম্পর্ক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার ভূমিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়, এ ক্ষেত্রে পশ্চিমা নিউজ এজেন্সীগুলোর দাবী হলো, তাদের সংবাদ ও রিপোর্টিং সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ নিরপেক্ষ পলিসির ওপর নির্ভরশীল,[১] কিন্তু এতদসত্ত্বেও পশ্চিমা নিউজ এজেন্সীগুলো সাধারণতঃ অবস্থা, পরিবেশ, পরিস্থিতি, ঘটনা ও বাস্তবতাকে বিকৃত করে উপস্থাপন করে, অথবা সুন্দর, চিত্তাকর্ষক, হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে উপস্থাপন করে। সাধারণভাবে উন্নয়নশীল দেশের সাথে এবং বিশেষভাবে ইসলামী বিশ্বের সাথে সহযোগিতার পরিবর্তে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে, যার দ্বারা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ও অনৈক্য আরো বিস্তার লাভ করে। সেসব দেশের অতি তুচ্ছ দুর্বলতার ছাইচাপা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও গোপন অনৈক্যগুলো এমন বাড়িয়ে-চাড়িয়ে উপস্থাপন করে, মনে হয় এটাই সে দেশের মৌলিক সমস্যা। জাতীয় ব্যক্তিত্ব, নিষ্কলুষ নেতৃবৃন্দ এবং উন্নত চরিত্রের পথপ্রদর্শকদের চরিত্র হননের কাজও থেমে থেমে চলতে থাকে।

পশ্চিমা দেশের নীতিনির্ধারকরা তাদের ষড়যন্ত্রপূর্ণ পরিকল্পনা সর্বদিক দিয়ে প্রস্তুত করে নিউজ এজেন্সীগুলোর কাছে পেশ করে। অতঃপর এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত এজেন্সীগুলো সেই পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ, কূটনীতিক ও সাংবাদিকদের দিয়ে সেই পরিকল্পনা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করানো হয়। সেই পরিকল্পনার সমর্থনে পতিত কিছু লোককে ফুটপাত থেকে ধরে এনে সমাজ কর্মী এবং ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও জাতীয় প্রতিনিধি বানিয়ে তাদের সাক্ষাতকার ও বিবৃতি নেয়া হয়। এভাবে ধীরে ধীরে সেই পরিকল্পনার প্রতি এক বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত জনমত সৃষ্টি হয়ে যায়, যার প্রতিক্রিয়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা যায়। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে সে পরিকল্পনার পরবর্তী অংশ বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। এ স্তরকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে অগ্রসর করানো হয়। এই স্তরে আশংকা, সম্ভাবনা এবং কখনো সুস্পষ্টভাবে বিদ্রোহ, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও সশস্ত্র আন্দোলনের আহবানও জানানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও তার সাথে কারো কোনো বিরোধ নেই, কিন্তু দৃঢ় সম্ভাবনা আছে, অমুক অমুক ব্যক্তি তার বিরোধিতা করতে পারে। কারণ জনসাধারণের মাঝে তার অবস্থান শক্তিশালী। যুদ্ধের সম্ভাবনা তো নেই, কিন্তু গেরিলা যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার সংশয় বেড়ে গেছে। কারণ ভৌগোলিক অবস্থা এ ধরনের যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বর্তমানে তার সরকারের কোনো সংকট নেই, কিন্তু পরবর্তীতে মুসলিম ব্রাদারহুডের পক্ষ থেকে সংকট সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। এজন্য

---

১. মার্কিন সংবাদ সংস্থা এ.এফ.পি. (এসোসিয়েটেড অব ফ্রান্স প্রেস)–এর গঠনতন্ত্রে উল্লেখ আছে, এজেন্সী সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পলিসি গ্রহণ করবে। কোনো বিশেষ দল কিংবা সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মের সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। অর্থনৈতিক দিক থেকে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে এবং খরিদ্দারদের চাঁদার ওপরই তার আমদানী নির্ভর করবে। এটা তো এজেন্সীর গঠনতন্ত্রের কথা, কিন্তু এজেন্সীর মালিক মোখতার ইহুদী পুঁজিপতিদের নিকট নিরপেক্ষতার কি প্রত্যাশা আছে? এটা একটা কল্পনা ও উন্মাদনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

সরকারের উচিত এখনই ধর্মীয় দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। এই বিস্ফোরণ কে ঘটিয়েছে? তৎক্ষণাত তো বিষয়টি জানা যায়নি, কিন্তু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এ বিস্ফোরণের পেছনে কট্টরপন্থীদের হাত থাকতে পারে। কারণ কিছু দিন ধরে এই গোষ্ঠী মসজিদে মসজিদে সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছে।

বিদেশী পর্যটকদের ওপর যে হামলা হয়েছে যদিও তৎক্ষণাত হামলাকারী শনাক্ত করা যায়নি, কিন্তু আমাদের কূটনৈতিক সংবাদদাতা সরকারী ও স্বাধীন সূত্রে আমাদেরকে এই সংবাদ দিয়েছে, এর পেছনে ইসলামী সংগঠনের হাত রয়েছে। এরাই সেই মৌলবাদী, যাদের নারীরা পর্দা করে। এসব লোক মার্কিন ও ইউরোপিয়ান পর্যটকদের আগমনকে দীনী দিক দিয়ে হারাম মনে করে।[২]

---

২. পশ্চিমা দেশগুলো ইসলামী বিশ্বের ওপর সামরিক হামলার পরিবর্তে মিডিয়াকে অস্ত্রের মর্যাদা দিয়েছে। এই মিডিয়াকে তারা এমন সামরিক দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করে যে, ঘরে বসেই বিশেষ করে ইসলামী বিশ্বে এবং সাধারণভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনগণ ও সরকারকে প্রতিপক্ষ হিসেবে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সৃষ্টি করায়। ইসলামী বিশ্বের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে উল্লিখিত কৌশলের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ আরব বিশ্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনৈক্য, গৃহযুদ্ধ ও ভ্রাতৃ হত্যার জন্য মিসর, সিরিয়া, ইরাক, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়াতে সামরিক বিপ্লব ঘটানো হয়েছে। মিশর, সিরিয়া ও ইরাকে মুসলিম ব্রাদারহুডের সুগভীর প্রভাব নির্মূল করার জন্য ব্রাদারহুডের নামেই রেডিও স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। যেখান থেকে ব্রাদারহুডের দীনী প্রোগ্রামগুলো সম্প্রচার করা হতো, আবার সেই স্টেশন থেকেই আরব সরকারগুলোর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে উসকানি দেয়া হতো। পরবর্তীতে জামাল আবদুন নাসেরের সরকার আসইউতে এমন রেডিও স্টেশন আবিষ্কার করেছে। জানা গেছে, বহিঃশক্তির সাহায্য এবং আশ্রয়-প্রশ্রয়েই এই স্টেশন পরিচালিত হচ্ছিল, কিন্তু তখনো পর্যন্ত হাজারো ব্রাদারহুড সদস্যকে দুনিয়া থেকে বিদায় করা হয়েছে, নাসেরের পরবর্তী সরকার কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি এ কথা স্বীকার করেছে। এভাবে নাসেরকে মিসরীয়দের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আমেরিকা একজন বিশেষজ্ঞকে মিসরে প্রেরণ করে, যার পরামর্শে প্রকাশ্য জনসভায় নাসেরের ওপর জীবনঘাতী হামলার নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক রাতেই পুরো দেশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ব্রাদার হুড সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ইসরাঈলের সাথে নতুনভাবে সম্পর্ক স্থাপনের পরের। কুয়েত থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন আল মুজতামার অনুসন্ধানী রিপোর্ট হচ্ছে, একজন বড় দায়িত্বশীল কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন, মিসরে সংঘটিত ষোলটি বিস্ফোরণের মধ্যে যেসব বিস্ফোরণ বিদেশী পর্যটক ও মিসরী কর্তৃপক্ষের ওপর ঘটানো হয়, তার একটি ভিডিও তৈরি করা হয়। আর এসব বিস্ফোরণ ঘটানো ও ভিডিও তৈরির সাথে ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি.আই.এ সরাসরি জড়িত ছিল। যখন সে কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, সরকার পুরো বিষয়টি সম্পর্কে জানার পরও কেন তা জনগণের সামনে প্রকাশ করল না। তিনি জবাব দিলেন, দু'টি বাধার কারণে সরকার তা পারেনি। একটি হচ্ছে মার্কিন সরকার নারাজ হবে, অপরটি হচ্ছে জনগণ নারাজ হবে। মার্কিন সরকার নারাজ হওয়ার কারণ, তার সংস্থার জড়িত থাকার কথা জনসাধারণে প্রকাশ হয়ে পড়বে, আর আমাদের জনসাধারণ নারাজ হওয়ার কারণ, আমরা এতদিন পর্যন্ত জনগণকে আশ্বস্ত করে আসছি, ইসরাঈলের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি আমাদের স্বার্থের পক্ষে। মিসরী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞগণ মিসরের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত বিস্ফোরণ ও জীবনঘাতী হামলায় ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি ও গোলাবারুদ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে বলেন, এগুলো বাইরে থেকে আমদানীকৃত এবং সেগুলো এত মূল্যবান, কোনো সরকারই কেবল তা বহন করতে পারে। মিসরী এক কর্মকর্তা ১৯৯৩ সালের একটি গোয়েন্দা মামলার উদ্ধৃতিক্রমে বলেন, যুগপৎ গ্রীক ও মিসরী নাগরিক ইহুদী অভিনেত্রী লূসি মিসরের শীর্ষস্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে দৈহিক ও আর্থিক সম্পর্কের বিনিময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সেসব ফাইল চুরি করে নেয়, যাতে মুসলিম ব্রাদারহুডের সক্রিয় সদস্যদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ছিল।

www.pathagar.com

পশ্চিমা সংবাদ সংস্থাগুলো সাধারণতঃ স্বীয় দেশ, সমাজ ও জনগণ সম্পর্কে ৯০% ইতিবাচক সংবাদ পরিবেশন করে। সেসব ইতিবাচক সংবাদের বেশির ভাগ তাদের উন্নতি-অগ্রগতি, বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং সামরিক শক্তির সাথে সম্পর্কিত। আর তাদের ক্রাইম অপরাধ, হত্যা, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস ইত্যাদি সম্পর্কিত সংবাদগুলো এমনভাবে পরিবেশন করে, যেন এগুলোর কোনো গুরুত্বই নেই। এগুলো একটি সাধারণ বিষয়। যদি বড় ধরনের কোনো বিস্ফোরণোন্মুখ সংবাদও হয়, তাহলেও তাতে ইতিবাচক দিক খুঁজে বের করা হয়। যেমন ১৯৯৩ সালের জানুয়ারীতে মার্কিন সামরিক বাহিনী ডেভিড কোরেশের দলের ওপর হামলা চালায়, তাতে ১৫০ জন মানুষ নিহত হয় কিংবা ২০০ মানুষ সম্মিলিতভাবে আত্মহত্যা করে। পশ্চিমা সংবাদ সংস্থাগুলো এমন একটি বড় ধরনের ঘটনাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা দেয় যে, পৃথিবীর প্রতিটি জায়গায় প্রতিটি সমাজে এমন কিছু লোক ও দল পাওয়া যায়, যারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। এ ধরনের লোক মানসিক ও ধর্মীয় রোগের শিকার। তাদের প্রতি বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি দেয়া উচিত। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে প্রতিদিন ধারাবাহিক সংবাদ আসছে, এক ব্যক্তি মেশিনগান দিয়ে পঞ্চাশ জন মানুষকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে, আরেকজন তিন হাজার নারীর ইজ্জত লুণ্ঠনের পর তাদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আরেকজন তিনশ' নিষ্পাপ শিশুর সাথে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের পর তাদের হত্যা করেছে। যে ব্যক্তি ওকলাহোমার নয় তলা বিল্ডিং বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে, সে ছিল সাদা বর্ণের আমেরিকান। এই বিস্ফোরণে এক হাজারের কাছাকাছি মানুষ নিহত হয়েছে, কিন্তু বিস্ফোরণকারীদের দীন ধর্ম এবং জাতীয় পরিচয়কে আলোচনার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়নি। এমনিভাবে ইহুদী প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিনের হত্যাকারী একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিল। হত্যাকারীর দীন

---

২. পরে সেই ফাইলগুলো ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের ঘাতক দলের কাছে হস্তান্তর করে। তারপর মোসাদ সদস্যরা ফাইলের বিবরণ অনুযায়ী মিসরী পুলিশের উর্দি পরে শত শত ব্রাদারহুড কর্মীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এ কর্মকর্তা ১৯৯৩ সালে এস্কান্দারিয়া উপকূলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে একটি লিফলেট পাওয়া যায়। উক্ত লিফলেটে লেখা ছিল, বিস্ফোরণ ঘটানোর কারণ হচ্ছে, মিসরী সরকার কাফির ও নির্লজ্জ। এই সরকারের আমলে নারী-পুরুষ উলঙ্গ হয়ে গোসল করে। আমরা এ সরকারকে নির্মূল করব। লিফলেটের নিচে এস্কান্দারিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ও ছাত্রদের নাম লেখা ছিল। এ সরকারী কর্মকর্তা বলেন, সরকার এই ঘটনার পুরো দায়-দায়িত্ব ব্রাদার হুডের ঘাড়ে চাপানোর নির্দেশ দেয়। আলজেরিয়ায় এ ধরনের ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'এক সাথে ৬০ জন মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়', 'শিশু ও নারীদের পেট চিরে দেয়া হয়', 'পঞ্চাশ জন নারী বাড়ী থেকে উধাও হয়ে যায়', 'ভরা বাজারে গাড়ী বোমা হামলায় ৮০ জন নিহত', এসব ঘটনার ব্যাপারে পশ্চিমা সংবাদ সংস্থাগুলোর ভাষ্য হলো, হত্যাকারীদের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি, কিন্তু ধারণা করা হচ্ছে, মৌলবাদীরা এর সাথে জড়িত থাকতে পারে। আরো ধারণা করা হচ্ছে, সরকারকে বদনাম করার জন্য এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে।

খোদ আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আবদুল আজীজ বু-তাফলিকার বক্তব্য অনুযায়ী ১৯৯০ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত সে দেশে দুই লাখ মানুষ নিহত হয়েছে, ২০ হাজার গুম হয়েছে, ৬ লাখ আহত হয়েছে, ২২ মিলিয়ন জনগণ দারিদ্রসীমার নীচে চলে এসেছে এবং ২০ কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট বুদিয়াফকে ক্ষমতার মসনদে আসীনকারী আলজেরিয়ার জেনারেল খালেদ নেযার এবং রেজা মালিকের লেখা থেকে জানা যায়, এই হত্যা তাদের ইশারা ও নির্দেশে হয়েছে। সূত্র : ম্যাগাজিন–আল জাসূর, ১৪২৪ হিজরী সংখ্যা-২৬।

www.pathagar.com

ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, আকীদা, বিশ্বাস ও তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কিছুকেই পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম টার্গেট বানায়নি। এমনিভাবে না পুলিশও হত্যাকারীর বংশ, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব অথবা যে স্কুলে সে পড়াশোনা করেছে, সে স্কুল বা কলেজের কাউকে গ্রেফতার করেছে। আর না সন্ত্রাসের আখড়া আখ্যায়িত করে সেগুলো বন্ধ করে দিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাইভেট ও সরকারী দু'ধরনের রেডিও স্টেশন আছে। এক জরিপ অনুযায়ী একশ' পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিনী দৈনিক রেডিও শোনে। এমনিভাবে মার্কিন টিভি কোম্পানীগুলো চব্বিশ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। এই জরিপ অনুযায়ী মার্কিন মিডিয়ায় সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ৯০% অনুষ্ঠানে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ও মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়। ভয়েস অফ আমেরিকা, বিবিসি, রেডিও ইসরাঈল এবং মস্কো থেকে সম্প্রচারিত প্রোগ্রামসমূহে ফিলিস্তিন, সুদান, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, লেবানন ও আরব বিশ্বসহ মুসলিম বিশ্বের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে প্রতিনিয়ত টার্গেট বানানো হচ্ছে। ধর্মপন্থীদের পশ্চাদপদ, কট্টরপন্থী ও মৌলবাদী বলে গালি দেয়া হচ্ছে এবং তাদের অস্তিত্বকে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও উন্নয়ন-উৎসকর্ষের জন্য বিপজ্জনক আখ্যা দেয়া হচ্ছে। প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে, আরব জাতির প্রধান ব্যস্ততা বিলাসিতা, অন্ধ চিন্তা-ধারা, মদ-জুয়া ও যৌনতা। পাশ্চাত্যের যদি কারো থেকে কোনো ভয় থাকে, তাহলে তা ধর্মীয় গোঁড়াদের থেকে, যারা বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের শত্রু। তারা ঘড়ির কাঁটা পেছনে নিয়ে যেতে চায়। পক্ষান্তরে ইহুদী ও খৃস্টানরা সভ্য ও উন্নত জাতি। তাদের রাষ্ট্র গণতন্ত্রের সুদৃঢ় স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ আরব বিশ্বের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ডিক্টেটরশীপ ও একনায়কতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[৩] পশ্চিমা নিউজ এজেন্সীগুলো ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কে কি ধরনের রিপোর্টিং করে এবং টিভি কোম্পানীগুলো কিভাবে মস্তিষ্ক ধোলাই ও জনমত গঠন করে, তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে পেশ করা হলো।

০১. ১৯৬৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির হত্যার পর পশ্চিমা বিশ্বে আরব বিশ্বের বিরুদ্ধে উত্তাল ভূমিকম্প শুরু হয়। এই হত্যাকান্ডে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইহুদীদের কালো হাত জড়িত ছিল, কিন্তু প্রকৃত হত্যাকারীকে আড়াল করে ইহুদী মিডিয়া এই ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে। ইহুদী মিডিয়া বাশারা সারহান নামের এক ব্যক্তিকে হত্যাকারী আখ্যা দিয়ে আরব বিশ্ব ও ইসলামের বিরুদ্ধে তুফান শুরু করে দেয়। সেই নিরপরাধ বাশারা সারহান দীর্ঘ বত্রিশ বছর ধরে হত্যার আসামী হিসেবে জেলের অভ্যন্তরে ফাঁসির অপেক্ষায় রয়েছেন।

০২. ১৯৭১ সালে মিসর-ইসরাঈল যুদ্ধের পর শাহ ফয়সাল যখন পশ্চিমা জগতকে তেল বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা দেন, তখন পশ্চিমা মিডিয়া তাঁর বিরুদ্ধে মহা অভিযান

৩. পশ্চিমা জগত একদিকে সামরিক জান্তার সমালোচনা করে, অপরদিকে এ ধরনের সরকার প্রধানদের পর্দার অন্তরাল থেকে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে।

www.pathagar.com

শুরু করে। তাঁর পরিবারের চরিত্র হননের জন্য একাধিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। শেষ পর্যন্ত একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শাহ ফয়সালকে হত্যা করা হয়। শাহ ফয়সালের শাহাদতের সংবাদ সর্বপ্রথম সংবাদ সংস্থা রয়টার বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করে। সংবাদের ধরন ছিল এরকম, 'বাদশাহ ফয়সাল 'ঈদে মিলাদুন্নবী' উপলক্ষে দরবারে লোকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তাঁরই পরিবারের এক যুবকের হাতে শাহাদত বরণ করেন।'[৪] এই সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে পশ্চিমা মিডিয়া বিশ্বকে এই প্রতিক্রিয়া দিতে চেষ্টা করেছে, যে নবীকে গোটা দুনিয়ার জন্য রহমত বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং যাঁকে শান্তি সম্প্রীতির পয়গাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে, সে নবীর জন্ম দিবস উপলক্ষে এক মুসলমান অপর মুসলমানকে হত্যা করেছে। এটা তাদের জন্য কোনো বিষয়ই নয়। এ ধর্মের অনুসারীদের জন্য এ ধরনের কর্মকান্ড একটি অতি সাধারণ বিষয়। এ মর্মান্তিক ঘটনার পরই পশ্চিমা মিডিয়া ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস থেকে কট্টরপন্থা উগ্রতার বিভিন্ন ঘটনাবলী খুঁজে খুঁজে বের করে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে মগজ ধোলাইয়ের নাপাক প্রচেষ্টা শুরু করে।

পশ্চিমা মিডিয়ার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, শত্রুকে বিভ্রান্তি কিংবা আত্মতৃপ্তিতে লিপ্ত করে তার ধর্ম ও সভ্যতার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা। পরবর্তী ধাপে শক্তিশালী ভঙ্গিতে নতুন হামলা চালানো, যাতে সন্দেহ-সংশয়ের স্তর অতিক্রম করে আপন দীন-ধর্ম, আকীদা-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি, স্বদেশের মানুষ ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে ঘৃণার বীজ রোপণ করে দেয়া যায়। ওরিয়েন্টালিস্টগণও জ্ঞান-গবেষণা বিষয়ে একই পদ্ধতি ও ধরন গ্রহণ করেছেন।[৫] ইহুদী মিডিয়া ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে সামান্য বিরতি দিয়ে দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করাকে নিজেদের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছে। এ জন্য তারা অত্যন্ত গভীর দক্ষতা ও সূক্ষ্মতার সাথে এমন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরি করে, যাতে লোকেরা এই পরিকল্পনার গভীরে যাওয়া তো দূরে থাক, তার আশেপাশেও যেতে সক্ষম হয় না। তারা ইহুদীদের দক্ষ ও চাতুর্যপূর্ণ পরিকল্পনার আপাতবাহ্যিক চাকচিক্যে মোহিত হয়ে হুবহু সেটাই গ্রহণ করে নেয়।

০৩. ১৯৯৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী প্রথমবার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, কিন্তু এই ঘটনাকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, কিভাবে এটাকে বাহানা বানিয়ে ইউরোপ-আমেরিকায় বসবাসরত

৪. অথচ গোটা বিশ্ব জানে, সৌদি আরবে ঈদে মিলাদুন্নবী নামে কোন অনুষ্ঠান হয় না। এ থেকেই এ সংবাদের নেতিবাচক ব্যাপকতা অনুমান করা যায়।

৫. উদাহরণস্বরূপ ওরিয়েন্টালিস্টরা তাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও বই-পুস্তকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দাওয়াতকে আরব বিশ্বের ভৌগোলিক, পারিপার্শ্বিক ও ঐতিহ্যগত অবস্থার একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে আখ্যা দিয়েছেন। তারা এই প্রতিক্রিয়া দেয়ার চেষ্টা করেছেন, তৎকালীন আরব পরিস্থিতিই এই দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অপর এক ওরিয়েন্টালিস্ট-এর উল্টো লেখেন, আরব বিশ্বের অবস্থায় এ ধরনের কোন নিদর্শন প্রকাশিত হয়নি। ওরিয়েন্টালিস্টরা তাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধে এমন সুন্দর সুন্দর ভাব ভঙ্গি ও পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, যেটাকে বর্তমান যুগের মিডিয়া সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের মোড়কে উপস্থাপন করছে।

www.pathagar.com

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ানো যায় এবং কিভাবে তাদের এদেশে আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায়-সেই প্রচেষ্টায় ইহুদী মিডিয়া একযোগে আদাজল খেয়ে ময়দানে আবির্ভূত হয়। শুধু তাই নয়; বরং এ দাবীও উত্থাপন করা হয়, এমন মুসলমানদের অস্তিত্ব ইহুদী, খৃস্টান ও গোটা সভ্য দুনিয়ার জন্য ভয়াবহ বিপজ্জনক।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিস্ফোরণের পূর্বে ধারাবাহিক দুই বছর ধরে ইউরোপ-আমেরিকায় বসবাসরত মুসলমানদের দীনী ও সামাজিক তৎপরতা, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান, ইউরোপ-আমেরিকার সমাজে তাদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া, মসজিদ, মাদরাসা এবং অন্যান্য ইসলামী দাওয়াতী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের ওপর অসংখ্য প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হচ্ছিল। ভয়েস অফ আমেরিকা, সিবিএস, আইবিএস, নিউইয়র্ক টাইমস, টাইম নিউজউইক, ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল এবং লস এঞ্জেলেস টাইমস তার সাংবাদিকদের তৈরিকৃত ফিচার, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সাক্ষাতকার প্রকাশের মাধ্যমে সার্বিক দিক দিয়ে ইউরোপ-আমেরিকায় মুসলমানদের উপস্থিতিরি সুদূরপ্রসারী ভয়াবহ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলের বিচার-বিশ্লেষণ করে আসছিল। মুসলমানদের ব্যাপারে পশ্চিমা মিডিয়ার অসাধারণ আগ্রহ দেখে মার্কিন মুসলমানদের এই ধারণা হয়ে গিয়েছেল, এটি একটি বড় ধরনের ঘটনার পূর্বাভাস ও ভূমিকা। এ জন্য ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিটি প্রোগ্রামের পর ইরানে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস দখল, বোমা মেরে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণকারী বিমান উড়িয়ে দেয়া, মিউনিখে এগার জন ইসরাঈলী খেলোয়াড় ফিলিস্তিনীদের হাতে নিহত হওয়া ইত্যাদি ঘটনাগুলো অত্যন্ত ফলাও করে প্রচার করা হতো। এর মাধ্যমে তারা এই প্রতিক্রিয়া দেয়ার চেষ্টা করত, যদি মুসলমানরা ইউরোপ-আমেরিকায় অবস্থান করে এবং তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে, তাহলে তারা এক সময় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করে নেবে। যেহেতু মুসলমানদের ধর্মে চার বিয়ে করার অনুমতি আছে সেহেতু তাদের সংখ্যাও অসাধারণ দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাবে। ফলে তারাই এক সময় ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলবে। অতএব মুসলমানদের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা জরুরী। এভাবে মগজ ধোলাই করতে করতে পরবর্তীতে টুইন টাওয়ারে বড় ধরনের আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়। এ হামলার পর পরই ইসরাঈলী সরকার কোনো অন্যায় অপরাধ ছাড়াই অধিকৃত অঞ্চল থেকে ফিলিস্তিনী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানীদের বহিষ্কার করে। এই ঘটনায় বড় ধরনের বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, কিন্তু টুইন টাওয়ারের মতো বড় ঘটনার মধ্যে এই বহিষ্কারের ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যায়। এই বহিষ্কারের মাধ্যমে ইসরাঈল আমেরিকাকে একথা বলতে চেয়েছে, যেভাবে আমরা দেশদ্রোহী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে লোকদের বহিষ্কার করেছি, তেমনিভাবে মার্কিন সরকারেরও উচিত মার্কিন মুসলমানদের তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া। টুইন টাওয়ারের এ ঘটনায় ইসরাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি.আই.এ এবং মিসরী গোয়েন্দা সংস্থা যৌথভাবে অংশ নিয়েছিল। আত্মঘাতী হামলার পর ইহুদী মিডিয়া নিয়মতান্ত্রিক মার্কিন সরকারের নিকট এই দাবী করেছিল, তারা মুসলমানদের আমেরিকায় আগমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুক,

www.pathagar.com

অবৈধভাবে বসবাসরত লোকদের এখান থেকে বের করে দেয়া হোক এবং আইন প্রণয়ন করা হোক মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর কোন রকম তদন্ত ছাড়াই বিদেশীদের দেশ থেকে বের করে দিতে পারবে। এ আত্মঘাতী হামলায় স্বয়ং মার্কিন সরকারই বিস্মিত হয়ে যায়। সাধারণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো রিপোর্ট ছিল না। এই আত্মঘাতী হামলাকে ইহুদী মিডিয়া কী সুনিপুণভাবে আরবদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়, মিডিয়াগুলোর সংবাদ শিরোনাম ও সংবাদ পর্যালোচনা থেকে সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়। উদারহরণস্বরূপ নিউইয়র্ক টাইমস এই আত্মঘাতী হামলার পর প্রথম শিরোনাম করে–'এক কট্টরপন্থী মুসলমান গ্রেফতার', ইহুদী পুঁজিপতিদের মুখপত্র ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল-এর শিরোনাম ছিল 'আমাদের বাগিচায় কট্টরপন্থা ও উগ্রতার বিষধর সর্প বিদ্যমান', অপর একটি মুখপত্র জিউস প্রেস শিরোনাম করে, 'ইসলামী মৌলবাদ সারা দুনিয়ার জন্য বিপজ্জনক'।

ইহুদী বুলেটিন এ.ডি.এল. সম্পাদকীয় শিরোনাম করে 'হামাস ইসলামী জেহাদ ও ব্রাদারহুড আমেরিকার জন্য বিপজ্জনক'। টাইমস পত্রিকা তার প্রথম পৃষ্ঠায় মসজিদের মিনারাকে বন্দুকের নলের আকারে উপস্থাপন করে শিরোনাম করে 'মসজিদের মিনারাও বন্দুকের নলের মতো কট্টর পন্থা, উগ্রতা ও হিংস্রতার নিদর্শন'। নিউজউইক কেন পেছনে থাকবে। তার শিরোনাম ছিল 'হুশিয়ার ! খবরদার !! মুসলমান মুজাহিদরা আসছে।' ফরাসী পত্রিকা দি পয়েন্ট তার প্রথম পাতায় একজন বোরকাপরা নারী হাতে রাইফেল উঁচিয়ে আছে দেখিয়ে শিরোনাম করে, 'মুসলিম নারীরাও কট্টরপন্থা ও উগ্রতার পতাকাবাহক'–কমবেশি এ ধরনের শিরোনাম, সংবাদ, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা, ছবি, কার্টুন ও সাক্ষাতকার প্রকাশ করা হয়। এ প্রচারাভিযানের বুনিয়াদী উদ্দেশ্য হলো–[৬]

০১. মার্কিন সমাজে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও দীনী পর্যায়ে মুসলমানদের তৎপরতা ও শক্তিকে দুর্বল করা।

০২. যেহেতু চলমান শতাব্দীর শেষ প্রান্ত নাগাদ আমেরিকায় খৃস্টানদের পরে মুসলমানদের অবস্থান হবে দ্বিতীয়। তারা রাজনীতি ও অর্থনীতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে। এ জন্য আরো অতিরিক্ত মুসলমানদের আমেরিকায় আগমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এবং তাদের নাগরিত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করা। কারণ অধিকহারে মুসলমানদের আগমণ ও তাদের পুঁজি বিনিয়োগে ইহুদী স্বার্থে আঘাত লাগবে।

০৩. মার্কিন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা, যাতে আরব ও ইসলামী বিশ্বের সক্রিয় শক্তিশালী ইসলামী প্রয়াসগুলো নির্মূল করার জন্য তাদের সরকারগুলোকে বাধ্য করে

---

৬. ২০০৬ সালের এক রিপোর্টে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক হাজার টিভি চ্যানেল ও দুই শতাধিক রেডিও একযোগে অব্যাহতভাবে ইসলামের বিরোধিতা এবং কুরআন সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করছে। ওই রিপোর্টে আরো দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত প্রায় ১ হাজার ৭শ' দৈনিক ও ৮শ' সাপ্তাহিক পত্রিকার অধিকাংশই সুপরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুতীব্র ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। সূত্র : আল জাজিরা।-অনুবাদক।

www.pathagar.com

এবং তাদের প্রদত্ত অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যে ইসলামপন্থীদের দমন ও নির্মূলের শর্ত জুড়ে দেয়।[৭]

০৪. বিশেষ করে ইসলামী বিশ্বে এবং ইউরোপ-আমেরিকায় সাধারণভাবে ইসলামী জগরণের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা, এতদুদ্দেশে ইসরাঈলকে বেশি থেকে বেশি সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন করা, বিশেষ করে সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য আমেরিকাকে উদ্বুদ্ধ করাই ইহুদী নিয়ন্ত্রিত পাশ্চাত্য মিডিয়ার উদ্দেশ্য।[৮]

০৫. ১৯৮৭ সালের ২৯ জানুয়ারী পশ্চিমা সংবাদসংস্থাগুলো সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে সংবাদ পরিবেশন করে, দক্ষিণ কোরিয়ার বোয়িং বিমান (এল.এল)-কে বোমা মেরে

---

৭. উল্লিখিত প্রচারাভিযানের ফলস্বরূপ মার্কিন সরকার চাপ প্রয়োগ করে আরব বিশ্বের যাকাত, সদকা, দান অনুদান সংগ্রহ ও বিতরণকারী সংস্থাগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অনেক ইসলামী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তারই ধর্মের অনুসারীদের কট্টরপন্থী মৌলবাদী আখ্যা দিচ্ছে। যেসব সাহায্য সংস্থা ইয়াতিম, দুঃস্থ ও বিধবাদের আর্থিক সহযোগিতা করত কিংবা ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান করত কিংবা ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে ফ্রি বিতরণ করত, সেসব সংস্থাগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তারা মিডিয়ার মাধ্যমে শীর্ষ ইসলামী ব্যক্তিত্বদের কথা জনগণ পর্যন্ত পৌছানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ইসলামী বিশ্বের প্রভাবশালী সংগঠনগুলোর সক্রিয়, শক্তিশালী ও কর্মতৎপর ব্যক্তিত্বদের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে তদস্থলে অখ্যাত ব্যক্তিদের বসানো হয়, যাতে প্রভাবশালী সংগঠনগুলো- যারা বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ রাখছিল এবং দীনী তৎপরতায় সাহায্য সহযোগিতা ও পথ প্রদর্শন করে আসছিল, তাদের যুগ খতম করে দেয়া যায়। এক কথায়, পাশ্চাত্য মিডিয়া ইসলামী দল, সংগঠন ও সংস্থাগুলোকে নির্মূল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

৮. মার্কিন ইহুদীরা এ উদ্দেশ্যও অর্জন করে ফেলেছে, মার্কিন চাপে ইসরাঈল ও ফিলিস্তিনীদের মধ্যে এমন সমঝোতা চুক্তি করানো হয়েছে, যে চুক্তিতে ইহুদীরাই ১০০%, বরং কল্পনাতীত লভবান হয়েছে। এ ঘটনায় ইহুদীরা এত বেশি খুশি হয়েছে যে, আইজাক রবিনের মত কট্টর ও গোঁড়া ইহুদী ইয়াসির আরাফাতের ইহুদী হওয়ার ওপর সীলমহর লাগিয়ে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য দিয়েছেন, 'শুরুতে আমার ধারণা ছিল আপনি একজন ইহুদী, কিন্তু এই সমঝোতার পর মনে হচ্ছে বাস্তবিকই আপনি একজন নিষ্ঠাবান পাক্কা ইহুদী।' এই সমঝোতার পর মার্কিন সরকার আল কুদসে মার্কিন দুতাবাস পুনঃস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। খৃস্টানদের নিকট অতি পবিত্র শহর বায়তুল লাহাম (বেথেলহাম) ফিলিস্তিনীদের দিয়ে দেয়। যে শহরের শাসকের স্ত্রী সোহা একজন কট্টর খৃস্টান প্রচারকের মেয়ে এবং তাদের গোটা পরিবার খৃস্টান রীতি নীতি অনুসরণ করে চলে। ইহুদীরা মার্কিন ভূ-খন্ডে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এভাবে অর্জন করল যে, প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের নির্দেশে তার শাসনামলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিস্তিনীদের যত সংগঠন কর্মতৎপর ছিল, সবগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং মুসলমানদের দীনী ও দাওয়াতী তৎপরতা সীমিত করে দেয়া হয়। এফ. বি. আই. ফ্লোরিডায় অবস্থিত ওয়ার্ল্ড ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টারের দফতরে অভিযান চালিয়ে সংগঠনের সকল রেকর্ড ও ফাইলপত্র জব্দ করে নেয়। সেন্টারের প্রেসিডেন্ট ড. সামী আল উরইয়ানী একজন ফিলিস্তিনী এবং দক্ষিণ ফ্লোরিডা ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর। তার বাড়ী ও ইউনিভার্সিটির দফতরে অভিযান চালিয়ে সকল রেকর্ড ও ফাইলপত্র জব্দ করে নেয়া হয়। কয়েক বছর হল তিনি মার্কিন নাগরিত্বও অর্জন করেন, কিন্তু আইনগতভাবে তাকে এখনো নাগরিকত্ব দেয়া হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁর ও তাঁর সেন্টারের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান চালানোর উদ্দেশ্য তাঁর নাগরিকত্ব অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। এ সম্পর্কে এফ.বি.আই সূত্রসমূহের কথা হচ্ছে, ড. সামীর বিরুদ্ধে প্রমাণাদি তালাশ করা হচ্ছে। ইহুদী মিডিয়া লেখেছে, ড. সামীর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনা হতে পারে। ফ্লোরিডার এই সেন্টার কয়েক বছর ধরে কাজ করছে। অসংখ্য সেমিনার-সিম্পোজিয়ামও করেছে। ইলমী ও রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর গবেষণাকর্মও প্রকাশ করেছে। যদিও ড. সামীকে আটক করা হয়নি, কিন্তু তার সহকর্মী ড. মূসা আবু মারযুককে মোসাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে এফ.বি.আই নিউইয়র্ক এয়ারপোর্ট থেকে গ্রেফতার করে, যখন তিনি ফিলিস্তীন থেকে আমেরিকায় আসছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বিস্ফোরণের পূর্বে এই বিমান বাগদাদ ও বাহরাইন এয়ারপোর্টে অবতরণ করে। ধারণা করা হচ্ছে, এই হামলায় কোনো আরব মুসলমান জড়িত রয়েছে। এই সংবাদ পরিবেশনের পর পরই আরব বিশ্ব ও তাদের দীন ধর্ম এবং সভ্যতা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমসমূহে তুফান শুরু হয়ে যায়, কিন্তু হামলার ঠিক এক বছর পর ১৯৮৮ সালের ২৫ এপ্রিল তদন্তের মাধ্যমে জানা গেল, এই হামলা চালিয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়ার এক নারী। তার স্বীকারোক্তিমতে, সে উত্তর কোরিয়ার ইশারা ও সাহায্যে এই হামলা চালিয়েছিল। পরে তাকে ফাঁসির নির্দেশ দেয়া হয়, কিন্তু এই সংবাদকে মিডিয়ায় কোনো গুরুত্ব দেয়া হয়নি এবং না জেনে আরব বিশ্বের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালানো হয়েছিল, মিডিয়া তার জন্য কোনো দুঃখ প্রকাশেরও প্রয়োজন মনে করেনি।

০৬. আবু জেহাদ (খালেদ হাসান)-কে যখন ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ওঁৎ পেতে হত্যা করতে সক্ষম হলো, তখন পশ্চিমা মিডিয়া ইসরাঈলের মেধা, তীক্ষ্ন বুদ্ধি, মোসাদের দক্ষতা ও পেশাগত প্রশিক্ষণের খুব প্রচার প্রসার করে। এমনিভাবে যখন ইসরাঈল ইরাকের আণবিক স্থাপনার ওপর বোমা নিক্ষেপ করে তা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়, তখন তার এয়ারফোর্সের সাহসিকতা, দক্ষতা, বিশেষজ্ঞদের সুনিপুণ পরিকল্পনা এবং ইসরাঈলী বিমান উড্ডয়ন ক্ষমতার খুব প্রসার করে এবং এ ডাকাতি ও সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতা বীরত্ব বাহাদুরী আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়।

০৭. উপসাগরীয় যুদ্ধ অস্ত্রের যুদ্ধ ছিল না; বরং স্বয়ং মিডিয়া বিশেষজ্ঞগণ এ যুদ্ধকে মিডিয়ার যুদ্ধ নামে আখ্যায়িত করেছেন। এটি এমন যুদ্ধ, যাতে মিডিয়াই লড়েছিল। এ যুদ্ধকে অস্ত্র বানিয়ে আরবদের থেকে কোটি কোটি ডলার উসুল করা হয়েছে, আবার তাদের ঘাড়ে চেপে বসার মহাসুযোগও লাভ করেছে। এই যুদ্ধে সাদ্দাম হুসাইনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের সবচে বড় শত্রু আখ্যা দেয়া হয়। তার ন্যাশনাল গার্ডকে বিশ্বের সবচে শক্তিশালী ও অত্যুন্নত অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী হিসেবে চিত্রিত করা হয়। যারা অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভা এবং সর্বোন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তাদের মোকাবেলার জন্য স্থলপথ, নৌপথ ও আকাশ পথে এ পরিমাণ সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র দরকার, যা আমেরিকার একার পক্ষে সম্ভব নয়; বরং ২১টি রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীই তা আঞ্জাম দিতে পারে। ইরাকের সাদ্দাম হুসাইনের ন্যাশনাল গার্ডের ভয়ানক বিপজ্জনক চিত্র পেশ করে পশ্চিমা মিডিয়া প্রচার করতে লাগল, আমেরিকার এক নম্বর শত্রু সাদ্দাম হুসাইন। অথচ পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে, আমেরিকার পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী ব্যক্তিই হলো সাদ্দাম হুসাইন। তার প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের পুরোপুরি পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। এক সাদ্দাম চলে গেছেন, কিন্তু এমন সাদ্দাম তার আরো প্রয়োজন, যিনি আমেরিকার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন। এজন্য আমেরিকা নতুন নতুন সাদ্দাম তৈরি করতে থাকে। (নিউজউইক)

বিবিসি সম্প্রচার সংস্থা : একটি পর্যালোচনা

বৃটিশ সম্প্রচার সংস্থা বিবিসি (বৃটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন) বিগত ৬২ বছর যাবত চল্লিশটি ভাষায় সম্প্রচার চালিয়ে আসছে। এটিই বিশ্বের সম্প্রচার সংস্থাগুলোর মধ্যে

www.pathagar.com

সবচে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। এ সংস্থার সম্প্রচারকৃত সংবাদ সমগ্র বিশ্বেই শোনা হয়। পেশাগত মান ও দক্ষতার দিক দিয়ে সমকালীন অন্যান্য সম্প্রচার সংস্থার মধ্যে উন্নত ও উত্তম হওয়ার কারণে জনগণ তার সম্প্রচারিত রিপোর্টের ওপর আস্থা রাখে, কিন্তু এর পাশাপাশি জনগণ এ সংশয়ও প্রকাশ করে থাকে, বিভিন্ন বিষয়ে বিবিসির রিপোর্টের মান বিভিন্ন ধরনের। সামগ্রিকভাবে সে নিরপেক্ষ নয়।

বিবিসি যখন পাশ্চাত্যের বিপক্ষ শক্তি বিশেষ করে ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনসমূহ সম্পর্কে কোনো রিপোর্ট ও প্রোগ্রাম পেশ করে তখন সে যে নিরপেক্ষ নয়, তা আরো সুস্পষ্ট হয়ে সামনে আসে। বিবিসির রিপোর্ট ও সম্প্রচারের ধরন দেখে শংকা জাগে, সে জেহাদ ও পাশ্চাত্যবিরোধী আন্দোলনসমূহের বিরুদ্ধে পশ্চিমা চিন্তাধারার আলোকে মেধা মনন প্রস্তুত করছে না তো? নিম্নে আমরা বিবিসি সম্প্রচারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব। আলোচনার সাথে সাথে ঐতিহাসিক প্রমাণ পেশ করারও চেষ্টা করা হবে।

আফগান সমস্যা

১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের ক্ষমতায় আরোহণ আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের সেক্যুলার শক্তিসমূহকে চিন্তায় ফেলে দেয়। এই যুগান্তকারী ঘটনা তাদের চোখে কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে। কারণ তারা আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ নির্মূল করে শান্তি -নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ইসলামী আইনও বাস্তবায়ন করে এবং ধর্মহীন শক্তির সামনে নতজানু হতে পরিষ্কার অস্বীকার করে। তালেবান সরকারের এই স্বাধীন পলিসি ধর্মহীন শক্তির ঘুম হারাম করে দেয়। তারা তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক মিথ্যা প্রচার প্রোপাগান্ডা শুরু করে দেয়, তাদের কঠোরতার সমালোচনা করতে থাকে, তাদের তথাকথিত মানবাধিকার লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত আখ্যা দিতে থাকে এবং তাদের সরকারের ইতিবাচক দিকগুলোর আলোচনা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অন্যান্য মিডিয়ার মতো বিবিসিও সাংবাদিকতার মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে পশ্চিমা প্রোপাগান্ডাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সম্প্রচার করতে থাকে। বর্তমান যুগে তালেবান সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার, ইনসাফ, অভ্যন্তরীণ শান্তি-নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সরকারী আমলাদের সহজ, সরল ও সাদাসিধা জীবন যাপন, বিলাসিতা মুক্ত সমাজ এবং আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের বিষয়টি গোটা বিশ্বের রাষ্ট্র সরকারের জন্য একটি শিক্ষাও বটে এবং চিন্তার বিষয়ও বটে।

সাংবাদিকতার মূল্যবোধের দাবি তো ছিল, বিবিসি যদি তালেবান সরকারের কঠোরতা সম্প্রচার করে, তাহলে তার উল্লিখিত ইতিবাচক দিকগুলোও সম্প্রচার করবে, কিন্তু বিবিসির অস্তিত্ব লাভের উদ্দেশ্যই পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার সংরক্ষণ। নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো–

২০০২ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি আফগানিস্তানের কয়েকটি প্রদেশে তালেবান কমান্ডোরা সম্মিলিত জোটের স্থলবাহিনীর ওপর প্রচন্ড হামলা চালায়। তখন বিবিসি পেশোয়ারে আফগানিস্তান বিষয়ক বিশেষজ্ঞ রহীমুল্লাহ ইউসুফের সাক্ষাতকার গ্রহণ করে।

সাক্ষাতকারের শেষ দিকে রহীমুল্লাহ ইউসূফ যখন তালেবান সরকারের কিছু ইতিবাচক দিক আলোচনা শুরু করেন তখন বিবিসি প্রতিনিধি সঙ্গে সঙ্গে টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে দিয়ে শুধু পূর্বের অংশটুকু ধারণ করে সম্প্রচার করে। যাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, সাক্ষাতকার এখনো শেষ হয়নি, তার আগেই টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

যৌথ বাহিনী যখন আফগানিস্তানের নিষ্পাপ নিরপরাধ জনগণের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা শুরু করে তখন বিবিসি ধারাবাহিকভাবে এই হামলাকে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ আখ্যা দিতে থাকে। উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে আফগানিস্তানের বৈধ শাসক এবং তালেবানকে কট্টরপন্থী, গোঁড়া ও সন্ত্রাসী আখ্যা দিতে শুরু করে। অথচ প্রকৃত বিষয়টি ছিল তার উল্টো। কারণ উত্তরাঞ্চলীয় জোটের জুলুম নির্যাতন ছিল নিকট অতীতের বিষয়।

মুজাহিদীনদের মনোবল ও সাহস নষ্ট করা এবং যৌথ বাহিনীর সফলতা বাড়িয়ে পেশ করার জন্য মুজাহিদ শহীদদের সংখ্যা বেশি বলে প্রচার করত। পক্ষান্তরে আমেরিকা ও যৌথ বাহিনীর ধ্বংস গোপন করার চেষ্টা করত। অথচ প্রকৃতপক্ষে শহীদদের লাশ দাবী থেকে অনেক কম এবং মার্কিন বাহিনীর লাশ অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছিল। অদ্যাবধি (মার্চ, ২০০২-এর শেষ পর্যন্ত) আফগান যুদ্ধে নিহত আমেরিকান সৈন্যের সংখ্যা চৌদ্দ পনের বলে প্রচার করা হয়। যখন জেহাদীদের মুখপত্র মাসিক আদ দাওয়ার দাবী মোতাবেক শুধু গার্দিজের লড়াইয়ে আশি থেকে একশ আমেরিকান সৈন্য নিহত এবং দুইশর বেশি আহত হয়েছে। (মাসিক আদ দাওয়া-এপ্রিল, ২০০২)।

ইরাক যুদ্ধে পশ্চিমা মিডিয়া একই নীতি গ্রহণ করে রেখেছিল। এর পূর্বে বিবিসি কারগিল ও কাশ্মীরের চলমান যুদ্ধেও আহত নিহতের সংখ্যা এ ধরনের কমবেশি করে প্রকাশ করেছিল। তবে একথা ঠিক, যুদ্ধের ময়দান থেকে হতাহতের সঠিক সংখ্যা সংগ্রহ করা খুবই কঠিন, কিন্তু এটা কেমন ইনসাফ যে, সংখ্যা শুধু এক পক্ষেরই পেশ করা হবে আর অপর পক্ষকে দেখেও না দেখার ভান করা হবে। বিবিসি অনেক সময় মুজাহিদীনদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ও কৌশল ব্যর্থ করা এবং হিম্মত মনোবল নষ্ট করার জন্য কৃত্রিম ও কাল্পনিক বোমাবর্ষণের রিপোর্টও দিয়েছে। কান্দাহারের আশেপাশে এবং আস্পাইন বোল্ডাকে সংঘটিত লড়াইয়ে এরকম কৃত্রিম ও কাল্পনিক রিপোর্ট দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। (জেহাদে কাশ্মীর, জানুয়রী-২০০২)।

এ কথার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করেছেন আফগানিস্তানে চিকিৎসা সেবাদানরত ইসলামিক মেডিকেল এসোসিয়েশনের এক চিকিৎসক।

বিবিসি আফগানিস্তানের বর্তমান নেতৃবর্গের মধ্যে হিযবে ইসলামীর আমীর গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের বিরুদ্ধেও প্রোপাগান্ডা শুরু করে, যাতে তিনি কোনোভাবে আফগানিস্তানে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন। কারণ তিনি পাশ্চাত্যের সামনে মাথানত করেননি এবং মার্কিন সন্ত্রাস ও আফগানিস্তানের পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। বিবিসি তাঁর বিরুদ্ধে অবিরাম প্রোপাগান্ডা শুরু করে দেয়, যাতে তিনি আফগানিস্তানে তাঁর কর্তব্যকর্ম আদায় না করতে পারেন। কেননা তাঁর ভূমিকা পাশ্চাত্যের স্বার্থ পরিপন্থী।

www.pathagar.com

২০০২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী ইরানে কর্মরত বিবিসির রিপোর্টার এ ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে, কাবুলে বেপর্দা মেয়ে লোকদের ওপর তেজাব ছোড়া হয়েছে। অতঃপর এ বছরের ২রা মার্চ তার ওপর কাবুল ধ্বংসের অভিযোগও আরোপ করে তাকে একজন হিংস্র রক্তপিপাসু লীডার রূপে উপস্থাপন করে। অথচ তাকে দেশের প্রধানমন্ত্রী বানানো হয়েছিল, কিন্তু বিদেশী হস্তক্ষেপে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা দায়িত্ব স্থানান্তর করা হয়নি।

জিহাদবিরোধী মানসিকতা প্রস্তুতকরণ

গোটা বিশ্বের যেখানে যেখানে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চলছে, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যাদের প্রচেষ্টা বৈধ স্বাধীনতা আন্দোলন, কিন্তু যেসব আন্দোলন পাশ্চাত্য স্বার্থের পরিপন্থী, বিবিসি তাদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মনগড়া পরিভাষার যথেষ্ট প্রচলন ও প্রচার ঘটিয়েছে। ফিলিস্তিনী মুজাহিদীন, আফগানিস্তান ও চেচনিয়ার মুজাহিদীন, ফিলিপাইনের মুজাহিদীন, ইন্দোনেশিয়ার জেহাদী সংগঠন এবং আলজেরিয়ার ইসলামপন্থী সকলেই বিবিসির নিকট কট্টরপন্থী, মৌলবাদী, গোঁড়া, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সন্ত্রাসী। আর সেসব দেশের দখলদার বাহিনী সর্বপ্রকার বর্বরতা প্রদর্শন করেও তারা নিজেদের আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করে। ফিলিপাইনের প্রায় এক কোটি মানুষের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনকারী সংগঠন আবু সাইয়াফ গ্রুপের ওপর বিবিসি ধারাবাহিক অপহরণ এবং বিদেশী ও সাধারণ জনগণকে হত্যার মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে, কিন্তু আবু সাইয়াফ বিবিসির কোনো কভারেজ পায় না।

১৯৯২ সালে আলজেরিয়াতে যখন ইসলামিক ফ্রন্ট পৌরসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে, তখন পশ্চিমা জগত জাতীয় নির্বাচনেও ফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয় আঁচ করতে পেরে নির্বাচনের পূর্বে সেনাবাহিনীকে উসকে দিয়ে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায় এবং ইসলামপন্থীদের কট্টরপন্থী ও মৌলবাদী অভিযোগে অভিযুক্ত করে। বিবিসিও অন্যান্য পশ্চিমা মিডিয়ার মতো এই অভিযোগ খুব ফলাও করে প্রচার করে। এমনিভাবে পাকিস্তানের যেখানেই সন্ত্রাসী কিংবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে বিবিসি সেখানেই সেই ঘটনাকে জেহাদী সংগঠনের সাথে জড়ানোর অপচেষ্টা করে, যাতে এর মাধ্যমে জিহাদী সংগঠনগুলোর দুর্নাম করা যায়।

২০০২ সালের ১৬ই মার্চ বিবিসির সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে পরিচালক রাজা যুলফিকার আলী সাম্প্রদায়িক সমস্যার ওপর শুধু জিহাদ বিরোধীদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাতকারে তারা সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক সরাসরি জিহাদের সাথে জুড়ে দিয়ে জিহাদী সংগঠনগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের তাকিদ দিয়েছেন এবং এই সংগঠনগুলোর ওপর কঠোরতা অব্যাহত রাখার সুপারিশ করেছেন। সাথে সাথে তারা দারিদ্রতা ও বেকারত্বকে জেহাদের কারণ সাব্যস্ত করেছেন। অথচ একথা সবাই জানে, মুজাহিদীনদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও ব্যবসায়ী সবাই শামিল আছেন। বিবিসি যদি সত্যিই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান চাইত, তাহলে তারা জাতীয় ঐক্য কাউন্সিলের নেতৃবর্গের নিকট থেকেও সাক্ষাতকার গ্রহণ করতে পরত। যারা

www.pathagar.com

উপরোক্ত সাক্ষাতকারদাতাদের চেয়ে আরো বেশি যোগ্য ও দক্ষ। অথবা কমপক্ষে উভয় গ্রুপকে শামিল করত এবং জিহাদ বিষয়ে মুজাহিদীনের অবস্থান সম্পর্কে নেতৃবর্গের থেকেও সাক্ষাতকার গ্রহণ করত, কিন্তু আফসোস ! বিবিসি পাশ্চাত্যের ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করে প্রমাণ করেছে, এই সংস্থা মুসলিম উম্মাহকে পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধেও বিবিসি পশ্চিমা প্রোপাগান্ডার খুব প্রচার প্রসার করেছে। যাদের থেকেই পশ্চিমা স্বার্থের ক্ষতির আশংকা আছে তাদেরই ওসামা বিন লাদেনের সাথে জুড়ে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা

সাম্প্রদায়িকতার প্রচার করে পশ্চিমা শক্তি ইসলাম ও ইসলামী সংগঠনগুলোকে দুর্নামগ্রস্ত করা এবং মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য দ্বন্দ্ব ছড়ানোর প্রয়াস চালায়। সাম্প্রদায়িকতার ঘটনাকে খুব অতিরঞ্জিত করে পেশ করে জনগণকে এই প্রতিক্রিয়া দিতে চেষ্টা করে, যদি দীনী সংগঠন ও জিহাদী আন্দোলনগুলো কখনো সফলকাম হয় তাহলে দেশে বিশৃংখলা ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এজন্য উত্তম হলো, আগে থেকেই তাদের সফলতার পথ প্রতিরোধ করা এবং লোকদের উচিত এসব সংগঠন থেকে দূরে থাকা।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যদি হিন্দু-মুসলিম, ইহুদী-মুসলিম কিংবা খৃস্টান-মুসলিমের মাঝে হয় আর সেখানে মুসলমান বেশি মারা যায় কিংবা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সে ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বহীনভাবে প্রচার করা হয় এবং মুসলমানের আলোচনা তখনই হয় যখন কোনো মুসলমান কাউকে মারে। আর যদি কোনো মুসলমান মারা যায় তা হলে সে ঘটনা আলোচিত হয় বটে, তবে তার দীন ধর্মের পরিচয় প্রকাশ করা হয় না। কেননা, এরূপ করা হলে অমুসলিমদের দুর্নাম হয়। ভারতীয় মিডিয়ার পলিসিও এরকমই।

এ ব্যাপারে বিবিসির দৃষ্টিভঙ্গি সাংবাদিক অসততার প্রকাশক। নিম্নের ঘটনাবলী থেকে সেটাই প্রমাণিত হয়। ২০০১ সালের মার্চ মাসে সীমান্ত প্রদেশের হিঙ্গু জেলার দুই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে লড়াই হয়। ঘটনাক্রমে এক গ্রামের অধিবাসী সুন্নী এবং আরেক গ্রামের অধিবাসীরা ছিল শিয়া। এ লড়াইয়ে কয়েকজন লোক মারা যায়। এ লড়াই হয়েছিল পানি নিয়ে। এর সাথে সাম্প্রদায়িকতার কোনো সম্পর্ক ছিল না। পেশোয়ারে কর্মরত বিবিসির রিপোর্টার সেটা স্পষ্টও করে দিয়েছিল। এরপরও বিবিসি এ ঘটনাকে সম্প্রদায়িকতার প্রলেপ দিয়ে সাম্প্রদায়িক ফাসাদ বিশৃংখলার সাথে এর সম্পর্ক জুড়ে দেয়। বিবিসি এভাবে দুই দলের মধ্যে সম্প্রদায়িকতা উসকে দেয়। অথচ এ বিশৃংখলার মূল কারণ সিকিউরিটি এজেন্সীগুলোর উদাসীনতা, সিকিউরিটি কর্মকর্তাদের অযোগ্যতা, আর প্রচার করা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিশৃংখলা বলে। অথচ সিকিউরিটি এজেন্সীগুলোর উদাসীনতা এবং এসব এজেন্সীর কর্মকর্তাদের অযোগ্যতা অদক্ষতা দূর করা গেলে আপনা আপনিই এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

বিগত বছরের শেষের দিকে করাচীতে পি. এস. ও'র ডিরেক্টর শওকত মির্জার হত্যাকাকেও বিবিস সাম্প্রদায়িক হত্যাকা বলে আখ্যায়িত করে। অথচ মাসিক আদ

www.pathagar.com

দাওয়ার ভাষ্যকারের মতে, শওকত মির্জা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে সন্ত্রাসের বলি হয়েছে। কেননা, শওকত মির্জা পিএসও'র অনেক উন্নতি সাধন করে একে দেশের সবচেয়ে লাভজনক সংস্থা বানিয়েছিলেন। তার হত্যাকা রে পর শেল কোম্পানী পিএসও সংস্থাটি কিনতে চাইছে। (মাসিক আদ দাওয়া, মার্চ-২০০২)

পাকিস্তানের বাইরে বিবিসির সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। যদিও কালেভদ্রে সত্য রিপোর্টও প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাও করা হয় একটা সীমা পর্যন্ত শ্রোতাদের বিশ্বাস ধরে রাখার জন্য।

ভারতের গুজরাটে সংঘটিত স্মরণকালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ১৫ হাজার মুসলমান শহীদ হন। শত শত ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমান গৃহহারা হয়। বিবিসি এই ভয়াবহ ঘটনাকে গুরুত্বহীনভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আখ্যা দিলেও একথা পরিস্কার করেনি, এই দাঙ্গায় সবচে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুসলমান সম্প্রদায় এবং তারাই সবচে বেশি নিহত হয়েছে। তারা প্রচার করেছে হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে। শত শত ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হয়েছে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তের সাথে মুসলমান নাম উল্লেখ করেনি। বিবিসি সুপরিকল্পিত এ মুসলিম নিধনযজ্ঞকে নিছক হত্যাকা বলে চালিয়ে দিয়েছে। মেসিডোনিয়ায় মুসলিম নিধনযজ্ঞেও বিবিসি একই পন্থা অবলম্বন করেছে। মুসলিম নিধনযজ্ঞ সম্পর্কিত বিবি-সির প্রচার নীতির একটি মাত্র উদাহরণ দেখুন–

২০০২ সালের ২২ মার্চ গুজরাটের বড়োদা জেলায় কর্মরত বিবিসির প্রতিনিধি অটল বিভাস রিপোর্ট দিয়েছে, আজকের দাঙ্গায় ছুরিকাঘাতে দু ব্যক্তি নিহত ও একজন আহত হয়েছে। দশটি বাড়ী এবং পাঁচখানা গাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু রিপোর্টার ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে মুসলমান নাম উল্লেখ করেনি। এই দাঙ্গা সৃষ্টির মূল পরিকল্পক বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, কিন্তু বিবিসির রিপোর্টার তার রিপোর্টে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবক আখ্যা দিয়েছে। অথচ এ একটি কট্টরপন্থী, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সংগঠন, যা পারস্পরিক প্রতিবেশীসূলভ অস্তিত্ব ও অবস্থাকে বিশ্বাস করে না। এরাই এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির মূল হোতা। অথচ তারাই হয়ে গেল স্বেচ্ছাসেবক।

বিবিসির উল্লিখিত রিপোর্টসমূহের ধরন থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে, দীন ধর্মের ব্যবধানের সাথে সাথে বিবিসির রিপোর্টিং পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটে; বরং বলা যায়, সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা অবলম্বিত হয়।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের শ্লোগান

গণতন্ত্রও পাশ্চাত্যের একটি অস্ত্র। এই অস্ত্র তারা অধিকাংশ সময় সামরিক সরকার আবার কখনো রাজা-বাদশাহদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে থাকে। এই অস্ত্র তখনই প্রয়োগ করে যখন সরকারগুলো তাদের নির্ধারিত এজেন্ডা পাশ কাটানোর শংকা জাগে। এই অস্ত্রের মাধ্যমে তারা সরকারগুলোকে ব্ল্যাকমেইল করে তাদের মাধ্যমে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার করে। যখনই তারা পাশ্চাত্যের তাবেদারী এবং তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে রাজি

হয়ে যায় তখন তাদের একনায়কতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের ওপর পাশ্চাত্যের কোনো অভিযোগ থাকে না, বরং তখন তারা পশ্চিমের নিকট গণতান্ত্রিক সরকার থেকেও বেশি প্রিয় হয়ে যায়।

রাজতন্ত্রের উদাহরণ আরব বিশ্ব, যারা অগণতান্ত্রিক হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপ-আমেরিকার নিকট খুব প্রিয়। কারণ সেখানে তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত ও নিরাপদ রয়েছে। আর সামরিক সরকারের উদাহরণ মিসর, সিরিয়া, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক এবং পাকিস্তান। এসব সরকারকে পাশ্চাত্য তার স্বার্থে ব্যবহার করেছে এবং তাদের সাথে সুগভীর সম্পর্ক রেখেছে; বরং একাধিকবার তাদের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে দলিত মথিত করেছে। পক্ষান্তরে তুরস্কের এরদোগানের সরকার এবং সুদান ও আফগানিস্তানকে পাশ্চাত্য পছন্দ করেনি। কারণ এরা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল। কিউবাতে ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে ক্ষমতায় আনতে আমেরিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু কিউবা যখন তার সাথে চলতে অস্বীকার করে, তখন ক্যাস্ট্রোকে সে একজন ঘৃণিত ব্যক্তি আখ্যা দেয়। স্বীয় স্বার্থে পাশ্চাত্য সব সময়ই দু'মুখো নীতি অবলম্বন করে এসেছে।

বিবিসিও সেসব জায়গায়ই গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের বিপর্যয় খুঁজে পায় যেখানে পাশ্চাত্যের অপছন্দীয় সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। আর যেখানে পাশ্চাত্যের পছন্দনীয় সরকার ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিপর্যয় তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রেও বিবিসির কতিপয় রিপোর্টের উদ্ধৃতি দেয়া যায়, কিন্তু পাশ্চাত্যবিরোধী সরকার ও রাষ্ট্রসমূহ সম্পর্কিত রিপোর্টের সাথে এ সকল রিপোর্টের সংখ্যা অনুমান করা যায়, তখন উভয়ের মাঝে বিস্ময়কর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

বিবিসির নিকট তালেবানদের পর্দার ওপর কড়াকড়ি আরোপ মানবাধিকারের লংঘন ছিল, কিন্তু তুরস্ক ও উজবেকিস্তানে বোরকা পরে শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ মানবাধিকারের লংঘন নয়। উজবেকিস্তানে পঞ্চাশ হাজার মুসলমানকে বন্দী করা এবং তাদের শরয়ী ইবাদত ও শরয়ী পর্দার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ মানবাধিকার লংঘন নয়। বসনিয়া, চেচনিয়া, হার্জেগভিনা, কাশ্মীর, আফগানিস্তান ও আরাকানের মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলা মানবাধিকারের লংঘন নয়। ইন্দোনেশিয়ার খৃস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ 'মালাকা' উপদ্বীপে ১৯৯৯ থেকে ২০০০ পর্যন্ত মাত্র দু'বছরে পঞ্চাশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। রোডে প্রকাশ্যে মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করা হয়েছে। এসব কি মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন নয়? বিবিসি কি এসব ঘটনা বস্তুনিষ্ঠতার সাথে পরিবেশন করেছে? পাকিস্তানের আইয়ুব খানের সরকারকে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য শক্তি ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। জেনারেল জিয়াউল হককে আমেরিকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। সে সময় আইয়ূব খান ও জিয়াইল হক দু'জনই পশ্চিমের পছন্দনীয় সরকার ছিল, কিন্তু এখন মিডিয়ায় তাদের ডিক্টেটর–একনায়ক নামে স্মরণ করা হয়। কারণ এখন আর তাদের কাছে কোনো স্বার্থ নেই।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের বিগত মোশাররফ সরকারও শুরুতে পাশ্চাত্যের নিকট প্রিয় ছিল না। তার ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হয়, কিন্তু যখনই মোশাররফ পশ্চিমের এজেন্ডা বাস্তবায়ন শুরু করে এবং আফগানিস্তান বিষয়ে প্রকাশ্যে আমেরিকাকে সমর্থন দেয়, তখনই সে পশ্চিমের প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠে। ইসলামাবাদে খৃস্টান চার্চের ওপর সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কে বিবিসি জেনারেল মোশাররফের নিন্দা এভাবে প্রচার করে–পাকিস্তানের লীডার প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোশাররফ চার্চের ওপর সন্ত্রাসী হামলার কঠোর নিন্দা করেছেন। এখানে প্রশ্ন, জেনারেল মোশাররফ জবরদস্তি ক্ষমতা দখল করেছেন। তাহলে তিনি কিভাবে পাকিস্তানের লীডার হলেন। একজন সামরিক জান্তার জন্য এ ধরনের শব্দ অবশ্যই মানায় না। সেক্যুলার পাশ্চাত্য এবং বিবিসির নিকট জেনারেল মোশাররফ এজন্য প্রিয়ভাজন যে, তিনি জিহাদী সংগঠনগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং ইসলামী পাকিস্তানকে সেক্যুলার পাকিস্তান বানাবার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। এখানেই বিবিসির নিরপেক্ষতা (?) প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বিবিসি এরকম পক্ষপাতিত্বপূর্ণ পাশ্চাত্য তোষানীতি সর্বস্ব পলিসির কারণে জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবে তার দেশে বিবিসির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

বিবিসির সমসাময়িক অন্যান্য সম্প্রচার সংস্থা

বিবিসির সমসাময়িক অন্যান্য সম্প্রচার সংস্থা, যেমন ভয়েস অফ আমেরিকা, ভয়েস অফ জার্মানী, রেডিও মস্কো ইত্যাদির ব্যাপারেও কোনো আত্মতৃপ্তিতে ভোগা উচিত নয়। কারণ সব রসুনের গোড়া এক জায়গায়। এরা সবাই পাশ্চাত্য স্বার্থের সংরক্ষক। এদের সকলেই একে অপর থেকে অগ্রসর হয়ে পাশ্চাত্য তোষণের প্রয়াস চালায়। রেডিও তেহরানকে ইসলামী বিশ্বের প্রকৃত মুখপত্রের ভুমিকা পালন করা উচিত ছিল, কিন্তু তার পলিসিও সকল ইসলামী বিষয়ে এক নয়। ইসরাঈলের সমালোচনা ও মজলুম ফিলিস্তিনীদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সে কঠোর ভূমিকা পালন করে, কিন্তু চেচনিয়া ও অন্যান্য ইসলামী বিশ্বের সমস্যা নিয়ে তেমন একটা কঠোর ভূমিকা পালন করে না। হতে পারে এটা আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে ইরানের অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে সংঘর্ষপূর্ণ। আর রেডিও তেহরানের সম্প্রচার নীতি, দলগত অভিমতের দৃষ্টিতে দেখা হলে আরো অনেক প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়।

রেডিও পাকিস্তান তো যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক তার সেবা করা 'মহান দায়িত্ব' মনে করে। বিরোধী দলের চরিত্র হনন এবং ক্ষমতাসীন দলের ভুল–সঠিক সব পলিসির প্রশংসা করা তার মহান পেশা। এতে বাস্তবতা বদলে ফেলার প্রয়োজনই পড়ুক না কেন। এটাকে সে পেশাগত দায়িত্ব ও সাংবাদিকতার মূল্যবোধ সাব্যস্ত করে রেখেছে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

দুনিয়ার চলচ্চিত্রের পর্দায় মুসলমানদের চিত্র

পশ্চিমা চলচ্চিত্র

ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য যে যুদ্ধ শুরু করেছে তা গোলাবারুদ ও কামানের যুদ্ধ নয়; বরং প্রকৃত অর্থে এ যুদ্ধ হলো মিডিয়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ব্যাপকতা, বিশালতা এত সুদূরপ্রসারী ও সুগভীর যে, এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার কল্পনাই করা যায় না। এর কল্পনা মানুষের চিন্তাশক্তিকেও নিতান্ত অসহায় করে দিয়েছে। এই যুদ্ধ বন্দুক ও আণুবিক বোমা থেকেও বহুগুণে বেশি বিপজ্জনক, বিপর্যয়কর ও ধ্বংসাত্মক। মুসলিম উম্মাহকে নির্মূল করার জন্য পাশ্চাত্য জগত একদিকে শিক্ষা অপরদিকে মিডিয়ার অস্ত্র সাজে সজ্জিত হয়ে দুর্দান্ত প্রতাপের সাথে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। পশ্চিমা মিডিয়ার অন্যতম শক্তিশালী বিভাগ হলো চলচ্চিত্র, যা সম্পূর্ণ ইহুদীদের কর্তৃত্বে ও দখলে। তারা দিন রাত বিরামহীনভাবে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করে বিভিন্নভাবে এমন সব চলচ্চিত্র নির্মাণ করছে, যেসব চলচ্চিত্রে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে মূল টার্গেট বানানো হচ্ছে। তারা পরিকল্পিতভাবে এসব কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে আর আমাদের সরকারগুলো সংস্কৃতির নামে সরকারী অর্থে এসব চলচ্চিত্রের বিকাশ ও বিস্তার ঘটাচ্ছে এবং জোর করে মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। সিনেমার এই যুদ্ধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ টেলিভিশনকেও নিজের কবলে নিয়ে নিয়েছে। এখন সরাসরি ডিশ এন্টিনার মাধ্যমে আমাদের ঘরে বাড়ীতে বসে দিবালোকে আগ্রাসন চালাচ্ছে।

ক্রুসেড যুদ্ধে লজ্জাজনক ও গ্লানিকর পরাজয়ের পর পাশ্চাত্যজগত ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে কৌশল ও পরিকল্পনা তৈরি করেছে, যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে, সেদিকে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে মার্কিন ক্যাথলিক চার্চের এক সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মার্শাল বোল্ডাউন বলেন, পশ্চিমাজগত ইসলামকে শুধু চলমান সভ্যতার জন্যই বিপদজনক মনে করে না; বরং খৃস্টান বিশ্বের সাথে ইসলামী বিশ্বের হাজার বছর ধরে লড়াই সংঘর্ষ চলে আসছে এবং এই লড়াই অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে।

ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পশ্চিমা জগত প্রথমে জ্ঞান গবেষণা ও সাহিত্যের পথে এই লড়াই চালিয়ে আসছিল। গত এক শতাব্দী থেকে এই যুদ্ধের আগুন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। চলচ্চিত্র অঙ্গনের ব্যাপকতা ও টেলিভিশনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া একথারই সাক্ষ্য দেয় যে, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার আলোকে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনাকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতরভাবে লোকদের মন মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। বাস্তব কথা হলো, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ

www.pathagar.com

সম্পর্কিত কোনো ঘটনা প্রচারে পশ্চিমা মিডিয়া ছাড় দেয়া তো দূরে থাক, সেটাকে একটু সহজভাবেও গ্রহণ করে না; বরং ধরন ও মোড়ক পাল্টিয়ে ধারাবাহিকভাবে নতুন নতুন আঙ্গিকে সেটা প্রচার করতে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ মাহদী সুদানী মার্কিন চলচ্চিত্রে একটি আলোচিত নাম। তাকে মার্কিন চলচ্চিত্র ও নাটকে অত্যন্ত ঘৃণিত আকারে উপস্থাপন করা হয়। সকল খল চরিত্রে অভিনয়ের জন্য মাহদী সুদানীকে ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তি মাহদী সুদানীর আড়ালে মূলতঃ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে টার্গেট বানানোই তাদের উদ্দেশ্য। ১৮৮৫ সালে নির্মিত খারতুম নামক এক নাটকে মাহদী সুদানীকে ইসলামের লেবেলে অত্যন্ত ঘৃণিত ও বিকৃত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছিল। নাটকটি লন্ডনে মঞ্চস্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ এ শতাব্দীর শুরুর দিকে এ. আই. ডব্লিউ সোনি রচিত 'চার পালক' উপন্যাসের নাম করা যায়। এ উপন্যাসটি এমন এক কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে, যা ইহুদী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। যদিও সমালোচক এটিকে ইংরেজি ভাষার উপন্যাসসমূহের মধ্যে অত্যন্ত নিম্নমানের সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু ১৯২৯ সালে প্রখ্যাত ইহুদী চলচ্চিত্র নির্মাতা আলেকজান্ডার এ উপন্যাসটিকে কোর্ডা ক্যারেজ উইল্টনের নির্দেশনায় চলচ্চিত্রের আকৃতি দান করে। দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ১৯৫৫ সালে 'নীল দরিয়ার উচ্ছাস', তৃতীয় চলচ্চিত্র ১৯৬৪ সালে 'পূর্ব সুদান' নামে সোলনা কোর্ডা ও চার্চ শ্যাডেড (দুজনই ইহুদী) নির্মাণ করে। চতুর্থ চলচ্চিত্র ১৯৭৯ সালে ফরম্যান র‍্যাশোট 'চার পালক' নামে ডান শর্পের নির্দেশনায় প্রস্তুত করে।

এ চারটি চলচ্চিত্রেরই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল, মাহদী সুদানীর ব্যক্তিত্বের আড়ালে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ওপর আগ্রাসন চালানো।

সিনেমার ইতিহাস রচয়িতা জেফরে অবকার্ডাস 'চার পালক' সিনেমার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন, চার পালক সিনেমায় নায়ককে একজন উদার ও পরোপকারীর দৃশ্যে দেখানো হয়েছে। সে আদ্যোপান্ত পরোপকার, আত্মত্যাগের প্রতীক ও আইন-কানুনের প্রতি আনুগত্যশীল। সে যে দেশের জন্য খেদমত আঞ্জাম দেয় সে দেশ তার কাছে খুব প্রিয়। তার অধীনস্থ কর্মচারীদেরও সে অত্যন্ত ভালবাসে। যে দেশে সে অবস্থান করে সে দেশের আদব-কায়দা, প্রথা-প্রচলন ও আকীদা-বিশ্বাসের সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই। অবশ্য স্থানীয় জনগণকে সে সব সময় বিদ্রোহ বিশৃংখলায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকে। বিপ্লবী এবং জাতির পথপ্রদর্শকদের সে মাতৃভূমির অধিবাসীদের শত্রু বানিয়ে উপস্থাপন করে। 'চার পালক' শিরোনামে যত সিনেমা নির্মিত হয়েছে, সেগুলোর ধারাবাহিক পয়গাম হচ্ছে, জনগণ সে সময় পর্যন্ত সচ্ছল সুখী জীবন যাপন করতে সক্ষম নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপর অন্য জাতির ছায়া না থাকবে। আর দ্বিতীয় মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল এ কথা দেখানো যে, মুসলমানদের কথা ও কাজে কোনো মিল নেই। তারা নৈতিক ও চারিত্রিক নীতিমালার কেনোই পরোয়া করে না। ভাষা, তাহযীব-তামাদ্দুন ও কৃষ্টি-কালচার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; বরং তাদের জীবনে এর কোনো স্পর্শই নেই।

www.pathagar.com

১৯৮৫ সালে নির্মিত খারতুম নামক যে নাটকটি লন্ডনে মঞ্চস্থ হয়েছিল তা ১৯৬২ সালে সিনেমার রূপ দেয়া হয়। এই সিনেমায় একটি জল্লাদখানার দৃশ্য দেখানো হয়, যা মাহদী সুদানীর অনুসারীরা বৃটিশ সেনাবাহিনীর জন্য তৈরি করেছিল। এই সিনেমায় মাহদী সুদানীর অনুসারীদের হত্যা, রক্তপাত ও শত্রুর নাক-কান কর্তন ইত্যাদি চরিত্রে দেখানো হয়। তারা 'না'রায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবরের' গগনবিদারী শ্লোগান দিয়ে এ কাজগুলো আঞ্জাম দিচ্ছে। তখন মাহদীর অনুসারীরা বলছিল, হে আমাদের প্রভু! হে আমাদের পবিত্র সম্মানিত মাহদী ! আমরা হাজারো সিপাহীর প্রাণ ও তাদের অস্ত্রশস্ত্র আপনার ওপর উৎসর্গ করেছি। একথা শুনে সাথে সাথে মাহদী সুদানী আসমানের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, হে আমার প্রিয়, হে রাসূলে খোদা। এতটুকু বলার পর সে তার অনুসারীদের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি কি তোমাদের অদৃশ্য সাহায্যের সুসংবাদ শোনাইনি? আমি কি তোমাদের বলিনি, তোমরা শত্রুর ওপর হামলা কর এবং তাদের গোলাবারুদের ভয় অন্তরে রেখো না।

পাশ্চাত্য নির্মিত নাটক ও চলচ্চিত্রে ইসলামের ইতিহাসের সাথে যেভাবে হত্যা রক্তপাতকে অত্যাবশ্যক বিষয়রূপে তুলে ধরা হয়েছে, খারতুম নাটকের পরিতবর্তিত সিনেমারূপ তারই একটি উদাহরণ। সিনেমার দৃশ্যে মাহদী সুদানীকে ব্যবহার করে তারা এই ম্যাসেজ দিতে চেয়েছে, ইসলামী ইতিহাস আর হত্যা-রক্তপাত একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর সাথে ইসলামের জেহাদগুলো তুলনা করা যায়। মূলতঃ ইসলামের ওপর আগ্রাসন চালানোর জন্য ইহুদীরা মাহদী সুদানীকে ব্যবহার করেছে। এ ধারার যেসব সিনেমা নির্মিত হয় তার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মোটা অংকের সম্মানী দেয়া হয়। আর এ কারণেই স্যার লরেন্স, লাপুর, চার্লটন হিসটন ও এ্যানথনী কুইনের মতো আমেরিকা ও বৃটেনের প্রসিদ্ধ অভিনেতারা এসব সিনেমায় অভিনয় করেছেন। মাহদী সুদানী তো শুধু বাহানা; বরং ইসলাম ও তার ইতিহাস বিকৃত করার জন্যই এরকম সিনেমা নির্মাণের ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

ইসলামের ওপর হামলা চালানোর জন্য চলচ্চিত্র নির্মাতা ও পরামর্শকরা যে সময় মাহদী সুদানীকে তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যবহার করেছে, সে সময় লরেন্সের মতো ব্যক্তিত্বকেও তার ষড়যন্ত্রপূর্ণ মেধা ও কীর্তির কারণে ব্যবহার করেছে। তার মাধ্যমে ইসলামী ইতিহাসের এমন বিকৃতি ঘটানো হয়েছে, যা সত্যের অপলাপ ও নিষ্কলুষ চাঁদে কালিমা লেপনের অপপ্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। যেসব বিষয় ইসলামী ইতিহাসের কীর্তি ছিল সেগুলোকে পশ্চিমের কীর্তি হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়েছে।[১]

এ প্রসঙ্গে 'লরেন্স অব এ্যারাবিয়ার'র আলোচনা করাও জরুরী। এ চলচ্চিত্রটি ১৯৬৩ সালে প্রস্তুত করা হয়েছে। ডেভিডলনের নির্দেশনায় শাম স্পেগাল এটি নির্মাণ করেন। এতে শাহ ফয়সালের মতো আরব বিশ্বের বিভিন্ন নেতৃবর্গকে দেখানো হয়েছে। এ সিনেমায় লরেন্সকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও আকর্ষণীয় আর আরব শায়খদের আহমক,

---

১. জুরজী যায়দানের উপন্যাসগুলোতেও তাই করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বোকা, নির্বোধ, দাস, ফকীর ও নিঃস্ব করে উপস্থাপন করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে, তাদের জন্য একে অপরকে হত্যা করা অতি সাধারণ বিষয়। অতিথির কাছ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থ আদায় না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে খাবার দেয়া হয় না। সিনেমার বিভিন্ন দৃশ্যে দেখানো হয়েছে, হত্যা ও রক্তপাত ঘটানোর সময় 'না'রায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবর' শ্লোগান দেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা লরেন্সকে আরব ভূ-খন্ডের অধিবাসীদের কাছে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে উপস্থাপন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে, যাতে আরব বিশ্বের সেসব লোকদের সমর্থন ও প্রশংসা আদায় করা যায়, যারা মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজাবাদী ব্যবস্থ্যা প্রতিষ্ঠা ও ইহুদীদের আবর ভূ-খন্ডে পুনর্বাসনের রাস্তা সুগম করছে।[২] ইসরাঈলী প্রেসিডেন্ট ওয়াইজমেন তার 'অভিজ্ঞতা ও পদস্খলন' গ্রন্থে লেখেন, আমি ঘোষণা দিচ্ছি, জেনারেল লরেন্স আমাদের জন্য যে দামী খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, এজন্য আমি তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং তার খেদমতকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখছি। কারণ তিনি চাইতেন, ফিলিস্তিনী ভূ-খন্ডে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক, যাতে পরবর্তীতে আরবদের ফায়দা হয়।

বাস্তবতা হচ্ছে, লরেন্স অব এ্যারাবিয়া সিনেমার সবটুকুতে ইসরাঈলের প্রেসিডেন্ট ওয়াইজমেনের কথারই বাস্তবায়ন ঘটানো হয়েছে। এতে ভাসা ভাসাভাবে মুসলিম ব্রাদারহুডের তৎপরতাকে বিদ্রোহের ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। তুরস্কের বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে খুব ফলাও করে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে লরেন্সের কীর্তিকে একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এই সিনেমায় শরীফ আলীকে আকার-আকৃতিতে আরবদের মতো দেখানো হয়েছে, যার ভূমিকায় অভিনয় করেছে এক ইহুদী অভিনেতা ওমর শরীফ, কিন্তু আরবদের আকার-আকৃতিকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দেখানো হয়েছে। এতে আরবদের তুলনায় জায়নিস্ট ও পশ্চিমাদের প্রশংসাবাদকে দৃষ্টিতে রাখা হয়েছে।

চলচ্চিত্র জগতের সাথে ইসলামী বিশ্বের শত্রুতা একটি সুস্পষ্ট বিষয়। এতে কোনো ব্যতিক্রম নেই। কিছু কিছু আরব সরকার উত্তর আফ্রিকার শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গের ওপর চলচ্চিত্র নির্মাণ করার জন্য নির্মাতাদের বিপুল অর্থ সরবরাহ করেছে, কিন্তু পরবর্তীতে তারা এই বলে আফসোস করেছেন, ইহুদী নির্মাতারা তাদেরকে ধোকা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উত্তর আফ্রিকা সম্পর্কে অনেক সিনেমা নির্মাণ করা হয়েছে। যেমন–সাগান দুর্গ (১৯৮৩), নতুন মারওয়ান (১৯৩৬), জেনারেল ডেকোরটা (১৯৩৭) ইত্যাদি। এসব সিনেমা নির্মাণে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু এসব সিনেমার কোথাও আমীর আবদুল কাদের আল জাযায়েরী, আবদুল করীম খাত্তা, আবদুল হামীদ বাদিস এবং ওমর মুখতার প্রমুখের আলোচনা নেই। যেসব চলচ্চিত্র

২. পাশ্চাত্য মিডিয়া বাস্তবিক পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের সেসব শাসকদের প্রশংসা করে থাকে, যারা তাদের জেলখানাগুলো ষাট সত্তর হাজার লোক দিয়ে ভরে রেখেছে, যারা ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির বিরোধী এবং যারা নামায, রোযা আদায় এবং দাড়ি রাখার মত বিদ্রোহী কাজে জড়িত। অপরদিকে এসব মুসলিম শাসক ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক, বীমা, কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইহুদীদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নির্মাণ করা হয়েছে, তাতে আরবদের গাদ্দার, বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দেখানো হয়েছে। তারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে হাজার হাজার জার্মান সেনার সাথে ইংরেজ সেনাদেরও হত্যা করিয়েছে। আরব যুবকদের সামান্য অর্থ কিংবা সুন্দরী নারী দিয়ে একাজ করানো হতো।

'জেনারেল পাইন' নামক সিনেমাকে শ্রেষ্ঠ সিনেমা আখ্যা দিয়ে অস্কার পুরস্কারের পাশাপাশি আরো ছয়টি পুরষ্কার দেয়া হয়েছে। এই সিনেমা সম্পর্কে প্রোপাগান্ডা চালানো হয়, এটি সত্য, বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বাস্তবে তা মিথ্যা ও অপবাদে ভরপুর, যা হলিউডের সিনেমার বৈশিষ্ট্য। এ সিনেমার দর্শক বাস্তবে এ পরিণতিতে উপনীত হবে যে, এতে বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়েছে। এই সিনেমায় ইহুদীদের কর্মকা কে ঔজ্জ্বল আর আরবদের লাঞ্ছিত অপমানিত বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইহুদীদের জানবায, বীর-বাহাদুর, দানশীল, ভদ্র ও ক্ষমাশীল আর আরবদের কাপুরুষ, অলস, গাদ্দার, বিশ্বাসঘাতক, খেয়ানতকারী, কপট, হত্যাকারী, লুণ্ঠনকারী, জালেম ও রক্ত পিপাসু ইত্যাদি চরিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। এমন দৃশ্যও দেখানো হয়েছে, মার্কিন সিপাহী নেশায় বুঁদ হওয়া সত্ত্বেও ইজ্জত ও সতীত্বের সংরক্ষক আর আরবরা তার উল্টো বিলাসী এবং নারী লোভী।

আলজেরিয়া সম্পর্কে দশটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। এসব চলচ্চিত্রে আলজেরিয়ার মুজাহিদদের ডাকাত, লুণ্ঠনকারী ও জালেম বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। আলজেরিয়া সম্পর্কিত দশটি চলচ্চিত্রের সবগুলোতেই এ দৃশ্য দেখানোর প্রয়াস চালানো হয়েছে, যারা ফ্রান্সের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে তারা চোর, ডাকাত, হত্যাকারী, অপরাধী এবং দুশ্চরিত্র। তাদের জন্য নিষ্পাপ শিশু ও নারীদের হত্যা করা অতি সাধারণ বিষয়। তারা আবার এ ধরনের কর্মকান্ড করে মসজিদে নামায আদায় করে।

হলিউডের চলচ্চিত্র নির্মাতারা সর্বদা পাশ্চাত্যের সামনে মুসলমানদের বিকৃত ও ঘৃণিত আকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে ইহুদীদের ফরমাঁবরদার ও আনুগত্যশীল বানিয়ে পেশ করে। এর কারণ, যাতে কোনো মার্কিনী আরব কিংবা মুসলমান শব্দ শোনার সাথে সাথেই একথা চিন্তা করে, এ তো ধোকাবাজ, প্রতারক, হত্যাকারী ও লুণ্ঠনকারী এবং যে আমেরিকা ও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রাণের শত্রু।[৩]

অতএব, তাদের কর্মকা র সাথে এমন ঘৃণ্য অপছন্দনীয় দিক সংযুক্ত করে দেয়া হয়, যা কখনোই মানবীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এতে দর্শকরা ভাবতে শুরু করে, এমন মানুষ তো ধরিত্রী বক্ষের কঠিন বোঝা। তখন তাদের কামনা জাগে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এমন পশু স্বভাব লোকদের থেকে নাজাত পাওয়া উচিত।

৩. ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলার মার্কিন ষড়যন্ত্র, অতঃপর ১৯৯৫ সালে ওকলোহোমায় ধ্বংসাত্মক বোমা হামলার পর পরই পাশ্চাত্য মিডিয়া আমেরিকা ও ইউরোপে অবস্থিত মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার ছড়াতে কোনো ত্রুটি অবশিষ্ট রাখেনি। সময়ে সময়ে এরকম নাটক মঞ্চস্থ হয়েই চলেছে, যাতে মুসলিম চরিত্র হনন কর্ম অব্যাহত থাকে। ১১ সেপ্টেম্বরের পরও এ কাজই করা হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রফেসর ডেগালস কিলজ এবং মাইকেল রামান ইয়ান তাদের যৌথ গ্রন্থে লেখেন, পশ্চিমা সিনেমায় আরবদের বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক ও অতিলোভী আকৃতিতে দেখানো হয়, যাতে দর্শকরা এ প্রত্যয় পোষণ করতে বাধ্য হয় যে, সকল অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য এই গোঁড়া সন্ত্রাসী আরবরাই দায়ী। যারা নিরীহ-নিষ্পাপ মানুষকে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে এবং তারা তাদের ভোগ বিলাসিতা অটুট রাখার জন্য ইউরোপ আমেরিকায় তেল সরবরাহ বন্ধ করে তাদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করে।

ম্যাচ গ্রন ফিল্ড নিউজউইককে লেখেন, আগামীতে আমরা যা কিছু দেখব, তাতে নিশ্চিত অতীতের পুনরাবৃত্তি করা হবে। সেখানে কোনো ঘটনা কম করে পেশ করা হবে না; বরং গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য তাতে আরো রং চড়িয়ে প্রচার করা হবে এবং একথারও পুনরাবৃত্তি করা হবে, আরবরা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে পশ্চিমাদের নিশ্চিহ্ন নির্মূল করে দিতে সচেষ্ট।

হলিউডে তৈরি সিনেমাগুলোতে মুসলমানদের চরিত্রের সাথে এমন দিকগুলো সম্পর্কিত করে দেয়া হয়, যা সাধারণতঃ কোনো মানুষের চরিত্র বৈশিষ্ট্য হয়তো হতে পারে না। অনুরূপ পাশ্চাত্যে তৈরি সিনেমাগুলোতে আরব নারীদের এমন নর্তকীর দৃশ্যে দেখানো হয়, যারা নগ্ন পেট ও বুকের প্রদর্শনী করে ফিরতে থাকে। অথবা কখনো তাদের কালো নগ্ন লেবাসে দেখানো হয়। আর পুরুষদের প্রকাশ্যতঃ কুফার দর্শনার্থী বানিয়ে আবাকাবা পরিহিত, কালো চশমা লাগানো অশ্বারোহী বেশে দেখানো হয়, যাদের একমাত্র কাজ ইউরোপীয় নারীদের অপহরণ করা। তাদের পশ্চাত দৃশ্যে থাকে তেলের খনি আর দুই হাতে বিপুল বিত্ত। আরব নারীদের হয়তো দেখানো হয় তারা সর্বদা যৌন ক্ষুধায় বিভোর, অথবা নর্তকী ও নাচ-গান ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। তারা হয়তো অশ্লীল কর্মে লিপ্ত, অথবা নিজের হীন কর্ম দ্বারা অন্যদের ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখে। অথবা তাদের আপাদমস্তক বোরকা পরিহিত নারীরূপে দেখানো হয়। যাদের প্রত্যেকেই তাদের স্বামীদের পেছনে এমনভাবে পথ চলে, যেন তার স্বামী থেকে পৃথক হওয়া একেবারেই পছন্দনীয় নয়।[৪] বৃটেনে নির্মিত 'উপহার' নামে একটি সিনেমায় দেখানো হয়েছে, আরব আমীর ও শায়খরা প্যারিসে সফরে যাওয়ার সময় ডজনে ডজনে সুন্দরী নারী সাথে নিয়ে যায়। তাদের হোটেলে আবদ্ধ রেখে এসব আরব আমীর ও শায়খরা প্যারিসের পতিতাদের সাথে যৌন বিলাসিতায় মত্ত হয়। অন্যদিকে হোটেলে অবস্থানরত আরব নারীরা হোটেলের বৃদ্ধ কর্মচারীদের সাথে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়।

৪. এ তো হচ্ছে পাশ্চাত্য চলচ্চিত্র নির্মাতাদের উপস্থাপিত আরব নারীদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য। ইহসান আবদুল কুদ্দুস, আহমদ বাহাউদ্দীন, মুহাম্মদ আতা তাবেয়ী এবং নজীবরাও কম করেননি। তারা আরব নারীদের যে চিত্র উপস্থাপন করেছেন, তা পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের উপস্থাপিত দৃশ্য থেকে কোনো অংশে কম নয়। নমুনা হিসেবে 'আরজুকা খুযনী মিন হাযাল বারমিল' গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে। এ যেন ফারসী ভাষার সে প্রবাদ বাক্যের মতো, যার মর্ম হচ্ছে-'আমি অন্যের জন্য কখনো কাঁদছি না, কিন্তু আমি নিজে কি করছি।'

www.pathagar.com

এখানে আমরা ইহুদী মালিকানাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা কোম্পানী মেট্রো গোল্ডেনের নির্মিত দু'টি সিনেমার কথা আলোচনা করব। যার একটি শিশু ও যুবকদের জন্য অপরটি বিজ্ঞানের উৎকর্ষ দেখানোর জন্য নির্মাণ করা হয়েছে, কিন্তু দুটো সিনেমাই আরবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। যা কাহিনীকারের মেধা ও ইহুদী ষড়যন্ত্রের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেশ করে।

উড়ন্ত বিড়াল

মেট্রো গোল্ডেন কোম্পানী নির্মিত প্রথম সিনেমাটি হচ্ছে 'উড়ন্ত বিড়াল'। এটি শিশু ও যুবকদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে ঠিক, কিন্তু যে মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নির্মাণ করা হয়েছে তাতে বড়দের জন্যই এটি বেশি উপযোগী এবং তারাই বেশি দেখতে আগ্রহী।

সিনেমার ঘটনাটি মোটামুটি এমন–একটি সুন্দর ছোট্ট বিড়াল দূর-দূরান্তে অবস্থিত একটি দ্বীপ থেকে উড়ে আসে, যেখানে শুধু বিড়ালরাই বাস করে। তাদের সকলেই খুব হুশিয়ার ও বুদ্ধিমান। বিড়ালটির গলায় একটি তাবিজ বাধা ছিল। তাবিজের কারণে তার মধ্যে এমন অসাধারণ শক্তি সঞ্চারিত হয়, যাতে সে প্রতিটি বস্তুর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করছিল। অনেক ঘটনা দুর্ঘটনা অতিক্রম করে এক মার্কিন বুদ্ধিজীবী চেষ্টা করে, যাতে কোনোভাবে বিড়ালটির তাবিজ ছিনিয়ে নিয়ে কোনো ভালো কাজে লাগানো যায় এবং এর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা সংকটগুলো নিরসন করা যায়। এ চিন্তায় সে বিড়ালটিকে খুব আদর ও সোহাগ করতে থাকে। বিড়ালটিও মার্কিন বুদ্ধিজীবীকে সহযোগিতা করতে চায় এবং তাকে অনেক উপকারী পরামর্শ দেয়। ইতোমধ্যে কোত্থেকে এক ভয়াবহ দলের আবির্ভাব হয়। যারা বিড়ালের তাবিজটি ছিনিয়ে নিয়ে গোটা বিশ্ব কবজা করে নিতে চেষ্টা করছিল। দলটির সবারই লেবাস ও চাল-চলন ছিল আরবদের মতো।

সবার হাতেই ছিল তরবারি। তারা একে অপরকে আহমদ, মুহাম্মদ, জাফর, আলী ইত্যাদি নামে ডাকে। এ দলের লীডারের নাম ওমর। তার আশ্রয়স্থল দেখানো হয় মসজিদ। সিনেমার বিভিন্ন স্থানে এমন এমন দৃশ্যের অবতারণা করা হয়, যেগুলোতে মসজিদের সীমারেখার মধ্যে নারী ও মদ নিয়ে ভোগ-বিলাসের জঘন্য দৃশ্য প্রদর্শন করা হচ্ছিল। আযান পর্যন্ত ভোগ বিলাসিতার এ দৃশ্য চলতে থাকে। যখন আযানের আওয়াজ ভেসে আসে তখন সবাই নামাযে শরীক হয়ে যায়।৫ এভাবে দেখানো হয়েছে, মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলো বিশৃংখলা, অন্যায় ও অশ্লীলতার কেন্দ্র। এজন্য এগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয়া উচিত। সিনেমার সর্বশেষ দৃশ্যে দেখানো হয়েছে, সেই ভয়াবহ দলটির কারণে মসজিদকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে।

---

৫. আমেরিকান সিয়াটেল প্রভৃতি শহরে শরাবখানার ইমারত মসজিদের আকৃতিতে বানানো হয়েছে এবং এগুলোর নামকরণও আরব মসজিদগুলোর মতো করা হয়েছে। লন্ডন, প্যারিস এবং তেলআবিবে নৈশ ক্লাব ও শরাবখানার ইমারতগুলো সবুজ গম্বুজ এবং মিনারা সজ্জিত করে সেগুলোর নাম মক্কা মুকাররমা এবং মদীনা মুনাওয়ারা রাখা হয়েছে।

www.pathagar.com

ধুলোর জাহাজ

মেট্রো গোল্ডেন কোম্পানীর দ্বিতীয় সিনেমাটি হচ্ছে, 'ধুলোর জাহাজ'। এটি নির্মাণ করা হয়েছিল ১৯৮১ সালে। এর মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানের উৎকর্ষ দেখানো। এ চলচ্চিত্রের কাহিনী হচ্ছে বিজ্ঞান সফর। মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের একদল ধুলোর জাহাজে সফর করছে। সফরসঙ্গীদের মধ্যে এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারীও ছিল। সফরের মাঝে জাহাজ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সফরকারী দলটি আফ্রিকার জংলী মানুষখেকোদের হাতে ধরা পড়ে যায়। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আফ্রিকার জংলীরা তাদের হত্যা করার মনস্থ করে। ইতোমধ্যে তারা কৌশলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপর তারা আবার ধুলোর জাহাজে চলতে শুরু করে। কিছুদিন চলার পর জাহাজটি এমন জায়গায় অবতরণ করে, যেখানের বাসিন্দারা সবাই মুসলমান। সেখানের বেশিরভাগ লোক তাঁবুতে বাস করে। তাদের কাঁচা রাস্তাঘাট উটের চলাফেলার কারণে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। সেখানকার লোকেরা ধুলোর জাহাজ দেখে মনে করল, মনে হয় আসমান থেকে কোনো শয়তান অবতরণ করেছে। সুতরাং ভয়ে তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। মুআযিযন আযান দিতে উঁচু জায়গায় ওঠে। সবাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, হে আল্লাহ ! আমাদের এই শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর। এ সফরকারী দলের লোকেরা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করার জন্য মুসলমান আরবদের শহরে প্রবেশ করে বুঝতে পারে, এরা শয়তান নয়, আমাদের মতোই মানুষ। তারা মুসাফির দলের লোকদের তাদের আমীরের শাহী মহলে নিয়ে যায়। দলটি যখন আমীরের দরবারে পৌঁছে তখন আমীর সুন্দরী নারী ও ওলামায়ে কেরামের মাঝে বসা ছিলেন। একই সাথে সেখানে কুরআনও পড়া হচ্ছিল আবার অনৈতিক কর্মকান্ডও চলছিল। আমীরের দৃষ্টি দলের অনিন্দ্যসুন্দরী নারীর প্রতি পড়ার সাথে সাথে তাকেও তার সেবিকাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার মনস্থ করেন। ফলে দলের সদস্য ও শহরবাসীদের মধ্যে প্রচন্ড লড়াই হয়। শেষ পর্যন্ত সুন্দরী নারীর কারণে সফরকারী দলের সবাই মুক্তি লাভ করে এবং ধুলোর জাহাজে করে সরে পড়ে।

গোটা সিনেমায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারের শত্রুতা প্রদর্শন করা হয়েছে। যেখানেই সুযোগ পাওয়া গেছে সেখানেই ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় করা হয়েছে। তাদের জংলী, মানুষখেকো ও বর্বর দৃশ্যে দেখানো হয়েছে। লড়াই-যুদ্ধ শেষ করে যখন তারা গনীমতের সম্পদ নিয়ে ফিরে তখন আযান ও না'রায়ে তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে ফিরে।

পশ্চিমা চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত মুসলমানদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য

পশ্চিমা চলচ্চিত্রে সাধারণত মুসলমানদের যেসব চরিত্র বৈশিষ্ট্যে দেখানো হয়, তা মৌলিকভাবে ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়।

০১. মুসলমানারা –বিত্তশালী ও বিলাসী।
০২. মুসলমানরা–সন্ত্রাসী ও বিপর্যয়-বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী।
০৩. মুসলমনারা–প্রবৃত্তি পূজারী
০৪. মুসলমানরা–প্রান্তিক ও হাসি-তামাশার পাত্র।
০৫. মুসলমানরা–শয়তান ও নির্দয়-নির্মম।
০৬. মুসলমানরা–ভবিষ্যতের জন্য বিপদ।

www.pathagar.com

মুসলমানরা–বিত্তশালী ও বিলাসী

উদাহরণস্বরূপ এমন ছয়টি চলচ্চিত্রের নাম করা যায়, যেগুলোতে এমন কোনো না কোনো ধনাঢ্য বিত্তশালী আরব রয়েছে, যে অবশ্যই নিরর্থক ফালতু কাজে হস্তক্ষেপ করে। তার চেষ্টা থাকে অঢেল বিত্ত বৈভব দ্বারা সমগ্র দুনিয়াকে কবজা করার। যেসব চলচ্চিত্রে এসব দৃশ্য দেখানো হয়েছে সেগুলো হল–'নীল দরিয়ার মতি', 'অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি', 'প্রতিরোধের উর্ধ্বে', 'লোলিরো', 'উরুগুয়ের মরুভূমি' প্রভৃতি। এ ছাড়া ১৯৮৫ সালে 'পরিবেষ্টন' ও 'অপহরণকারীদের পলায়ন' নামে টেলিভিশনের জন্য এমন দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে; যাতে আরবদের বেওকুফ নির্বোধ, বিত্তশালী এবং বিলাসী আয়াশপ্রিয় দেখানো হয়েছে।

মুসলমানরা–সন্ত্রাসী ও বিপর্যয়-বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী

মার্কিন চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান হলিউডের নির্মিত 'অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি' নামক সিনেমায় দেখানো হয়েছে, এক আরব শাসক একটি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের পরিকল্পনা করছে। বিষয়টি জানতে পেরে সিনেমার নায়িকা গোল্ডি হাওন সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়। এ কাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে নায়িকা আরব শাসকের হাতে ধরা পড়ে যায়। শাস্তিস্বরূপ তাকে আরব শাসকের সাথে বিবাহ বসতে বলা হয়, নতুবা তাকে আমেরিকায় ফিরে যেতে দেয়া হবে না। এভাবে আরব শাসক চায়, নায়িকার সাথে বিলাস করবে এবং তার মাধ্যমে যখন ইচ্ছা মার্কিন রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে। এক পর্যায়ে নায়িকা আরব শাসকের হাত থেকে মুক্তিলাভে সক্ষম হয়। মুক্তিলাভের পর মার্কিন টিভির পর্দায় আবির্ভূত হয়ে সে ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ তুলে ধরে। সবশেষে সে মন্তব্য করে, মুসলমানরা সন্ত্রাসী ও বিপর্যয়-বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী। তাদের অস্তিত্ব আমাদের শান্তি-নিরাপত্তার জন্য অব্যাহত হুমকি।[৬]

মুসলমানরা–প্রবৃত্তি পূজারী

পশ্চিমা চলচ্চিত্রে এ দৃশ্য দেখাতে মোটেও দ্বিধা করা হয় না যে, আরব ও মুসলমানরা নারীদের ব্যাপারে একই রকম লালায়িত ও বুভুক্ষু। তারা প্রবৃত্তি পূজারী। তারা কোনোভাবেই নারীদের সাথে যৌনকর্মে পরিতৃপ্ত হয় না। তাদের সবচে দুর্বল দিক হলো নারী, বিশেষ করে ইউরোপিয়ান শ্বেতাঙ্গ নারীরা হলো তাদের সবচে' প্রিয় বস্তু। মুসলমান ও আরবদের সম্পর্কে এ ধরনের দৃশ্য প্রায় অধিকাংশ সিনেমাতেই দেখানো হয়। অথচ পশ্চিমারা দাবী করে, তারা সব বিষয়ে নিরপেক্ষ। যেমন 'মিউনিখের কীর্তি' নামক সিনেমাটি আরব বিশ্ব ও ইসরাঈলের সব জায়গাতেই প্রদর্শন করা হয়। এ সিনেমার নামকরা অভিনেতা হল স্পিনার ও ট্রান্স বিল। নির্মাতাদের দাবী, সিনেমাটি নিরপেক্ষ, কিন্তু এতে আবরদের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকে চলে আসা ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা

---

৬. ২০০৬ সালের এক রিপোর্টে দেখা যায়, ১১ই সেপ্টেম্বরের পর 'দ্য সিজ, শেখ, দ্য জুয়েল অব দ্য লাইন' ইত্যাদি নামে হলিউডে অন্তত ১২টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে, যেগুলোতে মুসলমানদের নিকৃষ্ট হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।-অনুবাদক

www.pathagar.com

অত্যন্ত সুন্দর মোড়কে উপস্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু আরবরা তামাশা দেখার মতো তা উপভোগ করতে থাকে। পশ্চিমাদের ঠিকই উপলব্ধি আছে, সিনেমার পর্দায় যাদের দেখানো হয় তারা সেসব ব্যক্তি, যারা সোনালী চুল আর সাদা চামড়ার সুন্দরী নারীদের সৌন্দর্যের উত্তাল সহ্য করতে পারে না। তাদের সামনে পানি পানি হয়ে যায়। পশ্চিমারা ভালো করেই জানে, আরবদের ঘায়েল করার একমাত্র পথ সুন্দরী নারী। যখন মার্কিনীদের আরব বিশ্বের অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে কোটি কোটি ডলারের মার্কিন বিমান ক্রয়ে তাদের রাজি করাতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা আরব প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানাতে লম্বা চুল আর সাদা চামড়ার সুন্দরী এয়ার হোস্টেস প্রেরণ করে। কারণ তারা বিলক্ষণ জানে, এতে সহজেই আরবরা মাত হয়ে যাবে। এই সুন্দরী নারী যখন কোনো দাবী করবে তখন তাদের পক্ষে সেটা প্রত্যাখ্যান করার কোনো সুযোগ থাকবে না। যে কাজ পূর্বে দশ কোটি ডলারেও সম্ভব ছিল না সে কাজ এখন বিশ কোটি ডলারে সিদ্ধান্ত হয়। কথোপকথন ছাড়াই অত্যন্ত সহজে সাদামাটাভাবে এটা প্রমাণ করে দেয়া হয়।

'রোলিরো' নামক সিনেমায় দেখানো হয়েছে, এক আরব শায়খ এক যুবতী নারীকে অনৈতিক কাজে রাজি করাতে ব্যর্থ হয়ে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। 'নীল দরিয়ার মতি' সিনেমায় দেখানো হয়েছে, সিনেমার নায়িকা এক আরব শাসকের জীবনী লেখার উদ্দেশে তথ্য সংগ্রহের জন্য তার প্রাসাদে প্রবেশ করে। সেখানে পৌঁছে নায়িকা অনুভব করতে পারে, সে আরব শাসকের জালে আটকা পড়ে গেছে এবং সে তার কাছে বন্দিনী। খুব দ্রুত নায়িকা অনুমান করে ফেলে, আরব শাসক যৌনতার দিক থেকে খুবই দুর্বল।

মুসলমানরা–প্রান্তিক ও হাসি-তামাশার পাত্র

১৯৮৪ সালে নির্মিত 'মরুভূমি' নামক সিনেমায় দেখানো হয়েছে, আরবরা যাদুটোনায় বিশ্বাস রাখে। তারা যে কাজই করে তার ওপর হাসি আসে।

১৯৮১ ও ১৯৮৪ সালে দুই পর্বে নির্মিত 'গুলি' নামক সিনেমায় দেখানো হয়েছে, এক আরব আমীর ফালাফেল তার ছেলেকে তিরস্কার করছে, সে কেন মোটর দৌড়ে হেরে গেছে। সে ঝিড়কি মেরে ছেলেকে বলছে, আমার কুৎসিত স্ত্রীর অনুপযুক্ত ছেলে! নে, এই দুই মিলিয়ন ডলার নিয়ে আমেরিকায় চলে যা। হয়ত বা সেখানে তুই দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করতে পারবি। এই কথোপকথনের পর অত্যন্ত হাসি-কৌতুক ও ব্যক্তি স্বার্থপূর্ণ কিছু দৃশ্য অতিবাহিত হওয়ার পর একটি দৃশ্য সামনে আসে, যাতে আমীর ফালাফেল বলছে, রাতে আল্লাহ তাআলা আমার নিকট এসে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমার সমুদয় সম্পদ মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দাও। নে, এই সম্পদ নিয়ে যা আর কাপড় ভর্তি আলমারি কিনে আন। দৃশ্যে দেখানো হয়েছে, ছেলে পশ্চিমা হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে আর পিতার সাথে কথা বলছে। এ দেখে পিতা ছেলেকে বলে, তোমার যেহেতু এ হারমোনিয়াম পছন্দ, তাই আমি ৪৮ মিলিয়ন ডলার দিয়ে সে কোম্পানী কিনে নিয়েছি, যে কোম্পানী এ হারমোনিয়াম বানিয়েছে।

www.pathagar.com

মুসলমানরা-শয়তান ও নির্মম নির্দয়

পাশ্চাত্য নির্মিত কিছু সিনেমায় অত্যন্ত সোৎসাহে দেখানো হয়েছে, আরবরা যখন কাউকে হত্যা করে তখন অত্যন্ত নির্মম ও নির্দয়ভাবে হত্যা করে। অথচ আরবদের জীবনের সাথে এর দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই। আরবদের লাঞ্ছিত, হীন ও অপমানিত করার জন্যই তাদের হত্যাকারী, জালেম, নির্মম-নির্দয় দৃশ্যে দেখানো হয়। ১৯৮৪ সালে নির্মিত 'শয়তান' নামক সিনেমায় জর্জ হর্সকে শয়তানের আকৃতিতে দেখানো হয়েছে। যে এক আরব নেতার আনুগত্যে গর্ববোধ করে।

১৯৮৫ সালে নির্মিত 'অগ্নি সংযোগ' এক সিনেমায় দেখানো হয়েছে, এক রিসার্চ ফেলো ছাত্রীকে এক আরব অপহরণ করে হোটেলে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে নেশাদ্রব্য খাইয়ে তার ইজ্জত লুণ্ঠন করে। এ এক এমন আরব, যার ইজ্জত সম্মানের কোন পরোয়া নেই। সে সব সময় যৌন নেশায় উন্মাদ হয়ে থাকে। সে যৌনতার প্রতি প্রচন্ড দুর্বল মনে হয়। এজন্যই আরবদের মাধ্যমে নেশা ও মাদক দ্রব্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটানো হচ্ছে।

মুসলমানরা-আগামীর জন্য বিপদ

১৯৮৫ সালে নির্মিত এক সিনেমা শুধু একথা জানান দিতে নির্মাণ করা হয়েছে যে, আরব বিশেষ করে মুসলমানরা আগামীর জন্য বিপদ। তাই তাদের সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। আরবরা এমন ইসলামী বোমের অনুসন্ধানে রয়েছে, যা দ্বারা তারা উন্নত পৃথিবীকে ধ্বংস বরবাদ করে দেবে।

পাশ্চাত্য টিভি কোম্পানীসমূহের মাধ্যমে মুসলমানদের চরিত্র হনন

পাশ্চাত্য টেলিভিশনের ভূমিকা সেখানে নির্মিত চলচ্চিত্র থেকে কোনো অংশেই কম নয়। ডিশ এন্টিনা ও স্যাটেলাইটের কারণে আজ প্রতি মুহূর্তে আন্তর্জাতিক পরিম লে টিভি সংবাদ ও অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার অতি সহজ হয়ে পড়েছে। ফলে টিভি গোটা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মন-মগজ ধোলাই ও প্রভাবিত এবং তাদের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার এক সক্রিয় ও শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আন্ত র্জাতিক টিভি নেটওয়ার্কের পুরোটাই সুচতুর ধুরন্ধর ইহুদীদের দখলে। টিভির সংবাদ ও চিত্রসমূহ লাগাতার নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্প্রচারিত হওয়ার কারণে দর্শকরা এ বিচার করার সুযোগ পায় না, কোনটি ভাল আর কোনটি খারাপ। কারণ প্রতি মুহূর্তেই তারা বিভিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ও শ্রবণ করে। স্বচক্ষে ঘটনা প্রত্যক্ষ করাই একথার প্রমাণ যে, টিভির প্রতিটি সংবাদ ১০০% সত্য। সংবাদ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার ছাড়াও সিরিজের মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাদের মগজ ধোলাই আর মানসিকতা প্রস্তুত করা হয়। এমনিভাবে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনও টিভিতে সম্প্রচার করা হয়। এর দ্বারা একদিকে শিল্পপণ্যের পরিচিতি করানো হয়, অপরদিকে শত্রুর বিরুদ্ধে দর্শক-শ্রোতাদের মন মগজ বিষিয়ে তোলা হয়। এর পাশাপাশি অনৈতিকতা অশ্লীলতাও সহজেই বিকশিত করা যায়। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলো দ্বারাই ইহুদীদের ইসলাম বিরোধিতা, আরবদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ,

www.pathagar.com

শত্রুতা এবং মুসলিম উম্মাহকে ধোকা দেয়া ও প্রতারিতকরণে তাদের চালাকি, মেধাবী ও ষড়যন্ত্রপূর্ণ প্রকৃতি সহজেই অনুমান করা যায়।

মার্কিন টিভি কোম্পানী ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং (এন.বি.সি) ১৯৬৪ সালে 'বিকৃত তাওরাত' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। এক খৃস্টান পাদরী নায়কের ভূমিকা পালন করে। এই ছবিতে অত্যন্ত মেধা ও দক্ষতার সাথে সাধারণ মার্কিনীদের একথা বোঝানোর পূর্ণ প্রয়াস চালানো হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃস্টানদের মাঝে আকীদাগত মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। আর হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার যে অভিযোগ ইহুদীদের ওপর আরোপ করা হয় ইহুদীরা তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।[৭]

দ্বিতীয় মার্কিন টিভি কোম্পানী আমেরিকান ব্রডকাস্টিং (এ.বি.সি) লাগাতার চার সপ্তাহ ধরে ইসরাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা সম্পর্কে একটি সিরিজ প্রচার করে, তাতে ইহুদীদের মজলুম, ভদ্র, সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত সম্প্রদায় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৯৮২ সালে ইসরাঈলী বাহিনী লেবাননের ওপর কঠিন বোমাবর্ষণ করে। সাবরা, শাতিলা ও আইনুল হালওয়া শরণার্থী শিবিরে অবস্থানরত ফিলিস্তিনীদের ব্যাপকহারে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় সাড়ে সতের হাজার ফিলিস্তিনী নারী, পুরুষ ও শিশু নিহত হয়। মার্কিন টিভি যখন এই ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের সংবাদ পরিবেশন করে, তখন এ ঘটনার দায় থেকে ইহুদীদের সম্পূর্ণ মুক্ত ঘোষণা করে এর পুরো দায়-দায়িত্ব লেবাননের একটি গোষ্ঠী মারুনীদের ঘাড়ে চাপানোর অপচেষ্টা চালায়। পশ্চিমা মিডিয়া বার বার ইহুদীদের মুক্ত ও নির্দোষ ঘোষণা করতে থাকে। এর সাথেই এ.বি.সি টিভি ইসরাঈলের সাবেক প্রেসিডেন্ট আজরা ওয়াইজ মিলিয়ন লিখিত 'শান্তির জন্য যুদ্ধ' নামক গ্রন্থের পরিচিতি প্রসঙ্গে লেখকের সাক্ষাতকার গ্রহণ করে। এ সাক্ষাতকারে বলা হয়, ইসরাঈলের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা শান্তি-নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য। এ উদ্দেশ্যে লাখ লাখ মানুষ হত্যা করার প্রয়োজন হোক না কেন।

টিভি সিরিজ তৈরিকারী প্রসিদ্ধ মার্কিন কোম্পানী ক্যাননের মালিক ইহুদী। এ নামে তার একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ কোম্পানীও রয়েছে। আরব বিশ্বের প্রতিটি শহরে এ কোম্পানীর শাখা রয়েছে। যেখান থেকে সব ধরনের ভিডিও ক্যাসেট বিক্রি করা হয়। এমনিভাবে বৃটিশ ইহুদী পুঁজিপতি লর্ডগার্ড ইটিভি কোম্পানীর মালিক। এই কোম্পানী টিভি সিরিজ তৈরি করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাপ্লাই করে। ডালাস নামক প্রসিদ্ধ সিরিজ এই কোম্পানীরই তৈরিকৃত। ফ্রান্স ও বৃটেনের টিভি কোম্পানীগুলোও ইহুদী পুঁজিপতিদের দখলে। এসব টিভি কোম্পানী বিভিন্ন সিরিজ তৈরি করে সাপ্লাই করে। তাদের তৈরিকৃত সিরিজ 'ওনায়তিবী', 'এয়ারপোর্ট কী কারওয়াই' 'গোল্ড আমীর' 'এক ফোলাদী আওরত' প্রভৃতির মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে ইহুদীদের বীর-বাহাদুর, শান্তির প্রতীক, মেধাবী, কর্মপ্রিয় ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত বলে প্রমাণ করা হয়েছে।

---

৭. ইহুদীরা তাদের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় এভাবে সফলকাম হয়েছে যে, ভেটিকান সিটির পোপ জনপল কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভায় আলোচনা-পর্যালোচনার পর এই বিবৃতি জারি করে যে, ইহুদীরা হযরত ঈসার হত্যার অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

www.pathagar.com

বিবিসির তত্ত্বাবধানে টিভি সিরিজ তৈরিকারী এক কোম্পানী 'ইংলিশ শিখুন' নামে একটি ক্যাসেট তৈরি করেছে। এ শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমেও সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে তারা অলসতা করেনি। উদাহরণস্বরূপ এক ক্লাসে যেখানে বিভিন্ন দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর ছাত্র রয়েছে। শিক্ষক প্রশ্ন করেন, তোমরা বলতে পার, নির্বোধ ও বোকার সমার্থক শব্দ কোনটি? ভারতীয় এক ছাত্র উত্তরে বলে, নির্বোধ ও বোকার সমার্থক শব্দ হলো 'মুসলমান'।[৮] 'কম্পন' নামক এক নাটক ১৯৮১ সালে মঞ্চে প্রদর্শন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এটিকে টিভির জন্য তৈরি করা হয়। এ নাটকে 'মুহাম্মদ আরব' নামক এক ব্যক্তি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে। তাকে প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মালিক দেখানো হয়। সে দামী মদ ক্রয় করা এবং এক সুন্দরী ইংরেজ নারীকে উপহার দেয়ার জন্য দশ লাখ ডলার ব্যয় করে, কিন্তু দশ লাখ ডলার ব্যয় করার পরও সুন্দরী ইংরেজ নারী তার জালে আটকায় না এবং তার রূপ-লাবণ্য উপভোগে সফলকাম হয় না। নায়ক নামের জন্য মুহাম্মদ নির্বাচন এবং তার সাথে আরব জুড়ে দিয়ে আরবদের বদনাম করাই মুখ্য কৌশল। কারণ এই দু'টি শব্দের সাথে ইসলামের যাবতীয় চিন্তা-চেতনা জড়িয়ে আছে। এই শব্দ দু'টিকে যদি বদনাম করা যায় তাহলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর রূপ বিকৃত করতে কোনো অসুবিধা হবে না।

টেলিভিশন যেহেতু লাখ লাখ বরং কোটি কোটি মানুষ দেখে। এ জন্য দামী দামী বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনগুলো টিভি কোম্পানীগুলোই পেয়ে থাকে। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য, শিল্পপণ্যের সক্রিয় প্রচার প্রোপাগান্ডা চালানো, যাতে পণ্যটি বেশি বেশি বিক্রি হয়। তাই বিজ্ঞাপনে চিত্তাকর্ষক হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। নতুন নতুন প্যাকিংয়ের সাথে নতুন নতুন নাম দেয়া হয়, কিন্তু ইহুদীদের ধোকাবাজি, প্রতারণা ও চাতুর্যপূর্ণ কলুষ মস্তিষ্ক এসব বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনকেও ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে বদনামগ্রস্ত করার জন্য ব্যবহার করছে। এর জন্য এমন এমন চিত্তাকর্ষক পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে, যার দিকে সম্ভবত শয়তানেরও কল্পনা যায় না।

সিএনএন-এর মতো প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক টিভি কোম্পানীতে সাবানের একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। বিজ্ঞাপনে মডারেট ঘোষণা করছিল, এই সাবান প্রতিটি বস্তুকে পরিষ্কার করে, এমনকি পচা-গন্ধ আরবদেরও পরিষ্কার করে। এ ঘোষণার পর পরই টিভি স্ক্রিনে আরবী পোশাক পরে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, তার চেহারা, হাত ও পোশাকে ময়লাই ময়লা। এরপর এক অর্ধনগ্ন যুবতী নারী সামনে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে পানির হাউজে ফেলে দেয়। এরপর যুবতীও লাফ দিয়ে হাউজে পড়ে সাবান দিয়ে ডলে ডলে তাকে পরিষ্কার করে দেয়। অতঃপর বলে, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি, এর থেকে বেশি পরিষ্কারকারী আর কোনো সাবান নেই। ইতোমধ্যে এক যুবক আসে। তার হাত থেকে একখানা কাগজ নিয়ে অর্ধনগ্ন যুবতীটি

---

৮. মিসরী টিভিতে যে সিরিজ অথবা নাটক উপস্থাপিত হয়, সেগুলোতে এবং সিনেমায় খারাপ কাজের দৃশ্যে অভিনয়কারীর নাম আহমদ, মুহাম্মদ, আবদুল জব্বার, ওমর, আলী রাখা হয়। আপনাদেরই অবস্থা এ রকম, তা হলে অন্যদের সম্পর্কে আর অভিযোগ করার কী আছে।

www.pathagar.com

অত্যন্ত সোৎসাহে পড়তে থাকে, সবেমাত্র ল্যাবরেটরী থেকে এ সাবান সম্পর্কে রিপোর্ট এসেছে, এই সাবানের মধ্যে পরিষ্কার করার ভরপুর শক্তি বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু বিপদ হলো, আরবরা এত অপরিষ্কার যে, এই সাবানও কাজে আসে না। আসল কথা হলো আবরদের জন্য পরিষ্কার থাকা কখনোই সম্ভব না।

এনবিসি টিভিতে এক কোম্পানী বিজ্ঞাপন দেয়, আত্মরক্ষা ও ইজ্জত-সম্ভ্রম হেফাযতের খাতিরে এক বিশেষ রকমের তরল বস্তু ব্যবহার করে একজন দুর্বল লোকও নিজেকে রক্ষা করতে পারে। একদিকে এই ঘোষণা হচ্ছিল অপরদিকে এক অর্ধনগ্ন সুন্দরী যুবতী প্রশান্তির সাথে পায়চারি করছিল। হঠাৎ এক আরব এসে তার সাথে ধস্তাধস্তি করতে লাগল। এরপর সে ছুরির ভয় দেখিয়ে তাকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়। যুবতী তার ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ওই তরল বস্তুটি আরব লোকটির মুখে ছুঁড়ে মারে। এতে সে বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। এরপর যুবতী তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করে আপন রাস্তা গ্রহণ করে।

এক ইটালিয়ান সিনেমার পর্দায় যৌনশক্তি বৃদ্ধির এক ওষুধের বিজ্ঞাপন প্রচার হচ্ছিল। ইত্যবসরে পর্দার সামনে এক বৃদ্ধ লোক আরবী পোশাক পরে আবির্ভূত হয়। তার মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, কোমর ঝুঁকে পড়েছে। বৃদ্ধ হেলতে হেলতে একেক স্টলে যাচ্ছিল, যেখানে নগ্ন যৌন ম্যাগাজিন ও পুস্তক-পুস্তিকা বিক্রি হচ্ছে। ম্যাগাজিনের নগ্ন ছবি দেখে তার চোখে ছানাবড়া সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে যৌনশক্তি বৃদ্ধির এক ওষুধ তার সামনে পেশ করা হয়। ওষুধ পান করেই সে উন্মাদ হস্তির মত ইটালির সড়কে মেয়েদের পেছনে দৌড়াতে থাকে এবং জানোয়ারের মতো মহাসড়কেই অনৈতিক কর্মে লিপ্ত হয়, যা দেখে আশেপাশের মানুষ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। টিভি এবং সিনেমার বিজ্ঞাপন ছাড়াও ইহুদী কারখানার বিভিন্ন পণ্যে এমন এমন বাক্য লেখা থাকে. যা মুসলমানদের চেতনাবোধ আহত ক্ষতবিক্ষত করে এবং তাদের দীন ধর্মকে লাঞ্ছিত করে।

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ইহুদীদের কারখানাগুলোতে বিভিন্ন পণ্যের প্যাকিংয়ে সূরা মারইয়াম এবং সূরা বাকারার শুরুর আয়াতগুলো মুদ্রণ করা হয়েছে।

লন্ডনে প্রসিদ্ধ ইহুদী ডিপার্টমেন্টাল স্টোর মার্ক স্পেন্সার নারী পুরুষের গোপন লেবাস জাঙ্গিয়ায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমা লিখিয়ে 'আল্লাহ' শব্দটি বিশেষ জায়গায় রাখা হয়েছে। আমেরিকা ও লন্ডনের বিভিন্ন যৌন বিষয়ক ম্যাগাজিনে নগ্ন যুবতীদের ছবি কুরআনের আয়াতের মাঝে দেখানো হয়েছে। আমেরিকা, বৃটেন ও ইউরোপের অন্যান্য শহরে নগ্ন ক্লাবগুলো মসজিদের মতো বানিয়ে ওপরে বিদ্যুৎ জ্বালানো সাইনবোর্ডে মক্কা লেখা হয়েছে। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত 'মক্কা' শব্দটিকে বিকৃত করে 'মেক্কা' লেখা হতে থাকে। সাইপ্রাসের এক ইহুদী কারখানার মালিক তার কোম্পানীর তৈরি জুতার গোড়ালি অংশে 'আল্লাহ' শব্দ অঙ্কন করে দিয়েছে।

মার্কিন হোটেলগুলোতে টয়লেট পেপারে দীর্ঘ দিন ধরে জনপ্রিয় বড় বড় ওলামায়ে কেরামের ছবি ছাপা হতে থাকে। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ইসলাম ও তার ধারক-বাহকদের হেয় অপমান করা।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

আরব বিশ্বে পশ্চিমা মিডিয়ার আগ্রাসন

ঐতিহাসিক পটভূমি

পশ্চিমা দেশে সিনেমা, নাটক ও সাংবাদিকতার যুগের সূচনা হয় উনিশ শতকের শেষের দিকে, কিন্তু আরব বিশ্বে সিনেমা ও নাটকের প্রচলন হতে বেশি সময় লাগেনি। কারণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিজয় ও মিডিয়া শিল্পের ওপর ইহুদী পুঁজিপতিদের একচেটিয়া কর্তৃত্বের ভিত্তিতে ১৮৭৬ সালে সাংবাদিকতা ও ১৮৯৭ সালে চলচ্চিত্র শিল্প সর্বপ্রথম মিসর ও লেবাননে, এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আরব দেশে স্বীয় থাবা বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ১৯১৩ সাল থেকে আরব বিশ্বে নির্বাক চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী শুরু হয়।

১৮৯৭ সালের জানুয়ারীতে যখন কায়রোর প্রসিদ্ধ উজবেক পার্কে সিনেমার প্রথম সুটিং শুরু হয় তখন গোটা দেশে হৈ চৈ পড়ে যায়। চারদিকে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইতে থাকে। এই সিনেমার মালিক ও পরিচালক একজন ইহুদী পুঁজিপতি মোসিউ ডালাস্টার লোগো। মিসর সরকার এ ইহুদীকে সারা দেশে এ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সাধারণ অনুমতি প্রদান করে।

১৯০০ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের এক ইহুদী চলচ্চিত্র নির্মাণ কোম্পানী অতঃপর ইটালির দ্বিতীয় ইহুদী কোম্পানী 'ব্যাংক দ্বি রোমা'র আর্থিক সহযোগিতায় মিসরে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে চলচ্চিত্র কোম্পানীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে।

১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তুরস্কে ইহুদী পুঁজিপতিরা ইটালির ইহুদী ধনাঢ্য ব্যক্তি স্টিফেনের সহযোগিতায় মিসরের সিনেমা শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করে। ১৯২৬ সালে দুই মিসরী ইহুদী সহোদর আবরাহাম ও বদরলামা এস্কান্দারিয়াতে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ কোম্পানীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। তাদের কোম্পানী প্রথম যে সিনেমাটি নির্মাণ করে তার নাম—'রুডলফ ওয়েনেস্টো। এ সিনেমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইহুদীদের অত্যাচারিত নিপীড়িত হওয়ার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এ কোম্পানী 'সালাহুদ্দীন' নামে আরেকটি সিনেমা নির্মাণ করে, যা শৈল্পিক সৌন্দর্য, সততা, বস্তুনিষ্ঠতা ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা নির্ভর হওয়ার কারণে একটি শক্তিশালী ও জ্ঞানগর্ভ সিনেমা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। আলোচ্য দু'টি সিনেমা ছাড়াও আলোচ্য ভ্রাতৃদ্বয় ১৯২৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় সত্তরটি এমন সিনেমা নির্মাণ করে, যাতে অশ্লীলতা ও নগ্নতার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে এমন বিষাক্ত উপকরণ ছিল, যা নতুন প্রজন্মের মন-মস্তিষ্ককে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে সীমাহীন বিষাক্ত করে তোলে। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে ঘৃণা ও অসম্মানবোধের এক বিষাক্ত পরিবেশ তৈরি হয়।

www.pathagar.com

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত যেসব চলচ্চিত্র সরকারী অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে, তার মধ্যে ১৪২টি সম্পূর্ণ হলিউডের অনুকরণে, বাকী ২৭৬টি মিসরীয় সমাজের বিভিন্ন কাহিনী ও ঘটনা নিয়ে নির্মিত হয়েছে। মিশরী সিনেমায় কর্মরত অভিনেতা, অভিনেত্রী ও শিল্পীদের ৮০% আরবী নামে প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু তাদের সবার জাতীয়তা ইহুদী। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাম হলো, আসিয়া দাগের, মাযরাহী, মিশেল সোহায়লোব (আরবী নাম ওমর শরীফ), নাজমা ইবরাহীম, রাকিয়া ইবরাহীম, লায়লা মুরাদ, ক্যামেলিয়া, রাজা আবদুহু, জিবরিল তিলহামী, মারিয়া মুনিব, জর্জ আবইয়াজ, দৌলত আবইয়াজ, নজিব আর রায়হানী, ইলিয়াস মোআদ্দাব, ইয়াকুব সানু, আবু নাজ্জারা, নাজওয়া সালেম (আসল নাম নিনাত সালাম) ইত্যাদি।

চলচ্চিত্র শিল্পের ওপর ইহুদীদের বিস্তৃত থাবার কারণে ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৫১ সালের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে হলিউড শুধু ইহুদীদের বিষয়ে ৫৩টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করে, যার সবগুলোই আরবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। মিসরীয় মিডিয়ায় ইহুদীদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য সম্পর্কে উল্লেখ করে প্রসিদ্ধ ইসরাঈলী সাংবাদিক সাহিত্যিক ফোর্স শাম্মাস (জন্ম কায়রোতে)-লেখেন, বিশ শতকে আরব বিশ্বে যেসব চলচ্চিত্র, নাটক ও সংবাদপত্র সামনে এসেছে তার প্রতিষ্ঠা ও তাতে বিনিয়োগ পর্যন্তই ইহুদী পুঁজিপতিরা সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং অভিনয়ের ক্ষেত্রেও ইহুদী শিল্পীরা সবার থেকে এগিয়ে। তারা তাদের প্রকৃত নাম গোপন রেখে আরবী নামে এসব চলচ্চিত্রে কাজ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে সিনেমা নির্মাণ, নাটক সৃষ্টিতে, গান রচনা ও লিটারেচার সৃষ্টিতে ইহুদীদের অবদান রয়েছে। প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাতা পরিচালক টোগো মাযরাহীই সর্বপ্রথম মিসরে আরবী সিনেমার গোড়াপত্তন করেন। প্রসিদ্ধ গায়িকা লায়লা মুরাদ ইহুদী বংশোদ্ভূত। যদিও তিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এমনিভাবে আসতার শাত্তাহ, দাউদ হাসানী, মুরাদ ফারাহ এবং ডজনের পর ডজন সাংবাদিক, সমালোচক ও সাহিত্যিকদের সবাই ছিল ইহুদী, যারা তাদের জাতীয় স্বার্থে মিসরী মিডিয়ায় সক্রিয় কর্মতৎপর ছিল। এভাবেই ইহুদীরা মিসরী মিডিয়ায় দখলদারিত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

১৯২৬ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত মিসরে মিডিয়ার ভরপুর স্বাধীনতা ছিল। এ সময়ের মধ্যে মিডিয়া চতুর্দিকে তার হাত-পা প্রসারিত করে। ইহুদী নির্মাতারা যেসব চলচ্চিত্র ও নাটক নির্মাণ করে, মিসরী বুদ্ধিজীবীদের রচিত সাহিত্য ইহুদী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারার সমর্থন করেছে। মিসরী বুদ্ধিজীবীদের ইহুদী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারার সমর্থন নতুন প্রজন্মের মন-মস্তিষ্কে ইহুদীদের রোপিত বীজ ও চারায় ধারাবাহিক খোরাক সরবরাহ করতে থাকে। যেহেতু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কর্মরত বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্ক প্যারিস এবং লন্ডনেই গঠিত হয়েছিল, সে জন্য পশ্চিমা চিন্তা-দর্শন ও মূল্যবোধ আরব বিশ্বে স্থান করে নিতে তেমন একটা বেগ পেতে হয়নি এবং কোনো বাধারও সম্মুখিন হয়নি। খুব দ্রুত পশ্চিমা চিন্তা-দর্শন, মূল্যবোধ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ঢুকে পড়ে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। পুরো গোষ্ঠীই সক্ষম হয় স্থায়ী আসন করে নিতে।

www.pathagar.com

আরব বিশ্বে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, ধর্মহীনতা, নৈতিক ধস, অশ্লীলতা, নগ্নতা ও যৌন বিপথগামিতার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও পরিবেশ তৈরি করার জন্য আরব জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের শক্তিশালী একটি টিম পূর্ণ শক্তি নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। তাদের মধ্যে সালামা মূসা, সাতে আল হিসরী, জুরজী যায়দান (দারুল হেলালের প্রতিষ্ঠাতা), সালিম বাশারা তুকলা (আল আহরামের প্রতিষ্ঠাতা), কাসেম আমীন, আলী আবদুর রাজ্জাক, লুতফী সাইয়েদ, সাদ যগলুল, লুইস ও গালী শুকরী প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শক্তিশালী টিম অত্যন্ত চাতুর্য ও মেধা দিয়ে আরব জাতীয়তাবাদের আড়ালে আরব বিশ্বে ধর্মহীনতার বীজ রোপণ করে, যার শক্তিশালী বৃক্ষের মধ্যে তাওফীক আল হাকীম, নাজীব মাহফুজ, ইহসান আবদুল কুদ্দুস, লুতফী আল খাওলী, আহমদ আব্দুল মুতী হিজাযী, অবদুর রহমান আশ শারকাদী, আলী আমীন, মোস্তফা আমীন, মুহাম্মদ আত তাবেয়ী, যাকী আবদুল কাদের, ফাতেমা রোজ আল ইউসুফ, আমীনা সাঈদ, সালাহ আবদুস সবুর, মারসি জামিল আজীজ, সাদ ওয়াহবা, ইউসুফ আস সুবায়ী, আহমদ বাহাউদ্দীন, ইউসুফ ইদরীস, মোস্তফা বাহজাত বাদাবী ও আনীস মনসূর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এসব লেখক ও সাংবাদিক পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধের প্রসার এবং বিকাশে যেসব চলচ্চিত্র, নাটক এবং সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের আশ্রয় নিয়েছে, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো–দৈনিক আল আহরাম, মাসিক আল হেলাল, সাপ্তাহিক আল মোসাওয়ের, দৈনিক আল আখবার, আখির সাআ, রোজ আল ইউসুফ, হাওয়া আশ শুবকা, আস সাইয়াদ, আল কাওয়াকেব, হুওয়া হিয়া, সাবাহ আল খায়র, দৈনিক আল জমহুরিয়া প্রভৃতি। সাংবাদিকতা, চলচ্চিত্র, নাটক, উপন্যাসে এমন অসংখ্য নাম রয়েছে, যারা আরব দুনিয়ার মন-মস্তিষ্ক বিষাক্ত করতে, যৌন বিশৃংখলা ও চারিত্রিক বিপথগামিতা ব্যাপক করতে এবং সমাজের বন্ধন ও অবয়ব বিক্ষিপ্ত করতে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে।

মিসরী মিডিয়া : একটি জরিপ ও বিশ্লেষণ

মিসরে ফরাসী আগ্রাসনের পর পরই পশ্চিমা মিডিয়া একটি শক্তিশালী ও মজবুত সেনাবাহিনীর মতো নিজের রণাঙ্গন সামলে নেয়। সেমতে মিসর থেকে সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন প্রকাশের জন্য লেবাননী সাংবাদিকদের ডেকে আনা হয়, যাদের পুরো গোষ্ঠীই ছিল খৃষ্টান। এই গ্রুপ মিসরের রাজধানী কায়রোকে আরব বিশ্বের হৃৎপিন্ডে পশ্চিমা মিডিয়া ও সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে। যা হবে একটি স্বতন্ত্র চিন্তা কেন্দ্র। যেখান থেকে গোটা আরব বিশ্বে চিন্তার খোরাক যোগান দেয়া হবে।

কায়রো থেকে ১৮২৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে সরকারী গেজেট হিসেবে 'আল ওয়াকায়ে আল মিসরিয়্যাহ'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৭৬ সালের ১৫ই আগস্ট দ্বিতীয় দৈনিক পত্রিকা আল আহরাম প্রকাশিত হয়, যাকে আরব বিশ্বে পশ্চিমা মিডিয়ার মুখপাত্র ও চিন্তাদর্শনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা যায়। আজো এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সালিম ওয়া বাশারা তুকলার নাম পত্রিকার ললাটে লিপিবদ্ধ আছে।

www.pathagar.com

দৈনিক আল আহরামের চেহারায় ফেরাউনী ইতিহাস ও সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শন তিন ইমারতকে মনোগ্রাম হিসাবে রাখা হয়েছে। পত্রিকাটির নাম ও মনোগ্রাম থেকে এ ধারণা দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল যে, ইসলাম, ইসলামী বিশ্ব ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ মিসরের সাথে এ পত্রিকার কোন সম্পর্ক থাকবে না। অতএব সূচনালগ্ন হতেই পত্রিকাটি তার মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, চিন্তা-চেতনা, অভিরুচি ও আকর্ষণ অনুরাগ লুকানোর চেষ্টা করেনি; বরং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছে, আল আহরাম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খৃস্টানদের মুখপত্র অথবা পশ্চিমা মিডিয়ার নকীব প্রতিনিধি। একথা পত্রিকা প্রকাশের চতুর্থ দিনই দেশবাসী সুস্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। যখন তারা আল আহরামের মিসর ও আরব বিশ্বের বড় বড় শহরগুলোর এজেন্ট ও প্রতিনিধিদের নাম ঘোষণা করে। তাদের সবাই ছিল খৃস্টান। একজনও মুসলমান ছিল না। পত্রিকাটির এসব এজেন্ট প্রতিনিধি হলব, দামেশক, বৈরুত, সূর, সায়দা, হাইফা, আক্কা, কুদস, এস্কান্দারিয়া, তানতা এবং অন্যান্য মিসরী শহরের সাথে সম্পর্কিত ছিল।

একথার আরো প্রমাণ হলো, পত্রিকার সূচনালগ্ন থেকেই তার প্রথম পৃষ্ঠাগুলো সেসব সংবাদকেই গুরুত্ব দেয়া হতো, যার সম্পর্ক পশ্চিমা বিশ্ব ও সেখানকার রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই ছয়টি সংবাদ শিরোনাম ছিল পশ্চিমা শাসকবর্গ, তাদের স্ত্রী এবং তাদের ভ্রমণ পর্যটন ও বক্তৃতা-বিবৃতি সম্পর্কিত। আর দুইটি সংবাদ ছিল লেবানন সম্পর্কে, তাও আবার খৃস্টানদের বাণিজ্য সংক্রান্ত।

আল আহরাম পত্রিকা প্রথম দিন থেকেই লক্ষ্য স্থির করেছে, সে মিসরের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে না এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাপারে যে কোনো উত্তেজনাকর সংবাদ সম্পাদকীয় প্রকাশ থেকে দূরে থাকবে। সেমতে এ পত্রিকা তার শত বছরের ইতিহাসে কোন জুলুম, অতিরঞ্জন, জবরদখল এবং রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোনো আওয়াজ তোলেনি, কিন্তু মিসরের সামাজিক, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বিষয়ে সে সর্বদা সেদিককেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে, যা পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধের নিকটবর্তী। সে তার পৃষ্ঠাগুলোকে অত্যন্ত উদারতার সাথে ইহুদী-খৃস্টান লেখক, নাস্তিক-ধর্মহীন সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও আরব জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছে। যারা পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে মিসরের ঐতিহ্যময় ইসলামী ভূমিকা ও তার দীনি স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পূর্ণ বিকৃত করে দিয়েছে; বরং এগুলো সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে।

দৈনিক আল আহরাম বর্তমানে আরব বিশ্বের সবচে' জনপ্রিয় ও সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা। আঠাশ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ পত্রিকার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক পৃষ্ঠাগুলো বিশ্লেষণ করলে জানা যায়, এতে দীন ধর্ম, নৈতিকতা ও চরিত্র সংক্রান্ত কোনো সংবাদ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ নেই বললেই চলে। শুধু জুমাবারে ধর্ম দর্শন পাতায় অর্ধ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি মাত্র ধর্মীয় লেখা ছাপা হয়। পত্রিকার বাকী সংবাদের ৯৫% থাকে জনগণের জীবন ঘনিষ্ঠ ও তাদের সমস্যা-সংকট সংশ্লিষ্ট

www.pathagar.com

বিষয়ে। ধর্মীয় কোনো সংবাদ থাকলেও তাতে নেতিবাচক ক্ষতিকর দিক থাকে বেশি। যেমন–সভ্যতা, সংস্কৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত লেখাগুলোতে নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা ও পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা ছড়ানো হয়। ফেরাউনী সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং পশ্চিমা চিন্তাদর্শন, তার সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক উৎকর্ষ ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে লেখা হয়। ইসলামের বিরোধিতা ও ইসলামবিরোধী রাষ্ট্র প্রধানদের জন্য পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যয় করা হয়। যেমন–সাইপ্রাসের পাদরী ম্যাকারিউস, ইথিওপিয়ান মুসলমান হত্যাকারী হাইলে সেলাসী, তানজানিয়ার মুসলমানদের শত্রু জুলিয়স লয়ারে, সোমালিয়ার লিওপোল্ড সেঙ্গার, ফিলিপাইনের মুসলমানদের হত্যাকারী মারকোস প্রমুখের প্রশংসায় মিসরী মিডিয়ার এই মুখপত্র পঞ্চমুখর। পক্ষান্তরে এ পত্রিকা ওসমানী সালতানাত তথা তুর্কী খেলাফতকে সাম্রাজ্যবাদ আখ্যায়িত করে। মুসলিম বাদশাহদের মধ্যে শাহ সউদ ও শাহ ফয়সালের চরিত্র হননের ধারা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে। এখন পর্যন্ত ইসলাম ও ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত যে কোনো বিষয়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। আল আহরাম পশ্চিমা জীবনঘনিষ্ঠ সকল বিষয়ের প্রশংসা, তার পৃষ্ঠপোষকতা, পশ্চিমা সিনেমা, নির্মাতা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, অভিনয়শিল্পী, পশ্চিমা নাটক ও তার ভূমিকা, উপন্যাস, কাহিনী, ধর্মহীন ধ্যান-ধারণা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারকে উন্নতির শেষ স্তর মনে করে। খৃস্টান মিশনারী ও তার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের পবিত্রতা বর্ণনা, তাদের ত্যাগ তিতিক্ষার আলোচনা এবং তাদের জীবনকে আদর্শ হিসেবে পেশ করাই আল আহরাম পত্রিকা নিজের মৌলিক দায়িত্ব মনে করে। পক্ষান্তরে মুসলমান ও মুসলমান ওলামাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস, কার্টুন ও ফটোর মাধ্যমে তাদের সমাজে হেয় ও খাটো করাই মূলত তাদের প্রধান কাজ।

দারুল হেলাল

দৈনিক আল আহরামের পর পশ্চিমাদের সবচে' বড় মুখপত্র মাসিক আল হেলাল। আল হেলালের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্ম প্রচারক জুরজী যায়দান। এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আল মোসাওয়ের এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহ জুরজী যায়দানের পৃষ্ঠপোষকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১] জুরজী যায়দান

---

১. জুরজী যায়দান লেবাননে জন্ম গ্রহণ করেন। ফ্রান্সের এক মিশনারী তাদের নিজ দায়িত্বে তাকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মিসর প্রেরণ করেন। মিসরে সে খৃস্টান মিশনারীসমূহের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়। এও প্রমাণিত হয়েছে, জুরজী যায়দান ফ্রান্স মিশনারীসমূহ থেকে নিয়মতান্ত্রিক বেতন-ভাতা পেত। অপরদিকে তিনি ফ্রান্স পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাও ছিলেন। তার লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে, ০১. তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়া (চার খণ্ড), ০২. তারিখুত তামাদ্দুন আল ইসলামী (পাঁচ খ), ০৩. আল আরব ক্বাবলাল ইসলাম, ০৪. তারিখুল লুগাতিল আরাবিয়া প্রভৃতি। এছাড়া তিনি অনেকগুলো সাড়া জাগানো উপন্যাস লেখেছেন। সেগুলো হল–ফাতাতু গামসান, ফাতহুল আন্দালুস, আরমানুসা আল মিসরিয়া, আল আবাসাহ, শাজারাতুত দুরার, আরুস ফারগানা, ফাতাতুল কেরওয়ান, আযরা কুরাইশ, গাদাতু কারবালা প্রভৃতি। তার লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা সর্বমোট ৫০টি।

www.pathagar.com

১৮৯২ সালে আল হেলাল পাবলিশিং হাউজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। নাম যদিও রাখেন আল হেলাল, কিন্তু এ সংস্থার মৌলিক উদ্দেশ্য আগাগোড়া ক্রুসেডারদের সেবা করা। এ সংস্থা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আল মোসাওয়ের ও ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো জুরজী যায়দানের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তার অবস্থান শক্তিশালীকরণে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

যায়দান ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ভাষা, উপন্যাস ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ৫০টি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার মধ্যে শুধু ২২টি ঐতিহাসিক উপন্যাস আর বাকী গ্রন্থগুলো ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব, সাধারণ ইতিহাস, আরবী ভাষা-সাহিত্য, দর্শনের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে রচিত। যায়দান তার লিখিত গ্রন্থাবলীতে সে পথ ও পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন, যা অবলম্বন করেছেন ওরিয়েন্টালিস্ট ও খৃস্টান মিশ-নারীরা এবং তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তিনি পথ চলেছেন। জুরজী যায়দানের লিখিত গ্রন্থাবলী অধ্যায়ন করলে যে মৌলিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় তা হলো, সিরিয়া, মিসর, স্পেন, তুরস্ক থেকে খৃস্টান রাষ্ট্রের পতনে দুঃখ প্রকাশ, খৃস্টানদের পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা এবং মুসলিম মুজাহিদদের বীরত্ব-বাহাদুরী, আত্মত্যাগ এবং তাদের সামরিক ও ঈমানী শক্তিকে খাটো ও লাঞ্ছিত করা।

'ফাতাতু গাস্সান' ও 'স্পেন বিজয়' গ্রন্থে তিনি খৃস্টানদের প্রশংসা করেছেন, বড় বড় সাহাবাদের চরিত্র হনন করেছেন, ফুকাহা ও ওলামাদের হেয় করেছেন, ইসলামী ফিকাহ ও আইন প্রণয়নের গুরুত্বকে খাটো করেছেন, রোমান ল'র ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, কোনো প্রমাণ ছাড়াই ইসলামী ইতিহাসের অবয়বকে বিকৃত করেছেন, ইসলাম ও ইসলামের পয়গম্বরের অবদানকে হেয় করেছেন, কুরআনকে মানব রচিত গ্রন্থ আখ্যা দিয়েছেন, আর এ সম্পর্কে ওরিয়েন্টালিস্টদের মতামত-অভিযোগকে সুন্দর মোড়কে উপস্থাপন করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, তিনি হজ্জের সময় ওলামা-মাশায়েখদের সাথে মতবিনিময় করে জ্ঞান অর্জন করতেন। সিরিয়া সফরে খৃস্টান পাদরীর সাথে তাঁর সাক্ষাত ও তায়েফ সফরে খৃস্টান গোলাম সফরসঙ্গী হওয়া প্রমাণ করে, তিনি যা কিছু অর্জন করেছেন (নাউযু বিল্লাহ) খৃস্টানদের থেকেই অর্জন করেছেন।

যায়দান তার উপন্যাসসমূহকে ইসলামী নাম দিয়ে ওরিয়েন্টালিস্টদের মতো কোথাও জেহাদকে টার্গেট বানিয়েছেন, কোথাও সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর অবদান খাটো ও হেয় করেছেন এবং কোথাও ইসলামী সমাজের অবয়ব ক্ষত বিক্ষত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন।[২] আল হেলালে ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ও সাহিত্যমূলক উপন্যাস প্রকাশ করে নতুন প্রজন্মের মন মস্তিষ্ক বিষিয়ে তোলার নিরন্তর চেষ্টা করেছেন। তার প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের মাধ্যমে

২. আল্লামা শিবলী নোমানী (র.) জুরজী যায়দানের লিখিত তারীখুত তামাদ্দুন আল ইসলামী গ্রন্থের দালীলিক ও দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন এবং ধোকা প্রবঞ্চনার পর্দা উন্মোচন করেছেন। সর্বোপরি এ গ্রন্থপ্রণেতার ইলমী খেয়ানত ও খবিসীপনার অত্যন্ত বলিষ্ঠ জবাব দিয়েছেন। আল্লামা শিবলীর এ কিতাব 'আল ইনতিকাদু আলা তারীখিত তামাদ্দুনিল ইসলামী' নামে ছাপা হয়েছে।

www.pathagar.com

এখনো একই ধারা অব্যাহত রয়েছে। তার মধ্যে সাপ্তাহিক আল মোসাওয়ের, তাবীবুকাল খাস, সাপ্তাহিক আল ইসনাইন, আল কাওয়াকেব ও হাওয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো মহিলা ম্যাগাজিন। এতে আধুনিক পশ্চিমা ফ্যাশন এবং সেখানকার চলচ্চিত্র তারকাদের খবরাখবর ও উপন্যাস-কাহিনী প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

আল হেলাল এবং এ সংস্থার মুদ্রিত গ্রন্থসমূহ আল আহরামের সহায়তায় ও যৌথ অংশীদারিত্বে মিসরে পশ্চিমা মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণার প্রতিনিধিত্বকারী একটি মজবুত দল তৈরি করে দিয়েছে, যারা অতি বিশ্বস্ত শাগরেদের মতো আরব বিশ্বে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা ছড়ানোর কাজে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক আরব বিশ্বের সকল মিডিয়া আল হেলাল ও আল আহরামের ছায়াতলেই বিকশিত হচ্ছে। সব মিডিয়া এ দুটোকেই অনুসরণ করে চলছে। এক শতাব্দী ধরে এসব মিডিয়া সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ময়দান তৈরি করেছে।

পশ্চিমা মিডিয়ার এই দুই শক্তিশালী মুখপত্র ইসলাম সম্পর্কে যদি কখনো কোনো আলোচনা করেও, তাহলে তা সরকারী ইসলামের মতো। যেমন সরকার একদিকে দুই ঈদের নামায আদায় করে, ঈদে মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি প্রেরণ করে, অপরদিকে নৃত্যশিল্পী, গায়িকা, ফিল্ম স্টার ও ধর্মহীন নাস্তিক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদেরও স্বাগত জানায়, তাদের প্রশংসা করে, তাদের বড় বড় পুরস্কারে ভূষিত করে, সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা দান করে। এসব কাজের মাধ্যমে সরকার একথাই বুঝাতে চায়, এসব লোকই প্রকৃত সম্মানের অধিকারী। তারাই আলোকিত ও মুক্তচিন্তার অধিকারী।

পশ্চিমা মিডিয়ার এই দুই মুখপত্র ও তার ভাবশিষ্যরা গোটা আরব বিশ্বে যে দাওয়াত প্রচার-প্রসার করেছে তা হলো, ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য, সাধারণ ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া, নাহু-সরফ ও বালাগাত থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা, কুরআনের পরিবর্তে আধুনিক আরবী সাহিত্যকে নমুনা বানানো, সহশিক্ষা, ধর্মহীন সিলেবাস পাঠ্যসূচী করা, ইসলামী সমাজব্যবস্থার সংরক্ষণের পরিবর্তে আধুনিক চিন্তার পশ্চিমা জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করা ও পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়নের আহবানকে মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে গল্প, উপন্যাস, চলচ্চিত্র ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে উপস্থাপন করা উদ্দেশ্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ আল হেলাল ধর্ম ও রাজনীতির পার্থক্যের ওপর চারটি শক্তিশালী প্রবন্ধ প্রকাশ করার পর পাঠকের মতামত ও প্রতিক্রিয়া জানার জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলো উত্থাপন করে–

০১. আমরা কি দীন ধর্ম বাদ দিয়ে সামগ্রিক উন্নতি সাধন করতে পারব?

০২. আপনি ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতি পছন্দ করেন, না দীনকে প্রাধান্য দেন।

০৩. ধর্ম কি প্রগতির পথে অন্তরায়?

০৪. ইউরোপের অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রধান কারণগুলো কি?

০৫. আরব বিশ্ব কি ইউরোপের মতো উন্নতি করতে পারবে?

www.pathagar.com

সে সময় যারা তাদের ইচ্ছা অভিরুচি অনুযায়ী উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর সঠিক সুন্দর জবাব দিতে পেরেছে, তাদের মূল্যবান পুরস্কারে ভূষিত করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঠিকানা ও ছবি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে, তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়েছে, ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা অর্জনের জন্য স্কলারশীপ দেয়া হয়েছে এবং সেখানকার লেখাপড়া শেষ করার পরও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, তাদের গুণকীর্তন ও প্রশংসাবাদ অব্যাহত রাখা হয়েছে। লুতফী সাইয়েদ, সালামা মূসা, ত্বাহা হুসাইন, লুইস এওয়াজ তাওফীকুল হাকীম, নাজীব মাহফুজ, মুহাম্মদ তাবেয়ী, আহমদ যাকী ও আনীস মানসূর প্রমুখ সে যুগের স্মৃতি পাশ্চাত্য মিডিয়ার প্রতিপালিত এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।৩ আল হেলাল ও আল আহরাম একদিকে যেমন পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের শক্তিশালী ভাষ্যকার হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে, তেমনি সঠিক চিন্তাধারার ইসলামী দাঈ, দীনী আন্দোলনসমূহ ও তার নেতৃবর্গের চরিত্র হননের অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে আসছে।

পশ্চিমা মিডিয়ার এই দুই বড় মুখপত্র একদিকে যেমন খ্যাতনামা সাংবাদিক সাহিত্যিক সৃষ্টি করেছে, তেমনি আরব নারীদেরও সাহিত্য-সাংবাদিকতার ময়দানে অবতীর্ণ করেছে। সর্বদিক দিয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং উৎসাহ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এরকম আরব নারীর উদাহরণস্বরূপ ফাতেমা রোজ আল ইউসুফের নাম করা যায়। তিনি একজন প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী ছিলেন। তিনি দীর্ঘ দিন আল আহরাম ও আল হেলালের ছায়াতলে প্রতিপালিত হয়েছেন। এরপর সাপ্তাহিক রোজ আল ইউসুফ বের করে সাহিত্য সাংবাদিকতার ময়দানে পা রাখেন এবং এ সাপ্তাহিকীর মাধ্যমে মিসরী নারীদেরকে অশ্লীল লেখার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তার মাধ্যমে এমন একটি দল তৈরি হয়, যারা বিশেষভাবে মিসরী নারীদের এবং সাধারণভাবে আরব নারীদের ঘর ও পরিবার থেকে বের করে আনার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়েছে। নারীদের এই টিম শুধু সাহিত্য-সাংবাদিকতা নয়; বরং অভিনয়ের ক্ষেত্রেও নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনার সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।৪

---

৩. আলী আমীন, মোস্তফা আমীন, মূসা সাবেরী, আহমদ বাহাউদ্দীন ও মুহাম্মদ তাবেয়ী সেসব সংবাদিকদের অন্তর্ভূক্ত, যাদেরকে তাদের লেখার জন্য হাজার হাজার পাউন্ডের পুরস্কার ও ইউরোপ সফরের ব্যয়বহুল খরচ দেয়া হয়েছে। মুহাম্মদ আত তাবেয়ীর আত্মজীবনী 'নিসাউন ফী হায়াতী' পড়লে জানা যায়, খোদ এই সাংবাদিক মিসর ও মিসরের বাইরে নৈতিক অপরাধের কর্দমে আকণ্ঠ ডুবে থাকত। মিসর সরকারের পক্ষ থেকে এসব সাংবাদিক ও অশ্লীল লেখকদের এভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা হতো যে, তাদের লেখার ওপর সরকারের পক্ষ থেকে অনেক মোটা অংকের বিনিময় দেয়া, অতঃপর তাদের রচিত উপন্যাসগুলোকে সিনেমার রূপ দিয়ে এবং অশ্লীল লেখাগুলো সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করে অর্থ আহরণ করা হতো এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। কারণ আরব বিশ্বের মিডিয়াগুলো মূলত সরকারই পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. সর্বসাম্প্রতিক তথ্য মোতাবেক যেসব মিসরী ও আলজেরিয়ান অভিনেত্রী চিত্র জগতে পদার্পণ করেছে এবং অবাধ মেলামেশা ও নগ্নতার প্রতিনিধিত্ব করেছে, তাদের এগার জন এই পেশা থেকে ফিরে এসেছে। তাদের মধ্যে—শামসুল বারুদী, হালা সিদকী এবং মাদীহা ইয়াসমীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক মোস্তফা আমীনের পালিত শিষ্য প্রখ্যাত নারী সাংবাদিক আমীনা সাঈদ এমন নগ্নতা ও অশ্লীলতার আহ্বান জানিয়েছেন এবং বিশেষ করে আরব রাজ প্রাসাদসমূহের অভ্যন্তরীণ জীবনের এমন চিত্র অংকন করেছেন, যা শুনলে মানবতার ললাট ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। এই নারীর লেখাকে ভারতের নারী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ইসমত চুগতাই ও ওয়াজেদা তাবাস্সুম (এবং বাংলাদেশি বিতর্কিত লেখিকা তাসলিমা নাসরিনের) লেখার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

মিসরী মিডিয়ার দৃষ্টান্ত

নিম্নে মিসরী মিডিয়ার কিছু নমুনা ও দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো।

০১. প্রসিদ্ধ সাংবাদিক যাকী আবদুল কাদের, মোস্তফা আমীন, নাজীব মাহফুজ ও ইহসান আবদুল কুদ্দুস প্রমুখ তাদের লেখায় প্রকাশ্য জন্মনিয়ন্ত্রণ, ফ্রি-সেক্স ও অবাধ নারী স্বাধীনতার এবং নৃত্যকার, গীতিকার ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্মান দেয়ার জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন। মোস্তফা আমীন নাচকে ইবাদতের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, কারখানায় কাজ করা তাদের উঁচু ইবাদতের সমার্থক। (আল আহরাম, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫)

০২. ইহসান আবদুল কুদ্দুস, ইউসুফ আস সুবায়ী, আহমদ বাহাউদ্দীন, আনিস মানসূর ও মুহাম্মদ আত-তাবেয়ী প্রমুখ তাদের লেখায় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকাশ্য প্রশংসা করেছেন এবং সরকারের নিকট জোর আবেদন জানিয়েছেন, আধুনিক চিন্তা-ধারার অধিকারী পাশ্চাত্য জাতির মতো আমাদের সরকারেরও পতিতালয়ের লাইসেন্স দেয়া উচিত। আনিস মানসূর লেখেছেন, প্রবৃত্তিকে দাবিয়ে রাখা এবং অস্থির জীবন যাপনের পরিবর্তে সামান্য গুনাহ্ করায় কোনো ক্ষতি নেই। (আল আহরাম, ২১ মে, ১৯৬৬)

০৩. নারী সাংবাদিক আমীনা সাঈদ ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে লেখেছেন, মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতা আর টানাপড়েন থেকে রক্ষা পাওয়ার সহজ পদ্ধতি হলো, অনৈতিকতাকে সামান্য সময়ের জন্য গ্রহণ করে নেয়া। (সাবাহুল খায়র, ৩রা এপ্রিল, ১৯৬৬)

০৪. সাংবাদিক আনিস মানসূর তার রচিত 'হাওয়া' পুস্তিকায় পাশ্চাত্য ফ্যাশনকে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বোরকাকে তাঁবুর সাথে তুলনা করেছেন। প্রসিদ্ধ মহিলা লেখিকা মাদীহা রোজ আল ইফসুফ ম্যাগাজিনে লেখেন, যৌন রোগ ও বিপথগামিতা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় পতিতালয়ে গিয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। এর দ্বারা যৌন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি লজ্জা ও লাজুকতা নির্মূল হবে। (সাবাহুল খায়র, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৬৫)

কায়রো, বৈরুত, লন্ডন ও প্যারিস থেকে প্রকাশিত নারী বিষয়ক ম্যাগাজিনসমূহের মালিক, সম্পাদক ও সাংবাদিক খৃস্টান। এসব ম্যাগাজিনের মধ্যে আশ শুবকা, আস সাইয়াদ, হাওয়া, হুওয়া হিয়া, আল কাওয়াকেব নগ্ন ছবি এবং অশালীন কাহিনীর কারণে লাখ লাখ কপি বিক্রি হয়। এসব ম্যাগাজিনের পদাঙ্ক অনুসরণে আল আখবার ও আল জমহুরিয়ার অধিকাংশ কলাম লেখক খৃস্টান এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাংবাদিক

www.pathagar.com

নাস্তিক বেদীন। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত মিসরী মিডিয়ার গতিপথ কি ছিল, তা সে সময়কার সংবাদপত্রের বিভিন্ন শিরোনাম দ্বারা সহজেই অনুমিত হয়।

ক. এক নৃত্যশিল্পী তার ছাত্র বন্ধুর ফ্ল্যাটে আত্মহত্যা করেছে। (আল আখবার, ২৯ জুন, ১৯৬২)

খ. ষোল বছর বয়সী এক ছাত্রী একা ইউরোপ সফর করেছে, তোমরাও অভিজ্ঞতা অর্জন কর। (আল আহরাম, ২৯ জুন, ১৯৬৩)

গ. হাঁটুর ওপরে পোশাক পরা একটি নতুন ফ্যাশন। (আশ শুবকা, ৪ঠা আগস্ট, ১৯৬৫)

ঘ. তোমরা নিজের স্ত্রীকে অন্যের স্ত্রীর মতো মনে করে দেখ। (আস সাইয়াদ, জুন ১৯৬৫)

ঙ. এ সপ্তাহের সবচে' সুন্দরী ও হার্টথ্রব নারী। (আল কাওয়াকেব, মে ১৯৫৬)

আশ-শুবকা ম্যাগাজিন আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আধুনিকমনা নারীদের সাক্ষাতকার নিয়ে সহশিক্ষা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও অফিস-আদালতে নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সাথে কাজ করার উপকারিতার ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছে। (আশ শুবকা, মার্চ, ১৯৬৪)

মাসিক হাওয়া, হুওয়া হিয়া, আস সাইয়াদ ও সাপ্তাহিক রোজ আল ইউসুফ পত্রিকাগুলো অবাধ যৌন স্বাধীনতা, স্বামীর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তালাকের প্রতি উৎসাহ, দাম্পত্য জীবনের ওপর সন্দেহ-সংশয়ের ছায়া ফেলা, জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার, নারীদের প্যান্ট-শার্ট পরা, নারীদের চুল ছোট করা, পুরুষের চুল লম্বা করা, বিজ্ঞাপনী সংস্থায় নারীদের চাকরি করা ও বিজ্ঞাপনে মডেল গার্ল হওয়া ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত জোর দিয়ে থাকে।

দৈনিক আল জমহুরিয়া ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তার প্রচার বৃদ্ধি করার জন্য দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অশ্লীল লেখকদের মোটা অংকের অর্থ দিয়ে ইউরোপ-আমেরিকায় সংঘটিত বিভিন্ন যৌন ও এ সংক্রান্ত ঘটনাবলী ও কাহিনী ধারাবাহিক প্রচার শুরু করে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিদিন পত্রিকার সাথে কুপন ছাপা শুরু করে। এতে পাঠক একদিকে পত্রিকা পড়তে পারত, অপরদিকে কোনো সিনেমা হলে কুপনটি প্রদর্শন করে অর্ধেক মূল্যে সিনেমাও দেখতে পারত।

প্রসিদ্ধ মিসরী খৃষ্টান সাংবাদিক লুইস এওয়াজ ও মূসা সাবরী তাদের লেখায় ফেরাউনী সভ্যতা এবং গ্রীক চিন্তাধারা গ্রহণ করার খোলাখুশি দাওয়াত দিয়েছেন, ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, মার্কসবাদের দাওয়াত এবং পিতা-মাতা ও সমাজের আধিপত্য থেকে মুক্তি পাওয়া, জায়নবাদের সাথে সম্পর্ক সুসংহত ও মজবুত করা এবং আরবদের পরিবর্তে পশ্চিমাদের সাথে জনগণের ভাগ্য সম্পৃক্ত করার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়েছেন।

গীতিকারদের মধ্যে আবদুল ওয়াহাব, উম্মে কুলসুম, আবদুল হালীম হাফিজ, ফরীদুল আতরাশ ও ফিরোজ প্রমুখ উপাস্যের মর্যাদা লাভ করে। এমনকি এক গায়িকার ইন্তেকালে কয়েকজন নওজোয়ান ছেলে-মেয়ে আত্মহত্যা করে।

www.pathagar.com

মিসরী টেলিভিশন

আরব বিশ্বের দেশসমূহে মিডিয়ার ওপর সেখানকার সরকারগুলোর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। মিডিয়ার চারপাশে সেসব লোকেরই আধিপত্য, যারা পরিপূর্ণভাবে পাশ্চাত্যের ছাঁচে ঢেলে সাজানো। এর পাশাপাশি যদি মিডিয়ার জন্য সরকারের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা, শক্তি, সমর্থন এবং সরকারের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকে তাহলে মিডিয়ার অসাধারণ শক্তি ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমান করা যায়। জনমত গঠন এবং মেধা মনন প্রস্তুতের সকল উপায়-উপকরণের ওপর যখন কোন গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয় এবং তার সীমাহীন শক্তির পাশাপাশি যদি আর্থিক যোগানও থাকে তাহলে তার শক্তির কল্পনা করাও কঠিন ব্যাপার। স্যাটেলাইট ও ডিশ এন্টিনার এই যুগে টিভির সর্বগ্রাসী সুদূরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার অনুমানও করা যায় না।

পশ্চিমা মিডিয়া বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের কাজ শুধু প্রশিক্ষণ ও পথ প্রদর্শন পযন্তই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আমাদের মৌলিক দায়িত্ব হলো, সমাজজীবনে যা কিছু ঘটে যাচ্ছে তার ঝলক জনগণকে সরাসরি দেখিয়ে দেয়া এবং দ্বিতীয় মৌলিক দায়িত্ব হলো, প্রত্যেক নাগরিকের ইচ্ছা অভিরুচির প্রশান্তির উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা, যাতে প্রত্যেকে তার ইচ্ছা অভিরুচি অনুযায়ী প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান দেখতে পারে।

শুধু মিসরী টিভিই নয়; বরং গোটা আরব বিশ্বের টিভি প্রোগ্রামগুলো এই পাশ্চাত্য দর্শনের আলোকে পরিচালিত হচ্ছে। যদি পাশ্চাত্যের ধ্বংসাত্মক দর্শন মেনে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে, কল্যাণ, অকল্যাণ ও পবিত্রতার সাথে অপবিত্রতা, কলুষতা, নিরর্থক কাজকর্ম এবং সৌন্দর্য রূপ-লাবণ্যের সাথে কুৎসিত কদাকার চেহারাকেও এমন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা, যাতে মন্দ থেকে ভাল, অকল্যাণ থেকে কল্যাণ ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা কোনো পথ খুঁজে না পায়। কার্যতঃ মন্দকে এমন সুন্দর চিত্তাকর্ষক মোড়কে উপস্থাপন করা, যাতে এটাই সবার প্রিয় পছন্দনীয় বিষয়ে পরিণত হয়। অথচ আয়না দেখার উপকারিতাই হচ্ছে, তাতে দেখে চেহারার ময়লা ও দাগ দূর করা।

পক্ষান্তরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিডিয়ার মৌলিক দায়িত্ব, জাতিকে শিক্ষা-দীক্ষা ও পথ প্রদর্শনের গঠনমূলক মৌলিক দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া, হিদায়াত ও সত্যের আলো ছড়িয়ে দেওয়া এবং কল্যাণ মঙ্গলের প্রতিচ্ছবি চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা, কিন্তু সমস্যা হলো, মিডিয়াকে যেসব লোক নিয়ন্ত্রণ করে তারা এই মৌলিক নীতিমালার স্বীকৃতি দেয় না। আবার বেশির ভাগ লোকের পছন্দ অভিরুচি মোতাবেক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করার বিষয়টিও তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কিছু লোক আছে যারা অশ্লীল গান-বাজনা, আনন্দ-বিনোদন, অবাধ যৌন মেলামেশা এবং অনৈতিক সিনেমার পাগল ও প্রেমিক। আর কিছু লোক আছে যারা দীনী দাওয়াত, উন্নত চারিত্রিক মূল্যবোধ, জেহাদের প্রাণ ও আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন বিজয়ী করার চেতনায় সিক্ত পবিত্র, সংযমী, আল্লাহভীতির জীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং তার আহবানকারী। এখন এ দুই বিপরীতমুখী রুচি ও পছন্দের লোককে একই সাথে একই সময়ে সন্তুষ্ট রাখা সম্ভব নয়। এজন্য পশ্চিমা ফর্মূলা অনুযায়ী তারা প্রথম পথই বেছে

www.pathagar.com

নিয়েছে। যদি সাধারণ লোকের পছন্দ অভিরুচি অনুযায়ী অনুষ্ঠানমালা উপস্থাপনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়, তাহলে–মিসরী জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামকে পছন্দ করে এবং ইসলামের শিক্ষামালার আলোকে জীবন পরিচালনা করতে প্রত্যাশী–এই বাস্তবতা কেন পশ্চাতে নিক্ষেপ করা হয় ।

১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে মিসরী টেলিভিশনের ৩৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে তথ্য মন্ত্রণালয় এক আনন্দ সভার আয়োজন করে। সে সময় টিভি অনুষ্ঠানমালার ওপর একটি পর্যালোচনাও করা হয়। তাতে সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়েছে, নাচ, গান, ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাদের চেতনা জাগ্রত করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য, কিন্তু সে পর্যালোচনায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে কোথাও দীনী ও চারিত্রিক প্রোগ্রামের কথা উল্লেখ করা হয়নি। প্রসিদ্ধ মিসরী রিসার্চ স্কলার ইবরাহীম গানেম 'মিসরী টেলিভিশন ও ইসলামী সংস্কৃতি' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাতে ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত মিসরী টেলিভিশনের মাঠ পর্যায়ের জরিপ বিদ্যমান রয়েছে। সেই জরিপে মিসরী টেলিভিশনের যে ত্রুটি ও দুর্বলতা সামনে আসে তা শুধু মিশরী টেলিভিশনের ক্ষেত্রেই নয়; বরং গোটা আরব বিশ্বের টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ আরব বিশ্বের মিডিয়া মিসরী মিডিয়ার ধাঁচেই পরিচালিত হয়। কেননা, আরব বিশ্বের মিডিয়াগুলো মিসরী মিডিয়ার ভাবশিষ্যরাই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

মিসরীয় মিডিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ফল

মিসরী সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের মন-মস্তিষ্ক ও চেতনায় দীনের যে মর্যাদাবোধ রয়েছে এবং যেভাবে সকল সমস্যা সংকটের সমাধান তারা দীন ইসলামকেই মনে করে, মিসরী ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো সে অনুযায়ী প্রোগ্রাম উপস্থাপন করে না। তাদের সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানমালা দেখে মনে হয় দীন দুনিয়া আলাদা আলাদা ঘরে বিভক্ত এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সংকটের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। নিম্নে মিসরী মিডিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ফল তুলে ধরা হল–

০১. মিসরী মিডিয়ায় দীনী অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করার ধরন অতি নিম্ন মানের। তার মধ্যে কোনো আকর্ষণ ও নতুনত্ব নেই। আর না শৈল্পিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

০২. মিসরী নয়টি টিভি চ্যানেল দৈনিক ১৬৬ ঘন্টা অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করে। এর মধ্যে দীনী প্রোগ্রাম সম্প্রচারের হার মাত্র ৩%। তন্মধ্যে সূচনা অনুষ্ঠান, সমাপনী অনুষ্ঠান, কুরআন তিলাওয়াত এবং হামদ-না'ত ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত।

০৩. ৯০ শতাংশ দীনী অনুষ্ঠানমালা তখন সম্প্রচার করা হয় যখন টিভির সামনে দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা খুবই নগণ্য থাকে। এসব প্রোগ্রাম ৫ থেকে ১৫ মিনিটের বেশি দীর্ঘ হয় না, তাও আবার বেশির ভাগ সময় 'দুর্বল শরীরে সর্দি' প্রবাদের মতো কোনো ম্যাচ কিংবা কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের আগমন কিংবা পুলিশ অথবা এমনি কোনো আনন্দানুষ্ঠান উপলক্ষে দীনী প্রোগ্রামের সম্প্রচার মুলতবি করে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

০৪. ফিলিস্তীন সংক্রান্ত স্পর্শকাতর রাজনৈতিক সমস্যা, বিশেষ করে ফিলিস্তিনী ইন্তেফাদা ও হামাস আন্দোলন এবং ইসরাঈলের সাথে মিসরের সম্পর্ক, কূটনৈতিক যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ের দিকে মিসরী টিভি কোনো দৃষ্টি দেয় না। অথচ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইসরাঈলের সাথে মিসরের সুসম্পর্ক ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে কিনা, এমনিভাবে শিক্ষা-দীক্ষা, মাদকদ্রব্য, নারীদের চাকরি এবং মিসরী সমাজ দেহের অনিষ্ট অকল্যাণ নির্মূল করার জন্য দীন ও শরীয়তের ভূমিকা এমন কিছু বিষয়, যা মিসরী জনগণের সাথে সুগভীরভাবে জড়িয়ে আছে, কিন্তু মিডিয়া এর প্রতি কোনো গুরুত্বই দেয় না। অতি সুকৌশলে এ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলো এড়িয়ে যায়। যদি ইসলামী শরীয়া বিষয়ে কোনো আলোচনা-পর্যালোচনা হয়ও, তবে তা হয় ইসলামী আইন প্রণয়নের দর্শন নিয়ে। ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে মিসরী টিভি যেসব প্রোগ্রাম উপস্থাপন করে তা পর্যালোচনা করলে জানা যায়, মিসরী মিডিয়া ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির মাত্র দু'টি দিক নিয়ে আলোচনা করে। এক. ইসলামী দাওয়াত ও তার চাহিদা। দুই. আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান, কিন্তু ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে মোটেও আলোচনা করে না। যেমন— অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বিষয়ক সমস্যা সংকট সমাধানে ইসলাম কি সমাধান পেশ করেছে এবং মুসলমানদের দীনী, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবন কিভাবে সঠিক সুন্দর হতে পারে প্রভৃতি। যারা মিসরী মিডিয়ার জন্য দীনী প্রোগ্রাম তৈরি করেন তারা অত্যন্ত সংকীর্ণ চিন্তা-ভাবনা করেন এবং নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেন, সাধারণ জনগণের চাহিদা, অভিরুচি, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করেন না। তারা গোটা মিডিয়ার ওপর একতরফা ট্রাফিকের মতো থাবা বিস্তার করে আছে।

মিসরী তথ্য মন্ত্রণালয়ের দাবী অনুযায়ী পবিত্র রমযান মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় দীনী অনুষ্ঠামালা পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, কিন্তু এই দীনী অনুষ্ঠানমালার আসল বাস্তবতা কি? এ বিষয়ে একটি বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা দৈনিক আশ-শারকুল আওসাত প্রকাশ করেছে, যার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ—

০১. একেবারে ইফতারের সময় লক্ষ লক্ষ পাউন্ডের পুরস্কার সম্বলিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়, যা মিসরের সুন্দরী তারকাদের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। প্রত্যেক দিন নতুন নতুন নৃত্য ও গানের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। আধ ঘন্টার এই অনুষ্ঠানের পর পরই হাসি-কৌতুক, নাটক কিংবা যৌন সুড়সুড়িমূলক সিরিজ প্রচার করা হয়।

০২. মিসরী টিভির ৯৭% অনুষ্ঠান সুন্দরী নারীরা উপস্থাপন করে।

০৩. ৯৮% বিজ্ঞাপন উপস্থাপন করে নারীরা। ২৫% বিজ্ঞাপনে যৌন সুড়সুড়ি ও উসকানি থাকে।

০৪. ৯০% সিনেমায় নগ্নতা, ইজ্জত লুণ্ঠন, প্রেম–ভালবাসা, যৌন অপরাধ ও নৈতিক অবক্ষয়ের ঘটনা বিদ্যমান থাকে।

www.pathagar.com

০৫. মিসরের সিনেমা হলগুলোতে ৮০% মার্কিন চলচ্চিত্র ও ১৭% ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এসব চলচ্চিত্রে কট্টরপন্থা ও যৌন মিলনের উন্মুক্ত দৃশ্য প্রদর্শিত হয়।

০৬. মিসরী সেন্সর বোর্ড বিশটি সিনেমাকে অশ্লীল সাব্যস্ত করে তার প্রদর্শন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, কিন্তু মিসরী টেলিভিশন পবিত্র রমযান মাসে সেগুলো প্রদর্শন করে।

আইনে শামস ইউনিভার্সিটির উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ মিসরে বিদেশী সিনেমার প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করে। উক্ত জরিপ থেকে জানা যায়, বিদেশী সিনেমায় মার-দাঙ্গা ও যৌন উগ্রতার আধিক্যের কারণে মিসরীয় নির্মাতারাও সেই পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে এবং পশ্চিমা ও ভারতীয় সিনেমাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের নির্মিত বেশির ভাগ সিনেমা এ্যাকশন ও যৌন সুড়সুড়িমূলক। সেসব সিনেমার নায়ক বাহ্যিকভাবে সাদা পোশাকধারী হলেও কিন্তু আন্তর্জাতিক মাফিয়া ডন। যাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হত্যা, লুণ্ঠন ও রক্তপাত। তারা সামান্য কথাতেই রিভলবার ও মেশিনগান দিয়ে ডজনে ডজনে মানুষকে ভূনা করে রেখে দেয়। সশস্ত্র ডাকাতি করে, নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণ করে। এসব করেও তারা বেঁচে যায় এবং মন ভরে যাবতীয় আরাম বিলাস ভোগ করে। এমনকি তার বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

মিসরীয় সমাজে মিডিয়ার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি

এখানে উল্লিখিত সরেজমিন জরিপে পাওয়া কিছু ঘটনার আলোচনা রয়েছে, তা হলো, শিশুরা সিনেমা দেখে কিভাবে তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ 'আল ইখওয়াতুল আ'দা' (দুশমন ভাই) নামক একটি সিনেমা দেখে এক শিশু তার ঘুমন্ত ছোট ভাইকে গলা টিপে হত্যা করে। ষোল বছরের এক ছেলে 'মেছালী হিরো' (আদর্শ নায়ক) নামে একটি টিভি সিনেমা দেখে প্যাট্রোসের মোটরগাড়ী চুরি করে। এক ছাত্রী টিভির পর্দায় 'আর রাকেসা ওয়াস সিয়াসী' (নর্তকী ও রাজনীতিবিদ) নামক সিনেমা দেখে ড্যান্স ক্ল্যাবে চাকরি নেয়। এ সিনেমা দেখে সে মনে করে বসে, নর্তকী তার নৃত্য শিল্পের মাধ্যমে রাজনীতিক ও সম্পদশালীদের সহজেই মাত করতে পারে।

মিসরী সমাজে অপরাধের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাতা সালাহুদ্দীন আবু ইউসূফ বলেন, প্রতি যুগেই অপরাধ ছিল এবং এমন লোকও বিদ্যমান ছিল, যারা সামাজিক বন্ধন ও নৈতিক-চারিত্রিক সীমা লংঘন করে চলত। পূর্বে নেশা ও প্রতিশোধমূলক অপরাধ সংঘটিত হত, কিন্তু খুবই কম। তবে বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে অর্থনৈতিক অপরাধ বৃদ্ধি পায়, যেমন চুরি, ডাকাতি ও প্রতারণা ইত্যাদি। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক অপরাধেরও প্রবৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি এত ভয়ানক আকার ধারণ করেছে যে, এ্যাকশন, মার-দাঙ্গ, সন্ত্রাস, অপহরণ, ধর্ষণের ঘটনা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। সালাহুদ্দীন আবু ইউসুফ আরো বলেন, ১৯৭০ সালের পর যেসব সিনেমা নির্মিত হয়েছে তা সব হলিউড ও বলিউডের এ্যাকশন ছবির অবিকল প্রতিচ্ছবি। উদাহরণস্বরূপ এক নাযুক সুন্দরী নারী, আদালত, মৃত্যুর ফাঁদ, তের কাজ, তিন শয়তান, প্রতিশোধের আগুন, মন্দ মানুষ, তিন ঝগড়াটে, প্রতিশোধের চক্কর প্রভৃতি

www.pathagar.com

সিনেমাগুলোতে এ্যাকশন, মারদাঙ্গা, যৌনতা ও নগ্নতার ছড়াছড়ি রয়েছে। ভারতীয় নির্মাতা অমিতাভ বচ্চনের সিনেমাগুলোও মিসরে খুব জনপ্রিয়। কারণ তার নির্মিত বেশির ভাগ সিনেমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ্যাকশন ও যৌন সুড়সুড়ি বিদ্যমান রয়েছে। মিসরী সেন্সর বোর্ডের এক সদস্য হামদী সারওয়ার বলেন, অপরাধ বৃদ্ধিতে শুধু সিনেমাকেই কারণ সাব্যস্ত করা ঠিক নয়; বরং এতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণও রয়েছে। এছাড়া দীনী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অনুপস্থিতিও একটি মৌলিক কারণ।

মিসরী মিডিয়ার ওপর ইহুদী খৃস্টান ও নাস্তিক বেদীন গোষ্ঠীর আধিপত্যের কারণে বেশির ভাগ সিনেমা নাটকে ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব এবং দীনী পরিচায়ক বিষয়াবলীকে অত্যন্ত উপহাস বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে, যাতে ইসলামের আকার আকৃতি বিকৃত করা যায় এবং মন-মস্তিষ্ক থেকে তার প্রাণ ও মূল্যবোধ বের করে দেয়া যায়; বরং অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে আরো ঘৃণা সুদৃঢ় হয়। যেমন পশ্চিমা সমাজে তাদের দীন ধর্ম সম্পর্কে করা হয়। তবে পশ্চিমা সিনেমায় এ্যাকশন, যৌনতা, নগ্নতা ও অশ্লীলতা ছাড়া সাধারণতঃ তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত হানা হয় না। যদিও ব্যতিক্রম কিছু সিনেমা রয়েছে, যেখানে হযরত ঈসার যৌন জীবনকে পাশ্চাত্য ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে কোথাও কোথাও কিছু প্রতিবাদও হয়েছে, কিন্তু সাধারণতঃ পশ্চিমা সিনেমায় তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের মর্যাদাবান আকার আকৃতিতে হাসপাতাল ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে রোগী, নিঃস্ব দুঃস্থ এবং দুর্বল মানুষের সাহায্য সহায়তাকারীরূপে দেখানো হয়। এসব ক্ষেত্রে ইঞ্জিলের আয়াত এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা দ্বারা খৃস্টীয় শিক্ষা ও নীতিমালা সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং দর্শক-শ্রোতাদের মন-মস্তিষ্কে ভালো প্রভাব পড়ে, কিন্তু পশ্চিমের এই মিডিয়াই যখন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে কোনো অনুষ্ঠান উপস্থাপন করে, তখন তাতে ইসলামকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দেখানো হয়। মিসরী সিনেমা যেহেতু পাশ্চাত্যে নির্মিত সিনেমারই চর্বিত চর্বণ, সে জন্য এক শতাব্দী ধরে মিসরী সিনেমায় ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ, ইসলামী ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ব্যক্তিত্বকে বিকৃত করা, খাটো করা ও হেয় করার ধারাবাহিকতা চলে আসছে। এসব সিনেমায় একাধিক বিবাহ, তালাক, ইবাদত, চরিত্র, লেনদেন ও সামাজিকতা সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা ও অবয়বকে বিশেষভাবে টার্গেট বানানো হয়। পিতা-মাতার যে সম্মান মর্যাদা ইসলামী সমাজে আছে, যুগ যুগ ধরে ইসলামী সমাজে যেভাবে যৌথ পারিবারিক ব্যবস্থা প্রচলন রয়েছে, পর্দাপ্রথার যে ইসলামী ধ্যান-ধারণা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্পর্কে ইসলামের যে প্রাকৃতিক কানুন ও ইনসাফপূর্ণ বন্টন পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য পরোক্ষ প্রত্যক্ষ উসকানি দেয়া হয়। সূক্ষ্মভাবে এই ধারণা দেয়া হয়, এই ধর্ম অনেক কঠিন। সমস্যা সংকটের কোনো সমাধান এতে নেই। ইসলামে প্রতিটি সমস্যার সমাধান কঠোরতা ও তলোয়ারের মধ্যে খোঁজা হয়। অতএব কট্টরপন্থা থেকে বাঁচার জন্য পশ্চিমা জীবনপদ্ধতি গ্রহণ কর। অন্য ভাষায়, মানব সোসাইটির সকল অনিষ্টের মূল কারণ ইসলাম। এর সমাধান পশ্চিমা জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করা। যেমন 'উরীদু হাল্লান' (সংকটের সমাধান কাম্য)-মিসরী সিনেমায় ধারণা দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

মিসরী সিনেমায় সাধারণতঃ দীনী ব্যক্তিত্বে অভিনয়কারীদের নাম এমন রাখা হয়, যা দ্বারা কঠোরতা, জুলুম ও ত্রাসের প্রতিচ্ছবি মস্তিষ্কে ভেসে ওঠে। যেমন আবদুল জব্বার, আবদুল কাহহার, আবদুল জালাল ইত্যাদি। অতঃপর সেসব অভিনেতারূপী ব্যক্তিত্বকে সব সময় ক্রোধভরা ভয়ানক চেহারায় দেখানো হয়, যার চোখ লাল, ভ্রু টানা, চেহারা ভাঙ্গা, কথায় কথায় ক্রুদ্ধ কঠোর হয়, নিষ্পাপ শিশু ও স্ত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, কন্যাদের শিক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা ও খেলাধুলার ওপর অবরোধ আরোপ করে। এক কথায় ঘরকে জেলখানা বানিয়ে দেখানো হয়, আর ঘরের বাইরে উক্ত অভিনেতার জীবন অন্য দেখানো হয়। একদিকে নামাযী অপরদিকে খারাপ ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত। হাতে লম্বা তাসবীহও আছে আবার বন্ধুদের সাথে মদের আড্ডায়ও বিভোর।

দীনদার ও ভদ্র মানুষদের জন্য মিডিয়ায় সাধারণতঃ নিম্নের অভিযোগগুলো ব্যবহার করা হয়—সহজ, সরল, সাদাসিধা, বেওকুফ, নির্বোধ, কম জ্ঞানী, নাদান, ত্রুটিপূর্ণ বিবেকসম্পন্ন, স্থবির, অন্ধকারপ্রিয়, গোঁড়া, প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাদপদ, উজ্জ্বল চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির বিরোধী, উন্নতি ও প্রগতির অন্তরায়, কট্টরপন্থী, প্রাচীনতাপ্রিয়, সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক, অসভ্য, অভদ্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে দূরে, যুগের চাহিদা সম্পর্কে বেখবর, ধর্ম ব্যবসায়ী, ইসলামকে অপহরণকারী, মৌলবাদী, মোল্লা ইত্যাদি। এর চেয়ে ভয়ানক হল, দীনী অভিধার সাথে উপহাস বিদ্রূপের বিষয়টা, যার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এর চাইতেও সঙ্গীন ও সুদূরপ্রসারী। যেমন অন্যায়-অপকর্ম এবং দুষ্কৃতির দৃশ্যে অভিনয়কারী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম কোনো প্রসিদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্বের নামে রাখা হয়। এসব নামের বিকৃতি ঘটিয়ে নিন্দনীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন যয়নব ও ফাতেমাকে যানূবা ও ফাতুমা বলা হয়, আবার বিশেষ হাওয়াই চেলাদেরও যানুবা ফাতুমা নামে ডাকা হয়। নায়ক যখন নায়িকার সাথে অনৈতিক কাজ করে তখন এটাকে চার রাকাত নামায ও যৌন প্রমোদকে জান্নাতে প্রবেশের সাথে তুলনা করা হয়।[৫] নায়ক নায়িকা সমুদ্র তীরে আমোদ-প্রমোদ করতে থাকে আর একে অপরকে বলতে থাকে, আমরা সমুদ্রে নামার সময় বিসমিল্লাহ বলে কেন আল্লাহর রাসূলের সুন্নতের ওপর আমল করব না। এভাবেই মিসরী মিডিয়া পশ্চিমা মিডিয়ার অনুকরণে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে অঘোষিত ক্রুসেড চালিয়ে যাচ্ছে।

মিসরী সমাজে ইবনূল কালব (কুকুরের বাচ্চা), ইবনুল খিনযীর (শুয়েরের বাচ্চা) ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার ব্যাপক। বাপ তার ছেলেদের, বড় ভাই ছোট ভাইকে এসব শব্দে সম্বোধন করে। সাধারণতঃ আদর-ভালবাসা ও ক্রোধ-গোস্মা উভয় অবস্থাতেই একই পরিভাষা ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সিনেমার যে নায়ক-নায়িকার নাম কোনো প্রসিদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্বের নামে রাখা হয়েছে, তার ক্ষেত্রে এই পরিভাষাগুলো বার বার ব্যবহার করা হয়। এতে দর্শকদের ওপর অবশ্যই বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। নাটক, সিনেমা ও উপন্যাসে বিভিন্নভাবে ইসলাম ও তার শিক্ষামালার বিরুদ্ধে বিরূপ প্রচারণা চালানো হয়।

---

৫. এ অভিধা পদ্ধতি এতটাই ব্যাপক যে, ইসলামপ্রিয় আরবী সাহিত্যিকদের মধ্যে নাজীব কিলানীও তাঁর উপন্যাসসমূহে এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

www.pathagar.com

দৈনিক আল আহরাম এবং সাপ্তাহিক রোজ আল ইউসুফসহ সংবাদ পত্রের কার্টুনে বছরের পর বছর শায়খ মাতলূফ (আযহারী শায়খ) এবং মুহাম্মদ আফেন্দিয়া (মোনাফিক আলেমেদীন)-এর নামে দীন সম্পর্কে কৌতুক করেছে।

কায়রো টেলিভিশন

কায়রো টেলিভিশনের প্রথম চ্যানেল সকাল ৭টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত মোট ১৯ ঘন্টা সম্প্রচারিত হয়।

দ্বিতীয় চ্যানেল সকাল ৭টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত মোট ১৯ ঘন্টা সম্প্রচারিত হয়।

তৃতীয় চ্যানেল দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত মোট ১২ ঘন্টা সম্প্রচারিত হয়।

চতুর্থ চ্যানেল রাত ৪টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মোট ৯ ঘন্টা সম্প্রচারিত হয়।

পঞ্চম চ্যানেল সকাল ১০টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত ১৫ ঘন্টা সম্প্রচারিত হয়।

ষষ্ট চ্যানেল দুপুর ২টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত ১০ ঘন্টা সম্প্রচারিত হয়।

সপ্তম চ্যানেল দুপুর ১০টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত ১৪ ঘন্টা সম্প্রচারিত হয়।

নীল টিভিতে সকাল ১০টা থেকে রাত সন্ধা ৬টা পর্যন্ত মোট ৮ ঘন্টা সম্প্রচার হয়।

ডিশ এন্টিনার মাধ্যমে বিবিসি, স্টার টিভি ও সিএনএন ২৪ ঘন্টা সম্প্রচার হয়।

এম বি সি মিডলইস্ট ব্রডকাস্টিং সেন্টার লন্ডন থেকে ১২ ঘন্টা সম্প্রচারিত হয়।

কায়রো রেডিও

রেডিও কুরআন সকাল ৭টা ৩৫ মিনিট থেকে রাত ১টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত ১৯ ঘন্টা সম্প্রচারিত হয়।

সাধারণ অনুষ্ঠান সর্বমোট ২২ ঘন্টা সম্প্রচারিত হয়।

সওতুল আরব সকাল ৭টা থেকে রাত ৪টা ১০ মিনিট পর্যন্ত সর্বমোট ২০ ঘন্টা সম্প্রচার চালায়।

মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সর্বমোট ১২ ঘন্টা সম্প্রচারিত হয়।

রেডিও কুরআন শুধু তিলাওয়াতের জন্য নির্ধারিত। অন্যান্য রেডিও চ্যানেল থেকে দৈনিক মাত্র ২ ঘন্টা ২০ মিনিট দীনী ও নৈতিক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। কায়রো শহরে ২২টি সিনেমা হল, ৫টি নাট্যমঞ্চ, ২৫টি নাইট ক্লাব, এবং সমুদ্রের ভেতরে ৮টি নাইট ক্লাব রয়েছে, যা নীল দরিয়ার উপকূলে অবস্থিত। এখানে চলন্ত নৌকার মধ্যে বিদেশী পর্যটকদের জন্য প্রোগ্রাম হয়। কায়রো সিনেমা হলগুলোতে দৈনিক ২৫টি মার্কিনী, ৮টি ফরাসী এবং ৬টি ভারতীয় সিনেমা প্রদর্শন করা হয়। সামগ্রিকভাবে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত মোট ৩৯টি বিদেশী সিনেমা প্রদর্শন করা হয়।

মিসরী টেলিভিশনের সকল চ্যানেল থেকে দৈনিক ৬টি মার্কিনী, ১টি ফরাসী, ২টি ভারতীয়, ৬টি আরবী সিরিজ এবং ২টি আরবী নাটক সম্প্রচার করা হয়। রেডিও কায়রোতেও আরবী সিরিজ, নাটক ও সিনেমা সম্প্রচার করা হয়। এসব তো টিভি রেডিওর কথা। সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে যে নগ্নতা, অশ্লীলতা ছড়ানো হচ্ছে তা তো আলাদা কথা।

www.pathagar.com

পবিত্র রমযান মাসে এমবিসির বিশেষ অনুষ্ঠান দুপুর ১১টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত আরব বিশ্বের সকল দেশের জন্য সম্প্রচার করা হয়। ১৫ ঘন্টার এই অনুষ্ঠানে ১৪১৬ হিজরীতে দৈনিক ৩টি আরবী সিরিজ, ২টি আরবী সিনেমা ও ২টি মার্কিন সিনেমা সম্প্রচার করা হয়েছে। কায়রো টিভির সকল চ্যানেল রোযাকে সার্থক বানানোর জন্য একে অপরে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। সাপ্তাহিক আল মুজতামা আরব বিশ্বে মার্কিন সিনেমার আমদানী সম্পর্কে এক জরিপে লেখেছে, ডিশ এন্টিনার এই যুগে আরবরা সরাসরি ৩৫টি চ্যানেল থেকে তাদের ইচ্ছামতো অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারা সত্ত্বেও অতি চড়া মূল্যের রয়েলিটি দিয়ে সরকারী পর্যায়ে মার্কিন সিনেমা আমদানী করা হয়। জরিপে বলা হয়েছে, মিসরে ৮৫%, জর্ডানে ৬৫%, আরব আমিরাতে ৭৭%, তিউনিসিয়ায় ৭৮%, আলজেরিয়ায় ৭৯%, মরক্কোতে ৮২% এবং কুয়েতে ৭৭% মার্কিন সিনেমা প্রদর্শিত হয়। এসব দেশে প্রতিমাসে চারশ' নিষিদ্ধ ঘোষিত সিনেমার ভিডিও ক্যাসেট অনুপ্রবেশ করে। শিশুদের ৮৯% টিভি অনুষ্ঠানের জন্য অমুসলিম দেশ আমেরিকা জাপান থেকে প্রোগ্রাম আমদানী করা হয়। নতুন প্রজন্মের মন মস্তিষ্কে শেরেকী আকীদা-বিশ্বাস সুদৃঢ় করার জন্য অত্যন্ত শৈল্পিক দক্ষতা ও চতুরতার সাথে বিভিন্ন সিরিজ, নাটক, গেমস এবং কার্টুনও তৈরি করা হয়।

মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে পশ্চিমা মিডিয়ার যুদ্ধ কত ভয়াবহ, ব্যাপক, সুগভীর, সুদূরপ্রসারী, শক্তিশালী ও চতুর্মুখী, তার অনুমান এভাবে করা যেতে পারে, ভয়েস অফ আমেরিকা দৈনিক আরবীতে ৪৯ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে।

ফ্রান্সের রেডিও মোনিয়ে কার্লো ৫২ ঘন্টা, বিবিসি ৮ ঘন্টা আরবী ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। রেডিও ফ্রিতাস, যা ভেটিকন সিটির তত্ত্বাবধানে খৃস্টবাদ প্রচার-প্রসারের জন্য উৎসর্গীকৃত–আরব বিশ্বের শ্রোতাদের জন্য ২৪ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশেষ রেডিও স্টেশন স্থাপন করেছে।

পশ্চিমা মিডিয়ার সরাসরি মুসলিম সমাজের ওপর আগ্রাসন এবং বিনা অনুমতিতে মুসলিম পরিবারে অনুপ্রবেশের শক্তিশালী চেষ্টা-প্রচেষ্টা দেখুন, অন্যদিকে সেসব মুসলিম দেশগুলোকেও দেখুন, যারা কোটি কোটি ডলার দিয়ে পশ্চিম থেকে এ বিষ আমদানী করছে এবং স্বদেশের দীনী ভাইদের হলকে জোরপূর্বক ঢেলে দিচ্ছে। ১২টি ইসলামী দেশ ৫০%, দশটি ইসলামী দেশ ৬৫%, নয়টি ইসলামী দেশ ৭২% এবং চারটি ইসলামী দেশ ৮০% টিভি রেডিও প্রোগ্রাম পশ্চিম থেকে আমদানী করে। মুসলিম দেশগুলোতে সরকার নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার মাধ্যমে পশ্চিমা দেশে তৈরি দেড় থেকে দুই লাখ ঘন্টার অনুষ্ঠান দেখানো হয় এবং এর জন্য লাখ লাখ পাউন্ড ও ডলার ব্যয় করা হয়।

১৪১৬ হিজরীর রমাযান মাসে কুয়েতের তথ্য মন্ত্রণালয় লেবানন ও সিরিয়া থেকে একটি নৃত্য ও কণ্ঠশিল্পী দলকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এর জন্য ৪৫ লাখ ডলার নগদ, ৩০ লাখ ডলার হোটেল ও ভ্রমণ বিল বাবদ ব্যয় করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

জার্মানীর বন থেকে প্রকাশিত মাসিক আর রায়েদ মরক্কোর ওপর পশ্চিমা মিডিয়ার আগ্রাসনের বিশ্লেষণ করে লেখেছে, মরক্কোর যুবক-যুবতীরা চ্যানেল-২ বেশি পছন্দ করে। কারণ এই চ্যানেল শুধু বিদেশী অনুষ্ঠান দেখায়। এই চ্যানেল ১৯৯৪ সালেই ১১২৫টি বিদেশী সিরিজ ও ৮০২টি আরবী সিনেমা প্রদর্শন করে। সামগ্রিকভাবে এই চ্যানেলটি ৩০৫৬টি চরিত্রবিধ্বংসী অনুষ্ঠান প্রচার করে চল্লিশ লাখ ডলার মুনাফা করেছে।

পশ্চিমা মিডিয়া আজ যা করছে একথাই পবিত্র কুরআন আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে বলে দিয়েছে-'একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা খরিদ করে অন্ধভাবে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।' (সূরা লোকমান-৬)

কুয়েতী মিডিয়া

মিসরের মোকাবেলায় কুয়েতে ১৯৬০ সালের পর পশ্চিমা মিডিয়ার প্রসার ঘটে। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত কুয়েতে নৈতিক ও চারিত্রিক অপরাধ ছিল না বললেই চলে, কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়ার ঢেউয়ে কুয়েতী সমাজেও নৈতিক ও চারিত্রিক অপরাধ সংঘটিত হতে শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই পশ্চিমা সমাজব্যবস্থা কুয়েতী সমাজব্যবস্থাকে তার চাদরে ঢেকে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দৈনিক আল কাবাসের ১৯৯৪ সালের ১০ই আগস্ট সংখ্যার একটি সার্ভে রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো।

সার্ভে রিপোর্টে বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত যুবক যুবতীদের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, ১৯৯২ সালে যে চারিত্রিক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার সাথে জড়িত ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সের নওজোয়ানদের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৭ শ' ৯৭ জন। ২ হাজার ৮ শ' ২৮টি অপরাধের মধ্যে পুরুষের হার ৯৭% আর নারীদের হার ২.২%। সার্ভে রিপোর্টের্র বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ-

০১. ট্রাফিক আইন লংঘনকারীদের সংখ্যা ৯ শ' ৯২, এর মধ্যে মেয়েদের হার ৯৯ শতাংশ।

০২. মারদাঙ্গার ঘটনা ৭ শ' ২০, এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৭ শ' ৪ আর নারীদের সংখ্যা ৬।

০৩. চুরি ডাকাতির ঘটনা ৩ শ' ৫৪, এতে ৩ শ' ৪২ জন পুরুষ আর ১২ জন নারী গ্রেফতার হয়েছে।

০৪. ধর্ষণের ঘটনা সংখ্যা ৯৩।

০৫. নারীদের উত্ত্যক্তকরণ অশ্লীল কৌতুকের ঘটনা সংখ্যা ৬৩, এতে ৬০ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা গ্রেফতার হয়েছে।

০৬. অপরহরণ ও ধর্ষণের ঘটনা ৩৭।

উল্লিখিত অপরাধের মধ্যে শুধু কুয়েত সিটিতেই ঘটেছে ২ হাজার ২ শ' ২৩টি। আর বাকী ৬ শ' ৩৬টি ঘটে অন্যান্য শহরে।

www.pathagar.com

অন্যান্য আরব দেশ যেমন মরক্কো ও আলজেরিয়ায়ও অপরাধের হার মিসর এবং কুয়েতের মতো। উদাহরণস্বরূপ আলজেরিয়ায় যুবতী মেয়েদের আত্মহত্যার হার সকল আরব দেশ থেকে বেশি। ১৯৯৫ সালের এক জরিপে জানা যায়, অবৈধ সম্পর্কের ফলে যেসব মেয়ে আত্মহত্যা করেছে তাদের সংখ্যা ২ শ' ৮০। অল্প বয়স্ক যেসব ছেলে নৈতিক ও আর্থিক অপরাধে গ্রেফতার হয়েছে তাদের সংখ্যা শুধু রাজধানীতেই ৯ শ' ৫০।

আরব বিশ্বে ক্রমবর্ধমান সংঘটিত অপরাধও দেখুন এবং মিডিয়ার সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাও দেখুন, কিভাবে সেসব সরকার দীন ধর্ম ও চরিত্রের পথে চলাকে শাস্তি যোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। পক্ষান্তরে পশ্চিমা জীবনপদ্ধতি এবং যৌন বিপথগামিতা ও বিশৃংখলার পথে চলাকে কিভাবে উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। এখানে আমরা দৈনিক আল আহরামের ১৯৯৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে টিভি, রেডিও, সিনেমা ও নাটকের অনুষ্ঠানমালার একটি সংক্ষিপ্ত জরিপ পেশ করছি। এই জরিপ পেশ করার উদ্দেশ্য একথা বলা, আজ আমরা মুসলমানরাই কিভাবে নিজেরা নিজেদের হাতে কবর খুঁড়ছি।

সৌদি মিডিয়া

পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি যখন আরব বিশ্বের ওপর আগ্রাসনের সূচনা করে তখন মিসর সেই আগ্রাসনকে উষ্ণ অভিনন্দন জানায়। পক্ষান্তরে আরব উপদ্বীপ পাশ্চাত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সব বিষয় সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে, যা ছিল অপ্রাকৃতিক অযৌক্তিক, কিন্তু আরব উপদ্বীপ বেশিদিন পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির আগ্রাসন মোকাবেলা করতে পারেনি। সে পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসনের সামনে হাতিয়ার ছেড়ে দিয়েছে। আরব উপদ্বীপে সফরকারী প্রত্যেকেই আজ তা প্রত্যক্ষ করছে।

ইসলামের দু'টি পবিত্রতম শহরের দেশ সৌদি আরবে সর্বপ্রথম ১৯৬৫ সালে জিদ্দা ও রিয়াদ থেকে একযোগে টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়। এই সৌদি চ্যানেল দু'টি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে গোটা দেশে আরবী ও ইংরেজি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। টিভি অনুষ্ঠানমালা মিসর ও লেবাননে প্রস্তুত এবং বিন্যাস করা হয়। ১৯৮০ সালে যখন সরাসরি ইউরোপ-আমেরিকায় টিভি সম্প্রচারের সূচনা হয় তখন ডিশ এন্টিনার মালিক কেবল সৌদি আমীর ওমারা এবং রাজপরিবারই ছিল। সাধারণ জনগণের ডিশ এন্টিনার প্রোগ্রাম দেখার অনুমতি ছিল না। কুয়েতের বিরুদ্ধে ইরাকী বর্বরতা সর্বপ্রথম জনগণকে ডিশ এন্টিনা ও অন্যান্য পশ্চিমা মিডিয়ার মাধ্যমে সংবাদ শোনার অনুমতি প্রদান করে। ইরাক-কুয়েতের এই যুদ্ধ ব্যক্তিগত ও সরকারী উদ্যোগকে আরো তেজ করে দেয়। তারা স্যাটেলাইটের সাহায্যে অন্যান্য আরব দেশেও টেলিভিশন সম্প্রচারে সক্ষম হয়।

০১. কয়েকটি স্যাটেলইট চ্যানেল সৌদি নাগরিকের মালিকানায় রয়েছে। দেশের পূর্বাংশে হংকং-এর স্টার টিভির পাঁচটি চ্যানেল রয়েছে। তন্মধ্যে একটি মিউজিক চ্যানেল আর অন্যান্য চ্যানেলে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস নিউজ দেখা যায়। অন্যান্য টিভি

www.pathagar.com

সার্ভিসের মধ্যে সিএনএন ইন্টারন্যাশনাল এবং আরব সরকারের বিভিন্ন প্রোগ্রাম মিসর, কুয়েত, লেবানন ও দুবাই স্টেশন থেকে দেখা যায়। ভারতে জি টিভি সৌদি আরবের সকল শহরেই দেখা যায়।

০২. ১৯৯০ সালে বিজ্ঞাপন ও চাঁদার সাহায্যে মিডলইস্ট ব্রডকাস্টিং–এমবিসি এর সরাসরি সম্প্রচার শুরু হয়। এ টিভি স্টেশনটি সৌদি রাজপরিবারের মালিকানাধীন। এর হেড অফিস লন্ডনে। এ টিভি ১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সর্বপ্রথম সম্প্রচার শুরু করে। রাতদিন ১২ ঘন্টা বিরতিহীন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। কায়রো ও জিদ্দা থেকে প্রচারিত আরব রেডিও টেলিভিশন কোম্পানী এআরটি সৌদি পুঁজিপতি সালেহ কামেলের মালিকানাধীন। তার চারটি চ্যানেল থেকে সিনেমা, মিউজিক, স্পোর্টস ও শিশুদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়।

০৩. ব্রডকাস্টিং স্যাটেলাইট ১৯৯১ সালে তার সার্ভিস শুরু করে। এর সদর দফতর রোমে। আরবী ও ইংরেজি সতেরটি চ্যানেল এমন ব্যক্তিদের জন্য সরবরাহ করে থাকে, যারা আড়াইশ ডলারের ডিশ কিনতে এবং নিয়মিত মাসিক বিল পরিশোধ করতে পারে।

০৪. সরাসরি টিভি প্রোগ্রামের ব্যাপারে সৌদি আরবের তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়।

প্রথম শ্রেণীর বক্তব্য হলো, সরাসরি ডিশ এন্টিনার প্রোগ্রাম দ্বারা সৌদি অর্থনীতি বিশেষ করে সৌদি ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর বিপুল আর্থিক ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বক্তব্য হলো, সরাসরি ডিশ এন্টিনার সম্প্রচার ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্য বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর।[৬]

তৃতীয় শ্রেণীর বক্তব্য হলো, এ ধরনের প্রোগ্রাম দ্বারা সৌদি আরবের কোনো বড় ধরনের ক্ষতির আশংকা নেই; বরং এর মাধ্যমে আমরা পুরো বিশ্ব থেকে উপকৃত হতে পারি এবং আমাদের দ্বীপ থেকে বের হতে পারি।[৭]

সৌদি সংবাদপত্রের অবস্থাও সৌদি টিভির মতোই। গোটা দেশ থেকে সর্বমোট আটটি দৈনিক বের হয়, যেগুলোর মালিক, সম্পাদক, প্রকাশক ও নীতিনির্ধারক সবাই

---

৬. সুচিন্তিত পরিকল্পনা মোতাবেক মিডিয়ার মাধ্যমে হেজাযের সমাজকে যে দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কেবলা। চিন্তশীল ব্যক্তিবর্গ ১৯৬২ সালে হেজাযে টিভি আগমনের এক বছর পরই শেখ সাদী সিরাজী কবিতার ভাষায় সে দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। শেখ সাদীর কবিতার মর্ম হচ্ছে–'ওহে বেদুঈন তুমি কখনোই কাবায় পৌঁছতে পারবে না, তুমি তো তুর্কিস্তানের পথ ধরেছ।' কিন্তু চিন্তাশীল মনীষীদের এ আহবান মরুভূমির চিৎকার প্রমাণিত হয়েছে। আরব উপদ্বীপের সমাজের দৃষ্টিতে স্বাধীন বাধা বন্ধনহীন পাশ্চাত্য জীবনের প্রদর্শনীতে ধাঁধা লেগে গেছে। দেখুন, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র. প্রণীত–'হিজাযে মুকাদ্দাস উমের্দূ আওর আন্দেশুঁ কে দরমিয়ান', 'মুসলিম মোমালেক মে ইসলামিয়াত আওর মাগরিবিয়াত কী কাশমাকাশ', 'আলমে আরবী কা আলমিয়া')

৭. সৌদি প্রতিরক্ষা দফতরের মাসিক মুখপত্র 'আল হিরসুল ওয়াতানী'র এক সাংবাদিক সাবেক এক মার্কিন জেনারেল ব্রন্ট ইসকো ক্রফটকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমেরিকা ডিশ এন্টিনার মাধ্যমে গোটা বিশ্বের সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ফেলছে। জেনারেল এর জবাবে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, আমেরিকার মৌলিক উদ্দেশ্য, সকল আঞ্চলিক সভ্যতা-সংস্কৃতি নির্মূল করে গোটা বিশ্বকে মার্কিনী রঙে রঙিন করা।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী। এই আটটি দৈনিকের প্রত্যহ সর্বমোট এক লাখ কপি প্রচার হয়। এছাড়াও অন্যান্য ভাষায় প্রায় ৮০টি সংবাদপত্র, দেড়শ ম্যাগাজিন, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকা ও বইপত্র এবং প্রায় এক কোটির কাছাকাছি বিদেশী প্রকাশনা প্রচার হয়। প্রতিমাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের প্রস্তুতকৃত সত্তর থেকে আশি হাজারের কাছাকাছি ভিডিও ও এক লক্ষ অডিও ক্যাসেট বিক্রি হয়।[৮] যদিও মোকাবেলায় প্রিন্ট মিডিয়ার প্রভাব প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতার হার ত্রিশ শতাংশ, কিন্তু এরপরও আরব উপদ্বীপের সমাজব্যবস্থার ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পড়ছে।

সৌদি সমাজব্যবস্থার ওপর পরিচালিত এক জরিপ থেকে জানা যায়, সৌদি আরবের একজন ছাত্র যখন মাধ্যমিক স্কুল পাস করে তখন এ সময়ের মাঝে টিভির সামনে তার পনের হাজার ঘন্টা, আর সময় ক্ল্যাস ও পড়ালেখায় ব্যয় হয়েছে দশ হাজার ঘন্টা।

আরব সংবাদ সংস্থাগুলো সর্বমোট একলাখ পঞ্চাশ হাজার শব্দ সম্বলিত সংবাদ পত্রিকাগুলোকে সরবরাহ করে। আবার সংবাদপত্রের নব্বই শতাংশ আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলো থেকে সংগ্রহ করা হয়।

ইউনেস্কোর এক জরিপ অনুযায়ী গোটা বিশ্বের মিডিয়া থেকে দৈনিক একশ' বিশ চ্যানেলে সতের হাজার ঘন্টার প্রোগ্রাম পুরো দুনিয়ায় সম্প্রচার করা হয়। এর মধ্যে নয় হাজার ঘন্টার প্রোগ্রাম আরব বিশ্বের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়। ইসরাঈল স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সতেরটি চ্যানেল থেকে আরব বিশ্বের ওপর অবিরাম আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া জরিপ করে ইউনেস্কো বলেছে, পুরো বিশ্বের পঁচাশি শতাংশ মানুষ টিভির কারণে তাদের খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-ঘুমানো, লেখাপড়া ও কাজকর্মের নির্ধারিত সময় পরিবর্তন করেছে। টিভি তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এখন তারা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও চেতন-অবচেতন সর্বাবস্থায় তারা টিভি ও অন্যান্য মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত।

ইউনেস্কো আরব বিশ্বের ওপর এক পর্যালোচনায় বলেছে, অধিকাংশ মুসলমানের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়েছে। নব প্রজন্মের দশ থেকে পঁচিশ বছর বয়স্কদের আশি শতাংশ টিভির শেরেকী প্রোগ্রাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ইহুদী-খৃস্টানদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, ধর্মীয় পরিচায়ক বিষয়াবলী, তাহযীব-তামাদ্দুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং তাদের উদ্ভাবিত ফ্যাশনকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। পনের বছর সময়সীমা ধরে মিসর, সৌদি আরব ও কুয়েতকে টার্গেট বানিয়ে

---

৮. মিসরী দৈনিক আল আহরাম ১৩-৭-১৯৮৪ সংখ্যায় আরব বিশ্ব ও ফ্রান্সে টেলিভিশন এবং ভিডিও ক্যাসেটের ওপর একটি জরিপ প্রকাশিত হয়, যা উপদেশমূলক। ফ্রান্সে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে, দশটি ভিসিআর সেট রয়েছে। পক্ষান্তরে কুয়েতে প্রতি হাজারে চারশ নব্বই এবং সৌদি আরবে প্রতি হাজারে সাতশ' পঞ্চাশটি ভিসিআর সেট রয়েছে। ১৯৯৫ সালে এই হার শতকরা ১০০% হয়ে গেছে। মিসরে বার্ষিক এক কোটি মিসরী পাউন্ডের টিভি কেনাবেচা হয়। অথচ এ দেশের বৈদেশিক ঋণ রয়েছে পঞ্চাশ কোটি মিসরী পাউন্ড।

www.pathagar.com

মাদক ও নেশাজাত দ্রব্যের বিস্তার ঘটানো হয়েছে। ফলে অবৈধভাবে যৌনক্ষুধা নিবারণের ঘটনা, জুলুম, জবরদখল, ধর্ষণ, আর্থিক দুর্নীতি, নৈতিক অপরাধ ইত্যাদি বেড়ে গেছে। নারী ও শিশুদের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে নেশাজাত দ্রব্য এবং ক্যাসেট, টিভি গেমস ও এ্যালবামের মাধ্যমে অশ্লীলতার প্রসার ঘটানো হচ্ছে।[৯]

দশ বছরেরও কম সময়ে সৌদি সমাজে টিভির যে অসাধারণ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পড়েছে তার একটি বিশ্লেষণ রিয়াদ থেকে প্রকাশিত মাসিক আরবী ম্যাগাজিন আদ-দাওয়াহ'র শুধু দুটি সংখ্যা থেকে নিম্নে পেশ করা হলো।

আদ-দাওয়া পত্রিকা কয়েকজন মহিলার মাধ্যমে রিয়াদে অবস্থিত সৌদি রাজপরিবারের একটি সার্ভে করিয়েছে এবং ১৯৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে (১৫৭৭) সংখ্যায় সে সার্ভে রিপোর্টের ফল প্রকাশ করেছে।

ম্যাগাজিনাটি সৌদি আরবে ডিশ এন্টিনার আগমনের পর থেকে সৌদি সমাজে যে চারিত্রিক ও নৈতিক প্রভাব পড়েছে তার ওপর জরিপটি পরিচালনা করে। এ বিষয়ে মহিলাদের কাছ থেকে যে উত্তর এসেছে তা নিম্নরূপ–

০১. ৪৪% সৌদি নারী 'পশ্চিমা স্টাইলের' ফ্যাশনেবল লেবাস পরা শুরু করেছে।

০২. ৩৭% নারী ফ্যাশনেবল লেবাস পরে মার্কেটে যায়।

০৩. ৮১% নারীর পিতা-মাতা ও স্বামী এ ধরনের পোশাক পরা পছন্দ করে না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা এ ধরনের পোশাক পরে।

০৪. ৩৫% নারীর পিতা-মাতা ও স্বামী এ ধরনের ফ্যাশনেবল পোশাক পরতে তাদের উৎসাহিত করে।

০৫. ৩৫% নারী বলেছে, আমরা এ ধরনের পোশাক ছাড়ার চিন্তা ভাবনা করছি।

০৬. পঞ্চাশ বছর বয়স পার হয়ে গেছে, এমন নারীও ফ্যাশনেবল পোশাক পরতে শুরু করেছে।

০৭. ৬০/৬২ বছর বয়সী কিছু নারী বলেছে, আমরা একবছর ধরে এ ধরনের পোশাক পরতে শুরু করেছি।

০৮. ৮৫% নারী ফ্যাশনেবল পোশাক পরার কারণ বর্ণনায় বলেছে, আমরা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দেখে অথবা টিভি ও মার্কেটের শোরুম দেখে পশ্চিমা স্টাইলের ফ্যাশনেবল পোশাক পরতে শুরু করেছি।

---

৯. সৌদি টিভিতে শিশুদের যে অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয় তাতে চলমান কার্টুনের মাধ্যমে অত্যন্ত সুকৌশলে শেরেকী আকীদা-বিশ্বাস ও অনৈতিকতার বিষ শিশুদের মন মস্তিষ্ক ও মগজে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। উদাহরণতঃ বাবায়ে সিরিজ, আদনান ও লিনা সিরিজে হত্যা লুণ্ঠন এবং সুন্দরী বালিকার ওপর এত অসংখ্যবার অপরাধমূলক হামলার দৃশ্য দেখানো হয়, যাতে টিভিদর্শক শিশুরা অনিচ্ছাকৃত বলে ওঠে, পুনরায় বালিকাটির ওপর হামলা চালানো হবে। আরেক দৃশ্যে এক ব্যক্তি সমুদ্রে ডুব দিচ্ছে এবং মেঘে পর্যন্ত নিজের শত্রুর সন্ধান চালাচ্ছে। তৃতীয় এক দৃশ্যে অভিনেতা গাধায় চেপে আকাশে উড়ে যাচ্ছে; সেখানে মেঘের মধ্য থেকে কুৎসিত কদাকার এক ব্যক্তি বেরিয়ে আসে, যার দাড়ি লম্বা, চোখ লাল, অভিনেতা তাকে আবদুর রহমান নামে ডাকে এবং তাচ্ছিল্যভাবে তাকে নিজের পায়ের নীচে দলিত মথিত করে, সব শেষে তাকে হত্যা করে।

www.pathagar.com

৯. ৬১% নারী বলেছে, এমন পোশাক পরতে আমাদের লজ্জাবোধ হয় না।

১০. ৩৯% নারী বলেছে, যদিও আমরা এ ধরনের পোশাক পরি, কিন্তু বাস্তবিকই এগুলো পরতে আমাদের লজ্জাবোধ হয়।

১১. ৬৫% নারী বলেছে, আমাদের পিতা-মাতা ও স্বামী এ ধরনের পোশাক পরতে নিষেধ করেনি।

উল্লেখ্য, আদ দাওয়াহ ম্যাগাজিন ফ্যাশনেবল পোশাকের সংজ্ঞায় বলেছে, ফ্যাশনেবল পোশাক দ্বারা এমন পোশাক উদ্দেশ্য, যা সতর ঢাকে না, পাশ্চাত্য স্টাইলের আঁটসাট পোশাক। ম্যাগাজিনটির অনুসন্ধানী গবেষণা মোতাবেক মহিলা এবং মেয়ে শিশুরা (৬ থেকে ২০ বছর বয়সী) আঁটসাট জিন্সের প্যান্ট পরে, তাদের বাহু পেট খোলা এবং ওপরে পাতলা বোরকা থাকে ।

১২. ৪৫% নারী পশ্চিমা গান ও নৃত্য পছন্দ করে।

১৩. ৬৫% নারী পশ্চিমা খাবার ও ৯৫ শতাংশ নারী পশ্চিমা পানীয় পছন্দ করে।

নারীদের দ্বিতীয় আগ্রহের বস্তু হলো, সাজ-সজ্জার সামগ্রী, যাতে নেইল পালিশ, লিপিস্টিক, শ্যাম্পু, পারফিউম, সেন্ট, চোখের কাজল, ভ্রূপেন, স্নো-পাউডার, ক্রিম ইত্যাদি রয়েছে।

মাসিক আদ দাওয়া'র ১৯৯৮ সালের ২৭ আগস্ট সংখ্যায় রিয়াদের বাণিজ্য বিভাগ সূত্রে ১৯৯৭ সালের আমদানী সম্পর্কে যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে, যা কোনো মুসলিম সমাজের জন্য অবিশ্বাস্য, কিন্তু টিভি বিজ্ঞাপন, ফ্যাশন প্রোপাগান্ডা ও সাজ-সজ্জার সামগ্রী এত ব্যাপক হয়ে গেছে, যা দেখে আদ দাওয়াহ ম্যাগাজিন প্রকাশিত পরিসংখ্যান বিশ্বাস করতেই হয়।

১৯৯৭ সালেই ৩ কোটি ৭২ লাখ ৯৮ হাজার রিয়াল লিপিস্টিক ও নেইল পলিশ ক্রয়ে ব্যয় হয়েছে। বাণিজ্য বিভাগ থেকে তার ওজন ৪ লাখ ৬৭ হাজার ৩ শ' ৬৬ টন বলা হয়েছে।

চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলো রঙিন করার জন্য যে কাজল ও মেহেদি পশ্চিমা দেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, তার ওজন ১ লাখ ৫৮ হাজার ৬ শ' ৩৬ টন। যার মূল্য ২ কোটি ৪৪ লাখ ৪০ হাজার ১৭ রিয়াল।[১০] মেধা মনন ও চরিত্র গঠনে টিভির পর দ্বিতীয় নম্বরে রয়েছে সৌদি দৈনিক পত্র-পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনগুলো। যার মধ্যে দৈনিক আশ-শারকুল আওসাত সর্বশীর্ষে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও প্রচার সংখ্যার দিক দিয়ে এ পত্রিকাটি আরব উপদ্বীপে সবচে বেশি অগ্রগামী। এটি রাজপরিবারের মালিকানাধীন। এর প্রকাশনা সংস্থা থেকে নারীদের বিশেষ ম্যাগাজিন আল মাজাল্লা,

---

১০. আদ দাওয়া'র ১৯৯৮ সালের আগস্ট সংখ্যার এক গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে, লিপিস্টিক, নেইল পলিশ, শ্যাম্পু ও পাউডার তৈরিতে মৌলিক উপাদান হিসেবে শূকর, কুকুর, পোকা মাকড় ও অন্যান্য হারাম জানোয়ারের চর্বি ব্যবহৃত হয়। পত্রিকাটি আফসোস প্রকাশ করে বলেছে, হারাম বস্তু ক্রয়ে আরব বিশ্ব কোটি কেটি ডলার ব্যয় করছে। আর আমাদের মুসলিম নারীরা সাজ-সজ্জার জন্য এসব হারাম বস্তু ব্যবহার করছে।

www.pathagar.com

সাইয়েদাতী, সাপ্তাহিক আল মুসলিমূন, দৈনিক আরব নিউজ (ইংরেজি) ইত্যাদি ছাড়া খেলাধুলা সম্পর্কে ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। পরন্তু প্রতিমাসে বিভিন্ন বিষয়ে বই-পুস্তকও প্রকাশিত হয়।

দৈনিক আশ শারকুল আওসাত লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জাহরান, রিয়াদ, জেদ্দা, কাসা বল্যাংকা (মরক্কো), মার্চোলিয়া, প্যারিস, কায়রো ও লন্ডন থেকে একই সময়ে প্রকাশিত হয়। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬টি। বিষয়ের দিক দিয়ে পত্রিকাটির সংবাদ বিন্যাস নিম্নরূপ–

প্রথম পৃষ্ঠা : আন্তর্জাতিক ও আরব বিশ্বের রাজনৈতিক সংবাদ।

দুই পৃষ্ঠা : আরব বিশ্বের বিভিন্ন খবরাখবর।

এক পৃষ্ঠা : স্টক এক্সচেঞ্জ, পেট্রোল ও অর্থনৈতিক সংবাদ।

এক পৃষ্ঠা : আন্তর্জাতিক বিষয়।

এক পৃষ্ঠা : আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে নির্বাচিত অংশ এবং রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধের আরবী অনুবাদ।

এক পৃষ্ঠা : পাঠকের মতামত ও চিঠিপত্র।

এক পৃষ্ঠা : বিজ্ঞান, জরিপ, রোজনামচা, ভ্রমণকাহিনী, গ্রন্থ পরিচিতি ইত্যাদি।

এক পৃষ্ঠা : দীনিয়াত ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি।

এক পৃষ্ঠা : সাহিত্য, সাময়িকী, কাব্য এবং সাহিত্যিক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-গায়িকা ও নাস্তিকদের সাক্ষাতকার।

দুই পৃষ্ঠা : বিভিন্ন সংবাদ, কার্টুন, বিনোদন, সিনেমা, খেলাধুলা ও নগ্ন ছবি ইত্যাদি। কখনো খেলাধুলার জন্য তিন পৃষ্ঠা বরাদ্দ করা হয়। আর দীনিয়াত ও ধর্মের জন্য এক পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকলেও তাও আবার অর্ধ পৃষ্ঠা থাকে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে ভরপুর। বিজ্ঞাপনগুলোও আবার নারীর নগ্ন ছবি দ্বারা ভরপুর থাকে। দীনী প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলোতেও নওজোয়ানদের দীনদারী ও দীনের সাথে ভালবাসাকে অতি বাড়াবাড়ি, কট্টরপন্থা ও আধুনিক যুগের চাহিদা সম্পর্কে বেখবর ইত্যাদি শব্দে আখ্যায়িত করা হয়। যাদুটোনা, তাবিজ–ঝাঁড়ফুক, পশ্চিমা সমাজের সৌন্দর্য, আরব ও আমেরিকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংবাদ এবং ছবি ব্যাপকভাবে দেয়া হয়। ইরাক-ইরান যুদ্ধে সৌদি পত্রিকাগুলো ভূমিকা ছিল ইরাকের পক্ষে। ফিলিস্তিন, কাশ্মির, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, কসোভো ও বসনিয়ার মুসলমানদের সম্পর্কে যেসব সংবাদ প্রকাশ করা হয়, তা সম্পূর্ণ পশ্চিমা নিউজ এজেন্সীর সরবরাহকৃত। বসনিয়া ও কসোভোর মুসলমানদের গণহত্যার ব্যাপারে মার্কিন পলিসিকে ন্যায় ও ইনসাফ বলে অভিহিত করে সৌদি মিডিয়া। ইউরোপে ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাযতের লক্ষ্যে ন্যাটোর বোমা হামলার জন্য সৌদি পত্রিকা আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। বসনিয়া, কসোভো, সোমালিয়া ও সুদান জাতিসংঘের বর্বরতাকে সৌদি মিডিয়া কোনোই গুরুত্ব দেয়নি। পক্ষান্তরে যখন আরব লীগের কথা আসে তখন তার নেতিবাচক দিকগুলোই সৌদি মিডিয়া বেশি করে

www.pathagar.com

তুলে ধরে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ পত্রিকা আরব জাতীয়তাবাদের ধুয়া তোলে। যেমন আমেকিার সাথে আরব বিশ্বের খেলাধুলায় যদি সৌদি টিম থাকে তাহলে সৌদি টিমকে খুব হাই লাইট করা হয়।

পশ্চিমা অভিনেতা-অভিনেত্রী ও ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অমিতাভ বচ্চন, বৃটেনের রাণী, প্রিন্সেস ডায়ানা, ক্লিন্টনের প্রেমিকা মনিকা লিউনস্কি প্রমুখের আলোচনা, ছবি ও জীবন কাহিনী ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করা হয়। পত্রিকার শিরোনাম, সংবাদ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি দেখে কোনোভাবেই মনে হয় না, এটি ইসলামী পত্রিকা। খোদ পত্রিকার নাম আশ-শারকুল আওসাতও পশ্চিমা প্রোপাগান্ডার ফসল। আশ শারকুল আওসাত প্রকাশনা সংস্থা থেকে আরব নারীদের জন্য 'সাইয়েদাতী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হয়। যেটি সম্পাদনা করেন এক সৌদি নারী, যাতে এটিকে ভিত্তি বানিয়ে সৌদি সমাজ ছিন্নভিন্ন করা যায়।

এ পত্রিকায় সৌদি নারীদের কলমে পশ্চিমা ফ্যাশন, ডিজাইন, ইউরোপিয়ান সোসাইটি ও তাদের ব্যক্তিত্বদের পক্ষে প্রশংসামূলক প্রবন্ধ নিবন্ধ লেখানো হয়, যাতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিকভাবে পশ্চিমা সভ্যতা সহজে গ্রহণের একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়। এর কভার পৃষ্ঠায় সৌদী নারীদের মনোহারি ফটো, সৌদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি, সাক্ষাতকার, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও চিঠিপত্র থাকে। এতে সহশিক্ষা, বোরকা, নামায, পশ্চিমা সাহিত্য, কাব্য এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্কে তাদের মতামত ও চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটানো হয়। তাদের দ্বারা লেখানো হয়, বর্তমান যুগে জীবনের উন্নত মান ঠিক রাখার জন্য পুরুষের সাথে সাথে নারীদেরও মাঠে ময়দানে কাজ করা জরুরী। ফলে আজ সৌদি নারীরা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য প্রস্তুত, এমনকি তারা কাজ করেও যাচ্ছে। সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাসিক আল হিরসুল ওয়াতানীতে একজন বড় দায়িত্বশীলের একটি বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী। তিনি বলেন, আমরা কাউকে সৌদি নারীদের দ্বিতীয় স্তরের মর্যাদাদানের অনুমতি দিতে পারি না। তার এ বক্তব্যের কিছুদিন পরই সংবাদ পাওয়া গেল, সৌদি মজলিসে শূরায় নারীকে প্রতিনিধিত্ব দেয়া হয়েছে। একজন নারী সশরীরে মজলিসে শূরার অধিবেশনে অংশ গ্রহণও করেছেন।

মাসিক সাইয়্যেদাতীর ৩৮তম সংখ্যায় হিজাবের বিরুদ্ধে মিসরী নারীদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের ওপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে, সৌদি নারীরাও মিসরী নারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে প্রস্তুত। এ পত্রিকার দু'টি সংখ্যায় প্যারিস, লন্ডন, নিউইয়র্ক, বন ও মিউনিখে আরব চলচ্চিত্র মেলার বিস্তারিত রিপোর্ট ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবি ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে।

সাইয়েদাতীর একটি সংখ্যায় গৃহিণী নারীদের বেকারত্ব ও অপর একটি সংখ্যায় একাধিক বিবাহের সমালোচনামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

পত্রিকাটিতে 'সাইয়েদাতী আল জামিলা' শিরোনামে চার পৃষ্ঠাব্যাপী স্বতন্ত্র একটি কলাম থাকে। যাতে সাজসজ্জার সামগ্রী, বিভিন্ন ধরনের ক্রীম, পাউডার, শ্যাম্পু ও

www.pathagar.com

লিপিস্টিকের আলোচনা থাকে। আরও থাকে, অমুক মার্কিন অভিনেত্রী কোন ধরনের পারফিউম ব্যবহার করে এবং বিপরীত লিঙ্গের ওপর তার কি প্রভাব পড়ে। আপনি আপনার স্বামীকে আকর্ষণ করার জন্য কি করবেন। কোন ধরনের পোশাক পরবেন এবং খোশবু ব্যবহার করবেন।

পছন্দ ও অপছন্দ শিরোনামে স্বতন্ত্র আরেকটি কলাম থাকে। যাতে বিবাহিতা ও অবিবাহিতা আরব নারীদের সাক্ষাতকার থাকে। সে সাক্ষাতকারের একটি নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : আপনি কি বিশ বছর বয়সেই মেয়েদের বিয়ে করে নেয়া উচিত বলে মনে করেন?

জবাব : আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন থাকাটাই পছন্দ করি।

প্রশ্ন : মেয়েদের কি আগেই বিয়ে করা, নাকি প্রেম-ভালবাসার পর বিয়ে করা উচিত?

জবাব : প্রেম-ভালবাসার পর।

প্রশ্ন : আপনি কি ভিডিও ফিল্ম দেখেছেন?

জবাব : জি হ্যাঁ, বন্ধু-বান্ধব ও ভিডিও'র দোকান থেকে সংগ্রহ করে আমি ভিডিও ফিল্ম দেখেছি।

প্রশ্ন : আপনি কি আবেগী?

জবাব : আমি অনেক আবেগী।

প্রশ্ন : আপনি গান পছন্দ করেন, না বাদ্য?

জবাব : পশ্চিমা গান আমার খুব পছন্দ। কখনো বাদ্যও আমার মন কেড়ে নেয়।

প্রশ্ন : আর কি কি পছন্দ করেন?

জবাব : ব্যায়াম পছন্দ করি। ব্যয়ামের পোশাক পরাও পছন্দ করি।

পত্রিকাটিতে ফিকহী প্রশ্ন-উত্তরও থাকে। যেমন-

প্রশ্ন : মুসাফাহা কিংবা চুমু দ্বারা কি ওযু ভেঙ্গে যায়? (মুহাররাম কিংবা না মুহাররামের কোন কথা উল্লেখ থাকে না)

আজকাল আরব পরিবারে অমুসলিম নারী-পুরুষদের ড্রাইভার, সেবক-সেবিকা ও অফিস-আদালতে প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে ব্যাপকভাবে রাখা হচ্ছে। এর কারণে আকীদা-বিশ্বাস, আখলাক-চরিত্র ও তাহযীব-তামাদ্দুনগত যেসব সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তা স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে ধারাবাহিক তার ক্ষতিকর ভয়াবহ ফলাফলের ওপর আলোচনা-পর্যালোচনা এবং সমালোচনা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

পশ্চিমা মিডিয়ার পথ ধরে ভারতীয় মিডিয়া

ভারতীয় মিডিয়া সাধারণতঃ পশ্চিমা নিউজ এজেন্সীগুলোর মুখাপেক্ষী। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যেসব সংবাদ সরবরাহ করা হয়, তার ধরনও পশ্চিমা মিডিয়ার মতো। তার অবকাঠামো বা ছাঁচ যেন পাশ্চাত্য থেকেই তৈরি হয়ে এসেছে। কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হলো।

দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমস ১৯৯৭ সালের ১৬ই জানুয়ারী কাশ্মীর সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিলো 'A দিয়ে আল্লাহ B দিয়ে বন্দুক'। এই নিবন্ধে কাশ্মীরের ইসলামী মাদরাসাগুলোকে বিশেষভাবে টার্গেট বানানো হয়েছে। ইউ এন আই'র রিপোর্টার লেখেন, 'কাশ্মীরের মাদরাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়। উর্দূর সাথে ইংরেজীও শেখানো হয়, যা বিদেশী ভাষা। এসব প্রতিষ্ঠানে রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকে। এসব মাদরাসায় নিষ্পাপ শিশু ও নওজোয়ানদের সন্ত্রাস, গোঁড়ামি ও অপরকে ঘৃণা করার শিক্ষা দেয়া হয়। শিক্ষকদের সবার ভূমিকাই সন্দেহজনক। যদিও বিগত সরকার (বিজেপি) এসব মাদরাসা বন্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু মাদরাসার শিক্ষকরা আদালতের শরণাপন্ন হয়। আদালত তাদের পক্ষেই রায় দেয়। এরপর থেকে মাদরাসাগুলো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এখনো সেখানে সন্ত্রাসী ও কট্টরপন্থার শিক্ষাদান অব্যাহত রয়েছে।'

এ পত্রিকা রাজস্থানের সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত মুসলমান ও শিখদের ভূমিকাকে সন্দেহজনক আখ্যা দিয়ে তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও তাতে উর্দূ-আরবী ভাষা শিক্ষাকে মুসলমানদের চরিত্র হননের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে, এমনকি মুসলমানদের পছন্দ অপছন্দকেও সমালোচনার টার্গেট বানিয়েছে।

ভারতের সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন মহল থেকে বার বার এই প্রচারণা প্রোপাগান্ডা চালানো হয়েছে যে, মুসলমানদের দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পাকিস্তানের আই এস আই-এর আড্ডা। ইসলামী দেশসমূহ ছাড়া অন্য কোনো দেশে যদি কোথাও সন্ত্রাসী কর্মকা সংঘটিত হয়, তাহলে সেটা শুধু 'সন্ত্রাস' আখ্যায়িত করা হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী দেশসমূহে যদি ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশন নেয়া হয়, তাহলে সেটাকে ভারতীয় মিডিয়া 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযান' আখ্যা দেয়। বারবী মসজিদ শহীদকারীদের ভারতীয় মিডিয়ায় করসেবক, স্বেচ্ছাসেবক আখ্যা দেয়া হয়েছে, অথচ তারা ভয়ানক গু া, ডাকাত ও সন্ত্রাসী। ইরাকের আণবিক স্থাপনায় ইসরাঈলী হামলা ও লেবাননের সাবরা শাতিলা শরণার্থী শিবিরে ইসরাঈলের বোমাবর্ষণকে ভারতীয় মিডিয়া না 'ইহুদী সন্ত্রাস' আখ্যা দিয়েছে, আর না আয়ারল্যান্ডের খৃস্টানদের সন্ত্রাসী কর্মকা কে

www.pathagar.com

'খৃস্টান সন্ত্রাস' আখ্যা দিয়েছে, আর না হিন্দু সন্ত্রাসীদের গু া সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়েছে, যারা পি.এ.সি'র সহযোগিতায় সর্বদা মুসলমানদের নির্মূল করার প্রয়াস চালিয়েছে এবং জাবালপুর, জামশেদপুর, উড়কিলা, ভাগলপুর, মুরাদাবাদ, মিরাঠ ও মালিয়ানার নির্মম মুসলিম গণহত্যায় অংশ নিয়েছে। আর.এস.এস তাদের এ উদ্দেশেই তৈরি করেছে। নদওয়াতুল ওলামা, দারুল উলুম দেওবন্দ এবং অন্যান্য দীনী প্রতিষ্ঠান ও সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)-এর মতো শীর্ষ মুসলিম নেতৃবর্গ এবং দীনী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা, এ সবই ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্রের অংশ।

নগ্নতা অশ্লীলতার প্রসারে ভারতীয় মিডিয়ার ভূমিকা

প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবাল ভারতীয় সমাজের একটি মৌলিক দুর্বলতা সরাসরি বর্ণনা করার পরিবর্তে এখানকার কবি, চিত্রশিল্পী এবং কাহিনীকারদের মেধা-মনন ও ধমনীতে যৌনতার প্রাবাল্যের উল্লেখ করেছেন। আর এটা এক বাস্তবও বটে। যৌনতা ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসও যৌনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। ইলোরা, অজন্তা ও খাজুরায় অবস্থিত মূর্তি, ভাষ্কর্য এবং সেখানের ধর্মীয় গ্রন্থ, ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ, দেব-দেবীর ছবি, অংকন এবং তাদের যৌন কর্মকা ও এ বিষয়টা অসাধারণ প্রবল হয়ে ফুটে ওঠেছে। এমনকি প্রাচীন ভারতে যৌন সম্পর্ক ও মেলামেশা পবিত্রতার মর্যাদা অর্জন করেছিল, যার অনিবার্য প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আধুনিক ভারতীয় সমাজে দৃশ্যমান। আধুনিক ভারতের কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, বুদ্ধিজীবী এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজব্যবস্থা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের চিত্র অংকনকারী চলচ্চিত্র নির্মাতারা তাদের গবেষণায় যৌনতার এ বিষয়টিকে নতুন গতি ও ব্যাপকতা দান করেছে। আমরা ইসলামী ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব বিষয়কে নগ্নতা, অশ্লীলতা ও অনর্থক কর্মকা আখ্যা দেই এবং যেগুলোকে ইসলামের পবিত্রতা ও মর্যাদার খেলাফ মনে করি, সেগুলোকে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পবিত্র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার মনে করে, যার মূল উৎস কামশাস্ত্র, ইলোরা, অজন্তা ও খাজুরার গুহা। মহাদেব ও কৃষ্ণের যৌন লীলা তাদের জন্য বাস্তব কর্মের নমুনা। সাধারণতঃ ধারণা করা হয়, ভারতে বর্তমান যৌনতা, নগ্নতা ও উলঙ্গপনার যে ছড়াছড়ি, তা পশ্চিম থেকে আমদানীকৃত চলচ্চিত্র, টিভি ও ডিশ এন্টিনার মাধ্যমে তা প্রসার লাভ করেছে–এ ধারণা ঠিক নয়; বরং যৌনতা নগ্নতার চলমান স্রোত ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। কারণ ভারত কয়েক শতাব্দী পূর্বে কামশাস্ত্রকে একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও তার আদলে নির্মিত ইলোরা, অজন্তা ও খাজুরার যৌন উত্তেজক মুর্তি ও ভাস্কর্যগুলোকে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের মর্যাদা দিয়ে রেখেছে। কামশাস্ত্রের ব্রাহ্মণ লেখককে আজো ভারতীয় সমাজে যৌন গুরু নামে সম্মান করা হয়। খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে লেখা এই গ্রন্থ এক শতাব্দী পূর্বেও পাশ্চাত্যে নিষিদ্ধ ছিল। ভারত থেকে চোরাই পথে যাওয়া এ গ্রন্থ ইউরোপের বিভিন্ন পরিবারে খুব গোপনে পাঠ করা হত। বৃটেনে এই গ্রন্থ ১৯৬২ সাল থেকে হস্তগত হতে শুরু করে। আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে ভারতে কামশাস্ত্রকে নাবালেগ স্কুল শিশুদের বালেগ বানানোর মাধ্যম মনে করা হতো। কামশাস্ত্রের একটি শিক্ষা হচ্ছে, অন্যের স্ত্রীকে কিভাবে ফুসলিয়ে

www.pathagar.com

অনৈতিক কাজে লিপ্ত করানো যায়। অনৈতিক ও প্রকৃতিবিরোধী যৌন কর্মকান্ড, সমকামিতা ও দেহ ব্যবসার এমন এমন পদ্ধতি এ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যার সামনে বর্তমান যুগের সকল পতিতাবৃত্তি, দেহ ব্যবসা ও বেশ্যাপনার সব রীতি-পদ্ধতি পানি পানি হয়ে যাবে। যদি একথা বলা হয়, ভারত ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে একটি নগ্নতা, যৌনতা ও অশ্লীলতার প্রবক্তা দেশ, তাহলে সেটা অতিরঞ্জন হবে না। শুধু এটাই নয়; বরং কামশাস্ত্র যৌনতা এবং দেহকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বানানোর জন্যে কয়েকটি মূলনীতি পেশ করে। অর্থ ও নারী বর্তমান যুগে যে ধ্বংসের কারণ, কামশাস্ত্রের নিকট সেটা গ্রহণযোগ্য বিষয়। এ ধ্বংস গ্রহণীয়। এ জন্যই সিনেমা, টিভি সিরিজ, নাটক, উপন্যাস, কাহিনী, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও বিভিন্ন বই পুস্তকে যেভাবে নগ্নতা, যৌনতা, অশ্লীলতা ও দেহ ব্যবসাকে অত্যন্ত প্রমাণসিদ্ধ ও সজ্জিত আকারে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা এখানকার সমাজব্যবস্থার অবিকল প্রতিচ্ছবি। অশ্লীল ম্যাগাজিন, সিনেমা ও যৌন সম্পর্কের ওপর নির্মিত সিরিজগুলোর সমর্থনে ভারতীয় মিডিয়া অত্যন্ত সক্রিয় এবং একে পবিত্রতার মর্যাদা দেয়ার জন্য সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করছে।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে পশ্চিমা সিনেমার অনুকরণে যেসব সিনেমা নির্মিত এবং যেসব ম্যাগাজিন ও বই পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ধীরে ধীরে অবৈধ যৌন সম্পর্কের সমর্থনে দলীল-প্রমাণ সরবরাহ করা হতে থাকে। ১৯৬০ সালের পর অবাধ স্বাধীন যৌন সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে অশ্লীল উপন্যাস লেখা শুরু হয়, কিন্তু তখন এগুলো অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে সাপ্লাই করা হতো। তখনকার পরিবারের লোকেরা পারিবারিক সম্পর্ক ও পবিত্র সমাজব্যবস্থার ওপর নির্মিত সুস্থ পরিচ্ছন্ন ধারার সিনেমা দেখা খারাপ মনে করত না, কিন্তু সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনিময়ের নামে পশ্চিমের যেসব সিনেমা আজ ঘরে ঘরে দেখানো হচ্ছে, তা ভারতের রুচি ও মেযাজই সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। এসব পশ্চিমা সিনেমাগুলো প্রথমে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্ধারিত ছিল, কিন্তু এখন তো বেশির ভাগ ভারতীয় সিনেমা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যই নির্মাণ করা হয়। প্রথমে এসব সিনেমা হলগুলোতে প্রদর্শন করা হতো। এখন তা ভিসিআর, ডিশ এন্টিনা ও ইন্টারনেটের সাহায্যে দীনী ও নৈতিক মূল্যবোধ পদদলিত করে প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রদর্শন করা হচ্ছে। আজকের যুগের প্রতিটি ঘর এক একটি মিনি সিনেমা হল ও নগ্ন নাইট ক্লাবে পরিণত হয়েছে। নগ্ন সিনেমা ছাড়াও গোটা ভারতে বর্তমানে কমবেশি একশ'টি এমন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন বের হচ্ছে, যা নারীর পবিত্রতা ও তার সংশ্লিষ্ট চারিত্রিক মূল্যবোধের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব নগ্ন ও অশ্লীল মাগ্যাজিনের মধ্যে 'ফ্যান্টাসি' এমন একটি নাম, যা বর্তমানে চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধের যেটুকু আওয়াজ অবশিষ্ট রয়েছে, সেটুকুও মাটিচাপা দিয়ে দিয়েছে। যদিও ম্যাগাজিনটি বর্তমানে তার প্রকাশের সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করছে, কিন্তু ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে ম্যাগাজিনটি তখন সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে আসে, যখন তাতে এক স্কুল ছাত্রীর নগ্ন ছবি ছাপা হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী দিল্লীর ষোল বছরের এক ছাত্রীকে কিছু ফটোগ্রাফার ফুসলিয়ে বিভ্রান্ত করে তার উলঙ্গ ছবি তোলে এবং সে ছবিগুলো ফ্যান্টাসির এক সংখ্যায়

www.pathagar.com

ছাপা হয়। কিশোরীর পিতা-মাতা যখন বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করে তখন পুলিশ পত্রিকার সম্পাদক ও ফটোগ্রাফারদের গ্রেফতার করে, কিন্তু সামান্য কিছু জামানতের বিনিময়ে খুব দ্রুতই মুক্ত করে দেয়া হয়। এ ঘটনার পর গোটা মিডিয়া জগতে আলোচনার ঝড় ওঠে, ফ্যান্টাসি সম্পাদকের গ্রেফতার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর হামলা, অনৈতিক ও বেআইনী কাজের বিরুদ্ধে শিক্ষামূলক অভিযান? অথচ এ ধরনের নগ্নতা অশ্লীলতার প্রসার সমাজের জন্য কতটুকু বিষাক্ত এবং ধ্বংসাত্মক, সে আলোচনা মিডিয়ায় ওঠেনি। এ ঘটনার কয়েক মাস পরেই আবার দিল্লীর এক মহিলা উকিল নারী অঞ্জেলী কাপুর তার নগ্ন দেহের ছবি ফ্যান্টাসিতে প্রকাশ করে। সে তার নগ্ন ছবি প্রকাশের পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছে, নারী যদি তার চেহারা দেখাতে পারে তাহলে তার শরীরের অন্যান্য অংশ কেন দেখাতে পারবে না। এটি আমার শরীর। আমি আমার শরীরের সাথে যা ইচ্ছা তাই করব, তাতে কারো কিছু বলার অধিকার নেই। নারী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম অগ্রগামী নেত্রী মধু কিশোর এক বিবৃতিতে বলেছেন, এসব নগ্ন অশ্লীল ম্যাগাজিনের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা সৃষ্টির কোনো কারণই থাকতে পারে না।

ফ্যান্টাসি ছাড়াও ডেবোনোর নামক আরেকটি ইংরেজী পত্রিকা–যা দীর্ঘ দিন ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে, সে নগ্নতা অশ্লীলতার প্রসারে তার সকল শক্তি নিয়োগ করা সত্ত্বেও তথাকথিত উন্নতি ও প্রগতিপ্রিয়দের মাঝে অনেক জনপ্রিয়। এ দু'টি পত্রিকা ছাড়াও আরো দেড়শ'র বেশি পত্রিকা রয়েছে, যা গুজরাটী, হিন্দী, মিরাঠী, তামিল ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে এবং মানবিক, নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের সকল সীমা ডিঙ্গিয়ে ভারতীয় সমাজকে যৌনতার সমুদ্রে নিমজ্জিত করে চলেছে। আশ্চর্যের বিষয়, এগুলোর আবার রেজিস্ট্রারার অব নিউজ পেপারের পক্ষ থেকে রেজিস্ট্রেশনও রয়েছে।

ফ্যান্টাসির প্রচার সংখ্যা বর্তমানে আট লাখ ছাড়িয়ে গেছে। একই অবস্থা ডেবোনার নামক ইংরেজি ম্যাগাজিনেরও। শুধু এ দু'টিই নয়; বরং অশ্লীল নগ্ন পত্র-পত্রিকার সবগুলোরই প্রচার সংখ্যা কল্পনার থেকেও বেশি। এখন তো উপন্যাসগুলোতেও অশ্লীল আলোচনার পাশাপাশি নারী-পুরুষের ছবি থাকে, যাতে পাঠক অশ্লীল সাহিত্যে আত্মতৃপ্ত না হলে কমপক্ষে নগ্ন দেহের চিত্তহারী প্রদর্শনী দেখে চক্ষুর তৃপ্তি অর্জন করতে পারে।

জওহর লাল নেহরু ইউনিভার্সিটির এক রিচার্স স্কলার অরবিন্দ কুমার এসব অশ্লীল ম্যাগাজিন ও উপন্যাসগুলোর উলঙ্গ ছবি দেখে বলেন, এসব উলঙ্গ ও নগ্ন ছবিগুলো বিষের চেয়েও বেশি ভয়াবহ। এগুলো ধীরে ধীরে আমাদের নিঃশেষ করে দিচ্ছে। গবেষণায় তিনি স্বীকার করেছেন, আমার কামরায় ডজনকে ডজন অশ্লীল ম্যাগাজিন উপন্যাস ছাড়াও অসংখ্য অগণিত নগ্ন ছবির ছড়াছড়ি রয়েছে। এগুলো আমি দেখি ও পড়ি এবং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রকৃতিবিরোধী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজের স্বাস্থ্য ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। নগ্ন ছবি ও টিভি সিনেমায় উত্তেজিত হয়ে দু'জন স্কুল ছাত্র দিল্লীর এক স্কুল ছাত্রীকে অপহরণ করে জনমানবহীন অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে তাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে এবং তাদের এ অনৈতিক কর্মকা কে ক্যামেরায় ধারণ করে বিভিন্ন পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের কাছে বিক্রি করে। মহারাষ্ট্রের জুলগাঁয়েও এমন এক ট্রাজেডির কথা জনসম্মুখে প্রকাশ পেয়ে

www.pathagar.com

যায়, যার ধারাবাহিকতা কয়েক বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কয়েক ডজন যুবক যুবতী স্বেচ্ছায় এ অনৈতিক কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। অনুসন্ধানে এও জানা গেছে, উভয় পক্ষ আয়-রোজগার বাড়ানোর ধান্ধায় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এ কাজ করেছে। অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে বিভিন্নভাবে সেগুলো ক্যামেরায় ধারণ করে পরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের কাছে বিক্রি করে। যেমন ফ্যান্টাসির সম্পাদক এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, 'আমরা কি করব, আমাদের নিকট বিবাহিত অবিবাহিত নারী, স্কুল কলেজের ছাত্রী, প্রাইভেট কোম্পানীতে উচ্চপদে কর্মরত যুবতী মেয়ে, এমনকি কুমারী মেয়েদের পিতা-মাতা পর্যন্ত ধারাবাহিক টেলিফোন করে এ ধরণের অশ্লীল ও নগ্ন ছবি প্রকাশ করার আবেদন করতে থাকে। কারণ তাদের আমদানীর একটা মাধ্যম দরকার।' বোম্বের এক বিবাহিত নারী বলে, আমি বিত্তশালী। আমার উলঙ্গ ও নগ্ন ছবি তোলার প্রচন্ড আগ্রহ রয়েছে। আমার স্বামী বলেন, তুমি যখন সুন্দরী, তখন তোমার সুন্দর দেহ অন্যকেও দেখাও, যাতে আমি গর্ব করতে পারি, আমিও একজন সুন্দরী নারীর স্বামী।

দিল্লীর খালসা কলেজের একুশ বছর বয়সের এক ছাত্রী বলে, 'মমতা কুলকারনী ও পূজাভাট যখন সিনেমায় অশ্লীল দৃশ্যে আবির্ভূত হয়, আর তাদের অভিনেতা-অভিনেত্রী বলা হয় এবং সমাজে তাদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়, তখন আমরা কেন আমাদের শরীরের নগ্ন প্রদর্শনী করতে পারব না। নগ্নতা প্রদর্শনের পক্ষে এমন দলীল-প্রমাণ খোশবন্ত সিংয়ের মতো খ্যাতিমান সাংবাদিকও দিয়ে থাকেন। ফ্যান্টাসি ও ডেবোনারের মতো অশ্লীল ম্যাগাজিন ও উপন্যাসগুলোর পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন, এসব পত্রিকা ও ম্যাগাজিন যৌনতা বঞ্চিত মানুষের বিরাট খেদমত করে যাচ্ছে, কিন্তু সম্ভবত তিনি জানেন না, এসব পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন শুধু বিত্তশালীরাই পড়ে এবং এর দ্বারা তাদের যৌনতা স্তিমিত হওয়ার পরিবর্তে আরো উত্তেজিত হয়। ফলে আজ সমাজে যেনা ব্যভিচার ও ধর্ষণের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অশ্লীল টিভি সিরিজ ও যৌন মেলামেশা সম্বলিত সিনেমা টিভিতে প্রদর্শনের পক্ষে ওকালতি করে জৈন টিভির মালিক ড. জে কে জৈন বলেন, আমরা সেক্স সম্বলিত সিনেমা টিভিতে প্রদর্শন করি, এতে দোষটা কোথায়। এ ধরনের উলঙ্গ দৃশ্য দেখে মানুষ ক্লান্ত হয়ে যাবে। ফলে যেনা ব্যভিচার ও ধর্ষণের ঘটনা এমনি এমনিই কমে যাবে।

এসব অশ্লীল ম্যাগাজিন এবং উপন্যাস ছাড়াও টিভিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিজ্ঞাপন এমন এমন ভঙ্গিতে দেখানো হয়, যাতে মানবতা লজ্জায় পানি পানি হয়ে যায়।[১]

---

১ টিভিতে পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন যে নগ্নতার ভঙ্গিতে দেখানো হয়, তা সম্পূর্ণ বেডরুমের দৃশ্য। শিশু কিশোরদের ওপর এর যে প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পড়ে, তারা পিতা-মাতার নিকট যেভাবে প্রশ্ন করে এবং 'একটি হলে ভালো হয়, দু'টির বেশি নয়' কথাটি এমনভাবে তাদের মন মস্তিষ্কে বসে যায়, যাতে পিতা-মাতার কোলে তৃতীয় আরেকজনের আগমনে তারা ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকে। মিসরে দুই ভাই মিলে তাদের নবজাত তৃতীয় ভাইকে গলা টিপে হত্যা করে। হত্যার পর এই নিষ্পাপ শিশুরা উত্তর দিয়েছে, তৃতীয় জনকে আমরা মেনে নিতেই পারি না। ভারতীয় টিভিতে কনডমের বিজ্ঞাপনে ধর্মীয় রং প্রলেপ করা হয়েছে। অভিযোগ করা হলে তারা উত্তর দিয়েছে, এর চেয়েও তো বেশি যৌন সুড়সুড়িমূলক ছবি আমাদের মন্দিরগুলোতে রয়েছে। সূত্র : কওমী আওয়াজ-১৯৯৬ সালের ১২ই জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত ড. রফীক খানের নিবন্ধ-'বিজ্ঞাপন ও সমাজ'।

www.pathagar.com

জাতীয় পত্র-পত্রিকাগুলোতে কামসূত্র নামক কনডমের বিজ্ঞাপনে বিশেষ বেপরোয়া দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের দৃশ্যে প্রায় ৯৫ ভাগ নগ্ন এক যুবক যুবতী এমন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত দেখানো হয়েছে, যা কেবল বেডরুমের একান্ত দৃশ্যই হতে পারে। সমুদ্র তীরে যুবক যুবতীকে যে অবস্থায় যে কর্মকাণ্ডে লিপ্ত দৃশ্যে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় পেশ করা হয়েছে, তা আমেরিকার প্রসিদ্ধতম প্লেবয় ও লেসমেকারের মতো পত্রিকার নগ্ন অশ্লীল ছবিগুলোকেও লজ্জিত করে।

এসব নগ্ন পত্র-পত্রিকা এবং সিনেমা ছাড়াও অশ্লীল সাহিত্য ভারতীয় সমাজকে যৌনতা, নগ্নতা ও অশ্লীলতার এমন এক সেচ্ছাচারিতা উপহার দিয়েছে, যাকে পশ্চিমা দেশে Spuose Swap-Hing অথবা Couple Exchange বলে।

কিন্তু এ ফ্যাশন এখন শুধু পশ্চিমেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং ভারতও তার প্রাচীন মতবাদ 'ষোল স্বামী এক স্ত্রী'র ভিত্তিতে নতুন আঙ্গিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইন্ডিয়া টুডে'র এক জরিপ অনুযায়ী ভারতের বড় বড় শহরগুলোতে ব্যাপক আকারে বাধাহীনভাবে দুর্দান্ত প্রতাপের সাথে এসব অশ্লীল, অনৈতিক ও যৌন কর্মকাণ্ড চলছে। এ ক্ষেত্রে অশ্লীল ম্যাগাজিনগুলো কি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে, তা নিম্নের বিজ্ঞাপন দ্বারা সহজেই অনুমিত হয়। এসব বিজ্ঞাপন বহুল প্রচারিত অশ্লীল পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলোতে নিয়মিত ছাপা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের নমুনা

আমার নাম রবীন্দ্র মোহন। আমার বয়স পঁচিশ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা এম.এ। আমার স্ত্রীর নাম সুনীতা। তার বয়স বিশ বছর। আমরা অত্যন্ত উদার ও প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। আমরা উলঙ্গ সিনেমা অশ্লীল ম্যাগাজিন দেখতে খুব ভালবাসি। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তিতে আমরা পরস্পরকে যৌন রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ও স্বাদ উপভোগ করাতে পারি এবং একের স্ত্রী অপরজন ব্যবহার করতে পারি। আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে আমার স্ত্রীর সাথে বিনিময় করতে চান তাহলে নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

ফ্যান্টাসির শুধু একটি সংখ্যার 'কলম বন্ধুত্ব' কলামে এ ধরনের বায়ান্নটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার সম্পাদকের বক্তব্য হলো, প্রতিটি বিজ্ঞাপনের জবাবে কমপক্ষে দশটি জবাবী পত্র আমরা অবশ্যই পেয়ে থাকি।

১৯৯৪ সালের এপ্রিল সংখ্যায় এ ধরনের সত্তরটি বিজ্ঞাপনের জবাবে ছয়শ' উদার দৃষ্টিভঙ্গির স্বামী স্ত্রীর জবাব পাওয়া গেছে।

বি. এম. এ্যাডেস ও মোম্বাই আইয়েট-এর মতো অশ্লীল ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যায় এ ধরনের ছয়শ' বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ফ্রিসোলিস, পাল্লে দে এবং গায়েজ এন্ড গার্লসে মুদ্রিত এসব বিজ্ঞাপন নগ্নতা ও অশ্লীলতার সীমাহীন প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। এর বাস্তব প্রদর্শনী বড় বড় হোটেলগুলোতে স্ত্রীদের বিনিময় চাবির বিনিময়ের আকৃতিতে হচ্ছে

www.pathagar.com

এ সাধারণ যৌন মেলামেশায় না বয়সের আর না আত্মীয়তার শর্ত আছে। অসংখ্য নওজোয়ান এ কথা স্বীকার করেছে, তারা এই বিনিময়ে আপন বোন, চাচী, ভাতিজী, ভাগিনী, এমনকি আপন মেয়েদের সাথেও যৌন কর্মে পরিতৃপ্ত হয়েছি। তাদের কথা হলো, জীবন স্বল্প সময়ের জন্য। এই স্বল্প সময়ে যেভাবে ইচ্ছা উপভোগ করে নাও। এ হিসেবে আমাদের সন্তানরাও তো যুবক যুবতী। তাদেরও প্রবৃত্তির চাহিদা আছে। তাদেরও অবাধ স্বাধীন মেলামেশার সুযোগ সরবরাহ করা উচিত। আমরা যখন স্বাধীন তখন আমাদের সন্তানদেরও স্বাধীন ছেড়ে দেয়া কর্তব্য। তারা তাদের পথ অবলম্বনে তেমিন স্বাধীন, যেভাবে আমরা স্বাধীন। ইন্ডিয়া টুডে'র রিপোর্টার সবশেষে এ কথার ওপর তার রিপোর্টের ইতি টেনেছে, 'মোটকথা আমাদের তো একথা প্রমাণ করতেই হবে, ভারত কামশাস্ত্রের ভূ-খণ্ড'।

যে ভূ-খণ্ডে যৌন স্বাধীনতা ও মেলামেশাকে পবিত্রতার মর্যাদা দেয়া হয়েছে, সে ভূ-খন্ডে যদি এ ধরনের ম্যাগাজিন ও পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাও আবার সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনে এবং সেসব পত্র-পত্রিকায় খোলা যৌন স্বাধীনতার আহবান জানানো হয়, তাহলে এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। এমনিভাবে উভয় পক্ষ যদি স্বেচ্ছায় এসব অনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় তবে সেটা পাকড়াও করার বিষয় হবে না। যেমন পশ্চিমের ধাঁচে গড়া ভারতীয় আইন এ কথাই বলে। এমতাবস্থায় জোরপূর্বক সতীত্ব বিনাশ প্রবৃদ্ধি ও ব্যাপকতার ওপর প্রতিবাদ করার কোন অর্থ থাকে না। আর না এটাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য কোনো বিপদ বিপর্যয় আখ্যা দেয়া যেতে পারে। কারণ তাদের দৃষ্টিতে এটি একটি পবিত্রতম কাজ এবং তারা তাদের উপাসকদের এক বিরাট অংশকে অবাধ যৌন স্বাধীনতার নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করে। এটা তো সঙ্গীন সমস্যা মুসলমানদের, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের প্রতিবেশি ও বন্ধু। তারা জীবনের বহু বিষয়, লেনদেন, আকীদা-বিশ্বাস এবং সামাজিক ও নৈতিক বিষয়াবলীতে তারা নিজেদের বহু শতাব্দীকালের প্রতিবেশী বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত। পশ্চিমা শিক্ষা কারিকুলাম ও অশ্লীলতার উত্তাল তরঙ্গ মুসলিম সমাজের ঐক্যের অটুট বন্ধন একটি সীমা পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে।

ভারতে মুসলমানদের আগমনের পর থেকে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আকীদা, বিশ্বাস, পারস্পরিক লেনদেন, সামাজিক, চারিত্রিক ও নৈতিক বিষয়াবলীতে মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। যতদিন পর্যন্ত মুসলমানরা এখানে শাসনকার্য পরিচালনা করেছে ততদিন পর্যন্ত তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ওপর পতিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের আগমনরে পর যেমনিভাবে মুসলমানদের সামাজিক অবকাঠামো প্রভাবিত হয়েছে, তেমনি হিন্দুদের সমাজও কামশাস্ত্রের উত্তাল তরঙ্গের শিকার হয়েছে। মুসলমানদের নিকট তো পরিবর্তিত অবস্থায়ও আল্লাহর ভয়, লজ্জা-শরম, সতীত্ব ও পবিত্রতার সুস্পষ্ট কল্পনা এবং শক্তিশালী চারিত্রিক সীমারেখা, দাম্পত্য জীবনের সুদৃঢ় নীতিমালা ও নবী-রাসূলের নমুনা বিদ্যমান আছে, আছে হালাল-হারামের পার্থক্য, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নিকট না আছে ইবাদত-বন্দেগী, না আছে আকীদা-বিশ্বাস, না আছে হালাল-হারামের পার্থক্য আর না

www.pathagar.com

আছে চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সীমারেখা। আধুনিক পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহর শক্তিশালী সুদৃঢ় পারিবারিক ব্যবস্থায় ফাটল ধরানোর প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়েছে। এমনিভাবে সহশিক্ষা ব্যবস্থা অমুসলিমদের সাথে বিয়ে শাদীর কিছু দৃষ্টান্তও সৃষ্টি করেছে। মজবুত পর্দা ব্যবস্থার পর বেপর্দার সয়লাব এসেছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীরই নয়; বরং ঐতিহ্যগতভাবে দীনদার ঘরানার মজবুত দুর্গেও ফাটল ধরানোর প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে। আরব বিশ্বে উপার্জিত অঢেল বিত্ত-বৈভব ও ডিশ এন্টিনার কালচার মুসলিম সমাজের শক্তিশালী খুঁটিগুলো দুর্বল করে দিয়েছে। ভারতীয় মুসলমানরা যৌন ও নৈতিক অপরাধে কতটুকু অগ্রগামী, তার রেকর্ড তো আমাদের নিকট নেই, তবে প্রতিবেশী মুসলিম দেশ পাকিস্তানের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বশেষ যে জরিপ আমাদের সামনে রয়েছে, সে অনুযায়ী পাঞ্জাব প্রদেশে গত এক বছরে চারিত্রিক ও নৈতিক অপরাধের সূচক যে অসাধারণ দ্রুততার সাথে ওপরের দিকে ওঠেছে, তা প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে কোন অংশে কম নয়।

বিশ্ব সভ্যতায় ভারতের অবস্থান

দিল্লী থেকে প্রকাশিত মাসিক ইউজানার ১৯৯৫ সালের আগস্ট সংখ্যায় ড. সবিতা বাখেরীর একটি সার্ভে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি ভারতীয় সমাজে সিনেমার ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লোকদের নিকট যেসব প্রশ্ন করেছেন এবং লোকেরা তার যেসব জবাব প্রদান করেছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করে তিনি যে ফলাফল বের করেছেন তা নিম্নরূপ–

ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া : সিনেমা আনন্দ-বিনোদন, আমোদ-প্রমোদ, জ্ঞান-গবেষণা এবং আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া : সিনেমা অশ্লীল মূল্যবোধের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যৌনতা অশ্লীলতার প্রসার, সামাজিক ও নৈতিক অপরাধে প্রবৃদ্ধি, বাস্তবতার পরিবর্তে অলীক স্বপ্নের জগতে বিচরণ, বাস্তব সমস্যা সংকটের মোকাবেলা ও সমাধান করার পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করা, গুন্ডামি, সন্ত্রাস, হত্যা, ব্যভিচারসহ অন্যান্য চারিত্রিক ও নৈতিক অপরাধে জড়িয়ে পড়া এবং যারা এসব অপরাধে জড়িয়ে আছে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা এবং সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

উক্ত জরিপে বলা হয়েছে. ৩৩% লোকের অভিমত, সিনেমা দেখায় আত্মিক প্রশান্তি লাভ হয়, ২৭% লোকের অভিমত, সামাজিক বিপর্যয় ও যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিতে সিনেমা বিরাট ভূমিকা পালন করে, ৩৪% লোকের অভিমত দশ বছর পূর্বেও সিনেমা বিনোদনের মাধ্যম ছিল, কিন্তু এখন তা যৌন ও চারিত্রিক বিপথগামিতা, সন্ত্রাস ও বিশৃংখলা শেখানোর একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

উক্ত জরিপে শুধু দিল্লীর যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে তা কোনো মন্তব্য ছাড়াই আমরা এখানে পেশ করছি। এ দ্বারাই আপনি অনুমাণ করতে পারবেন, ভারতীয় সমাজ

www.pathagar.com

কোনো কর্দমে ফেঁসে যাচ্ছে। সাপ্তাহিক দাওয়াতে দিল্লী তার এক সংখ্যায় 'এটা ভারতের সংবাদ' শিরোনামে নিম্নের সংবাদগুলো উপস্থাপন করেছে–

ক. ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তার মেয়ের সাথে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়েছেন।

খ. ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী দীর্ঘ দিন যাবত তার মেয়ের সাথে অনৈতিক কাজ করে আসছেন।

গ. নয়াদিল্লীর আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট এস. এস. মালহোত্রা জোরপূর্বক ব্যভিচার সংক্রান্ত এক মামলার তদন্তের বাহানায় তার সরকারী চেম্বারে মজলুম নারীর প্রতি হস্ত সম্প্রসারিত করেছেন।

ঘ. ভারতের একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা সীতা প্রকাশ যাদবকে এ জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে, সে তার নিজের মেয়ের সাথে অনৈতিক কাজ করার পর তাকে হত্যা করে প্রতিবেশীর বাড়ীর নিকটে ফেলে রেখেছে। তার মেয়ের বয়স ছিল আট বছর। এই নেতা ইতোপূর্বেও তার ভাড়া বাড়ীর মালিকের বোনের সতীত্বহানি করেছে।

ঙ. মাসিক কওমী আওয়াজের রিপোর্ট অনুযায়ী উত্তর প্রদেশের এক গ্রামের এক লম্পট ব্যক্তি জং বাহাদুর সিং তার বিধবা পুত্রবধুর সাথে, এরপর তালাকপ্রাপ্তা যুবতী মেয়ে এবং নাতনীর সাথেও জোরপূর্বক অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছে। লম্পট পিতার এ কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে তালাকপ্রাপ্তা মেয়ে ভাড়াটিয়া খুনী দিয়ে তাকে হত্যা করিয়েছে।

দিল্লীর পুলিশ কমিশনার ১৯৯৫ সালে তার বছর শেষের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ বাস্তবতা স্বীকার করেছেন, ১৯৯৪ সালের তুলনায় ১৯৯৫ সালে অপরাধের হারে ২৪% প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। আরও প্রকাশ থাকে, কেবল ২০% অপরাধ পুলিশের রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়। পুলিশ কমিশনার একথাও বলেছেন, পুলিশের হেফাযতে নেয়া অপরাধীদের মধ্যে ৮৮% এমন যারা প্রথমবার মাত্র অপরাধ করেছে। পূর্বে তাদের অপরাধের কোনো রেকর্ড নেই।

যদি অপরাধের কারণ ও প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করা হয় তাহলে নিম্নবর্ণিত কারণগুলো সামনে আসে–

ক. অশ্লীল ও নগ্ন সিনেমা, খ. টিভি সিরিয়াল, গ. চরিত্রবিধ্বংসী অশ্লীল ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা ও বই পুস্তক, ঘ. নাইট ক্লাব ও হোটেলগুলোতে নগ্ন অর্ধনগ্ন নারী নৃত্য ও ড্যান্স. ঙ. যৌন সুড়সুড়িমূলক পোস্টার ও ছবি, চ. যৌন উত্তেজক বিজ্ঞাপন, ছ. অর্ধনগ্ন লেবাস পরে নারীদের অবাধ চলাফেরা, জ. সহশিক্ষা, ঝ. বাজার, ক্লাব, স্কুল, কলেজ, পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং ঞ. মাদক ও নেশাজাত দ্রব্যের ব্যাপক প্রসার।

www.pathagar.com

বড়দের পদাঙ্ক অনুসরণে ছোটরা

দৈনিক পাইওনিয়ার দিল্লী, ৭ সেপ্টেম্বর-১৯৯৪ এবং দৈনিক টাইমস অফ ইন্ডিয়া-১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় লাখনৌ, দিল্লী ও উত্তর প্রদেশের অল্প বয়স্ক শিশুদের অপরাধ সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, যা দ্বারা সহজেই অনুমিত হয়, নতুন প্রজন্ম কোন পথে ধাবমান।

উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী দিল্লীতে প্রতিমাসে দুই হাজার অবিবাহিত মেয়ে গর্ভপাত ঘটায়। দিল্লীর বিভিন্ন আদালতে ধর্ষণের ৮৯৩টি মামলা বিচারাধীন। ১৯৯৬ সালে গোটা দেশে চল্লিশ হাজার ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অথচ ৯০% ধর্ষণের ঘটনা বদনামের ভয়ে থানায় ডায়েরী করা হয় না।[২]

দিল্লী থেকে প্রকাশিত দৈনিক পাইওনিয়ার ক্রাইম কমিশনারের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেছে, তের বছরের এক স্কুল ছাত্র ব্যাগে করে ছুরি নিয়ে এক ব্যাংকে ঢুকে ক্যাশিয়ারকে চাকু দেখিয়ে বলেছে, সব টাকা পয়সা দিয়ে দাও। তিন জন অল্প বয়স্ক ছাত্র বাইশ বছরের এক ছাত্রীর সতীত্বহানি করে। মেয়েদের উত্যক্ত করা, বিবাহিত ও অবিবাহিত মেয়েদের বিনোদনমূলকভাবে অপহরণ করে গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া, বিনোদন ও পয়সার জন্য গাড়ী চুরি করা, নারীদের গলার স্বর্ণের অলংকার ছিনিয়ে নেয়া ইত্যাদি দিল্লীর অল্প বয়স্ক ছেলেদের নিত্য-নৈমিত্তিক অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী যৌন অপরাধ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড স্যাটেলাইট ও টিভির মাধ্যমে প্রসার হচ্ছে। খেলাধুলার সংবাদ সম্প্রচারক টিভি এবং ইন্টারনেট সোনায় সোহাগার কাজ করেছে। অল্প মূল্যে লগ্ন ছবি সম্বলিত সাহিত্য ও সিনেমার ভিসিডি প্রত্যেক রোডে রোডে, অলিতে গলিতে ও মোড়ে মোড়ে পাওয়া যাচ্ছে।

বিত্তশালী পরিবারের সাত নওজোয়ানকে সামাজিক অপরাধে এবং আট জনকে কার চুরির অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে। দু'জন অল্প বয়স্ক ছেলে এক মাসের মধ্যে তাদের এলাকা থেকে এগারটি কার চুরি করেছে। শুধু পশ্চিম দিল্লীতেই ১৯৯৩ সালে মেয়েদের উত্যক্ত করার অপরাধ উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রেফতারকৃত নওজোয়ানদের সংখ্যা একশ' দশ। এর মধ্যে ২৪ জনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, ২৫ জনের বিরুদ্ধে হত্যা, ২৭ জনের বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্র, ২০ জনের বিরুদ্ধে ডাকাতি এবং ১৪ জনের বিরুদ্ধে মেয়েদের উত্যক্ত করা ও তাদের গলা থেকে স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। এসব নওজোয়ানের ৯৫%-ই বিত্তশালী পরিবারের। ১৯৯১ সালে

২. ১৯৯৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার। ইন্ডিয়া টুডে'র ১৯৯৭ সালের ১৬ই জানুয়ারী সংখ্যা থেকে জানা যায়, আমেরিকার মতো ভারতেও মিনিট ও ঘন্টার হারে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ প্রতি ৪৫ মিনিটে একটি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, প্রতি ২৬ মিনিটে একটি যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটছে, প্রতি ১ ঘন্টা ১৫ মিনিটে একজন নারীকে যৌতুকের জন্য আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং প্রতি ৩৩ মিনিটে একটি জুলুমের ঘটনা ঘটছে। সাপ্তাহিক সানডে'র ১৯৯৭ সালের জুন সংখ্যায় 'হেল্প লাইন' নামক একটি সংস্থা পরিচালিত এক জরিপে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখানো হয়েছে, কিভাবে পিতা-মেয়ে, মা-ছেলে, ভাই-বোন, মামা-ভাগিনা ও চাচা-ভাতিজীর মাঝে অবৈধ যৌন সম্পর্কের ঘটনা ঘটছে। এ সংখ্যা বিপজ্জনক হারে বাড়ছে।

www.pathagar.com

পাঁচ জন শিশুকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের চার জনের বয়স ১২ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। ১৯৯২ সালে নয় শিশুকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তাদের সাত জনের বয়স ১৬ বছরের নিচে। পুলিশ কমিশনার এসব অপরাধের কারণের ওপর আলোকপাত করে বলেন, শিশুদের বাড়ীতে তেমন একটা দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। পিতা-মাতা যার যার কাজে ব্যস্ত থাকে। পারিবারিক ঐক্য-বন্ধন বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছে। সামাজিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। যেটুকুও বা অবশিষ্ট ছিল ক্যাবল টিভি সেটুকুও শেষ করে দিয়েছে। এদিকে একবছর ধরে ইন্টারনেট ধ্বংস আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে। চলমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে, ক্রমেই অবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর থাকবে।

মহিলা সাংবাদিক মঞ্জরী মিশ্রের টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট চমকে দেয়ার মতো এবং উপদেশমূলকও। উক্ত রিপোর্টের সারকথা হচ্ছে, অপরাধকর্ম সংঘটকদের বেশির ভাগই এখনো কৈশরের সীমা অতিক্রম করেনি, কিন্তু তাদের মেধা মস্তিষ্ক যথেষ্ট কাজ করে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে তারা সর্বোত্তম বস্তু চায়, তাও কোনো বিলম্ব ছাড়াই, তা যেভাবেই লাভ হোক। গু া বদমাশদের যথারীতি সুসংঘটিত দল তো এখন বিলীয়মান। এখন অল্প বয়সী যুবকদের ব্রিগেড সে জায়গা দখল করে নিয়েছে। সুতরাং প্রাদেশিক শহরগুলোতে অপরাধ সংঘটনে বিশ বছরের কম বয়সী ছেলেদের অগ্রগামী দেখা যায়। উত্তর প্রদেশের রাজধানী লাখনৌতে চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, অপহরণ, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা ও তাদের গলা থেকে অলংকার ছিনিয়ে নেয়া ইত্যাদিতে বেপরোয়া হয়ে ওঠেছে। প্রতিটি শহরেরই একই অবস্থা। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, ১৬ থেকে ১৮ বছরের শিশু-কিশোরদের এ সিন্ডিকেট–যাদের বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার করে উত্তর প্রদেশের জেলে পাঠানো হয়েছে, তাদের সংখ্যা ১৯৯৩ সালে ছিল মাত্র ১৬ জন, কিন্তু ১৯৯৫ সাল আসতে না আসতেই তাদের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় এক হাজার তিনশ' পঁচাত্তরে। আর ত্রিশ বছরের উর্ধ্বে যাদের বয়স তাদের সংখ্যা ছিল ১৯৯৩ সালে এক লাখ বিশ হাজার চারশ' বিয়াল্লিশ জন, কিন্তু ১৯৯৫ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় এক লাখ ছাব্বিশ হাজার নয়শ' একাত্তর জনে। লাখনৌতে নারীদের গলার চেইন ছিনতাইয়ের ৯০ শতাংশ এবং মোটর গাড়ী চুরির ৭৫ ভাগ ঘটনার সাথে জড়িত সকলেই অল্প বয়স্ক শিশু-কিশোর এবং বিত্তশালী পরিবারের ছেলে সন্তান। ইন্দিরা নগর ব্যাংক ডাকাতিসহ অন্যান্য বারটি ডাকাতির ঘটনার সাথে লাখনৌ ইউনিভার্সিটি ও ইউনিভার্সিটি সংযুক্ত কলেজের ছাত্ররা জড়িত ছিল। সতের বছরের এক ছাত্র স্বীকার করেছে, নারীদের গলা থেকে স্বর্ণের চেইন সে এজন্য ছিনতাই করত যে, এর দ্বারা সে মোটর সাইকেল কিনবে। যখন তার এ আশা পূরণ হয় তখন দামী দামী ফাইভ স্টার হোটেলে নারীদের নিয়ে ডিনার খাওয়া ও বিনোদনের জন্য গলার চেইন ছিনতাই শুরু করে। যৌন অপরাধেও এ ধরনের শিশু কিশোররা অগ্রগামী; বরং এ ধারায় ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি ঘটছে। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার মহিলা সাংবাদিকের ভাষ্যমতে এসবই ক্যাবল টিভি ও তথ্য–প্রযুক্তির বিস্ফোরণের ফল।

www.pathagar.com

প্রতিবছর দিল্লীর অপরাধ বিষয়ক পুলিশ কমিশনার দিল্লীতে সংঘটিত সকল অপরাধের রিপোর্ট জারি করেন এবং বিগত বছরের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পুলিশ কমিশনার বলেন, ১৯৯৫ সালে সংঘটিত অপরাধের তুলনায় ১৯৯৬ সালে ২৫% প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। ১৯৯৫ সালে দিল্লীর বিভিন্ন আদালতে বোমা হামলা, হত্যা, অপহরণ, পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ছিল ৪৫ হাজার ৩ শ' ৬৪টি। আর ১৯৯৬ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫ হাজার। দু'বছরের মধ্যে এফ.আই.আর-এর সংখ্যায় ৮৮% প্রবৃদ্ধি ঘটে। ভারতে যে কত দ্রুত অপরাধ বাড়ছে, তা ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সালের তৈরিকৃত রিপোর্ট সহজেই অনুমান করা যায়। এ রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইন্ডিয়ান প্যানাল কোডের অধীন অপরাধের সংখ্যা দেশের ৩৩টি বড় শহরে উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। এসব শহরে ১৯৯৪ সালে অপরাধের সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৩০ হাজার ৪ শ' ৬৯টি, ১৯৯৫ সালে ২ লাখ ৪৭ হাজার ৯ শ' ৩০ এবং ১৯৯৬ সালে এসে দাঁড়ায় ২ লাখ ৫৩ হাজার ৫৭। দেশের যে চারটি বড় শহরে অপরাধের হার রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে, সেগুলো হলো দিল্লী, মোম্বাই, আহমদাবাদ ও ব্যাঙ্গালোর। দিল্লীতে ৪.২১%, মোম্বাইতে ৮.১২%, আহমাদাবাদে ৬% এবং ব্যাঙ্গালোরে ৪.১১%। এ চারটি বড় শহরে যে পরিমাণ অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তা গোটা দেশে সংঘটিত অপরাধের অর্ধেক। শুধু ১৯৯৭ সালে দিল্লীতে সংঘটিত অপরাধের ধরন ও সংখ্যা নিম্নরূপ–

০১. ধর্ষণের ঘটনা–১৪ হাজার ৯ শ' ৯৮টি, অথচ ধর্ষণের ঘটনা সরকারী রেকর্ডে কেবল ১০%ই লেখানো হয়।

০২. মেয়েদের যৌন উত্ত্যক্তকরণ ও ধর্ষণের চেষ্টা সংক্রান্ত অপরাধ ২৭ হাজার ৯ শ'।

০৩. গৃহপরিচারিকা ও নিকটাত্মীয়ের সতীত্ব হানি সংক্রান্ত অপরাধ ৭০ হাজার ৬ শ' ৫২।

০৪. যৌতুকের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ৪ শ' ২০।

দিল্লীতে নারী সংক্রান্ত অপরাধের হার প্রতি লাখে ১.৩২% আর গোটা দেশে প্রতি লাখে ৫.৯% হয়ে গেছে। জাতীয় হারের তুলনায় শুধু দিল্লীতে নারীদের যৌন হয়রানির হার দ্বিগুণ এবং কন্যা শিশুদের চার গুণ বেশি। ১৯৯৬ সালের জরিপ অনুযায়ী যেনা-ব্যভিচার ও ধর্ষণের ঘটনা বেশির ভাগ নিকটাত্মীয়দের সাথে সংঘটিত হয়, এর হার ৮৮%। গোটা দেশে নারী নির্যাতনের যত ঘটনা সংঘটিত হয়, তার মধ্যে ১৮% শুধু দিল্লীতেই সংঘটিত হয়। এছাড়াও মেয়েদের অপহরণ, ধর্ষণ ও উত্ত্যক্ত করার ঘটনা গোটা দেশের তুলনায় দিল্লীতে ছয় গুণ বেশি।[৩] গর্ভপাতের আধিক্যের কারণে দিল্লীতে

৩. দিল্লীর ৯০% নারী রিপোর্ট দিয়েছে, আজকাল মিল-কারখানা, অফিস-আদালত, রাস্তাঘাট এবং পরিবহনে যৌন হয়রানি উদ্বেগজনক হারে বেড়ে গেছে। দিল্লীর এক হাজার নারীর ওপর পরিচালিত এক জরিপ দ্বারা জানা গেছে, তাদের মধ্যে ৯২% নারী কোনো না কোনো পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির শিকার হয়েছে। জওহর লাল নেহরু ইউনিভার্সিটির একটি জরিপ থেকে জানা গেছে, ৬৭% ছাত্রী কখনো না কখনো অবশ্যই যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭.৫৮% ছাত্রী হোস্টেলে অবস্থানকারী। ১৯৯৬ সালে গৃহপরিচারিকা ও নিকটাত্মীয়ের সাথে ব্যভিচারের হার ৬৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.pathagar.com

নারী পুরুষের হারেও পার্থক্য এসে গেছে। নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এক হাজার পুরুষের মোকাবেলায় নারীর সংখ্যা ৯ শ' ২৯ জন।[৪]

অন্য সব নৈতিক চারিত্রিক অপরাধের পাশাপাশি মাদক অপরাধেও লন্ডন এবং ওয়াশিংটনের সাথে দিল্লীর প্রতিযোগিতা রয়েছে। ১৯৯৬ সালের এক সরকারী জরিপে মাদকের ফল পর্যালোচনা করে নিম্নরূপ সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। দিল্লীতে ৩৫% থেকে ৭০% বন্দী মদপানের কারণে শাস্তি ভোগ করছে। ৬০% যৌন অপরাধ মদের কারণে সংঘটিত হয়, ৬৯% ধর্ষণের ঘটনা নেশাজাত দ্রব্য ব্যবহারের কারণে ঘটে, ৫০% চুরির ঘটনা মদের কারণে, ৮০% তালাকের ঘটনা মদের কারণে সংঘটিত হয় এবং ৯০% সড়ক দুর্ঘটনা মদ পান করে গাড়ী চালানোর কারণে ঘটে। এগুলো তো সেসব অপরাধ যা সরকারী খাতায় রেকর্ড রয়েছে। তাও আবার কেবল দিল্লীর একটি মাত্র শহরের। এছাড়া সরকারী বেসরকারী হিসাব মতে আরো কত অপরাধ রয়েছে যার কোনো ইয়াত্তা নেই। তার মধ্যে ধোকা প্রতারণা, ঘুষ দেয়া খাওয়া, সরকারী তহবিল লুটপাট, দুর্নীতি, কাজে চুরি, টেলিফোন, বাণিজ্য, কৃষি ও অন্যান্য সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীর কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থ আত্মসাতের কেলেংকারি ফাঁস বা ভারতে লক্ষ্মীপূজার উপকারিতা; বরং তার পবিত্রতার ওপর সত্যায়নের ওপর মহর মেরে দিয়েছে।

ভারতীয় সমাজে টিভির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

ভারতীয় সমাজে মিডিয়া বিশেষ করে সিনেমা যে প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ফেলছে তা কোনো গোপন বিষয় নয়। সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রী, নর্তকী ও গায়িকা- গীতিকারের যে মর্যাদা ভারতীয়দের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে, সম্ভবত সে মর্যাদা অন্য কারো নেই। এক সিনেমা অভিনেতা খান ড্রেস পরিধান করেছে তো জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই খান ড্রেস পরা শুরু করেছে। এক সিনেমায় এক মেয়ে তার প্রেমিকের সাথে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। যাওয়ার সময় দেয়ালে লেখে গেছে, 'প্রেম যখন করেছি তখন ভয় কিসের'। এর কিছু দিনের মধ্যেই ডজনের পর ডজন এমন ঘটনা ঘটে যায়। সিনেমায় যা কিছু দেখে নতুন প্রজন্ম তা বাস্তবায়ন শুরু করে দেয়। অভিনেতা চওড়া অথবা সংকীর্ণ প্যান্ট পরল তো এটা ফ্যাশন হয়ে গেল। সিনেমায় ডাকাতির দৃশ্য দেখে অল্প বয়স্ক শিশুরা ব্যাংকের ওপর হানা দিয়েছে, বাস লুটপাট করেছে। স্বয়ং দিল্লী সরকারের রিপোর্ট

---

৪. এমন হবেই বা না কেন, যখন টিভি ও সংবাদ পত্রসমূহে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়, 'এখন পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে ভবিষ্যতের পঞ্চাশ হাজার টাকা বাঁচান'। (অমৃতসরের ড. ভান্ডারির বিজ্ঞাপন) অর্থাৎ যদি পেটে মেয়ে সন্তান থাকে তাহলে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে গর্ভপাত ঘটিয়ে ভবিষ্যতে তার বিয়ে-শাদীর খরচ বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা বাঁচান। অমৃতসরে ৯৫% নারী তাদের গর্ভের কন্যা সন্তান বিনষ্ট করেছে। ১৯৯৫ সালে সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ত্রিশ লাখ গর্ভ নষ্ট করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে সামগ্রিকভাবে কন্যা সন্তান জন্মের হার সাড়ে সাত লাখ হ্রাস পেয়েছে। সরকারী হিসাবমতে শুধু যৌতুকের কারণেই প্রতিবছর গোটা দেশে আট হাজার নয়শ' সাতাশি জন নারীকে আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করা হয়। 'আমরা দুজন আমাদের দুজন' জন্ম নিয়ন্ত্রণ শ্লোগানের চক্করে পড়ে প্রতিবছর যেসব শিশুকে হত্যা করা হয়, তাদের সংখ্যা আলাদা।

www.pathagar.com

অনুযায়ী যেনা-ব্যাভিচার ও ধর্ষণের ঘটনায় ডিশ এন্টিনার আগমনের পর থেকে ৭০% প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। এক জরিপ মোতাবেক শুধু দিল্লী শহরের সীমানা পর্যন্ত টিভির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও কুফল লক্ষ্য করুন–খুব কাছে থেকে টিভি দেখলে শিশুদের মৃগী ও মোটা হয়ে যাওয়ার মতো শারীরিক ও ধমনী রোগ সৃষ্টি হতে পারে। যেসব শিশু বেশি সময় কাছে থেকে টিভি দেখে তাদের অনিদ্রা, ধমনী রোগ, খিটখিটে মেযাজ প্রভৃতি সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। একথার সমর্থন করেছেন মস্তিস্ক, মানসিক ও ধমনী রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. নীনা দোহরা, ডা. মনোরঞ্জন সুহা, ডা. নলীম কুমার দোহরা, লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম. সি. শ্রী বাস্তব এবং ডা. সতীশ আগারওয়াল প্রমুখ। ১৯৯৬ সালের টিভিতে কোকাকোলার বিজ্ঞাপনের অনুকরণ করতে গিয়ে লাখনৌর ছয় বছরের শিশু রিংকু তিন তলা বিল্ডিং থেকে পড়ে নিহত হয়েছে। এমনিভাবে টিভিতে প্রদর্শিত এক সিনেমায় এক অভিনেতাকে আত্মহত্যা করতে দেখে দিল্লীর সলিমপুরের নয় বছরের শিশু পূজা নির্মমভাবে আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করেছে। এসব ঘটনা টিভির ভয়াবহ ক্রমবর্ধমান ক্ষতিকর দিকগুলোর মুখোশ উন্মোচন করে দেয়। মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হলো, টিভিতে প্রদর্শিত অনুষ্ঠান ও দৃশ্যাবলী শিশুদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলে। তাদের দ্বারা সেসব দৃশ্যের বাস্তবায়ন যে কোনো সময় হতে পারে। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে টিভির ক্ষতিকর প্রভাব সবচে বেশি শিশুদের ওপর পতিত হয়। কারণ তারা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই টিভির অনুষ্ঠান ও দৃশ্যগুলো যথার্থ মনে করে তার অনুকরণ করতে থাকে। এক অনুমান মতে দিল্লীতে একটি শিশু প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১৭ ঘন্টা টেলিভিশন দেখে। এমন শিশুদের সংখ্যা সবচে বেশি, যারা পড়াশোনা, বাড়ীর কাজ, খাবার-দাবার, খেলাধুলা-বিনোদন ও শোয়া-ঘুমানোর কাজে যতটুকু সময় ব্যয় করে তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে টিভি স্ক্রিনের সামনে। এক অনুমানমতে আট বছরের একটি শিশু আগামী দশ বছরের মধ্যে প্রতি মাসে ৬৮ ঘন্টা সময় টিভি দেখায় অতিবাহিত করবে। মনস্তত্ত্ববিদ ডা. মনোরঞ্জন সুহা বলেন, টিভি দেখা শিশুদের একটি নেশা। যেসব শিশু এই নেশায় বুঁদ হয়ে যায় তারা ঘন্টার পর ঘন্টা টিভি দেখেও ক্লান্ত হয় না। যদিও টিভির অনুষ্ঠান অস্বস্তিকর ও বিরক্তিকর হোক না কেন।

অস্ট্রেলিয়ান বিশেষজ্ঞদের মতে টিভি থেকে বের হওয়া আলোকরশ্মি মস্তিষ্কের কর্মশক্তিকে প্রভাবিত করে। শিশুদের মস্তিষ্ক টিভির উজ্জ্বল আলোকরশ্মি বরদাশত করতে পারে না। যখন একবার মস্তিষ্ক প্রভাবিত হয়ে যায় তখন সে নেশায় বুঁদ হয়ে সারাক্ষণ টিভি দেখায় নিমগ্ন থাকে। এভাবে শিশু যেন টিভির মধ্যে বন্দী হয়ে অনবরত টিভি দেখতে থাকে, তা যে কোনো প্রোগ্রামই আসতে থাকুক।

ডা. রাম মনোহার লোহিয়া হাসপাতালের ডা. নীনা দোহরার মতে মস্তিষ্কের যে অংশটুকু আলোকরশ্মি দ্বারা প্রভাবিত হয়, সে অংশটুকু টিভি দেখার সময় খুব দ্রুত কাজ করতে থাকে। ফলে এক পর্যায়ে মস্তিষ্ক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে মেধাশক্তি ওলটপালট হয়ে যায়। এক সময় তা মৃগী রোগের আকৃতি ধারণ করে। এ ধরনের রোগ নির্ণয় করা খুবই কঠিন। কারণ এ অবস্থায় মুখ থেকে লালা পড়ে না। ফলে লোকেরা সঠিক সময়ে

www.pathagar.com

এ রোগ সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তা দূরারোগ্য ব্যধিতে পরিণত হয়।

এক জরিপ অনুযায়ী ভারতে ৫২ লাখ মৃগী রোগী আছে, যার মধ্যে ৩ লাখ শুধু লাগাতার টিভি দেখার কারণে মৃগী রোগের শিকার হয়েছে। ১৯৯৬ সালের ২রা মে ইউ এন আই পরিচালিত এক জরিপে ডা. মনোরঞ্জনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, টিভি দেখা যেসব শিশুর নেশায় পরিণত হয়ে যায় তাদের যদি এ থেকে নিষেধ করা হয়, তাহলে তারা উগ্র বদমেযাজী হয়ে ওঠে। এই রিপোর্ট প্রকাশের এক মাস পর ১৯৯৬ সালের ৩রা মে দ্বিতীয় আরেকটি রিপোর্ট ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাতে ভারতীয় সমাজে টিভির প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, ভারতীয়দের এখন এ বাস্ত বতা স্বীকার করতে হবে, টিভির পর্দায় প্রদর্শিত উগ্র পন্থা আর বাস্তব জীনের উগ্র পন্থার মধ্যে আর কোনো পার্থক্য থাকেনি; বরং ক্রমেই এ পার্থক্য হ্রাস পাচ্ছে।

এখন টিভি ও সিনেমার প্রতি মানুষের আঙ্গুলি ওঠছে। বিশেষ করে টিভির প্রতি মানুষের অভিযোগ বাড়ছে যে, এর মাধ্যমে সকল শয়তানী কাজকর্ম ও বিশৃংখলা সরাসরি ঘরে পৌঁছছে।

দক্ষিণ দিল্লীর এডিশনাল পুলিশ কমিশনার মি. প্রমিরা বলেন, সিনেমা ও টিভি দুটোই যৌনতা ও উগ্রতাকে নিন্দনীয়ভাবে উপস্থাপন করার পরিবর্তে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করে। যা অল্প বয়স্ক শিশুদের অপরাধের দিকে ঠেলে দিতে সিনেমা টিভি দুটোই সমান যিম্মাদার। তিনি বলেন, সিনেমায় প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উগ্রতা দেখানো হয়। নতুন প্রজন্মের মেধা-মননে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তিনি আরো বলেন, নতুন প্রজন্মকে উগ্রতা, বিদ্রোহ ও বিপথগামিতার দিকে ঠেলে দিতে একদিকে যেমন সিনেমা যিম্মাদার, অপরদিকে যিম্মাদার কঠোর আইনের অনুপস্থিতি। তিনি বলেন, কেবল টিভির প্রচলন হওয়া মাত্রই যৌনতা ও উগ্রতা সম্পর্কিত সিনেমা ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। এসব সিনেমার কারণে কচি মস্তিষ্কের শিশুরা গোমরাহীর পথে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে।

দিল্লীর এক নারী–যে আমদানী-রপ্তানীর কাজ করে, সে বলে, সিনেমার প্রথম কাজ ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো, দর্শদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিনোদন উপহার দেয়া, কিন্তু সিনেমা লোকদের সচেতন ওয়াকিফহাল বানাবে এ উদ্দেশ্য বহু পূর্বেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। দুঃখের বিষয়, আজ সিনেমাগুলো মানব জীবনের ইতিবাচক মূল্যবোধগুলো শিক্ষা দেয়ার প্রতি মোটেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে না।

'বাজিগর' সিনেমা একটি ব্যবসা সফল সিনেমা ছিল। এ সিনেমায় প্রভাবিত হয়ে মোম্বাইয়ের এক নওজোয়ান দানেশ কাজী তার প্রেমিকা ভারতী রামচন্দ্রকে হত্যা করার পূর্বে তার থেকে একটি আত্মহত্যার চিঠি লিখিয়ে নিয়েছিল। এরপর একটি উঁচ ভবনের ছাদে নিয়ে সেখান থেকে নিচে ফেলে দিয়ে তাকে হত্যা করেছে। এমনিভাবে 'রঘুবীর' সিনেমার একটি দৃশ্যে প্রভাবিত হয়ে এক অল্প বয়স্ক নওজোয়ান তার সমবয়সী এক বন্ধুকে হত্যা করেছে। এ তো মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো। নতুবা সিনেমার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত ও ঘটনা রয়েছে, যাতে প্রভাবিত হয়ে আজ নওজোয়ানরা ক্রমেই অপরাধের পথে ধাবিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

মনস্তত্ত্ববিদ ডা. এল কে ভগত বলেন, সিনেমার দু'টি দিক রয়েছে, তা হলো, হিরো বা নায়ক ভাল ও সুন্দর দৃশ্যে আর ভিলেন খল চরিত্রে অভিনয় করে, কিন্তু জীবনের ভারসাম্যের দিকটি ধামাচাপা পড়ে যায়। ভলিউডের রাজা শাহরুখ খান সিনেমায় অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে বেঁচে যায়। এতে করে নওজোয়ানদের মধ্যে বিরাট প্রভাব পড়ে। এছাড়াও নায়কের চরিত্র ও ভূমিকা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে লোকেরা নিজেদের সেসব চরিত্রের সাথে একাকার করতে প্রয়াস চালায়।

বেসরকারী একটি সংস্থার ডাইরেক্টর মি. অনিল কলি বলেন, মাদক ও টেলিভিশন মানুষের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। এ দু'টি নওজোয়ানদেরকে বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত উৎসাহিত করে। যদি কখনো সফল হয় তা হলে অপরাধের যে খবর সৃষ্টি হয় তা প্রায় প্রতিদিনই পড়তে পাওয়া যায়।

মি. কলি আরো বলেন, সিনেমা শুধু মধ্য ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের ওপর প্রভাব ফেলে। তারা সিনেমায় যেসব দৃশ্য দেখে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে প্রয়াস চালায়। ফলে তারা ধীরে ধীরে অপরাধ জগতে পা বাড়ায়। এছাড়াও সিনেমা সামাজিক বিশৃংখলা ও যৌন বিপথগামিতা বৃদ্ধি করছে। এর চেয়েও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, সিনেমা নওজোয়ানদের জীবনের সমস্যা সংকট মোকাবেলার সাহস যোগানোর পরিবর্তে তা থেকে পলায়নে বাধ্য করে।

সাম্প্রতিককালে দিল্লী পুলিশ এক কিশোরীকে অপহরণ করে কয়েক মাস আটকে রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করার অপরাধে সাত নওজোয়ানকে গ্রেফতার করে। তারা স্বীকার করেছে, টিভির একটি সিনেমায় প্রভাবিত হয়ে তারা এ জগতে পা বাড়িয়েছে। ১৯৯৬ সালের জুনে পরিচালিত ইউ এন আই'র এক জরিপ অনুযায়ী দিল্লীর সাবেক এডিশনাল পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) আর কে তেওয়ারি বলেন, এসব অপরাধের জন্য সিনেমা ও অশ্লীল ম্যাগাজিনের মতো পিতা-মাতাও একইভাবে যিম্মাদার।

দিল্লীর একটি আদালত নারীবাদী সংগঠন 'জাগ্রত মহিলা সমিতি'র প্রেসিডেন্ট নরমিলা শরমার আবেদনের প্রেক্ষিতে ঝিটিভি, স্টার টিভি ও দূর-দর্শনকে তারা তাদের কোম্পানীর পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, অনুষ্ঠানমালার পরিকল্পনাকারী ও প্রডিউসারদের নাম আদালতকে অবহিত করতে নোটিশ দিয়েছে। আদালত এসব কোম্পানীর বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিতে পারে। জাগ্রত মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট নরমিলা শরমা টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে এক সাক্ষাতকারে বলেন, কোনো ভদ্র রুচিশীল মানুষ ঘরের লোকদের সাথে বসে এসব প্রোগ্রাম দেখতে পারে না। কারণ এতে নির্লজ্জ নগ্ন দৃশ্য দেখানো হয়। তিনি আরো বলেন, নতুন প্রজন্মের শিশুরা এসব প্রোগ্রাম দেখে অশ্লীলতা শিখছে। পাশাপাশি তাদের মধ্যে উগ্রতাও বাড়ছে। তিনি আরো বলেন, একত্রিশটি প্রোগ্রামের মধ্যে আটটি প্রোগ্রাম এমন রয়েছে, যেগুলো প্রদর্শনের অনুমতি দেয়া যায় না। এতদসত্ত্বেও তা উন্মুক্তভাবে দেখানো হচ্ছে। ঝিটিভি ও স্টার টিভির আইনজীবীরা বলেন, যেহেতু এসব প্রোগ্রাম হংকং থেকে প্রচার করা হয়–এ জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনী এ্যাকশন নেয়া যাচ্ছে না। (সূত্র : ত্রৈমাসিক দাওয়াত, জুন-১৯৯৬)

www.pathagar.com

পাকিস্তানী মিডিয়া : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

পাকিস্তানে টেলিভিশনের আগমনের পূর্বে এসব ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার পলিসি নির্ধারণ করার জন্য যুলফিকার বোখারীর সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিংয়ে লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, পরিচালক ও সম্ভাব্য প্রসিউডারদের আহ্বান জানানো হয়। সে মিটিংয়ে বোখারী সাহেব পাকিস্তানী টিভির দু'টি মৌলিক উদ্দেশ্য তুলে ধরেন।

এক. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কীর্তি ও অবদানের কথা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া।

দুই. জাতি এবং সর্বাগ্রে মধ্যম শ্রেণীর লোকদের প্রাচীন ধর্মীয় চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করা। আর এটিই হলো সবচে' গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য এমনভাবে আঞ্জাম দেয়া হবে, যেন লোকেরা কোনো অবস্থায়ই বুঝতে না পারে যে, নতুন প্রজন্মকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করার অভিযান চালানো হচ্ছে। আপনারা যদি এ কাজ করতে পারেন তাহলে মনে রাখবেন, চিরকালের জন্য আমরা ধর্মীয় উন্মাদ ও মোল্লাদের থেকে আমাদের সমাজ ও রাজনীতিকে পবিত্র করতে সক্ষম হব।

মৌলিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পর বোখারী সাহেব উপস্থিত সুধীবর্গকে পৃথক পৃথক দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন, আপনাদের মধ্যে যারা আরবী চর্চা করবে তাদের আমি নির্ধারিত অনুষ্ঠানমালার বিনিময় ছাড়াও আরো দুইশ' টাকা করে প্রতি মাসে আমার পক্ষ থেকে দেব। যাতে আরবী শেখার পর আপনাদের রেডিও ও টিভির পক্ষ থেকে আলেম এবং নতুন চিন্তাবিদ হিসেবে প্রচারণা চালিয়ে সেসব ধর্মীয় গোঁড়া মোল্লাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব নির্মূল করা যায়, যারা নিজেদের ধর্মের ঠিকাদার বানিয়ে বসে আছে। ধর্মের জঞ্জাল থেকে সমাজকে পবিত্র করার দায়িত্ব আপনাদেরই নিতে হবে। তাই আমরা এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আধুনিক মেধা মননের অধিকারীদের সামনে নিয়ে আসতে চাই। নতুন মিডিয়ার মাধ্যমে আধুনিক মেধা মননের অধিকারীদের কেবল সেকেলে ও পশ্চাদপদ ধ্যান ধারণা থেকে পবিত্রকরণে ব্যবহার করা হবে; পুরো জাতির চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা পাল্টানোর দায়িত্ব মিডিয়াকেই গ্রহণ করতে হবে।

আপনারা এ উদ্দেশ্য এভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেন যে, মোনাফেকী, কপটতা ও দ্বি-মুখী চরিত্রে খল নায়কদের দাড়ি এবং উপহাস ও বিদ্রূপাত্মক চরিত্রে প্রাচ্যের পোশাক ব্যবহার করবেন। আর স্মরণ রাখবেন, আপনাদের সকল অভিনেতা ও মডারেটদের সে লেবাস পরিধান করাতে হবে, যা আমাদের উন্নত সমাজে একশ' বছর পর প্রচলন হওয়া উচিত এবং যা উচ্চ শ্রেণীর শতকরা এক পার্সেন্টের মাঝে ইতোমধ্যেই প্রচলন লাভ করেছে।'

এসব নির্দেশনা যদিও বোখারী সাহেবের মুখ থেকে বের হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে এটি সেই মৌলিক পলিসির অংশ, যা পাশ্চাত্য সৃষ্ট ধর্মহীন রাজ কর্মচারী ও ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী তৈরি করেছিল এবং যা অর্জন করার জন্য কোটি কোটি ডলার ঋণ নিয়ে টিভি মিডিয়াকে পাকিস্তানে আনা হয়েছে। এ কারণে সূচনালগ্ন থেকেই সেই পলিসির ওপর কাজ করা হচ্ছে। শহীদ জেনারেল জিয়াউল হকের শাসনামলে এই পলিসি কিছুটা

www.pathagar.com

পরিবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু বেনজীরের সরকার জাতীয় পলিসির নামে মিডিয়ার জন্য যে প্রোগ্রাম জারি করে গেছে তা থেকে সুস্পষ্ট হয়, পাকিস্তানকে পুরোপুরি পশ্চিমের মতো করে ঢেলে সাজানোর প্রোগ্রাম অব্যাহত থাকবে এবং যেটুকু বাকী থাকবে তা পশ্চিমা মিডিয়ার মাধ্যমে পূর্ণ করা হবে। 'পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পলিসি' শিরোনামে বেনজীরের সরকার ১৯৯৫ সালের আগস্টের প্রথম সপ্তাহে তার সাংস্কৃতিক পলিসির ঘোষণা দেয়। এই পলিসির গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক খুব জোরে শোরে ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মাঝের সময়কালে তথাকথিত কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী ও নগ্নতা অশ্লীলতাপ্রিয় ধর্মহীন গোষ্ঠী যার প্রদর্শনী করেছিল। যদি পলিসির ঘোষণা নাও দেয়া হত, তবুও পাকিস্তানের সকল সরকারী প্রচার মাধ্যম এবং সরকারী উৎসব অনুষ্ঠানসমূহের রীতি-নীতি ও ধরন সুস্পষ্টভাবে এ ঘোষণা দিচ্ছিল, এই জাতির ওপর ধর্মহীন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন খুব জোরেশোরে শুরু হয়েছে এবং নতুন প্রজন্মকে একটি বিশেষ চিন্তাধারার প্রতি নিয়ে যাওয়ার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে টিভির মাধ্যমে যা কিছু উপস্থাপন করা হচ্ছে তা জাতীয় উপকরণ দ্বারা জাতিকেই ধ্বংস করার একটি প্রয়াস।

সাংস্কৃতিক পলিসির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোতে বাদ্য, নৃত্য, মিউজিক, গান, লোক গীতি, সিনেমা, টেলিভিশন, নৃত্যশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, গায়ক, অভিনেতা, অভিনেত্রী ইত্যাদি শব্দগুলো কমপক্ষে সতের বার ব্যবহার করা হয়েছে। যেন গোটা সাংস্কৃতিক নীতির প্রাণই হলো গান, নৃত্য, বাদ্য, বাজনা, সংগীত ইত্যাদি। এ পলিসিতে দ্বিতীয় যে দিকটির জোর দেয়া হয়েছে। তা হলো আঞ্চলিকতা, আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্চলিক কালচার, স্থানীয় ও আঞ্চলিক বুদ্ধিজীবী এবং বিভিন্ন শহর ও প্রদেশের ইতিহাস ইত্যাদি। পলিসির তৃতীয় হলো সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক বিনিময়। যার মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর মাঝে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিকাশ ঘটানো।[৫]

পলিসির চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা তথা এনজিওদের পৃষ্ঠপোষকতা।[৬]

৫. প্রকাশ থাকে যে, পাকিস্তানের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে সবচে বড় ও নিকটতম দেশ হলো ভারত, যার ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির সাথে নিজেকে জোড়ার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সদা অস্থির পেরেশান থাকে। পাকিস্তানে ভারতীয় সিনেমার ব্যাপক জনপ্রিয়তা তার বাস্তব প্রমাণ।

৬. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এনজিও এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে বিরাট গুরুত্ব দেয়া হয়। এসব সংস্থা ফ্রি-মিশন আন্দোলনের অধীনে লায়ন্স ক্লাব, রোটারী ক্লাব, রেডক্রস সোসাইটি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের নামে কাজ করে থাকে, বিদেশী বৃহৎ শক্তিবর্গ যাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং বিপুল পরিমাণ আর্থিক ফান্ড সরবরাহ করে থাকে। গত বছর বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে এসব এনজিও এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানোর দাবী উঠলে বৃহৎ দেশগুলোর দূতাবাস চাপ দিয়ে তা বন্ধ করে দেয়। পক্ষান্তরে দীনী মাদরাসাগুলোর ওপর জোরেশোরে এই অপবাদ দেয়া হচ্ছে, তারা বিদেশ থেকে সাহায্য পেয়ে থাকে। ভারতেও দীনী মাদরাসাগুলোর ওপর একই অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে। অপরদিকে আরব বিশ্বের ওপর চাপ প্রয়োগ করে দীনী ও সেবা সংস্থাগুলোকে চাঁদা ও সাহায্য দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর পেছনে যুক্তি দেখানো হচ্ছে, এই সাহায্য দ্বারা মৌলবাদ ও ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের শক্তি যোগানো হয়।

www.pathagar.com

পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক পলিসির পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ১৮৭২ সালে সেন্সরের নামে যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, সেগুলো যেহেতু সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা, এজন্য এ আইন নির্মূল করা হবে। এখন সিনেমা ও নাটকের স্ক্রিপ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্য ভাষায়, সিনেমা এখন কোনো সেন্সর ছাড়াই প্রদর্শন করা হবে।

উপরোল্লিখিত পাঁচটি দিকই হলো পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক পলিসির মৌলিক কথা। এছাড়া আরো তেত্রিশটি পয়েন্টের কথা বলা হয়েছে, যেগুলো শুধু মূর্তির চিত্র এবং কতিপয় সুন্দরীর আকৃতি সর্বস্ব, চোরের বড় গলার মনোজ্ঞ প্রবাদের মতো এ সংস্কৃতি এবং এসব বেলেল্লাপনাকে কালচার নাম দিয়ে তা আল্লামা ইকবাল ও কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হচ্ছে।[৭]

পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পলিসির কিছু দৃষ্টান্ত

০১. সাহিত্য, নির্মাণ, খেলাধুলা, নৃত্য, সঙ্গীত, লোকগীতি, আর্টস, সিনেমা, টেলিভিশন, রেডিও, প্রচার মাধ্যম এবং সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করা।

০২. শিল্পী, গীতিকার, কণ্ঠশিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, চলচ্চিত্র নির্মাতা, নাট্যকার ও নর্তক-নর্তকীদের জাতীয় একাগ্রতা ও একমুখিতার কর্মপ্রচেষ্টার সাথে সম্পৃক্ত রাখা। অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রডিউসার ও চলচ্চিত্র পরিচালকদের তালিকা তৈরি করা, সঙ্গীত,

---

৭. সাংস্কৃতিক পলিসি নির্মাতারা শুধু নাচ, গান, বাদ্য, বাজনা, নগ্ন শরীর প্রদর্শনী, চিত্রাংকন, ভাস্কর্য নির্মাণ ইত্যাদিকেই সংস্কৃতি গণ্য করেছেন। অথচ দুনিয়ার কোনো অভিধানেই সংস্কৃতির এ অর্থ নেয়া হয়নি, আর না আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুপরিচিত বুদ্ধিজীবীদের নিকট কালচার সংস্কৃতির পরিধি এত সীমিত। সংস্কৃতির আরবী শব্দ 'ছাকাফাহ', এর মূল ধাতু ছাক্ফুন। ছাকফুন শব্দের অর্থ কাটছাঁট করা। অর্থাৎ ডালপালা কেটেছেঁটে সুন্দর করা। এমনিভাবে আরবী তাহযীব শব্দের মধ্যেও গাছপালার তরতাজা পাতাগুলো কেটেছেঁটে পরিষ্কার করার অর্থ রয়েছে। আজকাল সমাজবিজ্ঞানে তাহযীব দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়া হয় কোন ব্যক্তি কিংবা সমাজ পবিত্রতা ও মার্জিত আচার-আচরণের ভূষণে সজ্জিত হওয়া। আরবী ছাকাফাহ অর্থে ইংরেজীতে কালচার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কালচার শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে। বেকন এটিকে পশ্চিমা বিশ্বে পরিচিত করেছেন। ইংরেজি কালচার শব্দের মধ্যেও কাটছাঁট করার অর্থ পাওয়া যায়। এগ্রিকালচার শব্দটিও কালচার থেকেই এসেছে। এ্যামারসনের মতে কালচারের মূল লক্ষ্য মানবতার সৌন্দর্য চেতনা জাগ্রত করা। আর্নলডের মতে, কালচার হলো এমন একটি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কর্ম, যার কাজ হলো মানব জীবনে সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করা। গয়েটের মতে সংস্কৃতির তিনটি অংশ রয়েছে, এক. বিশ্ব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। দুই. সচ্চ চরিত্রের আদর্শ হওয়া, তিন. সূক্ষ্ম রুচি দ্বারা উপকৃত হওয়া। সংস্কৃতির উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের। কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এখানে পেশ করা হয়নি, যাতে পাশ্চাত্য প্রভাবিত ও পাশ্চাত্যের যে কোনো চাকচিক্যপূর্ণ বস্তুকে খাঁটি সোনা ধারণাকারী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, পশ্চিম থেকে আমদানীকৃত যে নাচ-গান, বাদ্য-বাজনা, অশ্লীল বিনোদন ও নগ্ন নারী দেহের প্রদর্শনকে আমরা সংস্কৃতি হিসেবে চালিয়ে দেই, সেগুলো পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের কাছে আসল সংস্কৃতির শত ভাগের এক ভাগও নয়। ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, চলমান অশ্লীলতা নগ্নতা পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী চিন্তাবিদদের মতেও মোটেই সংস্কৃতি নয়। মূলতঃ এগুলো সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি।

www.pathagar.com

লোকসঙ্গীত, কল্যাসিক্যাল সঙ্গীত, জনপ্রিয় সঙ্গীত, গানের সুর-সজ্জা এবং আবৃতির মূল্যায়ন, সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী, সঙ্গীত সভার আয়োজন অনুষ্ঠান–এসব সাংস্কৃতির পলিসি-সর অন্তর্ভূক্ত কতিপয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের চিত্রাংকন মাত্র।

এগুলো পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পলিসির যৎকিঞ্চিত ঝলক। এখন দেখার বিষয় এগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পাকিস্তানী টেলিভিশনের সকল চ্যানেল ছাড়া পশ্চিমা টিভি কোম্পানী এস.টি.এন, সি.এন.এন, বি.বি.সি ও এন.টি.এম ইত্যাদি চ্যানেল থেকে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে যেসব অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে, তা জাতিকে ময়ূর নাচে উম্মাদ দিশাহারা করার সুদূরপ্রসারী, সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত প্রয়াস। সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানী টিভির অনুষ্ঠানমালায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তা নিম্নরূপ–

০১. টেলিভিশনের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন চব্বিশ ঘন্টা কোনো না কোনো চ্যানেল চালু থাকছে। পাকিস্তানী টিভির দুই নম্বর চ্যানেলটিকে শিক্ষা চ্যানেল বলা হয়, কিন্তু এই চ্যানেলে যেসব প্রোগ্রাম প্রচার করা হয় তার মাত্র বিশ শতাংশ শিক্ষা বিষয়ক, আর বাকী আশি শতাংশ বিনোদনমূলক। পুরাতন নাটক বার বার দেখানো হয়। এভাবে নতুন প্রজন্মের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও আরামের সময়কে বিনোদনমূলক প্রোগ্রামে ব্যয় করা হচ্ছে। টিভির এসব প্রোগ্রাম নৈতিক ও চারিত্রিক ধ্বংসের সাথে সাথে স্বাস্থ্যগত ধ্বংসেরও কারণ হচ্ছে। আজকাল স্কুলের ৪২% ছেলে-মেয়ে চশমা ব্যবহার শুরু করেছে, অথচ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে টিভির অধিক সম্প্রচার বিভিন্ন ক্যান্সারের মতো কষ্টকর জীবনবিনাশী রোগের কারণ হতে পারে। পাকিস্তানী সমাজের ওপর শারীরিক সুস্থ্যতা ব্যতীত মনস্তত্ত্ব এবং স্বভাব চরিত্র গঠনেও টিভি প্রোগ্রামসমূহের ধ্বংসকর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পড়ছে। এ্যাকশন, মারপিট ও অপরাধে ভরপুর সিনেমাগুলো আগে হলে দেখানো হতো, কিন্তু এখন ভিসিআরের কারণে মহল্লায় মহল্লায়, অলিতে গলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো সিডি ভিসিডির দোকান গজিয়ে ওঠেছে। আর ডিশ এন্টিনা তো প্রতিটি ঘরকে পতিতাবৃত্তি শিক্ষার কেন্দ্র বানিয়ে দিয়েছে। একটি পাশ্চাত্য টিভি চ্যানেল চব্বিশ ঘন্টা এমন যৌন প্রোগ্রাম দেখায় যা স্বয়ং পাশ্চাত্যেও নিষিদ্ধ।

০২. পাকিস্তানী টিভি ও এনটিভিএম-এর প্রোগ্রামগুলো সঙ্গীত চ্যানেল বনে গেছে, যেখান থেকে গোটা জাতিকে নর্তন কুর্দনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। গীতিকার, কণ্ঠশিল্পী ও চলচিত্র তারকাদের হিরো বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। পশ্চিমা সমাজের মতো যুবক-যুবতীদের সম্মিলিত উত্তাল সঙ্গীতের তালে তালে নাচ-গান, ঢলাঢলি এবং একে অন্যের ওপর পতিত হওয়ার দৃশ্যও দেখানো হয়। এছাড়া পাকিস্তানী সিনেমা হলগুলোতে পাশ্চাত্য থেকে আমদানীকৃত হত্যা, মারপিট, ছিনতাই, ডাকাতি, নগ্নতা, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা ও যৌন সুড়সুড়ি ভরপুর ইংরেজি সিনেমা প্রকাশ্যে প্রদর্শন করা হচ্ছে। আর এগুলোর অনুকরণে পশতু, উর্দূ, পাঞ্জাবী ভাষায় সিনেমা ও ক্যাসেট তৈরি করে ব্যাপকভাবে প্রসার করা হচ্ছে। ভারতীয় সিনেমা ছাড়াও বিনোদনের নামে পাশ্চাত্য কলুষতায় কলুষিত নাটক ও নাচ গানের অনুষ্ঠানগুলো প্রদর্শিত হয়। আর পাকিস্তান সরকার এর পেছনে পানির মতো অর্থ ব্যয় করে।

www.pathagar.com

এসব সিনেমা ও টিভি প্রোগ্রাম নতুন প্রজন্মেও মেধা মননকে এ্যাডভেঞ্চার অথবা অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অপরাধ, অশ্লীলতা ও নগ্নতার ওপর উসকে দিচ্ছে। ১৯৯১ সালে সংঘটিত ডাবল মার্ডার মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি নাঈমুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশন একথার স্বীকৃতি দিয়েছে। মামলার আলোকে আদালত সে সময়ের সরকারকে প্রস্তাব দেয় যে, অতি দ্রুত যৌনতা ও অপরাধ সম্বলিত সিনেমার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত, কিন্তু পাকিস্তানের বিভিন্ন বুক স্টল ও অলি গলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দোকানগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হলে দেখা যায়, দেশী বিদেশী পত্র পত্রিকা, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, সাময়িকী ও বই পুস্তকে এমন এমন চরিত্র বিধ্বংসী প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মন্তব্য, রঙিন পৃষ্ঠা, মা বোনদের নগ্ন ও অর্ধ নগ্ন দেহের ছবিতে ভরা। এসব কিছুর মৌলিক উদ্দেশ্য সমাজে পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতির প্রাধান্য বিস্তার করা এবং মুক্ত চিন্তা ও স্বাধীন যৌন মেলামেশার কালচারের বিকাশ ঘটানো। ১৯৯২ সালে পাকিস্তানের একটি প্রসিদ্ধ ইংরেজি পত্রিকার শুক্রবারের সংখ্যায় একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপ বিশেষ করে হল্যান্ডের প্রসিদ্ধ শহর আমস্টার্ডামের বিলাসিতা, বিনোদন ও যৌন আমোদ প্রমোদের স্থানগুলোর পরিচিতি পেশ করা এবং সেখানকার কোন গলিতে কি হয় তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা। এটি এমন এক পত্রিকা যা প্রায় প্রতিটি ঘরেই পড়া হয়।

পাকিস্তানী সমাজে পশ্চিমা মিডিয়ার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

পশ্চিমা সমাজে মিডিয়ার ধ্বংসাত্মক ও নেতিবাচক প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে খোদ পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কোন দ্বি-মত নেই। আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রাচ্যের দেশগুলোর জন্যও তারা এসব সিনেমা চলচ্চিত্র পছন্দ করে না। যেমন মার্কিন এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত ১৯৯৩ সালের ১০ই মার্চের এক সেমিনারে ওয়াশিংটনের জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. ওয়াল্টার বার্নাস বলেন, রক মিউজিক, হলিউডের সিনেমা ও অন্যান্য বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম যা আমেরিকা বহির্বিশ্বে প্রেরণ করে, সেগুলো না শুধু সেখানের সমাজে বিরাট ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে; বরং তা মার্কিন সমাজকেও ক্ষত বিক্ষত করে। (ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর মার্চ, ১৯৯১; সূত্র : আল ফারুক, করাচী, সংখ্যা-১৩, খণ্ড -১১)

পাকিস্তানী বুদ্ধিজীবী জামিলুদ্দীন আলী পাক টিভির প্রোগ্রামগুলোর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন, বর্তমানে পাকিস্তানের উচ্চ শ্রেণীর কথা বাদই দিলাম, তারা তো নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কারো স্বার্থই দেখে না। বর্তমানকালে আমার তো মধ্যম শ্রেণীর অশিক্ষিতদের সম্পর্কে ঈর্ষা হয়। করাচী, বসনিয়া ও কাশ্মীরের মতো দুনিয়ার বড় বড় বিপদ বিপর্যয়েও প্রভাবিত হয় না তাদের সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলো। হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে বিয়ের অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক ও বিনোদন অনুষ্ঠান, কোনো না কোনো উপলক্ষে নগ্ন ও অর্ধ নগ্ন যুবক যুবতীদের বড় বড় নাচ গানের আসর ইত্যাদিতে কোনো ভাটা আসে না। যে কোনো জাতীয় দুর্যোগেও তা স্তিমিত হয় না। ১৯৯৫ সালে

www.pathagar.com

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পাকিস্তানী একটি ব্যাংকার সংগঠন এমন একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে, যাতে আট লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পাকিস্তানী টিভিও এমন এমন শো'র আয়োজন করে, যা দেখলে মনে হয় গোটা পাকিস্তান একটি অতি সচ্ছল ও উন্নত রাষ্ট্র। (দৈনিক জং করাচী, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫)

নগ্নতা ও অশ্লীলতার সয়লাবে সবচে বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে মিডিয়া। মিডিয়া নারীর রূপ-লাবণ্য, নারীর চেহারা ও নারীর নগ্ন দেহকে তার ব্যবসা প্রসারের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। কত পত্র পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও সাময়িকী রয়েছে যেগুলো শুধু অশ্লীল সংবাদ, অশ্লীল কিস্‌সা-কাহিনী ও নগ্ন নারী দেহের মাধ্যমেই চলছে। পৃথিবীর কোনো স্থানে অশ্লীলতা নগ্নতার কোনো ঘটনা ঘটলে কিংবা কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীর স্ক্যান্ডেল হলে কিংবা কোনো খেলোয়াড়ের প্রেম-ভালবাসার আলোচনা শুরু হলে পাকিস্তানী পত্র পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলো তাতে আরো রং চড়িয়ে প্রকাশ করা তার গুরুদায়িত্ব মনে করে। সম্ভবত তারা মনে করে যদি এ স্ক্যান্ডেল সম্পর্কে আমাদের জাতি না জানে তাহলে তারা উন্নতি প্রগতির ক্ষেত্রে পেছনে রয়ে যাবে।

নগ্নতার বিকাশ ও বিস্তারে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়ার কোনো বস্তুর বিজ্ঞাপন নারীর ছবি ছাড়া পূর্ণতা পায় না। লেবাস পোশাকে নারী, শিল্প-পণ্যে নারী, এমনকি যেসব বিষয় একান্তই পুরুষের জন্য, তাতেও নারীর ছবি। মোটর সাইকেল এবং ট্রাক্টরের বিজ্ঞাপনেও নারীর ছবি। নারীর একেক অঙ্গ প্রদর্শন করে অঢেল বিত্ত-বৈভব অর্জন করা হচ্ছে। মডেলিং একটি বিরাট লাভজনক ব্যবসা হয়ে গেছে। যেখানে নামী দামী ঘরের যুবতী মেয়েরা তাদের শরীরের প্রদর্শনী করে চড়া বিনিময় আদায় করে, কিন্তু নগ্নতা অশ্লীলতার বিকাশে মডেলিংয়ের চেয়েও বেশি ভূমিকা পালন করছে নাটক ও চলচ্চিত্র। এখন তো টিভি ভিসিআর প্রতিটি ঘরকে এক একটি মিনি সিনেমা হল বানিয়ে দিয়েছে। এর আগ্রাসন থেকে ভদ্র অভিজাত পরিবারগুলোও নিরাপদ নেই। এখন তো ডিশ এন্টিনা ও ইন্টারনেটের কারণে দুনিয়ার নিকৃষ্টতম ব্লু-ফিল্মগুলো এক ক্লিকেই সামনে চলে আসে। একবার তাতে ঢুকে পড়লে দর্শকদের দিন কিভাবে চলে যায় তা অনুমানই করা যায় না।

পাঞ্জাব প্রদেশের চালচিত্র

১৯৯৬ সালের অপরাধ সংক্রান্ত এক জরিপ অনুযায়ী পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে বিগত পাঁচ বছরের গড় হিসাবে বিভিন্ন অপরাধে ৩৯৫%, হত্যার ঘটনায় ৩৪%, ছিনতাই ও পকেট মারের ঘটনায় ৫৩%, অপহরণের ঘটনায় ২১% এবং ধর্ষণের ঘটনায় ২১% বৃদ্ধি ঘটেছে। প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত জরিপে ধর্ষণের ঘটনা মাত্র ২% অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এছাড়া ব্যাংক ডাকাতিও ৪৩৩% প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। এমনিভাবে পেট্রোল পাম্প লুট ও রাস্তা ঘাটে লুণ্ঠনের ঘটনায়ও ১৬৭% প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। শুধু এতটুকুই নয়, মোটর গাড়ী চুরিতেও ব্যাপক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। এক সিনিয়র পুলিশ অফিসার বলেন, পুলিশের

পাশাপাশি ক্ষমতাশালী লোকেরাও আইন শৃংখলা বিনষ্টে একই রকম দায়ী। পুলিশ বিভাগেও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে কৃতিত্বের অধিকারী বিপুল সংখ্যক লোক রয়েছে।[৮]

উল্লিখিত জরিপ ২০০২ সালের। দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত লাহোর সর্বসাম্প্রতিক জরিপ প্রকাশ করেছে, যা আমরা মাসিক বেদার ডাইজেস্ট লাহোর, ফেব্রুয়ারী, ২০০৫-এর সূত্রে নিম্নে উপস্থাপন করছি।

২০০৪ সালের প্রথম দশ মাসে শুধু পাঞ্জাব প্রদেশেই ৬ হাজার ১ শ' ২০ জন নারী আর্থিক সংকট ও পারিবারিক সমস্যায় অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যা করেছে, আর ১ হাজার ৯৪ জন বিভিন্ন অপরাধে জড়িত হয়ে জেলে গেছে। তাদের ৩ শ' ৪৭ জন হত্যার অভিযোগে, ২ শ' ৯৪ জন ব্যভিচারের অভিযোগে, ১৫ জন অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে, ১৬ জন ডাকাতির অভিযোগে, ১৬ জন চুরির অভিযোগে, ২ শ' ২০ জন আইন-শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে, ৫০ জন অন্যান্য অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে জেলে গেছে। বিগত ১২ মাসে ১ হাজার ৬৫ জন নারী সামাজিক নিপীড়ন, ১ হাজার ১ শ' জন পারিবারিক নিপীড়ন ও ৯ শ' ৭৩ জন যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে। পাঁচ জন নারীকে গায়ে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে অথবা এসিড নিক্ষেপে হত্যা করা হয়েছে, ৪ হাজার ৯ শ' ৬৭ জনকে অপহরণ করা হয়েছে, ২ হাজার ৮ শ' ৬০ জনকে হত্যা করা হয়েছে আর ১ হাজার ৫ শ' জনকে বদকার ব্যভিচারিণী অভিহিত করে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। ২০০৪ সালে হত্যার ৫ হাজার ৫ শ' ৯টি, জোরপূর্বক ধর্ষণের ২ হাজার ১ শ' ৬০টি এবং গণধর্ষণের ২ শ' ২০টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই হলো পাকিস্তানের একটি মাত্র প্রদেশ পাঞ্জাবের চালচিত্র।

---

৮. ভারতের উত্তর প্রদেশ পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলের বর্ণনামতে, উত্তর প্রদেশের পুলিশ বিভাগে অপরাধমূলক কর্মকা লিপ্ত পুলিশের সংখ্যা ১০ হাজার, যাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলী করা হয়েছে। এ বদলী সম্ভবতঃ অপরাধ সংঘটনে অধিক অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যেই।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

টিভির নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া : একটি পর্যালোচনা

এক সময় রেডিও, সিনেমা ও নাটক বিনোদনের প্রধান মাধ্যম ছিল। সময়ের বিবর্তনে পৃথিবীর পরিবেশ বদলে যেতে থাকে। নতুন নতুন জিনিস আবিস্কৃত হয়। টিভি, ইন্টারনেটের দাপটে সনাতন যুগের বিনোদন ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ে। উদ্ভাবিত হয় আধুনিক যন্ত্রপাতি। রিমোর্ট চাপলেই টিভির পর্দায় গোটা পৃথিবী চোখের সামনে হাজির। তাই মানুষ ঝুঁকে পড়ে টিভি এবং ইন্টারনেটের প্রতি। ঘরে টিভি থাকলে মানুষ আর কোনো কাজের যোগ্য থাকে না। একাকী টিভি প্রোগ্রাম দর্শকের অনুভব অনুভূতি সামগ্রিক অনুভব অনুভূতির থেকে আলাদা রকমের হয়ে থাকে। দর্শক যখন মনোযোগ সহকারে একা একা কোনো অনুষ্ঠান দেখে তখন সে পুরোপুরি তাতে ডুবে যায়। তখন তার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ বা পর্যালোচনা করার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলে। ঠিক-বেঠিক প্রশ্নে সে তখন টিভি অনুষ্ঠানের ওপরই ভরসা করে।

চব্বিশ ঘণ্টা দেশী-বিদেশী অসংখ্য চ্যানেলে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার আমাদের যুব সমাজের চরিত্র ও মন মানসিকতায় যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং ভবিষ্যতে আরো যা প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ফেলবে, তা সূর্যালোকের চেয়েও সুস্পষ্ট।

নতুন প্রজন্মের ওপর টিভির ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্বে বিশেষ করে আমেরিকান সমাজে শিশুদের ওপর টিভির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। আমাদের দেশেও এ বিষয়ে গবেষণা চলছে।

এখানে আমি ফিকাহ্ ও ফতোয়ার পরিবর্তে খোদ পশ্চিমা বিশ্বের মনোবিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী এবং মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত জরিপের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি।

আমেরিকার কর্নেল ইউনিভার্সিটির মানব বংশ বৃদ্ধি বিষয়ক লেকচারার ড. জন কোন্ডারী তার গবেষণামূলক এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েরা টিভিকে নির্ভরযোগ্য মনে করে। টিভির পর্দায় তারা যা দেখে সবই বিশ্বাস করে। অধিকাংশ শিশু মনে করে, টিভির ছবিগুলোও তাদের দেখে।

বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদ ড. জন এম. হিলে তার যুগশ্রেষ্ঠ গ্রন্থে শিশুদের ওপর টিভির প্রভাব বিষয়ে নিরীক্ষা চালানোর পর মন্তব্য করেন, সাধারণতঃ সপ্তাহে ২৮ ঘণ্টা টিভি দেখে এমন কমবয়সী শিশুদের মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। আর এ পরিবর্তন তাদের ভাল ও সুন্দরের দিকে পরিচালিত করে না

শিশুদের পড়াশোনার ওপর টিভির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কর্নেল ইউনিভার্সিটির মনস্তত্ত্ববিদ ড. জেরভী সিনগার লেখেন, শিশুদের পড়ালেখায়

www.pathagar.com

অমনোযোগী এবং দক্ষতা অর্জনে পিছিয়ে পড়ার পেছনে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে আমেরিকান টেলিভিশন। টিভি দেখায় অভ্যস্ত শিশুরা পড়ালেখায় অনগ্রসর এবং দুর্বল হয়ে থাকে। (সূত্র : টাইমস, অক্টোবর-১৯৯৯)

নেলসন মিডিয়া রিসার্চের শিক্ষা বিভাগ থেকেও অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়। শিশুরা টিভি দেখায় যত বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, লেখাপড়ায় ততবেশি দুর্বল হতে থাকে। এক জরিপে দেখা যায়, সপ্তাহে ১০ ঘণ্টার বেশি সময় টিভি দেখায় অভ্যস্ত ছাত্ররা ২ ঘণ্টা টিভি দেখায় অভ্যস্ত ছাত্রদের তুলনায় ১০% নম্বর কম পায়। পড়ালেখার ক্ষতি ছাড়াও শিশু স্বাস্থ্যের ওপরও টিভি মারাত্মক প্রভাব ফেলে। যেমন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ড. কিরিট ভি গোল্ড তার এক প্রবন্ধে লেখেন, যে শিশুরা টিভি কম দেখে তাদের তুলনায় যারা দৈনিক দু' থেকে চার ঘণ্টা টিভি দেখে তাদের রক্তে কোলেস্টরেলের পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

কোলেস্টরেল বেড়ে যাওয়ার ফলে অধিকাংশ শিশু বড় হওয়ার পর অসময়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। শারীরিক সুস্থতা ব্যতীত আত্মিক ও নৈতিক অবক্ষয়েও টিভির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ম্যাচাসুয়েট্স ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. ডেন্সিল এ. এন্ডারসন তার সতের বছরের অনুসন্ধানী গবেষণার ফল এভাবে বর্ণনা করেন, 'টিভিতে প্রচারিত ভয়ংকর দৃশ্য সম্বলিত প্রোগ্রাম শিশুর বাস্তব জীবনে সন্ত্রাসী মনোভাব জন্ম দেয়। যে সমস্ত শিশু ভয়ানক দৃশ্য লুটতরাজ এবং মারামারির দৃশ্য মিশ্রিত টিভি প্রোগ্রাম বেশি বেশি দেখে, তারা অত্যধিক আক্রমণাত্মক মনোভাবাপন্ন হয়। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর দেখা গেছে, ভয়ংকর চরিত্রের দৃশ্যসমূহ দেখার ফলে শিশুদের ভবিষ্যত জীবনেও মেযাজে উগ্রতা, হঠকারিতা এবং লড়াই ঝগড়ার প্রবণতা প্রসার লাভ করে। (সূত্র : টিভি গাইড- মার্চ, ১৯৯৩)

এমন গবেষণার ফল সে জরিপ থেকেও জানা যায়, যা টিভির যৌন উত্তেজক প্রোগ্রামসমূহের ব্যাপারে পরিচালিত হয়েছে। আমেরিকার অধিকাংশ মানুষ এখন অনুভব করতে শুরু করেছে, এসব প্রোগ্রাম বন্ধ করার জন্য সরকারীভাবে আইন প্রণয়ন করা জরুরী। এসব অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির শাসনামলে ফেডারেল কমিউনিকেশনের চেয়ারম্যান এবং কলাম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের সাবেক ডাইরেক্টর নিউটন মেনু আমেরিকান টিভি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে টিভি স্টেশনকে সবচেয়ে দুষ্কর্মশীল প্রতিষ্ঠান আখ্যায়িত করে বলেন, ১৯৬১ সালে আমি পেরেশান হতাম, আমার সন্তানরা আমেরিকান টিভি চ্যানেলগুলো থেকে বিশেষ কোন উপকার পাচ্ছে না। আজ ১৯৯৬ সালে এসে আমাকে এ অস্থিরতা পেয়ে বসেছে, আমার নাতী-পুতীরা টিভি দেখার ফলে কত বড় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। আমেরিকায় ১৮ বছর বয়সে উপনীত একটি শিশু হত্যা, লুটপাট, মারামারি এবং যৌন উত্তেজনামূলক অশ্লীল চরিত্র সম্বলিত কমপক্ষে ২ হাজার ৫ শ' দৃশ্য দেখে থাকে। (সূত্র : লন্ডন অবজারভার-১৯৯২)

www.pathagar.com

ওয়াশিংটনের জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. ওয়াল্টার প্রিন্স তার এক বক্তৃতায় বলেন, রক মিউজিক হলিউডের ফিল্ম ও অন্যান্য বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম যেগুলো আমেরিকা বিশ্বের অন্যান্য দেশে সরবরাহ করে, সেগুলো শুধু সেখানকার সমাজে ক্ষতিকর প্রভাবই ফেলে না; বরং মার্কিন সমাজের চিত্রকেও ক্ষত-বিক্ষত করে। (সূত্র ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর, মার্চ ১৯৯২)

'আমেরিকান সমাজে জুলুম অত্যাচার বিস্তারে টিভি এবং ফিল্মের ভূমিকা : প্রশাসনের দায়িত্ব' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক টাইমস এবং লস এঞ্জেলেস টাইমস। প্রতিবেদকগণ মার্কিন সিনেটের কংগ্রেস কমিটির এক বৈঠকে আমেরিকান মিডিয়ার ভয়াবহ চিত্র সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এটর্নি জেনারেল ক্ষোভে উত্তেজিত হয়ে ধমকের স্বরে বলেন, টিভি চ্যানেলগুলো বছরের শেষ নাগাদ সতর্ক না হলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাহায্যে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের প্রশাসন কঠোর আইন প্রণয়ন করে অনুষ্ঠান সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণ করবে।

এসব আমেরিকান সাংবাদিকের বর্ণনা মোতাবেক আমেরিকা বর্তমানে এক ক্রান্তি কাল অতিবাহিত করছে। সারা দেশে অবাধে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট এবং যৌন কেলেংকারির ঘটনা ঘটে চলেছে। যুবকদের অশোভন অভদ্র আচরণকে সুসময় বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। টিভির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আমেরিকার বিভিন্ন সমাজের মানুষের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে সিংহভাগ মানুষ টিভিকে ফেতনা-ফাসাদ প্রচারের ইউনিভার্সিটি বলে মত ব্যক্ত করেছেন। অথচ ঘরে টিভি নেই আমেরিকান সমাজে এমন মানুষের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

আমেরিকার এটর্নি জেনারেল জেনিট রেনভ সিনেটের বৈঠকে একথাও বলেছেন, ভয়ংকর চরিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমেরিকা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে আসছে। ফলে রাত-দিন মানুষ এগুলোতেই মেতে থাকে। তিনি একথাও স্বীকার করেন, শুধু কোন এক ফিল্মের কিছু অংশ বাদ দিয়ে দিলেই হবে না কিংবা কোনো একটি চ্যানেলের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করলেই এ সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ এক দুটি নয়, পাঁচশত চ্যানেলের সাথে এ সমস্যা জড়িত। অপরদিকে আমেরিকার আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এবং আদালতসমূহ ঐতিহাসিকভাবে শিল্প সম্পর্কে উদারনীতির সহযোগী ছিল। (সূত্র : নিউজউইক, ১লা নভেম্বর, ১৯৯৩)

বিখ্যাত ম্যাগাজিন রিডারস ডাইজেস্ট ১৯৬১ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল, যার শিরোনাম ছিল 'টিভিতে প্রদর্শিত অপরাধ বনাম ঘরে সংঘটিত অপরাধ'। এই প্রতিবেদনের শুরুতে আর্ক বিশপের বিবৃতিও যোগ করা হয়েছে। তিনি বলেন, টিভির মাধ্যমে প্রোপাগান্ডা চালানো হয়, হত্যা, লুটপাট খুব স্বাভাবিক কাজ। ধীরে ধীরে সকল দর্শকের মন-মগজে এ বিষয়টি দৃঢ়ভাবে আসন গেড়ে বসে। ফলে তার দ্বারা এগুলো সংঘটিত হওয়াও স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

আমেরিকান এক সার্জন টিভির প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন, ভয়ংকর চিত্র দেখার ফলে, চাই সেটা চলমান কার্টুন হোক না কেন, এতে শিশুদের ভেতর উগ্রতা, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা, নির্মমতা বৃদ্ধি পায়।

আধুনিক গবেষণায় ফল বেরিয়ে এসেছে, মিডিয়ায় সন্ত্রাসের দৃশ্য প্রদর্শনীতে সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টির মূলে পানি সিঞ্চন করা হয়। এক ফরাসী সাংবাদিক বলেছে, টিভিতে সন্ত্রাস, জোর-জুলুমের দৃশ্য সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। এতে সন্ত্রাস, জোর জুলুম সংঘটনে সাহস বর্ধিত করা হয়। নতুন এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মিডিয়ার উগ্রতার ফলে সমাজেও উগ্রতা বেড়ে চলেছে। ফ্রান্সের এক প্রতিবেদক মন্তব্য করেন, টিভিতে উগ্র ও ভয়ংকর দৃশ্য প্রদর্শনের ফলে সমাজে উগ্রতা শতগুণে বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. কার্ল বাটস শিশুদের জন্য প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে পর্যালোচনা করে লেখেন, ফিল্ম, টিভি সিরিজ, কাল্পনিক ঘটনাবলী এবং কার্টুন নির্ভর অনুষ্ঠান দেখার ফলে শিশুদের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। যে সকল প্রতিষ্ঠান ভিডিও গেমস এবং কার্টুন প্রোগ্রাম নির্মাণ করে তাদের উচিত, এ সকল প্রোগ্রামের নেতিবাচক প্রভাব এবং সমূহ সমস্যা নিয়ে গভীর অনুসন্ধান করে এগুলো থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তার গবেষণায় ভিডিও গেমস এবং কার্টুন নির্ভর প্রোগ্রাম দেখার ফলে শিশুরা নিম্ন বর্ণিত রোগে আক্রান্ত হয়। যেমন হাত ঘর্মাক্ত হয়ে যায়, মাথা ব্যথা, মৃগী, বমি ভাব ছাড়াও বদ হজমী এবং ধমনীতন্ত্রে খিচুনি সৃষ্টি হয়। কাল্পনিক প্রোগ্রাম দীর্ঘক্ষণ দেখার ফলে মস্তিষ্কে প্রচ চাপ পড়ে, মানসিক কষ্ট বহন করতে হয়। অনুষ্ঠান শেষ হলে তখন সে বাস্তব জগতে ফিরে আসে।

স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধীনে পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত বাস্তব অবস্থা সামনে আসে। জন্মের পরই মানুষ নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতিতে চলতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। নির্দিষ্ট পথ ধরেই সে বাড়তে থাকে। জীবনের প্রতি মুহূর্তে তার নিরেট বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়, কিন্তু যখন কল্পনা ও বাস্তবতার মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন শিশুরা প্রচ মানসিক আঘাত পায়। ফলে শিশুর মাঝে অস্থিরতা বিরাজ করে। সে বাস্তবতা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। একটি বটন টিপেই কল্পনার রঙিন পৃথিবীতে পৌঁছে যায় যে শিশুটি, সে কামনা করে এবং প্রাণান্তকর চেষ্টাও করে রাঙন পৃথিবীটাকে বাস্তবে পাওয়ার জন্য। যখন বাস্তবে তা সম্ভব হয় না তখন সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কাল্পনিক দৃশ্য দেখার ফলে চোখেও কষ্ট অনুভব হয়। ফলে সে মাথা ঘূর্ণন এবং মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়।

ক্যানসাস ইউনিভার্সিটির স্বর বিশেষজ্ঞ মাইকেল তার এক গবেষণায় প্রকাশ করেন, চৌদ্দ মাসের কম বয়সী শিশু যদি টিভি স্ক্রিন দেখে তাহলে তার ভেতরেও এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। বড় হয়ে এ সব শিশু দাম্ভিকতা, উগ্রতা, হত্যা ও ধর্ষণে লিপ্ত হয়।

www.pathagar.com

একজন আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ লিউনার্ড আইরি একটি শিশুর বেড়ে ওঠা নিয়ে বিস্তর বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তার গবেষণাকর্ম ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত প্রলম্বিত করেছেন। ১৯৬০ সালে যেসব শিশু জন্ম গ্রহণ করেছে, ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তাদের জীবন কেমন কেটেছে, তিনি তার গবেষণা জরিপে এ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ড. লিউনার্ড মিশিগান ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী সাড়ে ছয়শ শিশুর ওপর জরিপ চালিয়েছেন। শিশুরা অকপটে স্বীকার করেছে, হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি এবং সকল প্রকার অপকর্মের পেছনে আমাদের ওপর টিভি সিনেমার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এসব শিশু পড়ালেখায় উন্নতি করতে পারেনি। ১৬-১৭ বছর বয়স হওয়ার সাথে সাথে এরা হত্যা, লুটতরাজে জড়িয়ে পড়ে সকল প্রকার অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে থাকে। তারা নিজ নিজ স্ত্রীদের মারপিট করেছে, যেনা ব্যভিচার প্রভৃতি সকল অপকর্মের পথ অবলম্বন করেছে। মদ নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে।

বৃটেনের মহিলা মনস্তত্ত্ববিদ সোজান ব্যাল বৃটেনের ঘাতকগোষ্ঠীর যে সাক্ষাতকার নিয়েছেন এবং তাদের জীবনের ওপর পর্যালোচনা চালিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এসব ঘাতকের ৪৫ শতাংশ ভয়ংকর চরিত্রনির্ভর ফিল্ম দেখত।

১৯৯৪ সালের ৩ অক্টোবর সিনেমা দেখার সময় উত্তেজিত হয়ে আমেরিকান এক যুবক মা-বাবা, বোন এবং স্ত্রীকে হত্যা করে ফেলে। ফরাসী একটি ফিল্ম দেখে এক যুবক নিজ পরিবারের পাঁচ জন সদস্যকে একের পর এক গুলি করে। এই ফিল্মে বার বার এই ডায়ালগ উচ্চারিত হচ্ছিল, যদি তোমার হাতে রিভলবার থাকে তাহলে সবকিছু তোমার অধীন।

লন্ডনের মনস্তত্ত্ববিদগণ তাদের এক গবেষণায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পনেরশ বালক-বালিকার ওপর জরিপ চালিয়ে জানা গেছে, এরা সাধারণতঃ সিনেমার অশ্লীল এবং খারাপ চরিত্রের দৃশ্যগুলো ভুলে যায়, কিন্তু সন্ত্রাসের ভয়ংকর দৃশ্যগুলো কখনো ভুলতে পারে না। এসব দৃশ্যের কথা মনে হলে ঘুম উড়ে যায়। শত চেষ্টা করেও তারা মাথা থেকে এগুলো সরাতে পারে না, কিন্তু বাস্তবতা হল, শিশুরা অধিক পরিমাণে এবং দীর্ঘ সময় ভয়ংকর দৃশ্য সম্বলিত ফিল্ম দেখা পছন্দ করে।

বৃটিশ মেডিকেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত ম্যাগাজিন মিডিয়ার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে, মিডিয়া ভিডিও গেমস এবং কার্টুননির্ভর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে বর্তমান প্রজন্মকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। টিভি ইঞ্জিনিয়ার, প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর এবং দর্শক সকলের অভিযোগ হলো, মানসিকভাবে তারা অস্থিরতায় ভোগে। বৃটেনের সাম্প্রতিক চিত্র হলো, শিশুদের জন্য নির্মিত প্রোগ্রামে ৪০% কার্টুন দেখানো হয়, যা ভয়ংকর দৃশ্য সম্বলিত হয়ে থাকে। শিক্ষা বিষয়ক প্রোগ্রাম কমে এখন মাত্র ৭% অবশিষ্ট আছে। পৃথিবী জুড়ে ডিশ এন্টিনার সুবাদে শিশুদের জন্য প্রচারিত প্রোগ্রামসমূহে কার্টুনের পরিমাণ ৭০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.pathagar.com

উপরোল্লিখিত জরিপ তথ্য ছাড়াও আমেরিকানিবাসী বিল ম্যাকেন টিভি প্রোগ্রামসমূহ সম্পর্কে চমকপ্রদ আরেকটি আলাদা ধরনের জরিপ চালিয়েছেন। তিনি নাম দিয়েছেন সময় হত্যা। তিনি ভার্জিনিয়ার এমন একটি শহরকে তার গবেষণা জরিপ চালানোর জন্য নির্বাচন করেন যেখানে একশ চ্যানেল সব রকমের প্রোগ্রাম প্রচার করে থাকে। বিল ম্যাকেন সিদ্ধান্ত নেন, সবগুলো চ্যানেলের প্রোগ্রাম ২৪ ঘন্টা করে দেখবেন। অতএব ২৪ ঘন্টা করে প্রত্যেক চ্যানেলের অনুষ্ঠান ভিডিও ক্যাসেটে টেপ করে একের পর এক দেখা শুরু করেন।

মোট ২ হাজার ঘন্টার এই ভিডিও চিত্র দেখার পর তিনি এই পরিণতিতে উপনীত হয়েছেন যে, টিভি শুধুই বিনোদনের মাধ্যম, অপরাধের মাধ্যম। এর দ্বারা জ্ঞানে, জানাশোনায় সামান্যও প্রবৃদ্ধি ঘটে না। বিল ম্যাকেন মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ ড. ব্লুমারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মার্কিন চলচ্চিত্র গোটা পৃথিবীতে যৌন প্রবৃত্তি উসকিয়ে দিতে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। কারণ আমেরিকার ৯৯% চলচ্চিত্রে যৌনতাকে প্রধান বিষয় বানানো হয়। যুবক-যুবতীরা এসব চলচ্চিত্র দেখে যৌনতার শিক্ষা গ্রহণ করে। মাদক ব্যবহার, চুরি, ডাকাতি, বাটপারি, হত্যা, লুটপাট ও অনৈতিকতা ইত্যাদি এসব ফিল্ম দেখে শিক্ষা পায়।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির মনস্তত্ত্ববিদ ড. স্টিফেন বলেন, জেলখানাকে অপরাধের আখড়া বলা হয়, কিন্তু বর্তমানে টিভি হলো অপরাধ শেখানোর প্রাথমিক স্কুল, যেখানে অতি যত্ন সহকারে এবং সুশৃংখলভাবে অপরাধীদের গড়ে তোলা হয়।

অস্ট্রেলিয়ান বিশেষজ্ঞদের মতে টিভির স্কিন থেকে বের হওয়া রশ্মি মস্তিষ্কের কর্মপরিকল্পনার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। শিশুদের মস্তিষ্ক টিভির রশ্মি সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না। রশ্মির তেজস্ক্রিয়ায় মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতের ন্যায় অবশ হয়ে যায়। এরপর তার দৃষ্টি পর্দার সাথেই আটকে থাকে। এভাবে একটি শিশু টিভি দেখার সময় যেন বন্দী হয়ে যায়। যে কোনো ধরনের অনুষ্ঠানই হোক সে তা দেখতে থাকে।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

মিডিয়া বা গণমাধ্যম : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মিডিয়া বা গণমাধ্যম

এক সময় প্রশ্ন ছিল মিডিয়া বা গণমাধ্যম মানব জীবনে কোনো প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে কিনা? কিন্তু এখন আর সে প্রশ্ন নেই। সে প্রশ্ন এখন দৃষ্টিভঙ্গির স্তর অতিক্রম করে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। এখন বাস্তবতা, অভিজ্ঞতা ও ফলাফলের আলোকে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, জনগণের ওপর মিডিয়ার প্রভাব প্রতিক্রিয়া কি পরিমাণ পড়ছে এবং এ প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ধরন ও গভীরতাই বা কতটুকু? এ ধরনের প্রশ্ন ওঠাই এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং পরোক্ষ স্বীকারোক্তি যে, মিডিয়া আজ মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলছে। এই যুগকে আমরা মিডিয়ার যুগ বলতে পারি। এই যুগে সমরাস্ত্র ও সেনাবাহিনীর মাধ্যমে মানুষ হত্যার পরিবর্তে মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। একে আমরা সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং মনস্তাত্ত্বিক লড়াই বলতে পারি, বলতে পারি স্নায়ু যুদ্ধ। এ যুদ্ধের মূল পরিকল্পনা তৈরি করে সংবাদপত্র, রেডিও ও টিভি বিশেষজ্ঞরা। আর সামরিক যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরি করে সমর বিশেষজ্ঞরা। বর্তমান বিশ্বে সে ব্যক্তিই বিজয়ী ও প্রবল, যার প্রোপাগান্ডার পাল্লা ভারী। প্রোপাগান্ডা এমন এক শক্তিশালী ও কার্যকর হাতিয়ার, যার মোকাবেলায় উন্নত থেকে উন্নততর নৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও সৌন্দর্যবোধ, উত্তম থেকে উত্তমতর চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার সামান্য কোনো মূল্য ও গুরুত্ব নেই। আজকাল শিক্ষিত শ্রেণীও প্রোপাগান্ডা, প্রচারণা ও বিজ্ঞাপন দ্বারা কোনো জিনিসের গুরুত্ব ও মূল্যের পরিমাপ করে। এটা প্রোপাগান্ডার সাফল্যও বলা যেতে পারে। প্রোপাগান্ডায় যে যত বেশি বিশেষজ্ঞ সে তত বেশি জনদরদী ও জনকল্যাণকামীর মর্যাদা অর্জন করে। এ বাস্তবতা সর্বজনবিদিত যে, এ প্রচার-প্রোপাগান্ডার অন্তরালে বড় বড় সরকারগুলোর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ লুকায়িত রয়েছে, যারা মিডিয়া বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য মিডিয়াকে 'অগ্রগামী সেনাবাহিনী'র মর্যাদা প্রদান করে ময়দানে ছেড়ে দিয়েছে। এর অনিবার্য ফল হিসেবে শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনই নয়, বরং খোদ মানব জীবনও মিডিয়ার অনুগামী হয়ে পড়েছে।

মিডিয়ার সীমাহীন, সুদূরপ্রসারী, সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে সমাজ ও গণসংযোগ বিশেষজ্ঞরা এ পরিমাণ আস্থাবান যে, মিডিয়া যখন ইচ্ছা তার নির্ধারিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে কোনো দেশ ও জাতি-গোষ্ঠীর চারিত্রিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ ওলট-পালট করে দেয়। তারা যখন এরকম উদ্যোগ

www.pathagar.com

গ্রহণ করে, তখন সঙ্গত কারণেই তাদের আস্থা ভরসা থাকে যে, তাদের লক্ষ্যীভূত দেশ ও জাতির লোকেরা তাদের ছড়ানো জালে ফেসে যাবে। কারণ সেসব দেশ ও জাতি-গোষ্ঠীর নিকট না মিডিয়ার সর্বগ্রাসী প্রভাব-প্রতিপত্তির মোকাবেলা করার শক্তি আছে, আর না এমন কোনো প্রযুক্তিগত শক্তি আছে, যার মাধ্যমে তারা এই প্রোপাগান্ডার জাল ছিন্ন করতে পারে। মিডিয়ার চাপ ও পথ-নির্দেশনায় যে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা স্বাভাবিকভাবেই মিডিয়া-প্রোপাগান্ডার অভ্যন্তরীণ চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও পরিকল্পনারই প্রতিচ্ছবি। প্রোপাগান্ডার মধ্যে যে চারিত্রিক মূল্যবোধ উপস্থাপন করা হয়, সে আলোকেই সমাজ গঠিত হয়।

এমনিভাবে তার উপস্থাপিত সামাজিক জীবন ও চারিত্রিক মূল্যবোধের বিপরীত অন্যান্য সকল সামাজিক জীবন ও চারিত্রিক মূল্যবোধের সাথে সে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে সেসবের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দেয়। যে কোনো বাস্তবতা ও মতাদর্শের পরিবর্তন ঘটিয়ে তা বিকৃত করে দেবার মতো শক্তি মিডিয়ার রয়েছে। যখন বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয় তখন তা এমন প্রত্যাখ্যান অযোগ্য বাস্তবতা বলে গ্রহণ করে নেয়া হয়, যে সম্পর্কে কোনো আলোচনা পর্যালোচনা বা দ্বিমত পোষণ সম্ভব নয়; বরং সেটি ওহীর মর্যাদা লাভ করে। মিডিয়ার এই রাজত্ব সম্পূর্ণ ওয়ান ওয়ে ট্র্যাফিক নীতির ওপর পরিচালিত হয়। যাতে কারো কোনো কথা বলা কিংবা প্রভাব সৃষ্টি করার অধিকার থাকে না। মিডিয়া যদি কারো সম্পর্কে বলে, সে সুস্থ, তাহলে তার মধ্যে হাজারো রোগ-বালাই এবং এইডস থাকা সত্ত্বেও সে সুস্থ সবল পাহলোয়ান।

মিডিয়ার এই মনস্তত্ত্বকে প্রাচীন যুগের একটি ঘটনায় বড় সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি হলো, এক পাদরী কোথাও থেকে একটি ছাগল কিনে আনছে। রাস্তায় এক প্রতারকচক্র ফন্দি আঁটল, এই সহজ-সরল পাদরীর কাছ থেকে যে করেই হোক ছাগলটি ছিনিয়ে নিতে হবে। সেমতে প্রতারকচক্রের এক সদস্য অসহায় মিসকীন সেজে পাদরীকে বলল, এই কুকুরটি আপনি কত দিয়ে কিনেছেন? এটি কি আপনি ঘর-বাড়ী পাহারা দেবার জন্য কিনেছেন?

বেচারা পাদরী মিসকীনরূপী প্রতারকের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বলল, আরে! এটি কুকুর নয়, এটি তো ছাগল। কিছুক্ষণ চলার পর প্রতারকচক্রের আরেক সদস্য অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে আবির্ভূত হয়ে আস্থাভরা কণ্ঠে পাদরীকে বলল, আপনার কুকুরটি তো অত্যন্ত সুন্দর এবং ভাল জাতের। এটি বাগান-বাড়ী পাহারা দেয়ার জন্য খুবই উপযোগী হবে। পর্যায়ক্রমে প্রতারকচক্রের তৃতীয় চতুর্থ সদস্যও ধরন পাল্টিয়ে একই কথা বলল। পর পর এত জনের মুখে একই কথা শুনে পাদরীর বিশ্বাস হয়ে গেল, এটি ছাগল নয়; বরং একটি কুকুর। যে এটি বিক্রি করেছে সে মনে হয় ছাগল বলে কুকুরই বিক্রি করেছে। শেষ পর্যন্ত পাদরী ধারাবাহিক প্রোপাগান্ডার জালে আটকা পড়ে ছাগলকে কুকুর মনে করে সেটি ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

এই ঘটনার আলোকে আধুনিক যুগের এক প্রতারক ও সুচতুর গোয়েবলস বলেছে, মিথ্যা এতবার বল, যাতে এক পর্যায়ে সেটা সত্য পরিণত হয়ে যায়। আধুনিক যুগের

www.pathagar.com

মিডিয়া আর প্রাচীন যুগের ধোকাবাজ প্রতারকদের মধ্যে যদি কোনো পার্থক্য থাকে তা হল, সে যুগে একজন পাদরী ধারাবাহিক প্রোপাগান্ডার জালে আটকা পড়ে একটি মাত্র ছাগল হারিয়েছিল আর বর্তমান যুগের বিভিন্ন দেশ ও জাতি-গোষ্ঠী তাদের আকীদা-বিশ্বাস, তাহযীব-তামাদ্দুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার এবং নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধ ইত্যাদি সবকিছু থেকে হাত ধুয়ে বসছে। তারা অত্যন্ত তুষ্টির সাথে নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং জাতীয় উত্তরাধিকার হারিয়ে চলেছে।

মানব জীবনে মিডিয়ার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বহুমুখী। স্বল্প পরিসরে সবগুলোর বিশদ আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে শুধু গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোরই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হবে।

বর্তমান যুগে মানুষের জন্য মিডিয়া একটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউশনের রূপ ধারণ করেছে, যা ছাড়া মানব জীবনের পরিভ্রমণ সম্ভব নয়। সামাজিক জীবনের মূল দুই স্ত স্ভ–নারী পুরুষ মিডিয়া থেকেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং মিডিয়ার সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্তকেই জীবনের খোরাক হিসেবে গ্রহণ করে। অন্য ভাষায়, মিডিয়ার দুর্দান্ত আধিপত্যের কারণে মানব জীবন থেকে বই-পুস্তকের গুরুত্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে, যা বিগত শতাব্দীর সূচনালগ্নে বই-পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমানে মানুষ জ্ঞান-গবেষণার নির্ভরযোগ্য উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং সরাসরি সেসব উৎস থেকে উপকৃত হবার পরিবর্তে মিডিয়ার উপস্থাপিত ভাসা ভাসা জ্ঞান-গবেষণার ওপরই নির্ভর করতে শুরু করেছে।

এ কারণেই মিডিয়া থেকে উপকার গ্রহণকারীদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, রুচি-অভ্যাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি, কর্মধারা-কর্মপদ্ধতি এবং আচার-আচরণে অভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদের এমন এক ছাঁচে ঢালা মনে হচ্ছে, যা মিডিয়া তৈরি করেছে। এসব লোক সত্তাগতভাবে না নিরেট ভাল, আর না নির্ভেজাল মন্দই। অতএব সকল মানুষ একরকম হতে পারে না। কারণ সৃষ্টিকর্তা মানুষকে বিভিন্ন রকমের যোগ্যতা, প্রতিভা, জ্ঞান, বিবেক এবং বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। মানব সোসাইটি একটি ফুল কানন, যেখানে রঙ বেরঙয়ের ফুল ফোটে। এসব ফুল দ্বারাই বাগান সজীব সতেজ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। যদি মানব সমাজ ফুল কাননের মতো না হয়ে গ্রন্থের মতো হয়ে যায়, তাহলে মানবিক বিবেক, যোগ্যতা, প্রতিভা, জ্ঞান-গবেষণা ও সভ্যতা, সংস্কৃতির আর কী উপকারিতা থাকে!

আজকের মিডিয়া মানুষের সামনে জীবন সম্পর্কে যে বাস্তবতা উপস্থাপন করে তার ওপর মানুষ অসাধারণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখে। তারা মিডিয়ার পেশকৃত ভাসা ভাসা জানা-শোনা এবং সাময়িক জিনিসকেই বেশি পছন্দ করে। আজকের যুগকে 'স্পেশালাইস্ট বা বিশেষায়নের' যুগ বলা হয়। এ যুগে মানুষ জ্ঞান-গবেষণার আসল উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিশেষায়নের এ যুগে বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান, জানা-শোনা এবং সাময়িক কোনো বিষয় কি আমাদের জন্য উপকারী এবং ফলপ্রসূ হতে পারে? অথচ আজ প্রতিটি জ্ঞানের শত শত শাখা-প্রশাখা এবং প্রতিটি

www.pathagar.com

বিষয়ে এক একটি গ্রন্থাগার সৃষ্টি হয়েছে। এর থেকে অস্থির হয়ে বড় বড় দেশগুলো তথ্য-ব্যাংক সৃষ্টি করেছে। এই তথ্য-ব্যাংক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এখনো কি লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্রসমূহে যাওয়ার প্রয়োজন অবশিষ্ট নেই? তাহলে আমরা প্রাচীন জ্ঞান-ভা ার থেকে কিভাবে উপকৃত হব।

এ যুগে মিডিয়া ও জাতীয় উন্নয়ন একে অপরের অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে এশিয়ান সংবাদপত্রের সম্পাদকদের গোলটেবিল সম্মেলনে মঞ্জুরকৃত সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবাবলী দ্বারা বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়। উক্ত সম্মেলনের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সফলতা সম্পূর্ণ জাতীয় চেতনার ওপর নির্ভর করছে। এই জাতীয় চেতনা সৃষ্টি তখনই সম্ভব যখন মিডিয়া এ ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। এ প্রস্তাব যেন একথারই স্বীকৃতি যে, মিডিয়া ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা সফলকাম হতে পারে না।

এ জন্য দুনিয়ার যেখানেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী তৈরি করা হয়, সেখানে এর জন্য বস্তুগত ও অভ্যন্তরীণ প্রয়াসের প্রয়োজন। বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা হলো, উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরিতে সরকার ও বিশেষজ্ঞদের প্রয়াস, যাতে শিল্প, কৃষি ও অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা তৈরি করে জাতীয় আশা-আকাঙ্খার পূর্ণতা দান করা যায়, কিন্তু এ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা শৈল্পিক বিশেষজ্ঞদের যত মেহনত ও প্রাণান্তকর প্রয়াসের মাধ্যমেই তৈরি করা হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মিডিয়ার মাধ্যমে জাতীয় চেতনা জাগ্রত না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে সেই পরিকল্পনা পূর্ণতা লাভ করা অসম্ভব।

মিডিয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ও মানবজীবনে তার প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয়টি সেসব বিজ্ঞাপন দ্বারা সহজেই অনুমিত হয়, যা সুনিপুণ শৈল্পিক কলা-কৌশলের মাধ্যমে জনসাধারণের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা দৃষ্টিতে রেখে প্রস্তুত করা হয়। যেহেতু মিডিয়ার বিজ্ঞাপন দ্বারা একদিকে মিডিয়ার অস্তিত্ব অপরদিকে কলা-কুশলীদের বিরাট আর্থিক লাভের মাধ্যম, তাই এ দিকটির প্রতি প্রোপাগান্ডা বিশেষজ্ঞরা অসাধারণ মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। মিডিয়ার বিজ্ঞাপন জীবন-মান সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। গোটা সমাজ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় শিল্প-পণ্য কেনাকাটার জ্বরে এমনভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের সেসব পণ্যের ধরন, মান ও ভাল মন্দের পার্থক্য করারও হুশ অবশিষ্ট নেই। অন্য ভাষায়, মিডিয়ার বিজ্ঞাপন সমাজের যাদুকরী প্রভাব ফেলেছে, অথবা কোনো একটা আকর্ষণের শিকার হয়েছে, যাতে মিডিয়ার বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হয়ে শিল্প-পণ্য কেনাকাটায় তাদের ইচ্ছারও কোনো দখল থাকে না। সমাজের প্রতিটি সদস্যের যোগ্যতা, প্রতিভা ও বিবেক-বিবেচনার শক্তি অবশ অসার হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ এই অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণেই মিডিয়াকে এই যুগের নেশা ও আফিম বলা হয়ে থাকে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আধুনিক যুগের তাহযীব-তামাদ্দুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি মানুষকে সমাজ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আমাদের সমাজের প্রতিটি সদস্য

www.pathagar.com

চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, সমস্যা-সংকট এবং উচ্ছ্বাস-আবেগের কারণে একে অপরের সাথে অপরিচিত হয়ে গেছে। কাজেই আশেপাশে যারা রয়েছে, তারা সবাই পরস্পরে অপরিচিত একটি সমাজ পরিবেশেই শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছে। এ অবস্থায় মিডিয়ার বিজ্ঞাপন ও প্রচারের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া উন্নতির শীর্ষে উপনীত হয়। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি সহজেই মিডিয়ার যাদুর শিকার হয়ে যায়। কেননা, সে মিডিয়ার নেশাকর ইনজেকশন গ্রহণ করেছে।

মগজ ধোলাই

মগজ ধোলাই বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা যেসব গ্রন্থ লেখেছেন, তার মধ্যে গেস্টাওলিবান রচিত 'সাইকোলজি অফ গেদারিং' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত গ্রন্থে তিনি মানব সমাবেশের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন, মানুষ যতই সভ্য, সচেতন ও শিক্ষিত হোক না কেন, যখন সে কোনো গ্রুপ কিংবা সমাবেশের সাথে থাকবে তখন সে ওই গ্রুপ বা সমাবেশের মনস্তত্ত্ব এবং অবস্থার অনুগামী হয়েই থাকবে। ভাল বিবেকবান সচেতন মানুষও আবেগ তাড়িত হয়ে দলের পেছনে দৌড়াতে থাকে। অন্যকে যা সে করতে দেখে পশুর মতো বিনা চিন্তায় তাই করতে থাকে। যেন তার ওপর যাদু মন্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে।

ফ্রয়েডের মতো মনস্তত্ত্ববিদও একই মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, মানুষ দলের সাথে থাকতেই ভালবাসে। সুতরাং এমন পথ-নির্দেশকের প্রয়োজন, যে গোটা দল বা সমাবেশকেই যাদুগ্রস্ত করে দেবে।

মিডিয়ার চিত্র

ক. পাঠের উপকরণ। খ. শ্রবণের উপকরণ। গ. দর্শনের উপকরণ। ঘ. দর্শন ও শ্রবণের উপকরণ। ঙ. বলার উপকরণ।

পাঠের উপকরণ : পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বই-পুস্তক ও হ্যান্ডবুকস ইত্যাদি।

শ্রবণের উপকরণ : রেডিও, আলোচনা, কবিতা, লেকচার, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও বিতর্ক ইত্যাদি।

দর্শনের উপকরণ : টেলিভিশন, নাটক সিনেমা ইত্যাদি।

দর্শন ও শ্রবণের উপকরণ : যেমন–বিজ্ঞাপন, স্টিকার, মূর্তি, ভাস্কর্য, ফ্রেম, শিলালিপি, আর্ট, ছবি ইত্যাদি।

বলার উপকরণ : ইন্টারভিউ, সাক্ষাতকার, আলোচনা, কথাবার্তা ও গুজব ইত্যাদি।

গেস্টাওলিবান ও ফ্রয়েডের পর শত শত মনস্তত্ত্ববিদ এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। মগজ ধোলাই বিষয়ে এ পরিমাণ গবেষণা হয়েছে যে, এ বিষয়ে মনস্তত্ত্ববিদগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। প্রথম দলের কেন্দ্র হলো ইংল্যান্ড। তারা মানবিক সম্পর্কের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন। আর দ্বিতীয় দলের কেন্দ্র হলো ফ্রাঙ্কফুর্ট। তারা সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক মনস্তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। তারা

www.pathagar.com

মগজ ধোলাইয়ের উপকরণ এবং মাধ্যম নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা করেছেন। একে তারা উত্তম থেকে উত্তমতর বানানোর প্রয়াস চালিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ প্রিন্সটন প্ল্যানের আওতায় এই গ্রুপ রেডিও'র প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ওপর জরিপ চালিয়ে যে ফল বের করেছেন, তা আজ টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রস্তুতকারীদের কাজে আসছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটেন ও জার্মানী মনস্তত্ত্ববিদদের সেবা নিয়ে রেডিও'র মাধ্যমে একে অপরের বিরুদ্ধে তুমুল মনস্তাত্ত্বিক লড়াই চালিয়েছিল। এই গ্রুপ প্রথম গ্রুপের সংগৃহীত ফল থেকে উপকৃত হয়ে বাস্তব প্রোগ্রাম রূপায়ণ করেছে।

মগজ ধোলাইয়ে সাধারণভাবে ব্যক্তির মনস্তত্ত্বকে ধারাবাহিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও অস্থিরতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখার সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হয়। এমনকি এক পর্যায়ে সে তার অস্থিরতা প্রকাশের রাস্তা অনুসন্ধান করে কিংবা অস্থিরতাপূর্ণ পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, কিন্তু যখন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও অস্থিরতার পরিবেশ দীর্ঘায়িত হয় এবং প্রতিটি মুহূর্তে তার ওপর নতুন নতুন অস্থিরতা চাপতে থাকে, তখন সে এ পরিবেশের সাথে ইতিবাচকভাবে খাপ খাইয়ে নেবার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন সে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, যা তার ব্যক্তিত্ব ও কর্মকা ধ্বংস করে ছাড়ে। তখন সে পশুর চেয়েও নিচে নেমে যায়। যেখানে তার নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধ বড় নির্দয় নির্মমভাবে পদদলিত হয়। সুতরাং মগজ ধোলাইয়ের প্রোগ্রামকে অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে আঞ্জাম দিতে হবে। মানব মনস্তত্ত্বকে অস্থিরতা পেরেশানীর মধ্যে লিপ্ত করতে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, যা হবে পরিকল্পিত। এর জন্য উত্তম পদ্ধতি হলো এমন স্থায়ী পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়া, যাতে বার বার সে দৃশ্যই তার সামনে এসে হাযির হয় এবং এক দীর্ঘ সময় ধরে পদ্ধতি ও ধরণ পাল্টিয়ে পরিকল্পিতভাবে তার মন-মস্তিষ্ক, মেধা-মগজ ও চেতনার ওপর সে বিষাক্ত পরিবেশ চাপিয়ে দেয়া হয়।

রেডিও আবিষ্কারের পর ব্রেন ওয়াশিং বিশেষজ্ঞরা একে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ও দেশের মগজ ধোলাই করার একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। সেমতে প্রিন্সটন প্ল্যানের আওতায় রেডিও'র একক ও ব্যাষ্টিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়। সে পর্যালোচনার আলোকে এ বাস্তবতাই ফুটে উঠেছে যে, শ্রোতা কোনো সংবাদ, প্রস্তাব কিংবা শৈল্পিক বিষয় গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিষয় ও তার তথ্যাবলী থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যে বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয় সেটি হলো, সে সংবাদের পুনরাবৃত্তি ও তা উপস্থাপন করার ধরন-পদ্ধতি কেমন। কোনো সাধারণ সংবাদ যদি শক্তিশালী ভঙ্গিতে পাঠ বা উপস্থাপন করা হয়, তাহলে শ্রোতা এর দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়, কিন্তু যদি হাজারো মানুষের গণহত্যার সংবাদকে অত্যন্ত ঠান্ডা ও দূর্বল ভঙ্গিতে পাঠ বা উপস্থাপন করা হয় তাহলে শ্রোতা এর দ্বারা মোটেও প্রভাবিত হয় না। টেলিভিশন আবিষ্কারের পর ব্রেন ওয়াশিং বিশেষজ্ঞদের সে হাতিয়ার অর্জিত হয়েছে, যা তারা স্বপ্নেও দেখেনি। সুতরাং টিভির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এক মগজ ধোলাই বিশেষজ্ঞ থিউডোর এডওয়ার্ড বলেন, টেলিভিশন আবিষ্কারের ফলে মানুষের মন মস্তিষ্ক ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের ওপর

www.pathagar.com

পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরোপের একটি শক্তিশালী মাধ্যম আমাদের হাতে এসে গেছে, যা আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি।

টেলিভিশনের মৌলিক ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, তা আওয়াজ ও ছবি উভয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যা দ্বারা সর্বোত্তমভাবে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়। আবার তা দ্বারাই সে পরিবেশ সর্বোত্তমভাবে প্রশমিত করা যায়।

টেলিভিশন আপনার সামনে এমন এমন জিনিস উপস্থাপন করে, আপনি চান আর না চান, কিন্তু আপনি সেটা পছন্দ করতে বাধ্য হবেন। টেলিভিশন এমন পদ্ধতিতে তা উপস্থাপন করবে, যেন তা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই। সে আপনার চিন্তাশক্তি স্থবির করে দেবে। এমন পরিস্থিতিতে আপনি নিজের মধ্যে বিবেকের পরিবর্তে যৌন উত্তেজনা ও প্রবৃত্তির অগ্নি প্রজ্বলিত দেখতে পাবেন। নিজের মাঝে শিশুসুলভ চেতনা ও অনুভূতি প্রোথিত দেখবেন। আপনি মনে করবেন, প্রতিটি মানুষ একই চিন্তা করছে, একই কথা বলছে, একই কাজ করছে। ধীরে ধীরে আপনার সামনে পছন্দনীয় ও চিত্তাকর্ষক বস্তু উপস্থাপন করা হবে। সংবাদ এমনভাবে উপস্থাপন করা হবে, যেন এটাই জনমত। উদাহরণস্বরূপ কোনো খবর বিভিন্ন টিভি স্টেশনের বরাত দিয়ে একই ধরনে একই পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়।

খবর পরিবেশনের সময় সর্বপ্রথম দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খবর পরিবেশন করা হয়। এরপর বিশেষ প্রতিবেদন, সর্বশেষ খেলাধুলা, আর্ট ও সাহিত্য বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করা হয়, কিন্তু এই খবরের আড়ালে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শৈল্পিকপদ্ধতিতে প্রোপাগান্ডা চালানো হতে থাকে। খবরের প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্য এমনভাবে নির্বাচন করা হয়, যাতে তা শ্রোতা ও দর্শকদের মন মস্তিষ্কে সুদূরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ফেলে যায়। এসব শব্দ এবং বাক্যের জন্যও সীমিত কিছু সময় নির্ধারিত থাকে।

ব্রেন ওয়াশিং বিশেষজ্ঞরা যখন সংবাদ বিন্যাস করে তখন তারা তাদের মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রাখে, কোনো অবস্থায়ই যা তারা এড়িয়ে যেতে পারে না। সংবাদের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য ও প্রতিটি ছবি এমনভাবে চয়ন করা হয় যে, তা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের তাৎপর্য বহন করে। সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক সংবাদগুলো ব্রেন ওয়াশিং বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মর্জির আলোকেই পরিবেশন করা হয়। পৃথিবীর সেসব চিত্র, যা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ, যা দেখলে মানসিক অস্থিরতা আরো বেড়ে যায়, সেগুলো বার বার দেখানো হয়। টিভিতে প্রতিটি ছবির স্থায়িত্ব ত্রিশ সেকেন্ড থেকে বেশি হয় না। উদাহরণস্বরূপ কোনো শিশু বহুতল ভবনের ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া কিংবা গুলির আঘাতে ছটফট করা, পুলিশ কোনো অপরাধীকে ধাওয়া করা, সন্ত্রাসীর গুলিতে রক্তাক্ত ব্যক্তির স্বজনদের আহাজারি, বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকা , সড়ক দূর্ঘটনা এবং যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের করুণ অবস্থার দৃশ্যগুলো টিভির পর্দায় বার বার দেখানো হয়। শুধু দৃশ্যগুলোই বার বার দেখানো হয়, কিন্তু ঘটনার বিস্ত ারিত কিছুই বলা হয় না। এসব দৃশ্য দেখে দর্শক-শ্রোতারা শুধু এ প্রতিক্রিয়াই গ্রহণ করে যে, কোথাও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে কিংবা ভয়াবহ আগুন লেগেছে। এরপর

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক সংবাদ পরিবেশন করা হয়। যেমন ডলার ও স্বর্ণের বর্তমান বাজার মূল্য ইত্যাদি। উল্লিখিত সংবাদ ও দৃশ্যগুলো দেখে স্বাভাবিকভাবেই দর্শক-শ্রোতার মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। এরপর এমন সংবাদ পরিবেশন করা হয়, যাতে মানসিক অস্থিরতা হ্রাস পায়। যেমন অতি নিম্নস্তরের যৌন কাহিনী, ধর্ষণ ও ইজ্জত হরণ, ফ্যাশন শো'র নগ্ন দৃশ্য এবং চলচ্চিত্র জগতের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রেম-ভালবাসার রোমান্টিক কাহিনীগুলোকে রং চড়িয়ে পরিবেশন করা ইত্যাদি। এরপর টেলিভিশন তার নির্ধারিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে সেসব রাজনীতিবিদের বক্তব্য বিবৃতি প্রচার করে, যা তার নির্ধারিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করে। টেলিভিশন এসব সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগের সাথে পরিবেশন করে। ফলে লাখ লাখ কোটি কোটি দর্শক-শ্রোতা একে সত্য বলে গ্রহণ করে নেয়। অথচ দর্শক সেসব সচিত্র সংবাদ দেখেছে, যা পশ্চিমা মিডিয়া নিজের তরফ থেকে মনগড়াভাবে উপস্থাপন করেছে।

ব্রেন ওয়াশিং-এর আরেক বিশেষজ্ঞ ফ্রেডারিক আইমোর টেলিভিশনের ছবির গভীর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন, টেলিভিশনের ছবিগুলো এত প্রভাব সৃষ্টিকারী ও যাদুকরী হয়, যা দর্শক-শ্রোতাদের সকল মনোযোগ তার দিকে টেনে নেয়। টেলিভিশন বিশেষভাবে চোখ ও মস্তিষ্ককে অসাধারণ প্রভাবিত করে। তা এভাবে, আওয়াজ, ছবি ও অতীত ঘটনাবলীর মাঝে চোখ অতি দ্রুত সংযোগ প্রতিষ্ঠা ও সমন্বয়ের কাজ আঞ্জাম দেয়। এমতাবস্থায় মস্তিষ্ক, যার আসল কাজ ঘটনাবলীর জরিপ, বিশ্লেষণ এবং সংবাদ ও ছবিগুলো ধারাবাহিক দেখা ও ফল বের করানো, কিন্তু সে তার কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম নয় এজন্য যে, প্রতিটি মুহূর্তে দৃশ্যের পরিবর্তন হতে থাকে। ফলে সে কোনোভাবেই দ্রুত পরিবর্তনশীল দৃশ্য ও ঘটনাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ করার উপযোগী থাকে না। কারণ এমতাবস্থায় বিবেক ও মস্তিষ্কের শূন্য জায়গা কোনো বিচার-বিশ্লেষণ ও ফলাফলে পৌঁছা ছাড়াই দ্রুত পরিবর্তনশীল দৃশ্য ও ঘটনাবলীকে হুবহু গ্রহণ করে নেয়। অন্য ভাষায়, দর্শক-শ্রোতারা চুম্বক আকর্ষণের শিকার হয়ে যায়।

ফ্রেডারিক আইমোর অল্প বয়স্ক শিশুদের মন-মস্তিষ্ক ও ধমনীর ওপর টেলিভিশনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন, শিশুদের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রোগ্রামগুলো সাদামাটাভাবে পুনরাবৃত্তির কারণে মানুষের ধমনীসমূহকে পূর্ণাঙ্গভাবে রুদ্ধ করে দেয়। থিউডোর এডওয়ার্ডের ভাষায়, মিডিয়ার মাধ্যমে লোকদের মস্তিষ্কগত পশ্চাদপদতায় বাধ্য করা যায়। প্রাপ্তবয়স্ক ও সভ্য-সংস্কৃতিবান মানুষদের সহজেই শিশুদের কাতারে এনে দাঁড় করানো যায়। টেলিভিশন এমন বস্তুগত ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে, যাতে আবেগ-অনুভূতিকে উত্তেজিত ও আন্দোলিতকরণে জ্ঞান-বিবেককে খুবই কম কাজে লাগানো হয়। মগজ ধোলাইয়ের সবচে' সফল ও প্রভাবক, বরং সহজ পদ্ধতি হলো, মগজকে যৌন পরিবেশের সাথে জুড়ে দেয়া এবং এমন অবস্থা সৃষ্টি করা, যদিও তা মরীচিকার মতোই হোক, মানুষ যেন তার পেছনে দেওয়ানার মতো ছুটতে বাধ্য হয়। পশ্চিমা সিনেমায় শৈশবকালকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন সেটি অত্যন্ত আনন্দঘন সময় ছিল। উদাহরণস্বরূপ ষাটের দশকে শৈশবকাল সম্পর্কে

www.pathagar.com

একটি সিনেমা গোটা বিশ্বে প্রদর্শন করা হয়েছে, তাতে শৈশবকালকে একটি উন্মাদনার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়েছে। এ বয়সে একজন নওজোয়ান কিভাবে প্রতিবেশীর মেয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং কিভাবে তারা আবেগ-উচ্ছ্বাসের জোয়ারে ভেসে যেতে থাকে। এটাই ছিল আলোচ্য সিনেমার প্রতিপাদ্য বিষয়। সত্তরের দশকে এমন সিনেমা দেখানো হয়েছে যাতে বলা হয়েছে, পঞ্চাশের দশকের নওজোয়ানরা কেমন হতো। এসব সিনেমা প্রদর্শনের মাধ্যমে সত্তর বছরের বৃদ্ধদের মধ্যে বিশ বছরের নওজোয়ানদের চেতনা সৃষ্টির প্রয়াস-প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

জনমত

দীনী ও নৈতিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতিতে জনমত অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের ঝোঁকপ্রবণতা বাস্তবতা এবং ঘটনাসমূহ পরখ করার মাধ্যম বলে অভিহিত হয়। এক মনস্তত্ত্ববিদ জনমতের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন, সাধারণতঃ আমরা ধারণা করে থাকি, আমরা নিজেরাই নিজেদের অভিমত প্রতিষ্ঠা করি, কিন্তু বাস্তবতা তার উল্টো। কারণ সাধারণতঃ আমরা এই অনুমাণ করে সিদ্ধান্ত নেই যে, জনমত আমাদের তৎপরতা ও সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে। আমাদের প্রকৃতির অভ্যন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল রয়েছে।

জানাশোনা ও জ্ঞানের জন্য সংবাদ নয়; বরং সংবাদ হলো মগজ ধোলাইকারীদের পরিকল্পনা মোতাবেক মগজের অভ্যন্তরে বিদ্যমান চিত্র ও প্রতিচ্ছবিকে অন্যের নিকট পৌঁছানোর নাম। এটাকেই সে জনমত নামে আখ্যায়িত করে। নির্ধারিত চিত্র ও পরিকল্পনা মানুষের সামনে উপস্থাপন করার মাধ্যমে সে এটার পূর্ণতা দান করে। এর জন্য সে জনমত জরিপের চিত্তাকর্ষক নাম দিয়ে তার পক্ষে দলীল-প্রমাণ সরবরাহ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জনমত জরিপের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান অস্তিত্বশীল হয়েছে। সেসব প্রতিষ্ঠানে বড় বড় বিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ ও ব্রেন ওয়াশিং বিশেষজ্ঞরা কর্মরত রয়েছেন। হল বেকরিসা এ ধরনের জনমত জরিপের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন, যদি আপনি চান, মার্কিনীরা কোনো বিশেষ চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে নিক, তাহলে আপনাকে শুধু এটা করতে হবে যে, আপনি জনমতের আশ্রয় নেবেন এবং বলবেন, জনমত এ কথা বলে। অতঃপর টেলিভিশন ও মিডিয়ার অন্যান্য মাধ্যমে তা প্রকাশ করে দেবেন। এর সহজ পদ্ধতি হলো, আপনি যত দক্ষতা ও প্রতিভার সাথে জনমত জানার জন্য প্রশ্নের অবকাঠামো তৈরি করবেন, সে আলোকেই আপনার পছন্দমতো জবাব পাবেন। উদাহরণস্বরূপ আপনি প্রশ্ন করবেন, ৮৫% মার্কিনীদের ধারণা, তারা নির্ভরযোগ্য সংবাদের জন্য টেলিভিশনের ওপর আস্থা রাখে, আপনার কি অভিমত? প্রত্যাশিত জবাব আপনি ইতিবাচকভাবে পেয়ে যাবেন। এখন এই আলোচনা নেই যে, টেলিভিশনের কোন সংবাদগুলো সম্পর্কে আপনার প্রশ্ন। রাজনৈতিক সংবাদ উদ্দেশ্য, না স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও খেলাধুলা সম্পর্কে এই প্রশ্ন করা হচ্ছে। রাস্তা-ঘাটে চলমান লোকদের কাছে এ ধরনের প্রশ্ন প্রচার করে, তার নাম জনমত জরিপ দেয়া হয়। সাধারণভাবে জনগণ জনমত জরিপের এই পর্যালোচনায় অতি তাড়াতাড়ি প্রভাবিত হয়।

www.pathagar.com

বিশেষ করে যদি কোনো ব্যক্তি বিশেষের সফলতা ও ব্যর্থতার সাথে সম্পর্ক থাকে, তাহলে এটা আরো ফলপ্রসূ হয়। আজকাল টেলিভিশন ও দৈনিক পত্রপত্রিকার সহযোগিতায় শুধু একদিনেই জনমত জরিপ পর্যালোচনা করে ওই দিনই তা প্রচার করে দেয়া হয়, যাতে প্রত্যাশিত মনযিলের দিকে লোকদের পথপ্রদর্শন হয়ে যায়। দেখুন, ইহুদী প্রটোকলের দশম দস্তাবেজ।

যা ভাল ছিল না, ধীরে ধীরে তাই ভাল হয়ে গেছে

সিনেমা, নাটক, লিটারেচার, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে অসাধারণ দ্রুততার সাথে সাধারণ ও বিশেষ সর্বশ্রেণীর চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। আকবর এলাহাবাদীর ভাষায়-'যা ভাল ছিল না, ধীরে ধীরে তাই ভাল হয়ে গেছে।'

কাউ বয়েজ সিরিজে কঠোর আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীদের পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সেখানে পুলিশকে হিরো হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু দীনী, নৈতিকতার বিরোধীতাকারী অপরাধীদের আশ্রয়দাতাদের সম্মান করা হয়। দীন ও নৈতিকতার বিরোধীতাকে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই অপরাধ মনে করা হয় না। এক মজলুম ব্যক্তি, যে আইনের যাঁতাকল থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে যায়, কিন্তু আইন তার পিছু ধাওয়া করে। পক্ষান্তরে এই আইনই সাদা পোশাকধারী অপরাধীদের নিরাপত্তা দান করে। এই সিনেমায় ইনসাফকারীদের উপহাস করা হয় এবং তাদের ঘুষখোর ও দুশ্চরিত্র প্রমাণ করার প্রয়াস চালানো হয়। ডান্ডা ও বিত্তের বলে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে চাপ প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনকারীদের হিরো বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়।

পঞ্চাশের দশকের পূর্বে সিনেমাগুলোতে যৌনতার ইশারা-ইঙ্গিতও পাওয়া যেত না, কিন্তু পঞ্চাশের দশকের পরে সিনেমাগুলোতে প্রথমে ইশারা ইঙ্গিতে অতঃপর চলাফেরায় নড়াচড়ায় এরপর বাস্তবে যৌনতার প্রদর্শন শুরু হয়। এই অশ্লীলতা ও যৌনতাকে 'আমেরিকান ভালবাসা' নাম করা হয়েছে। 'প্রেম-ভালবাসার আমেরিকান পদ্ধতি' নামক ফিল্ম-সিরিজে যৌনতার দৃশ্যসমূহ খোলামেলাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালে প্রতি সপ্তাহে যৌনতার দৃশ্য প্রদর্শনের হার ছিল ১৫%, যা ১৯৭৮ সালে ২৪%-এ উন্নীত হয়েছে। এখন টিভি সিরিজে মারপিট ও উগ্রতার দৃশ্য প্রদর্শনের হার ৬০% এবং যৌন মেলামেশার দৃশ্য প্রদর্শনের হার ৩৫%-এ উন্নীত হয়েছে। অনেক সময় একটি মাত্র সিনেমাতেই এই হার পূর্ণ হয়ে যায়।[১]

শিশু-কিশোরদের জন্য যেসব সিরিজ, কার্টুন ও ভিডিও গেমস দেখানো হয়, তাতে জানোয়ারদের সৃষ্টির সেরা মানুষের আকৃতিতে দেখানো হয়। তারকা ও নক্ষত্র পূজা এবং চন্দ্র ও সূর্যকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য মন-মানস প্রস্তুত করা হয়। শক্তি ও উগ্রতা

---

১. উত্তর প্রদেশের রাজধানী লাখনৌর সাতটি সিনেমা হলে এমন সাতটি সিনেমা প্রদর্শন করা হয়েছে, যার পোষ্টারে লেখা ছিল-'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য'। সূত্র : কওমী আওয়াজ, ১৯ সেপ্টেম্বর-১৯৯৬।
এছাড়া ভারতীয় ও বাইরের টিভি চ্যানেলগুলোতে যৌনতার দৃশ্য সম্বলিত যেসব সিনেমা প্রদর্শিত হচ্ছে, তার সংখ্যা ২৫% থেকে ২৮%-এর মধ্যে। সূত্র : কওমী আওয়াজ, ২০ সেপ্টেম্বর-১৯৯৬।

www.pathagar.com

প্রদর্শন করে এই ধারণা দেয়া হয় যে, শক্তি ও বিত্তই সকল বস্তু অর্জন ও অসাধ্য সাধন করার মোক্ষম অস্ত্র। সত্য ও সততার ওপর থাকা আসল সম্পদ নয়, আসল সম্পদ হলো শক্তি ও বিত্ত। ঘরগুলোতে দেখানো হয়, পিতা-মাতা সন্তানদের থেকে গাফেল উদাসীন এবং মা বয়ফ্রেন্ড ও পিতা গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ব্যস্ত। আর বলা হয়, সন্তানের ওপর পিতা-মাতার শাসন-কর্তৃত্ব অকাম্য-অবাঞ্ছিত সীমা পর্যন্ত বেড়ে গেছে। পিতা-মাতা তাদের স্বাধীনতার পথে সবচে' বড় বাধা। এক সিনেমায় দেখানো হয়েছে, বিত্তশালী পিতা ঘরের বাইরে এত ব্যস্ত যে, স্ত্রী ও সন্তানদের দিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। গভীর রাতে বাড়ীতে ফেরে এবং খুব প্রভাতেই বাড়ী থেকে বের হয়ে যায়। স্বামী ও পিতার ভালবাসা বঞ্চিত স্ত্রী ও সন্তানরা এ শূন্যতা তাদের ইচ্ছা ও পছন্দমতো পূরণ করে। তারা নিজ নিজ বন্ধু তালাশ করে নেয়। আর এতে তারা ন্যায়ের ওপর রয়েছে। অন্য এক সিনেমায় দেখানো হয়েছে, এক মেয়ে তার গবেট নির্বোধ পিতার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছে। সে মনমতো বয়ফ্রেন্ড নিয়ে চলাফেরা ও রাত যাপন করে। অপর এক সিনেমায় দেখানো হয়েছে, ঘরে পিতা-মাতার কোনো ক্ষমতা-কর্তৃত্ব ও সম্মান-মর্যাদা নেই। দুষ্ট উচ্ছৃংখল ছেলে-মেয়েরা তাদের শাসকে পরিণত হয়েছে। এক সিনেমায় ভাই-বোন আর অপর সিনেমায় পিতা-মেয়ে যৌনতায়, এমনিভাবে মাকে তার ছেলের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত দেখানো হয়েছে।[২]

পঞ্চাশের দশকের পূর্বে সিনেমাতে দীনী ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং সেগুলোর অন্তর্নিহিত রহস্যসমূহের সমালোচনা থেকে বিরত থাকা হতো। অবশ্য সরাসরি দীন ও নৈতিকতার আলোচনা করার পরিবর্তে সেসব রসম-রেওয়াজ, প্রথা-প্রচলন এবং সেগুলোর আনুগত্য অনুসরণের আলোচনা করা হতো, যা প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছিল। পারিবারিক জীবনে দীন ও নৈতিকতার যে সক্রিয় ভূমিকা ছিল, ইশারা-ইঙ্গিতেও তার আলোচনা করা হতো না। ষাটের দশকের পর এমন সিনেমা তৈরি হতে লাগল, যাতে সরাসরি দীনের সমালোচনা এবং চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে টার্গেট বানানোর পরিবর্তে গির্জার পাদ্রীদের ব্যক্তিগত জীবনে ঘটে যাওয়া চারিত্রিক পদস্খলন,

২. এসব দৃশ্য আগে শুধু পাশ্চাত্যের সিনেমায় দেখানো হতো, কিন্তু ১৯৯৩ সাল থেকে ভারতীয় সিনেমাতেও এ ধরনের ডায়ালগ প্রচারিত এবং দৃশ্য প্রদর্শিত হচ্ছে। গানের মাধ্যমে অশ্লীলতা শিক্ষা দেয়ার কাজ তো ১৯৬০ সাল থেকেই শুরু হয়েছে। 'সঙ্গম হবে কিনা' এবং 'ভালবাসা যখন করেছি তখন ভয় কিসের' ইত্যাদি গানের ধারা ১৯৬০ সাল থেকেই শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, পিতা এবং মেয়ের মধ্যেও এ ধরনের অশ্লীল যৌন কথোপকথন ও গানের ধারা শুরু হয়ে গেছে, যা সম্ভবত স্বামী-স্ত্রীও বলতে পছন্দ করবে না। ব্যান্ডেট কোয়েনের দৃশ্য ও খলনায়কের গান পশ্চিমা সিনেমার যথার্থ চিত্র। ১৯৯৭ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে জাপান চলচ্চিত্র উৎসব পালন করা হয়েছে। দৈনিক কওমী আওয়াজ পত্রিকায় এক চলচ্চিত্র সমালোচক এই চলচ্চিত্র উৎসবের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন, দু'টি জাপানী সিনেমায় আপন ভাই-বোনের মাঝে যৌন সম্পর্কের উন্মুক্ত দৃশ্য দেখানো হয়েছে। নির্দেশকরা কাহিনী ও ঘটনার স্বার্থে এমনটি করা হয়েছে বলে এর বৈধতার প্রমাণ পেশ করেছেন এবং এ ধরনের সম্পর্কের পরিণামও পূর্ণ দক্ষতার সাথে দেখিয়েছেন। সিনেমার কাহিনীতে দেখানো হয়েছে, ভাইয়ের স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ছোট বোন ভাইকে খুব ভালবাসে। এজন্য ভালবাসার উপহারস্বরূপ ভাইকে তার শরীর দান করে। আসলে তারা যা করে, সেটিকে শয়তান তাদের সামনে সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে। সূত্র ঃ দৈনিক কওমী আওয়াজ, ১০ মার্চ–১৯৯৭।

www.pathagar.com

যৌন বিপথগামিতা এবং নৈতিক ধসের আলোচনা করা হতো। এভাবে মগজ ধোলাইয়ের ধারাবাহিক অভিযানের ফল যখন সামনে আসতে লাগল তখন সিনেমা ও টিভিতে দর্শক-শ্রোতাদের জন্য তিনটি পদ্ধতি উপস্থাপিত হতে লাগল।

০১. উঁচু সোসাইটি ও উন্নত জীবন মানে পৌঁছতে না পারার কারণে নিরাশ হয়ে মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিজেকে পরাজিত ধারণা করা এবং কঠোর পরিশ্রমের জীবন গ্রহণ করার পরিবর্তে শেষ উপায় হিসেবে মাদকের আশ্রয় নেয়া। পশ্চিমা লেখক এলডাস হ্যাক্সলের স্বরচিত গ্রন্থ 'বীরত্ব ও সাহসিকায় পূর্ণ এক নতুন পৃথিবী'-তে এমন একটি সোসাইটির চিত্র অঙ্কন করেছেন, যার মধ্যে কোন নিয়ম-নীতি, চরিত্র ও নৈতিকতার কোনো শাসন নেই।

০২. বড় বড় সোসাইটিকে ছোট ছোট সোসাইটিতে ভাগ করে দেয়া, যাতে ব্যক্তি সোসাইটির চাহিদা থেকে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। কারণ সামাজিক ঐক্য কঠোরতা ছাড়া বাকী থাকতে পারে না। এই প্রস্তাবের বাস্তব রূপায়ণ করা হচ্ছে এভাবে, বড় বড় দেশগুলোকে আঞ্চলিকতা, গোত্রগত, ভাষা, বর্ণ ও জাতীয়তার ভিত্তিতে বিভক্ত করে দেয়া হচ্ছে।[৩]

০৩. ব্যক্তি সামাজিক ও পারিবারিক জীবন থেকে নিজেকে আলাদা করে নেবে। সে সর্বদা নিজেকে টেলিভিশনের আশ্রয়ে ছেড়ে দেবে, যাতে সামাজিক ও পারিবারিক জীবন থেকে আলাদা হওয়ার কারণে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, টিভি তা পূর্ণ করে দেয়। সে ঘরের কোণে বসে টিভিতে ফুটবল ও ক্রিকেট ম্যাচ দেখবে আর নিজেকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত মনে করবে। তা এভাবে টিভিতে শয়তানদের পূজা করা, জীব-জানোয়ারদের সম্মান করা এবং মানুষকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করার যে দৃশ্যাবলী উপস্থাপন করা হয়, সেসব দেখে সে সত্যিই শয়তানকে পূজার যোগ্য, জীব-জানোয়ারকে সম্মানের পাত্র এবং এবং মানুষকে ঘৃণার পাত্র মনে করতে থাকে। মার্কিন লেখক টনি ব্রেগস তার গ্রন্থে দেখিয়েছেন, স্কুল, কলেজ ও প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো ফায়দা নেই। কারণ এতে পড়াশোনাকারীদের রাস্তা-ঘাটে সড়কে আশ্চর্য ধরনের পোশাক পরে নেশায় বুঁদ দেখা যায় এবং বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকে। এই গ্রন্থের নায়কের নির্ধারিত কোনো রাজনৈতিক ও চারিত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। সে নতুন প্রজন্মের ভাষা, অনুভূতি ও চেতনা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। সে সর্বক্ষণ শুধু কল্পনার জগতে বিচরণ করে এবং উঁচু ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করতে থাকে। (সূত্র : দস্তাবেজ-১৩)

প্রকাশনা

প্রকাশিত উপকরণ ও মাধ্যম স্বয়ং নিজে কোন যোগাযোগ ও সংযোগের মাধ্যম নয়; বরং তার মূল উদ্দেশ্য সাধারণ লোকেরা তা পড়ুক, তার পয়গাম গ্রহণ করুক, সেটা ভালভাবে

---

৩. সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদি দেশগুলো আমাদের সামনে আছে, এমনিভাবে ইরাক, ইরান ও তুরস্কের সীমান্ত, পাকিস্তান ও ভারতের পশ্চিম এবং পূর্ব সীমান্তে বসবাসকারী জনগণের মাঝে বিভক্তির পর বিভক্তি সৃষ্টির ধারা শুরু করেছে। সূত্র : ইহুদী প্রটোকল, পঞ্চম দস্তাবেজ।

www.pathagar.com

বুঝুক ও আত্মস্থ করুক। এক কথায়, তার অভ্যন্তরের পয়গামই মূল কথা। আর তখনই কেবল বলা যেতে পারে, মিডিয়ার মাধ্যমে দেয়া পয়গাম পৌঁছে গেছে, কিন্তু নিম্নবর্ণিত অবস্থাগুলোর কারণে যদি এই পয়গাম পৌঁছতে না পারে তাহলে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ বলে অভিহিত করব।

০১. প্রকাশনা যদি সঠিক সময়ে প্রকাশিত না হয় এবং সেসব লোকের হাতে সময়মতো না পৌঁছে, যাদের সাথে এর সম্পর্ক।

০২. উপযুক্ত সময়ে পৌঁছলেও তা ব্যাপকভাবে পঠিত না হলে।

০৩. সঠিক সময়ে পৌঁছে গেছে, তা পাঠও করা হয়েছে, কিন্তু তার ভেতরের পয়গাম বোঝা হয়নি।

০৪. সঠিক সময়ে পৌঁছে গেছে, তা পাঠও করা হয়েছে, তার পয়গামও বোঝা গেছে, কিন্তু তা তৈরিতে সামান্য ভুল রয়ে গেছে। প্রকাশনায় উপস্থাপিত চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার জ্ঞানগত ও শৈল্পিক দুর্বলতা, অনুপযুক্ত সময়ে সেসব প্রকাশনার প্রচার-প্রসার কিংবা অধিক ভুলের কারণে তার গুরুত্ব ও উপকারিতা নিঃশেষ হয়ে যায়।

প্রকাশনার বৈশিষ্ট্য

০১. প্রকাশনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, বিপুল হারে তা প্রচার-প্রসার হয়, তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ও স্থায়ী হয় এবং তা খুব সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা তা থেকে উপকৃত হতে পারে, একাধিকবার তা পাঠ করা যায় এবং একাধিক ব্যক্তি তা থেকে উপকৃত হয়। এভাবে প্রকাশনা তার নির্ধারিত পয়গাম ও উদ্দেশ্যাবলী মন মস্তিষ্কে সুদৃঢ় করে দিতে বুনিয়াদী ভূমিকা পালন করে। কারণ একই পয়গাম বার বার বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

লিখিত উপকরণ ও মাধ্যম এদিক দিয়েও অন্যের ওপর প্রভাবশীল হওয়ার শক্তি সামর্থ্য রাখে যে, পাঠক নিজের মতামত গঠনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। পাঠক চিন্তা-ভাবনা দ্বারা কাজ নেয় এবং চিন্তা করে। দুই তিন বার তা পাঠ করে সে ওইসব বিষয়বস্তুর সমালোচনা করে অথবা গ্রহণ করে নেয়। এভাবে পাঠক ও লেখকের মাঝে একটি নিরব আলোচনা চলে, যা উভয়ের মাঝে চালু থাকে। এই নিরব অধ্যয়নের মাঝে পাঠককে সর্বাবস্থায় গ্রন্থের বিষয়বস্তুর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করতে হয়। এর অনিবার্য ফল হলো, পাঠকের মন মস্তিষ্কে সে চিন্তা-চেতনা ছেয়ে যায় এবং বিষয়বস্তুর প্রাণ পাঠকের চিন্তা-চেতনায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে, যা শিক্ষক থেকেও বেশি প্রভাবশালী ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এর মৌলিক কারণ হলো, লিখিত শব্দাবলীর মধ্যে মন-মস্তিষ্কের ওপর প্রভাবশালী হওয়ার যাদুকরী শক্তি আছে। তবে শর্ত হলো, সে প্রকাশনা তৈরিতে শৈল্পিক দক্ষতা থাকতে হবে এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক দিয়ে শক্তিশালী পদ্ধতি হতে হবে। এরপরই লিখিত শব্দাবলী পাঠকের অনুমতি ছাড়াই অতি নিরবে তা হৃদয়ে পৌঁছে যায় এবং পাঠকের আবেগ অনুভূতি সে বিষয়বস্তুর প্রবক্তা ও জোরালো সমর্থক সাহায্যকারী হয়ে যায়।

www.pathagar.com

০২. লিখিত শব্দাবলী ও বিষয়বস্তুর মর্ম উপলব্ধি করতে পাঠক কারো মুখাপেক্ষী হয় না। সে সরাসরি তা থেকে উপকৃত হয় এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিষয়বস্তুর মূল্য মান নির্ধারণ করে। কোন জিনিস তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় না।

০৩. লিখিত বিষয় পড়া দ্বারা পাঠকের ব্যক্তিত্ব এবং আত্মবিশ্বাস শক্তিশালী হয়। সে নিজেই তার বিবেক ও চিন্তাশক্তি দ্বারা লিখিত বিষয়ের মর্মের গভীরে পৌঁছতে পারে এবং তার ইশারা-ইঙ্গিত ও জটিলতার সমাধান করে। অন্য ভাষায় সে শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এটি প্রসিদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা যে, পাঠক যখন নিজেই নিজের শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে এবং নিজেকে উপদেশ ও শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকে, তখন গ্রন্থের বিষয়বস্তু তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভালভাবে গেঁথে যায়। এর অর্থ এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, লিখিত বিষয়বস্তু বোঝার ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিকের প্রাধান্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত এর ফলে পাঠকের ব্যক্তিত্ব এবং কোনো বিষয়বস্তু দ্বারা আশ্বস্ত হওয়া, অন্যকে তা দ্বারা আশ্বস্ত করার বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি ও যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। একে মনস্তত্ত্ববিদরা কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা নামে আখ্যায়িত করেন।

০৪. লিখিত শব্দাবলী পাঠ করার ফলে পাঠকের ওপর সামাজিক দায়িত্ব অর্পিত হয়। তার মধ্যে আরো বেশি জ্ঞান অর্জন এবং অন্যের নিকট তা স্থানান্তর করার আগ্রহ ও চেতনা সৃষ্টি হয়। যখন মূর্খ লোক শিক্ষিত লোকের মুখ থেকে নতুন জ্ঞান ও উদ্ভাবনের কথা শুনে তখন তার মধ্যে জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। অপরদিকে পাঠকের ইচ্ছা হয়, সে আরো জ্ঞান অর্জন করুক এবং তার জ্ঞান শুধু তার সমাজ, দেশ ও জীবন সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ না থাকুক; বরং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা সংকট, চিন্তা-দর্শন, মতবাদ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করুক।

০৫. লিখিত শব্দাবলী পাঠে পাঠকের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক কল্পনার জগতে ডুব দেয়ার সুযোগ ঘটে। সে পড়ার চেয়ে বেশি বুঝে ও চিন্তা করে। যতটা না সে বুঝে কল্পনার জগতে তার চেয়ে বেশি বিচরণ করে। কখনো চিন্তা করলে আরো বোঝার চেষ্টা করে। কখনো সে কল্পনার পাখা লাগিয়ে উড়ে এবং কখনো তার বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিকে সমস্যা সংকটের সমাধানে ব্যবহার করে।

০৬. পত্র পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের লেখাগুলোতে নিম্নবর্ণিত শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যাবলী নিহিত রয়েছে :

ক. সাধারণ ও বিশেষ সর্বশ্রেণীর জন্য সাংবাদিকতার লেখা নবতর জ্ঞানের ভাণ্ডার হয়।

খ. সাংবাদিকতার লেখা দ্বারা জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐক্য সৃষ্টি হয়, যার ফলাফল অনেক গভীর ও সুদূরপ্রসারী।

গ. সাংবাদিকতার পাতায় প্রকাশিত সাক্ষাতকার, সেমিনারের রোয়েদাদ, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সামাজিক ও জ্ঞানমূলক জরিপ, বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, সরকারের বিবৃতি ও ঘোষণা জাতির অর্থনৈতিক তৎপরতার অগ্রগতিতে মৌলিক ভূমিকা পালন করে।

www.pathagar.com

ঘ. সাংবাদিকতা এমন এক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দর্পণ, যার মধ্যে জীবন প্রাণ-চাঞ্চল্য ও শক্তিতে ভরপুর দৃষ্টিগোচর হয়। তাতে ব্যক্তি, দল ও সরকারের চিত্র দেখা যায়।

ঙ. সাংবাদিকতাকে আমরা যুগের সাক্ষী এবং প্রত্যক্ষদর্শীও বলতে পারি, যার মধ্যে গোটা দুনিয়া গুটিয়ে যায়।

চ. আধুনিক যুগের সাংবাদিকতা মুদ্রণের অসাধারণ সহজলভ্যতা, রঙিন ছাপা, স্যাটেলাইটের সুযোগ-সুবিধা, উন্নত থেকে উন্নততর শৈল্পিক উদ্ভাবন, সর্বোন্নত বিন্যাস ও সংকলন পদ্ধতি, উপরন্তু সর্বনিম্ন মূল্য, বেশির থেকে বেশি তাজা সংবাদ এবং সকল প্রকার রুচিসম্পন্ন পাঠকের চিত্তাকর্ষক পঠনসামগ্রীর উপস্থিতি এবং সর্বত্র পাওয়া যাওয়ার কারণে অনেক আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে গেছে। সাংবাদিকতা জীবনের এক বিরাট বড় অংশের ওপর তার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ সাংবাদিকতা যত অসাধারণ দ্রুততার সাথে লোকদের নিকট পৌঁছতে পারে, অন্য কোনো লেখা তত দ্রুত লোকদের নিকট পৌঁছতে পারে না। এজন্য সাংবাদিকতার প্রভাব-প্রতিক্রিয়াও বড় দ্রুততা এবং শক্তিমত্তার সাথে প্রসার লাভ করে।

শ্রবণ উপকরণ

মানব জীবনে রেডিও শ্রবণের যে প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পড়ে তার বিশ্লেষণ করার পূর্বে সে সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পড়া উচিত যাতে বলা হয়েছে, কোরিয়ার যুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট সরকার যখন সিউল দখল করে নেয়, তখন সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সিউলের জনগণের নিকট বিদ্যমান সকল রেডিও জব্দ করে নেয়। অথচ রেডিও স্টেশন দখল করে নেয়ার পর এর কোন প্রয়োজন ছিল না। সমাজতান্ত্রিক সরকার এই পদক্ষেপ এজন্য গ্রহণ করেছিল, যাতে সিউলের জনগণ গোপন স্টেশন থেকে প্রচারিত রেডিওর কোনো সংবাদ শুনতে না পারে। সেকালে কোরিয়ায় রেডিও রাখা এবং ভিনদেশ থেকে প্রচারিত সংবাদ শ্রবণের শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। এ খবর দ্বারাই আপনি অনুমান করুন, মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও চেতনা গঠনে রেডিও কত ভয়ানক ভূমিকা পালন করে।

মানব জীবনে রেডিও'র প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

মানব জীবনে রেডিও'র বিভিন্নমুখী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

০১. রেডিও মানব শরীরের শুধুমাত্র কানের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং কানই তার কেন্দ্রবিন্দু। মানুষ যখন কোনো জিনিসের ওপর তার মানসিক মনোযোগ নিবদ্ধ করতে চায় তখন কিছু সময়ের জন্য সে তার চক্ষু বন্ধ করে নেয়। এভাবে সে তার স্মৃতিশক্তির ওপর জোর দিয়ে তাকে আরো বেশি সক্রিয় ও কর্মতৎপর করে তুলতে এবং তার কল্পনাশক্তিকে সচেতনতা ও পূর্ণ শক্তি দিয়ে কাজ করার সুযোগ দিতে চায়, যাতে সে কল্পনা তার স্মৃতিতে ভালভাবে স্থান করে নেয়।

অতঃপর কখনো ভুলে না যায়। আর রেডিও শুনে যে চিন্ত-ভাবনা তার মাঝে সৃষ্টি হয়েছে বিস্তারিত ও আংশিক কিছু তার স্মৃতি থেকে বিলীন হয়ে যায় না। একই আচরণ রেডিও তার শ্রবণকারীর সাথে করে। রেডিও মানুষের শ্রবণশক্তির মাধ্যমে ধীরে ধীরে

www.pathagar.com

জ্ঞান স্থানান্তর করে। এর ফলে রেডিও'র পয়গামের সকল অংশ শ্রোতার মেধায় জায়গা করে নেয়। এর পাশাপাশি রেডিও শ্রবণকারী অত্যন্ত চিন্তা ফিকির ও পরিকল্পনার সাথে কাজ করার অতিরিক্ত সুযোগ পেয়ে যায়। পরিশেষে কোনো বিশৃংখলা ও ঝামেলা ছাড়াই রেডিও'র পয়গামের সকল অংশ মানুষের মস্তিষ্কে স্থান করে নেয় এবং ভালভাবে শেকড় গেঁড়ে বসে।

০২. রেডিও'র পয়গাম সকল মানব সম্প্রদায়ের কাছে একইভাবে পৌঁছে যায়। মূর্খ-জ্ঞানী, উচ্চ-মধ্যম, উচ্চ শিক্ষিত-কম শিক্ষিত, এক কথায় সর্বশ্রেণীর নিকট একইভাবে পৌঁছে। রেডিও এদিক দিয়ে অত্যন্ত ভয়াবহ হাতিয়ার যে, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক চেতনার প্রাচীর সুসংহত কিংবা দুর্বল করার ক্ষেত্রে রেডিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

০৩. রেডিও'র পয়গাম জাতীয় দূরত্ব ও সীমারেখার উর্ধ্বে উঠে সর্বশ্রেণীর নিকট বিনা বাধায় পৌঁছে যায়। রেডিওর পয়গাম মানব সমাজের নারী-পুরুষ, ছোট-বড় প্রত্যেক বয়সের মানুষের কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। যদিও রেডিওর মোকাবেলায় টিভির আকর্ষণ ও কাছে টানার ক্ষমতা বেশি, কিন্তু রেডিও যেভাবে সহজেই শ্রোতার মন-মস্তিষ্কে পৌঁছে যায় এবং সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও সীমারেখার উর্ধ্বে উঠে সর্ব জায়গায় পৌঁছতে পারে, স্থানীয় টিভি তা পারে না। এই ভিত্তিতে বিভিন্ন ঘটনাবলী, তথ্য ও জ্ঞান শ্রোতা পর্যন্ত স্থানান্তর করে তার অভিরুচি ও প্রকৃতিকে প্রভাবিত করার সুযোগ সবখানে সব সময় রেডিওর রয়েছে। কারণ ট্রান্সমিটার আবিষ্কারের ফলে সহজেই রেডিও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায়। প্রতিটি শিক্ষিত, মূর্খ, গ্রাম্য, শহুরী, সফরকারী, বাড়ীতে অবস্থানকারী, উপবেশনকারী, শয়নকারী এক কথায় সর্বশ্রেণীর লোক যখন ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা রেডিও শুনতে পারে। এজন্যই রেডিও আবিষ্কারের পর যত দ্রুত তা প্রসার লাভ করেছে, অন্য কোন মিডিয়া এত দ্রুত প্রসার লাভ করেনি।

রেডিও'র আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, রেডিও যেভাবে সহজেই সর্বশ্রেণীর নিকট পৌঁছতে পারে, এতে সময় ও অবস্থানের কোন বাধা নেই, টিভি তা পারে না। রেডিও'র মোকাবেলায় টিভি দেখা জন্য বসার প্রয়োজন রয়েছে। টিভি দেখার জন্য মানুষের অবসর সময়ের প্রয়োজন পড়ে। পক্ষান্তরে রেডিও শোনার জন্য শুধু সুইচ অন করে দিলেই হয়। এক প্রোগ্রাম যদি ভাল না লাগে, তাহলে শুধু সুইচ ঘুরিয়ে দিলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে আপনি এক জগত থেকে অন্য জগতে পৌঁছে যাবেন। এভাবে ন্যূনতম কোনো প্রচেষ্টা এবং শারীরিক মানসিক কষ্ট ছাড়াই আপনি রেডিও থেকে উপকৃত হতে পারেন। আপনি কাজে ব্যস্ত থেকেও রেডিও শুনতে পারেন। এভাবে মিডিয়া জগতে রেডিও'র বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর যদি শক্তিশালী ট্রান্সমিটারের সাহায্যে রেডিও'র অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়, আওয়াজ যদি হয় হৃদয়গ্রাহী, বিষয়বস্তু অত্যন্ত দক্ষতা ও মেহনতের সাথে যদি প্রস্তুত করা হয় এবং উপস্থাপন হয় চমৎকার, আকর্ষণীয়,

www.pathagar.com

চিত্তাকর্ষক ও যাদুময়ী, তাহলে অন্য কোনো মিডিয়া রেডিও'র মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়। বিশেষ করে রেডিওর সম্প্রচার যদি চিন্তা-গবেষণা, অভ্যন্তরীণ রং ও শক্তিসম্পন্ন হয়, আর সম্প্রচারিত বিষয়ের উদ্দেশ্য হয় জ্ঞান-বিবেক ও মেধা-মননের ওপর নৈশ হামলা চালানো এবং রুচি ও মানসিক ঝোঁকপ্রবণতার পরিবর্তন সাধন, তাহলে রেডিওর বিকল্প কোনো মিডিয়া নেই।

যেসব বস্তু শ্রোতাদের মনস্তত্ত্ব, তাদের অভিরুচি, অভ্যন্তরীণ চিন্তা-চেতনা, মতামত এবং মানসিক ঝোঁকপ্রবণতার পরিবর্তন ঘটায় কিংবা তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তার মধ্যে বক্তৃতা, আলোচনা, কাব্য ইত্যাদির বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আজকালের মিডিয়ায় নিম্নস্তরের চপল আবেগ অনুভূতিসমূহকে উত্তেজিতকরণে সিনেমার অশ্লীল গানগুলো বিরাট অংশ দখল করে রেখেছে।

দেখার উপকরণ ও মাধ্যম

মিডিয়া জগতে দেখার উপকরণ ও মাধ্যমকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ, তাদের ওপর প্রভাবশীল হওয়া এবং তাদের অভিরুচি ও চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে অসাধারণ গুরুত্ব দেয়া হয়। এই হিসেবে মিডিয়া বিশেষজ্ঞগণ দেখার উপকরণ ও মাধ্যমকে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর ও প্রভাব বিস্তারকারী মনে করেন। যা দর্শকের ধমনী থেকে স্থানান্তরিত হয়ে তার আচরণ ও কাজে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অন্য ভাষায়, তাৎক্ষণিকভাবে সতর্কীকরণ কিংবা চূড়ান্ত সুসংবাদের মর্যাদা অর্জিত হয়। তার প্রতিক্রিয়া দর্শকের ধমনীর শিরা-উপশিরা ও আচরণে সংগে সংগে চূড়ান্ত হয়ে যায়। বিজ্ঞাপন ও স্টিকারে বিদ্যমান চিত্র ও ছবিকে যদিও শব্দের পোশাক পরানো হয় না, কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রভাব ও শক্তি বিস্তারে তার পূর্ণ দক্ষতা রয়েছে।

দেখার উপকরণ ও মাধ্যমের মধ্যে সবচে' কার্যকর ও শক্তিশালী হল সেগুলো, যেগুলো শব্দের পরিবর্তে শৈল্পি পন্থা-পদ্ধতিতে আদায় করা হয়। কারণ শৈল্পিক পদ্ধতিতে যে চিত্র ও রেখা অংকন করা হয়, তা স্বয়ং নিজস্ব ভাষা রাখে। এমন ভাষা ও ইঙ্গিত, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সর্বত্র বোঝা ও তার প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সে ভাষা ও ইঙ্গিত কিভাবে সহজ করে উপস্থাপন করা হবে, যাতে একজন সাধারণ মানুষও তার অভ্যন্তরীণ পয়গাম সহজেই বুঝতে পারে।

উন্নত বিশ্ব তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সক্রিয় চিত্র ও ইলেক্ট্রনিক গেমসের মাধ্যমে অর্জন করে। ইহুদী ও খৃস্টানরা তাদের জাতীয়, ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় রহস্য ও পরিচায়ক বিষয়াবলী এবং তাদের শিল্প-পণ্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জ্ঞান ও সামাজিক তৎপরতার মাধ্যমে বিকশিত করে এবং তার প্রচার-প্রসার করে। মিডিয়া হোক কিংবা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার হোক, কোন জায়গাতেই তার প্রচার-প্রকাশ থেকে তারা বিরত থাকে না।

www.pathagar.com

শ্রবণ ও দর্শনের উপকরণ এবং মাধ্যম

শ্রবণ ও দর্শনের প্রধান মাধ্যম টেলিভিশন, যা আধুনিক যুগের সবচে' ভয়াবহ আবিষ্কার। টেলিভিশন মিডিয়ার জগতে অবিশ্বাস্য বিপ্লব সাধন করেছে। এই আবিষ্কার আওয়াজ ও ফটো উভয়ই ব্যবহার করে গোটা বিশ্বের দূরত্বটা সংকুচিত করে এক পল্লীতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে।[৪]

টেলিভিশন মানুষের শ্রবণ দর্শন উভয় ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করে। এদিক দিয়ে টিভিকে একটি কার্যকর ও শক্তিশালী মিডিয়া আখ্যা দেয়া হয়। কারণ টিভি দর্শকের সকল যোগ্যতা প্রতিভা ও ইন্দ্রিয়শক্তিকে পূর্ণভাবে ব্যস্ত রাখে এবং নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেয়। দর্শক সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। ঘন্টার পর ঘন্টা অত্যন্ত একাগ্রতা ও মনোযোগের সাথে টিভি দেখায় ব্যস্ত থাকে। এভাবে সে তার সকল মানসিক ও শারীরিক শক্তিকে এক জায়গায় নিবদ্ধ করে ফেলে। দর্শক টিভির পর্দায় যেসব অনুষ্ঠান দেখে ও শুনে, সেগুলো কোনো দ্বিধা ছাড়াই গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এজন্য টেলিভিশনকে মিডিয়া জগতে সবচে' উত্তম, গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত মাধ্যম বলে মেনে নেয়া হয়।

টিভিতে যেসব অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়, তা উপস্থাপন করার আন্দাজ, ধরন ও পদ্ধতি সব সময় ডাইনামিক, আন্দোলিত, ভিন্নতা, বৈচিত্র ও নতুনত্বে ভরপুর থাকে। এর কারণ হলো, টেলিভিশনের মধ্যে যে অসংখ্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে, তা দর্শকের মন-মস্তিষ্কে শ্রবণ ও দর্শন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পৌছাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এভাবে দর্শক আধুনিক টেকনোলজির যাদুতে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। টিভির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ যেভাবে ইচ্ছা যেদিকে ইচ্ছা দর্শক-শ্রোতার মন-মস্তিষ্ক ঘোরাতে পারে। এর পাশাপাশি একথাও স্বরণ রাখতে হবে, টেলিভিশনের ক্যামেরা দৃশ্য ও ছবিগুলো বিভিন্নভাবে, রঙে, স্বাভাবিক অস্বাভাবিক আকৃতিতে বিচিত্র আঙ্গিকে ইচ্ছামতো সক্রিয় ও স্থবির উভয়ভাবে প্রদর্শন করতে পারে। এই ক্যামেরা সুন্দরকে অসুন্দর, অসুন্দরকে সুন্দর, নিকটকে দূর, দূরকে নিকট দেখাতে পারে। টিভি ক্যামেরা স্বাভাবিক বস্তুসমূহের কৃত্রিম ছবি প্রকৃত ছবির মতোই শুধু দেখায় না; বরং তার মধ্যে এমন উপকরণ রয়েছে, যা এসব জিনিসকে ইচ্ছামতো নতুন শৈল্পিক ছাঁচে অভিনব পদ্ধতিতে উপস্থাপন করতে পারে। এটা শুধু ক্যামেরার মাধ্যমে প্রকৃত বস্তুর কৃত্রিম ছবি প্রদর্শন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়; বরং চিন্তা এবং বাস্তব কর্ম–উভয় ক্ষেত্রে ক্যামেরার বৃত্ত সর্বপ্রকার অনুকরণ অনুসরণ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। রেডিওর বিপরীতে টিভি তার স্ক্রিনে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে সামান্যতম চিন্তা-ভাবনারও অবকাশ দেয় না। টিভি আপনার এমন বন্ধু, যে আপনার থেকে সবটুকু সময় এবং পূর্ণ একাগ্রতা ও মনোযোগ চায়। সে চায় আপনি আপনার মন-মস্তিষ্ক, বিবেক-

---

৪. টেলিভিশনের সমগ্র বিশ্বকে এক পল্লীতে রূপান্তরিত করে দেয়াকেই গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন বলে। এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক হতে পারে। ইতিবাচক দিক হলো, তথ্য, প্রযুক্তি ও জ্ঞান-গবেষণা, আর নেতিবাচক দিক হলো মিডিয়ার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া যেভাবে আন্তর্জাতিক সমাজে পতিত হচ্ছে, পশ্চিমা সমাজে যেভাবে ক্রমবর্ধমানহারে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, একই ধরনের অপরাধ প্রাচ্যের দেশগুলোতেও সংঘটিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা ও কথা-কল্পনা সব দিয়ে কোনো বিরতি ছাড়াই লাগাতার আপনার অস্তিত্ব তার জন্য বিলিয়ে দেবেন।

টিভির সামাজিক ভূমিকা

টিভি দ্বারা সামাজিক প্রাণ সৃষ্টি হয়–একথা একটি ধোকা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের এ প্রতারণার শিকার না হওয়া উচিত। অনেকে দাবী করেন, টিভি দেখতে যেহেতু ঘরের সব লোক একত্রিত হয়, ঘরের সবাইর এক জায়গায় সমাবেশ ঘটে। এতে তাদের পরস্পরে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। অথচ যেভাবে এসব লোক টিভি দেখার জন্য একত্রিত হয় তা বিশ্লেষণ করলে এ দাবীর মুখোশ খুলে যায়। টিভি দর্শকরা যদিও শারীরিকভাবে একত্রিত হয়, কিন্তু আবেগ ও চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে প্রত্যেকেই পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে কল্পনার জগতে বিচরণ করতে থাকে। টিভি দেখার জন্য চাই একই পরিবারের সকল লোক একত্রিত হোক কিংবা কোন ক্লাবের সকল সদস্য একত্রিত হোক–সবার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। কিছুক্ষণ টিভি দেখার পর সবাই যার যার মতো আলাদা হয়ে যায়।

প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বপ্ন ও আকাঙ্খার জগতে বিচরণ করে। প্রত্যেকেই নিজের পছন্দনীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং টিভিতে উপস্থাপিত ঘটনা ও সংবাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, উপস্থাপিত ঘটনা ও সংবাদ সম্পর্কে নিজস্ব প্রতিক্রিয়া, অনুভূতি এবং তার ব্যাখ্যা ও কারণ অনুসন্ধানে হাবুডুবু খেতে থাকে। এটা খুব কমই ঘটে যে, কোনো একটি বিষয়ে দর্শকদের সকলেই নিজ নিজ প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে একমত। কারণ প্রত্যেক দর্শকেরই নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ রয়েছে, যা তাকে স্ক্রিনে উপস্থাপিত ঘটনাবলী, ব্যক্তিবর্গ ও সংবাদ সম্পর্কে একটি অদৃশ্য মজবুত সুতায় গ্রথিত করে রাখে। এজন্য নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি না, টিভি দেখা দ্বারা সামাজিক ঐক্যের প্রাণ সৃষ্টি হয়। কারণ মানুষ যখন শারীরিকভাবে একত্রিত, কিন্তু মেধা-মনন ও মানসিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন হলে সেটাকে আমরা সামাজিক ঐক্যের প্রাণ আখ্যা দিতে পারি না। মার্কিন লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সামাজিক জরিপের ভাষায়–'টিভি দ্বারা এমন সামাজিক জীবন অস্তিত্ব লাভ করে, যার মধ্যে ঐক্যের প্রাণ নেই।'

নাটক এবং কিসসা-কাহিনী

আধুনিক মিডিয়া জগতে নাটক এবং কিসসা-কাহিনীর বিষয়বস্তু, সেসবের কেন্দ্রবিন্দু এবং ধ্যান-ধারণাকে বিরাট গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ নাটক শেষ হওয়ার পর দর্শকের মন-মস্তিষ্কে তার প্রাণ মিশে যায়। নাটক মঞ্চস্থ করার সময় যে আলোকসজ্জা করা হয় এবং যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, সেই আলোকরশ্মি ও তার ঢেউ নাটকের প্রাণের মতোই দর্শক অথবা পাঠকের মন-মস্তিষ্কের গহীনে এবং তার ব্যবহারিক জীবনে চেতন ও অবচেতনভাবে সংক্রমিত হয়ে যায়। এই প্রাণ প্রবাহই মানব মস্তিষ্কের জন্য পথনির্দেশক এবং তার ব্যবহারিক জীবনের জন্য মৌলিক চালিকা শক্তির ভূমিকা পালন করে। নাটকের মধ্যে যে প্রভাব থাকে, তা অনেক সময় সরাসরি প্রভাব ফেলে না।

www.pathagar.com

কারণ নাটকের মঞ্চ বক্তৃতা ও ওয়াজ-নসীহতের মঞ্চ হয় না; বরং নাটকের মঞ্চে হওয়া কথোপকথন, আওয়াজের উত্থান-পতন, শব্দ ও বাক্যের বিনিময় এবং নরম, স্পর্শকাতর ও সূক্ষ্ম পর্দার মাধ্যমে মানব মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে পৌঁছে যায়।

নাটকের মঞ্চে উপস্থাপিত শরীরের অঙ্গভঙ্গি, নড়াচড়া ও রঙিন চিন্তা-চেতনা যখন মানুষের মস্তিষ্কে স্থিত হয়ে যায়, তখন তার অভ্যন্তরের ঢেউ থেকে থেকে বাইরে আঘাত হানে এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রশান্তিকে পেরেশানীতে রূপান্তরিত করে তার ঘুম দূর করে দেয়। তাকে কোনো কাজ উদ্বুদ্ধ করে কিংবা নিরব থাকতে বাধ্য করে। উভয় অবস্থাতেই মানুষ ভাল কর্মকান্ড কিংবা মন্দ অভ্যাসের থাবায় আবদ্ধ থাকে এবং সব ধরনের গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক, পবিত্র-অপবিত্র, পরিষ্কার অপরিষ্কার বাতাস নাটকের জানালা পথে মানব মস্তিষ্কে ঢুকে পড়ে। নাটককে আমরা একজন দক্ষ সার্জনের হাতে এমন ধারালো অস্ত্র বলে আখ্যায়িত করতে পারি, যার ফলে যদিও অল্প অল্প রক্ত প্রবাহিত হয়, কিন্তু তা লাগাতার প্রবাহিত হতে থাকে।

মানবীয় মন-মস্তিষ্ক গঠন, তার চরিত্র ও কর্ম বিনির্মাণে নাটকের অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। এ কারণেই পাশ্চাত্যের শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ব্যক্তিবর্গ নাটককে তাদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, দার্শনিকসুলভ সূক্ষ্ম ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস প্রচার প্রসারের মাধ্যম বানিয়েছে। বিশেষ করে ফ্রান্সের নাস্তিক ধর্মহীন দার্শনিক জাঁপল সার্টার তার ধর্মহীন নস্তিক্যবাদী চিন্তা-চেতনাকে নাটকের ছাঁচে ঢেলে উপস্থাপন করেছে। কারণ সেসব সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর দৃঢ় বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, নাটকের মাধ্যমে সমাজের প্রাচীন আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা পরিবর্তন করে সমাজের সদস্য এবং দলগুলোর জ্ঞান-বিবেক নতুন ছাঁচে ঢালাই করা যেতে পারে।

এক নাট্যশিল্পী 'নাটকের মাধ্যমে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার ওপর আগ্রাসন' শিরোনামে তার এক নিবন্ধে লেখেন, নাটক ও মঞ্চ উভয় জায়গায় সর্বাবস্থায় নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে কেন্দ্রীয় ও মৌলিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এত অসাধারণ গুরুত্ব দেয়া হয়, যাতে প্রকাশ্য হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া এবং সকল নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধকে বাস্তবে পদদলিত করা হয়। ইসলামী ও আরবী বিষয়বস্তুর ওপর প্রদর্শিত নাটকেও অনৈতিক খলচরিত্র দৃশ্য দেখা যায়। নিবন্ধকার প্রসিদ্ধ আরবী নাটক 'বাসর' (প্রাসাদ)-এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন, নাট্যকার তার নাটকে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থাপন করে, যে পূর্ণ অক্ষম ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সে গোটা প্রাসাদে হুইল চেয়ারে বিচরণ করে।

এই প্রাসাদে ভোগ-বিলাসের সকল উপকরণ রয়েছে, কিন্তু এই প্রাসাদে সেসব বস্তুই হারাম, যা জান্নাতে হারাম। এখানে প্রেম-ভালবাসা নিষিদ্ধ, মুহাব্বত নিষিদ্ধ, যৌন কর্মকাণ্ডে নিষেধাজ্ঞা, এমনকি এসব বিষয়ে চিন্তা করাও নিষিদ্ধ। চেতনার ওপরও পাহ-ারা লাগানো আছে। এতদসত্ত্বেও নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রেম-ভালবাসা হয়, উভয়ের মাঝে যে কথোপকথন হয় তা অত্যন্ত অশ্লীল ও নিম্ন প্রকৃতির। শেষ পর্যন্ত ফল এই

www.pathagar.com

দাঁড়ায়, এই জান্নাতের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, জান্নাতের অধিবাসীরা এই অত্যাচারপূর্ণ ও প্রকৃতিবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে হৈ চৈ বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং সেই প্রেম-ভালবাসার অনুসন্ধান ও তা অর্জন করার পেছনে পড়ে, যা ছাড়া মানব জীবন অসম্পূর্ণ ও অসম্ভব। এর প্রমাণ পেশ করা হয়, আদম-হাওয়া জান্নাতের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য আনুগত্য অস্বীকার করেন। এই নাটকে অত্যন্ত শৈল্পিক দক্ষতা ও চাতুর্যের সাথে সংস্কৃতির নামে লোকদের মন-মস্তিষ্ক বিষাক্ত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এই অবস্থা হলো সেই নাটকের, যার ব্যাপারে প্রোপাগান্ডা চালানো হয়েছিল যে, এটি নির্ভেজাল ইসলামী চিত্র পেশ করে।

চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র হলো দু'মুখো তরবারি কিংবা দু'মুখো মুদ্রার মতো। লোকদের চিন্তা-চেতনা, ইচ্ছা-সংকল্প, ধ্যান-ধারণা ও বিবেকের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং অত্যাধুনিক টেকনোলজির মাধ্যমে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের অনুগামী করাই হলো চলচ্চিত্রের মৌলিক উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে সিনেমা ও টেলিভিশন একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। টিভিতে সিনেমা প্রদর্শন করা হলে দর্শকদের ওপর তার যে প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পড়ে, একই প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পড়ে প্রেক্ষাগৃহে বা হলে প্রদর্শন করা হলে, কিন্তু এ কথা আর গোপন নেই যে, এ শিল্পের সূচনায় নির্মাতাদের মাথায় যে উদ্দেশ্য ছিল তা হলো, দর্শকদের বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা, ইচ্ছা-সংকল্প ও পকেট নিয়ে খেলা করা, যুবক-যুবতীদের যৌন চেতনা উত্তেজিত করা, তাদের মধ্যে অনিষ্টের বীজ রোপণ করা এবং তা বিকশিত ও তাতে পানি সিঞ্চন করা।

এর জন্য নমুনাস্বরূপ এমন আচার-আচরণ প্রদর্শন করা হবে, যা অনিষ্ট, ফাসাদ ও বিশৃংখলাকে সুসজ্জিত আকারে উপস্থাপন করবে। অন্য ভাষায়, কল্যাণকে অকল্যাণ এবং অকল্যাণকে কল্যাণ বানিয়ে চিত্তাকর্ষকভাবে দর্শকদের মন-মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেয়া। এটাই ছিল চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মৌলিক উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশে তারা শতভাগ সফলকাম হয়েছে। তার প্রমাণ আমরা পাশ্চাত্য সমাজে বিশেষভাবে এবং গোটা মানব সমাজে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করছি।

চলচ্চিত্রের কারণে মানব সমাজ যেভাবে প্রভাবিত হয়েছে, তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। তদ্রূপ এ বাস্তবতাও সুস্পষ্ট যে, চলচ্চিত্রাঙ্গনের ওপর মানবতার শত্রু ইহুদী অপরাধীদের ধ্বংসাত্মক মস্তিষ্ক ও পরিকল্পনার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ ময়দানে তারা পরিকল্পিতভাবেই অগ্রসর হয়েছে। কারণ ইহুদী প্রটোকলের দস্তাবেজসমূহে 'চলচ্চিত্রাঙ্গনের ওপর ইহুদীদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথা সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। চলচ্চিত্র নির্মাতারা তাদের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যে কাজগুলো আঞ্জাম দিয়েছে তা হলো–

(ক) মানবতার দুশমন ইহুদীরা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মানবতাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। চলচ্চিত্রের কারণে আজ বিশেষভাবে পাশ্চাত্যের যুব সমাজ এবং সাধারণভাবে গোটা দুনিয়ার যুব সমাজ এমন অধঃপতনে পৌঁছে গেছে যে, তারা

www.pathagar.com

সিনেমার নায়কদের নিজেদের মডেল বানিয়ে অপরাধের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। যৌনতা, চারিত্রিক ও আর্থিক অপরাধ, এমনকি হত্যা করতে পর্যন্ত তারা দ্বিধা করে না। তারা এটাও ভালোভাবে জানে, এসব অপরাধ করে শাস্তি থেকে কিভাবে নিজেদের রক্ষা করা যায় এবং পুলিশের জালে যদি আটকাও পড়ে তাহলে কিভাবে তাদের সাথে ফাইট করতে হবে।

(খ) যুবতী মেয়েদের অবস্থা আরো শোচনীয়। তারা এসব সিনেমা দেখে নায়িকা ও অভিনেত্রীদের নিজেদের মডেল হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের মতো আধুনিক ফ্যাশনের এমন নগ্ন লেবাস পরিধান করে এবং এমন এমন অভিনয় করে, যাতে পুরুষ হৃদয় প্রভাবিত না হয়ে পারে না। তাদের নগ্ন, অর্ধ নগ্ন শরীরের ঝাঁকুনি, হৃদয়গ্রাহী অঙ্গভঙ্গি এবং পুরুষকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরার মনোরম দৃশ্য দেখে যুব সমাজ যৌনতার উত্তাল সাগরে হারিয়ে চারিত্রিক মূল্যবোধ পদদলিত করতে এবং পিতা-মাতা ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

মোটকথা, চলচ্চিত্র নির্মাতারা গোটা দুনিয়ার যুব সমাজের যৌন চেতনাকে উত্তেজিত করে স্বাধীন অবাধ মেলমেশার মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছে। মানব সোসাইটি ও পশু সোসাইটির মধ্যে আর কোনো পার্থক্য বাকী থাকেনি। এই সোসাইটি সকল চারিত্রিক মূল্যবোধ শুধু অস্বীকারই করেনি; বরং দলিত মথিতও করেছে। এখন তো জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অন্যায়, অশ্লীলতা, উলঙ্গপনা, নগ্নতা ও অসৎ কর্মকান্ডকে শক্তির বলে মানবতার ওপর চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। কায়রো ও বেইজিং সম্মেলন তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সম্পর্ক

জনসাধারণের পর্যায় সর্বস্তরের লোকের সাথে যদি সরাসরি কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হতো, তাহলে মিডিয়ার জগতে এটি অসাধারণ ক্ষমতা, শক্তি, প্রভাব, গভীরতা এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফলের দিক দিয়ে একটি সর্বোত্তম ও অনন্য নযীর হতো। কারণ সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম থাকলে মিডিয়ার নেতিবাচক দিকসমূহ এবং ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলকে তাৎক্ষণিকভাবে শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ, সমালোচনা-বিশ্লেষণ, আশ্বস্তকারী জবাব এবং প্রমাণভিত্তিক প্রতিবাদ দ্বারা সহজেই মোকাবেলা করা সম্ভব হতো। আর এটাই একমাত্র মাধ্যম, যার দ্বারা তাৎক্ষণিক যে কোনো প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমান করা যায়।

দ্বিতীয় কথা হলো, ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেসব উপাদান উপকরণ ক্রিয়াশীল হয়, তার মধ্যে প্রেম-ভালবাসা, অকৃত্রিম সম্পর্ক, কল্যাণ ও উপকারের বিনিময়, আশানুরূপ শিক্ষার্জন, লাগাতার সাক্ষাত ও মতবিনিময় অন্যতম। আর এসব উপাদান উপকরণ প্রত্যাশিত উদ্দেশ্য অর্জন ও কার্যসিদ্ধিতে বিরাট উপকারী ও সাহায্যকারী হয়।

এর পাশাপাশি আপনার কাছ থেকে সাক্ষাতকার গ্রহণকারী যখন কোনো ক্যামেরা বা টেপ রেকর্ডার ছাড়াই আপনার সাথে কথাবার্তা বলে এবং আপনার জবাব ও

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়ার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে থাকে আর আপনার অভিযোগের তাৎক্ষণিক জবাবও প্রদান করতে থাকে, তখন এর সুস্পষ্ট মর্ম হলো, এ ক্ষেত্রে সাক্ষাতকার গ্রহণকারী কিংবা স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির স্বীকৃতি আদায়কারীর নিকট কেবল তার নির্ধারিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই সামনে থাকে। তার মূল টার্গেট থাকে, কিভাবে আপনি তার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ঐক্যমত হয়ে যাবেন। এভাবে মিডিয়ার পয়গাম আপনার নিকট পৌছাতে সে সক্ষম হয়ে যায়। আপনি অনুভবও করতে পারবেন না, সাক্ষাতকার গ্রহণকারীর প্রশ্নাবলীর ছাঁচে কিভাবে আপনি ঢলে গেছেন এবং অতি দক্ষতা, পান্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিন্যাসিত তার প্রশ্নাবলীর জালে কিভাবে আপনি ফেঁসে গেছেন।

গুজব ছড়ানো

মিডিয়াতে গুজব ছড়িয়ে বড় বড় মৌলিক উদ্দেশ্য অর্জন করা হয়। কোনো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত দক্ষতা ও চতুরতার সাথে অতি পরিকল্পিতভাবে গুজব ছড়ানো হয়। এই গুজব একেবারে নিম্ন পর্যায়ের জনসাধারণ থেকে ওঠানো হয়। মিডিয়া বিশেষজ্ঞ ও প্রোপাগান্ডাকারীদের নিকট এর উদ্দেশ্য থাকে, জনগণের মধ্যে যে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, তা দ্বারাই যেন তাদের মন-মস্তিষ্ক তৈরি হয়।

এসব গুজব ছড়ানোর মৌলিক উদ্দেশ্য, সামাজিক স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত ইমারত ধসিয়ে দিয়ে তাদের মাঝে অনৈক্য বিশৃংখলা সৃষ্টি করা এবং অভিজাত লোকদের ইজ্জত-সম্মানের ওপর হামলা করা।

মিডিয়ার গুজবকে এমন বলের সাথে তুলনা করা হয়, যা এক খেলোয়াড় থেকে আরেক খেলোয়াড়ের কাছে, তার থেকে আরেকজনের কাছে, এভাবে জনগণের মাঝে ঘুরতে ফিরতে থাকে। মিডিয়া বিশেষজ্ঞরা গুজবের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সৃষ্ট অস্থিরতা ও বিশৃংখলা শান্ত করার এবং তাদের ক্রোধ, ক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা করে। জনগণের মধ্যে যখন হতাশা, নিরাশা ও ব্যর্থতা জমাট বেঁধে যায়, তখন গুজবের মাধ্যমে জনরোষ স্তিমিত করে তাদের আশার আলো দেখায়। এভাবে গুজবের কিশতি তাদের জন্য উত্তাল সমুদ্রে নিরাপদে কিনারায় পৌছার মাধ্যমে পরিণত হয়। গুজবের বৈশিষ্ট্য হলো, তা জংগলের আগুনের মতো অসাধারণ দ্রুততা ও ক্ষিপ্রতার সাথে প্রসারিত হয়ে যায়। মানুষের মুখে মুখে তা ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি ব্যক্তি তা শুনে প্রশান্তি লাভ করে। যখন শত্রুর পক্ষ থেকে গুজব ছড়ানো হয়, তখন তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পুরোপুরি নিঃশেষ করা কঠিন বরং অসম্ভব হয়ে পড়ে। মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে গুজব সবচেয়ে সক্রিয় ও শক্তিশালী অস্ত্র। মিডিয়া বিশেষজ্ঞগণ এর ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে খুব ভালভাবেই ওয়াকিফহাল রয়েছেন।

প্রোপাগান্ডা ও মনস্তাত্ত্বিক লড়াই

বিশেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রোপাগান্ডা একটি কার্যকর ও সক্রিয় অস্ত্র। অতি পরিকল্পিতভাবে অত্যন্ত দক্ষতা ও চতুরতার সাথে এই প্রোপাগান্ডা চালানো হয়। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, সংশয়পূর্ণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অধীনে ব্যক্তি ও দলের ওপর

www.pathagar.com

প্রভাবশীল হওয়ার এবং তাদের আদত-অভ্যাস, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ ও চিন্তাধারা-দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর চেষ্টা-প্রচেষ্টার নাম প্রোপাগান্ডা। যার সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট সমাজ, বিশেষ সময় এবং গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের সাথে। প্রোপাগান্ডার দ্বিতীয় সংজ্ঞা বলা হয়েছে, সাধারণ ও জাতীয় মিডিয়াকে বিশেষ নির্দিষ্ট কোনো দলের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মেধা-মনন, আবেগ-অনুভূতির ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা-প্রচেষ্টার নাম প্রোপাগান্ডা। সে উদ্দেশ্য সামাজিক, অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক যাই হোক।

প্রোপাগান্ডার সংক্ষিপ্ত তৃতীয় সংজ্ঞা হচ্ছে, মিডিয়ার মাধ্যমে নিরপেক্ষ দল বা শত্রুদলের সদস্যদের মন-মানস, মেধা-মনন, অভ্যন্তরীণ অনুপ্রেরণা এবং আবেগ-অনুভূতির ওপর বিশেষ কর্ম-কৌশল এবং প্রযুক্তির অধীনে প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা-প্রচেষ্টার নাম। এদিক থেকে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে প্রোপাগান্ডা মৌলিক সঞ্চালক শক্তি ও কার্যকর হাতিয়ার। এক জার্মান নেতা এর বাস্তবতা, গুরুত্ব ও উপকারিতার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, শত্রুর অস্ত্রাগার বরবাদ করার জন্য আমরা বোমা ব্যবহার করি, কিন্তু যে মস্তিষ্ক তোপ-কামান ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে সে মস্তিষ্ককেই পরিবর্তন করে দেয়া কি এর থেকে উত্তম ও উপযুক্ত নয়, যাতে সে হাত আর চলতে না পারে যে হাত তোপ-কামান ব্যবহার করে।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন উপকরণ ও মাধ্যমের অধীনে প্রোপাগান্ডার প্রয়োগ ও ব্যবহার করা হয়। আরব-ইসরাঈলের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধসমূহে ইসলামী দাওয়াতের কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়নি। ইসলামী দাওয়াতের স্থান অনৈসলামিক উপকরণ ও মাধ্যমগুলো দখন করে নিয়েছে। এই অনৈসলামিক প্রোপাগা া দ্বারা না ইসলামী উদ্দেশ্য অর্জিত হয় আর না অজ্ঞদের পথপ্রদর্শন ও তাদের চিন্তাধারার বিনির্মাণ সম্ভব হয়। অপরদিকে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অধীনে গোটা বিশ্বে প্রোপাগান্ডার পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত বিভিন্ন রূপ ও পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। এর সবগুলো পদ্ধতিই সমাজের মানদন্ড অনুযায়ী সফল। এতে কেউ একমত হোক বা না হোক। উদাহরণস্বরূপ আর্জেন্টিনা ও ব্রিটেনের মাঝে ফাকল্যান্ড সংকট সৃষ্ট যুদ্ধের সময়, পানামার সরকার উৎখাত, গ্রানাডার ওপর আক্রমণ চালানো ও ভারতে বাবরী মসজিদ শহীদ করার সময় প্রোপাগান্ডা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৫]

প্রোপাগান্ডার প্রকার

প্রোপাগান্ডার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন–

সাদা প্রোপাগান্ডা : প্রোপাগান্ডার এই প্রকার শীর্ষস্থানীয়, অত্যন্ত ব্যাপক ও সুস্পষ্ট। এর মূল উৎস সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যম। বিশেষ করে সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, রেডিও এবং টিভিকে বিশেষ নির্ধারিত উদ্দেশে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উন্মুক্ত মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে এগুলো বেশি সহায়ক প্রমাণিত হয়।

---

৫. বাবরী মসজিদ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম তা বিতর্কিত বাবরী মসজিদ 'রাম জন্মভূমি', অতঃপর রাম জন্মভূমি বাবরী মসজিদ, অতঃপর মসজিদের বিতর্ক কাঠামো এবং তা স্থানান্তর, এসব প্রোপাগান্ডা চালিয়ে অবশেষে মসজিদের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

www.pathagar.com

কালো প্রোপাগান্ডা : প্রোপাগান্ডার এই প্রকার অত্যন্ত গোপনীয়। অতি সংগোপনে এ প্রোপাগান্ডা চালানো হয়, যার মূল গোপন আলোচনা। এর প্রকৃত উৎস অত্যন্ত গোপন থাকে। অতি গোপনীয়ভাবে এটি প্রসারিত ও প্রভাবশীল হয়। কালো প্রোপাগান্ডা শত্রুর ভূ-খন্ড কিংবা তার সীমান্তের কাছাকাছি চলতে থাকে। ঠান্ডা লড়াইয়ে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গোয়েন্দা সংস্থা এ মিশন পরিচালিত করে। প্রোপাগান্ডার এই প্রকারকে ফিফ্থ কলামিস্ট বা পঞ্চম কলাম বলা হয়।

হলুদ প্রোপাগান্ডা : প্রোপাগান্ডার এই প্রকার বিভিন্নমূখী উৎসের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। এ ধরনের প্রোপাগান্ডাকারীরা তাদের মূল উৎসের প্রকাশ পাওয়াকে সামান্যও পরোয়া করে না।

প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্য

প্রোপাগান্ডার মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ :

০১. শত্রু শিবিরের মাঝে অনৈক্য অস্থিরতা সৃষ্টি করা।

০২. সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীকে নাফরমানী ও অবাধ্যতায় উদ্বুদ্ধ করা।

০৩. জনসাধারণকে নেতৃস্থানীয়দের আনুগত্যের বিপরীত বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করা।

০৪. জনগণের মাঝে জাতীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করা।

০৫. জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি সর্বসাধারণ মানুষের আস্থা-বিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত করা।

০৬. শক্তিশালী নেতৃত্বকে দুর্বল করা।

০৭. কোনো বিশেষ ইস্যুতে মন-মানস পরিবর্তন করে দেয়া, প্রকৃত ঘটনা বিকৃত করে পেশ করা এবং জনগণের মাঝে প্রকাশ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করা।

০৮. মিডিয়ার সপক্ষ সমাজের গুণাবলী ও সৌন্দর্য ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার করা এবং বিপক্ষ সমাজের সৌন্দর্য বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে কালে ভদ্রে সংঘটিত ঘটনাবলীকে বাড়িয়ে ছাড়িয়ে পেশ করা, নিন্দা-মন্দ করা এবং দোষ-ত্রুটি ও ছিদ্রান্বেষন করা।

০৯. সাধারণ দুর্বলতাকে বড় করে প্রচার করা।

১০. উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পশ্চাদপদতার বিষয়ের ওপর জোর দেয়া।

প্রোপাগান্ডার মানদন্ড

পোপাগান্ডার দু'ধরনের মানদন্ড হয়ে থাকে।

০১. টেকনিক্যাল। ০২. স্ট্র্যাটেজিক্যাল।

টেকনিক্যাল প্রোপাগান্ডা

ক. প্রোপাগান্ডার জন্য বেশির থেকে বেশি উত্তম ও উপযুক্ত লোকদের সমর্থন অর্জন করা।

খ. প্রস্তাবিত প্রোপাগান্ডার জন্য অনুকূল ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে সমাজ তা গ্রহণ করে।

গ. জনসাধারণের প্রয়োজন, প্রাধান্য দানকরা বিষয়সমূহ এবং চাহিদা ও দাবী অনুসন্ধান করা, যাতে প্রোপাগান্ডার সময় তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনকে ধারাবাহিক ও বিন্যাসিত আকারে দৃষ্টিতে রাখা যায়।

www.pathagar.com

স্ট্র্যাটেজিক্যাল প্রোপাগান্ডা

ক. সমাজের সমস্যা সম্পর্কে মানুষের পূর্ণ রাজি-খুশি ও পছন্দের ওপর ভরসা না করা।

খ. সমাজের নতুন কর্মতৎপরতাকে বাস্তবতার লেবাস পরিধান করার প্রচেষ্টা চালানো এবং সেসব দিকগুলো সামনে নিয়ে আসা, যা মৌলিক চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করে। এটি ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডার বৈশিষ্ট্য।

গ. নতুন সমস্যাগুলোকে উত্তেজিত করা, যাতে সমস্যাগুলোর ইসলামের আলোকে স্থায়ী সমাধান চাওয়ার পরিবর্তে বহিরাগত চিন্তাধারার আলোকে সমাধান করতে লোকদের বাধ্য করা।

প্রোপাগান্ডার পদ্ধতি

প্রোপাগান্ডার বিভিন্ন ধরন রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত ধরনগুলো তুলনামূলক বেশি প্রসিদ্ধ।

০১. সূক্ষ্ম পদ্ধতি : এ পদ্ধতির সম্পর্ক সেসব জাতিগোষ্ঠীর সাথে, যারা উন্নত জীবন মানে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এই পদ্ধতি সাধারণত খুবই কার্যকর ও ফলপ্রসূ।

০২. পুনরাবৃত্তির পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে প্রোপাগান্ডাকারী সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত হয়ে যায় যে, প্রচলিত প্রোপাগান্ডা মন মস্তিষ্কে গেঁথে গেছে।

০৩. দীনী পদ্ধতি : ইসলামী সমাজে এ নামের কোনো প্রোপাগান্ডা চলতে পারে না। কারণ ইসলামে প্রকৃতপক্ষে দীনী পদ্ধতি ও পার্থিব পদ্ধতি বলে ভিন্ন কিছু নেই। নিঃসন্দেহে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দীন, পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, কিন্তু অন্যান্য সমাজে দীন ধর্মকে কিছু কাল পর্যন্ত প্রোপাগান্ডার সেবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

০৪. মিথ্যা ও অপবাদ আরোপ পদ্ধতি : এই পদ্ধতির মধ্যে মিথ্যা, বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভারতের বাবরী মসজিদ, গিয়াঁপী মসজিদ ও মথুরার ঈদগাহ সম্পর্কে হিন্দুদের প্রোপাগান্ডা এবং ফিলিস্তিন বিষয়ে ইসরাঈলের প্রোপাগান্ডা।

০৫. গান ও সংগীতের পদ্ধতি : এই পদ্ধতি জেহাদী চেতনা উজ্জীবিত করা, জালেমের বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা সৃষ্টি করা, মজলুমের সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং দেশ জাতির হেফাযতের উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ, উপকারী ও কার্যকর।

০৬. উত্তেজনাকর শ্লোগানের পদ্ধতি : এই পদ্ধতির আসল উদ্দেশ্য হলো, কাপুরুষ নেতাদের হুমকিমূলক প্রচার-প্রচারণা, বক্তৃতা-বিবৃতি এবং ঐক্য-উন্নয়ন, তাহযীব-তামাদ্দুন, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, ইনসাফ-সমতা, গণতন্ত্র ও সচ্ছলতার শ্লোগানের পুনরাবৃত্তি করা। ভারতে বাবরী মসজিদ শহীদ করার ক্ষেত্রে এসব উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তৃতা বিবৃতি ও শ্লোগানের বিরাট ভূমিকা রয়েছে, যা এ ঘটনার পক্ষ-বিপক্ষের নেতারা বিভিন্ন সময় দিয়েছে। যেমন, আমরা রক্তের লোহিত সাগর সৃষ্টি করে দেব, রক্তের বন্যা বইয়ে দিব। আমরা প্রয়োজনে মাথার কুতুব মিনার বানাব। দিল্লী থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত

www.pathagar.com

পথে যত মন্দির রয়েছে, আমরা তার সবগুলো মিসমার করে দেব। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শ্লোগান–মুসলিমদের রাস্তা দুটোই। হয় পাকিস্তান না হয় কবরস্তান। তেল লাগাও ডাবরের নাম মেটাও বাবরের।

০৭. **জবাবী প্রোপাগান্ডা :** আমরা এখানে ইসলামের জবাবী প্রোপাগান্ডার কথা উল্লেখ করব। এই প্রোপাগান্ডা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় বস্তুগত টেকনিক দ্বারা সুসজ্জিত। প্রোপাগান্ডাকারীরা টিকটিকির মতো রঙ পরিবর্তন করে। কখনো কখনো বাস্তব ঘটনাবলী সংক্রান্ত তাদের ডকুমেন্টগুলো আগ্নিতে ভস্মীভূত করে দেয়। অতঃপর আফসোস করতে থাকে। ইসলামের জবাবী প্রোপাগান্ডাকে আমরা নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলীর আলোকে আমাদের জন্য আরো বেশি কার্যকর ও ফলপ্রসূ বানাতে পারি। জবাবী প্রোপাগান্ডার সফলতার প্রথম মৌলিক শর্ত হলো কিতাব ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং তার শিক্ষার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা। শত্রুর প্রোপাগান্ডাকে দীন ও শরীয়তের মাপকাঠিতে পরিমাপ করে তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর বিশ্লেষণ করা, যাতে তার বাস্তবতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

০৮. শত্রুর প্রোপাগান্ডার দুর্বল দিকগুলো অনুসন্ধান করে তার ওপর আঘাত হানা। সরাসরি শত্রুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা। কারণ এতে শত্রু আরো শক্তিশালী ও সুসংগঠিত হয়।

০৯. শত্রুর প্রোপাগান্ডার জন্য বিরূপ পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস চালানো। এমনকি যাতে মিডিয়ার ওপরও তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া না পড়ে। (সূত্র : তা'মীরে হায়াত–১৯৯২, জানুয়ারী সংখ্যা)

লবিংয়ের আধুনিক সিস্টেম

প্রোপাগান্ডার উন্নত ও অত্যাধুনিক পদ্ধতি হলো লবিং (Lobbying)। লবিংয়ের অর্থ জনমত গঠন করা এবং কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য কোনো শ্রেণীর ওপর চাপিয়ে দেয়া। প্রোপাগান্ডার মতো এ লবিংও একটি নিয়মতান্ত্রিক পেশার রূপ ধারণ করেছে। এ উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন সরকার ও সংগঠন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। এ ময়দানে বিত্ত-বৈভবের কারণে ইহুদী গোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি এগিয়ে রয়েছে। আমেরিকা ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশে ডজনে ডজনে ইহুদী সংস্থা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের কাজই শুধু লবিং করা। বিশেষ করে আমেরিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এর অসাধারণ গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ সেখানে সরকারের কর্মকান্ডের পরিধি অনেক ব্যাপক বিস্তৃত হয়ে গেছে এবং সমস্যাও সংখ্যা ও ধরন-ধারনের দিক থেকে অনেক বেড়ে গেছে। এ জন্য কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে কংগ্রেস সদস্যদের সরকার ও পার্লামেন্টের বাইরে বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করতে হয়।

এই প্রয়োজন লবি সৃষ্টিকারী অসংখ্য পেশাদার সংগঠনের জন্ম দিয়েছে, যারা কংগ্রেসের সদস্যবর্গ ও তাদের সহকারীদের সাথে শুধু যোগাযোগই করে না; বরং তাদের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করার অস্ত্রও প্রয়োগ করে। যার মধ্যে জরুরী আইনী নীতিমালার গবেষণা-পর্যালোচনা, বিজ্ঞাপন প্রচার এবং রেডিও-টিভিতে টকশো ছাড়াও

সংশ্লিষ্ট সরকারী সদস্যদের নিকট জনগণ থেকে ফোন, চিঠিপত্র ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে দাবী-দাওয়া পেশ করানোর কাজও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে লবিংকারী সংগঠন ও গণসংযোগকারী প্রতিষ্ঠানের মাঝে পার্থক্য রয়েছে, সেটা দৃষ্টিতে রাখা জরুরী। যদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উভয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এক অভিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু লবিংকারী প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো মার্কিন কংগ্রেসের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং আইন প্রণয়নে যে কোনো ধরনের জটিলতার মোকাবেলা করা। আর গণসংযোগকারী প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো মিডিয়ার মাধ্যমে কোনো কাজের প্রতি জনগণের সমর্থন ও বিরোধিতাকে প্রভাবিত করা। অনেক সময় লবিংকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মিশনে সফলতার জন্য গণসংযোগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য ও সেবা গ্রহণ করে।

দুনিয়ার অন্যান্য সরকারের মোকাবেলায় মার্কিন সরকারের কর্মকান্ডের ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্যান্য দেশে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা আইনের কোনো পরিবর্তন ও সমর্থনের জন্য সরকারের দু'চার জন ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখলেই যথেষ্ট, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ কাজের জন্য হাজার হাজার ব্যক্তিকে আন্দোলিত করতে হয় এবং এটিকে গণমুখী রূপ দিতে হয়।

ওয়াশিংটনে বিদেশী বিভিন্ন সরকারের জন্য লবি সৃষ্টি করা একটি নিয়মতান্ত্রিক শিল্পে পরিণত হয়েছে। কারণ আমেরিকা গোটা বিশ্বের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। আমেরিকার মর্জি ছাড়া বিশ্বের কোনো সরকারই এককভাবে কিছু করতে পারে না। এজন্য মার্কিন প্রশাসনে প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানো কিংবা তার দৃষ্টি আকর্ষণে প্রচেষ্টারত দেশের সংখ্যা বিগত কয়েক বছরে বিশেষ করে ঠান্ডা লড়াইয়ের পরিসমাপ্তির পর থেকে খুব দ্রুত বেড়ে গেছে।

অনেক ছোট দেশ রয়েছে, যারা পূর্বে আমেরিকা বিরোধী ছিল, কিন্তু এখন তারা আমেরিকার সমর্থনের আকাঙ্খী। এসব দেশ ও সরকার সরাসরি মার্কিন প্রশাসন কিংবা পার্লামেন্টের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না, এর জন্য লবির দরকার হয়। ফলে এখন লবির প্রয়োজন সীমাহীন বেড়ে গেছে। বর্তমানে আমেরিকায় নয়শ' বিয়াল্লিশটি লবি শুধু বিদেশী গ্রাহকদের জন্য কাজ করছে। এসব লবির মধ্যে শুধু ইসরাঈলের জন্য কাজ করছে প্রায় দেড়শ' প্রতিষ্ঠান, যাদের বার্ষিক বাজেট এক কোটি ডলার। (আশ-শারকুল আওসাত পত্রিকা, ১০ ডিসেম্বর-১৯৯৪)

এসব লবি বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সংস্থা ও মিডিয়ার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে ইসরাঈলের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও এসব লবি খোদ আমেরিকায় বসবাসরত ইহুদীদের বিভিন্ন সমস্যা সংকটে জনমত সৃষ্টির কাজ করে। নির্বাচন ও আইন প্রণয়নের সময় এসব লবির কর্মতৎপরতা আরো বেড়ে যায়। এছাড়া সারা দুনিয়ায় ইহুদীদের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এসব লবি ইহুদী মিডিয়া ও কূটনৈতিক মিশনগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ বাগিয়ে নেয়।

www.pathagar.com

মাঠ পর্যায়ে জরিপ : মিডিয়া বিশেষজ্ঞগণ যখন দর্শক-শোতাদের জন্য অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করে তখন তারা এ বিষয়ের প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে যে, এসব অনুষ্ঠান দর্শক-শ্রোতারা কতটুকু পছন্দ কিংবা অপছন্দ করেছে। এ উদ্দেশে তারা মাঠ পর্যায়ে জরিপ করে এবং সর্বস্তরের লোকদের কাছে তাদের পছন্দনীয় অনুষ্ঠান ও তার ধরন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। এরপর তারা এই জরিপের আলোকে সেসব অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে, যাতে অনুষ্ঠানমালা উপভোগকারীদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পায় এবং এর পরিধি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়।

যারা টিভি অনুষ্ঠান উপভোগ করে তাদের মধ্যে বেশির ভাগ শিশু, যারা সাধারণত অনুসরণ অনুকরণপ্রিয় হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে শিশুদের ওপর টিভি কি প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ফেলছে, সে সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে যে বিচার-বিশ্লেষণ ও জরিপ করা হয়েছে, তার আলোকে যে বাস্তবতা ফুটে ওঠে তা হলো, টিভির অনুষ্ঠান দ্বারা শিশুরা এ পরিমাণ প্রভাবিত হয়, যেমন কেউ শিক্ষা-দীক্ষা অর্জনের পূর্বে কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি চোখ ও কান দিয়ে শিখে প্রভাবিত হয়। আধুনিক জরিপ থেকে জানা গেছে, টিভির যুগে বিকশিত শিশুরা টিভি থেকেই জীবনের মৌলিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

শিক্ষিত ও বিবেকবান লোকেরা যখন কাউ বয় অথবা জেমস বন্ডের সিনেমা দেখতে থাকে তখন তাদের ওপর পিনপতন নিরবতা ছেয়ে যায়। তারা রঙীন সোনালী স্বপ্নের মহাসাগরে হারিয়ে যায়, বাহ্যিক জ্ঞান লোপ যায়, কিন্তু শিশুরা যখন এই সিনেমা দেখে তখন চোখের সামনে অতিবাহিত সকল ঘটনাবলীর বিস্তারিত ও শাখা-প্রশাখা সব কিছুর ওপর তাদের দৃষ্টি থেমে যায়। টিভি স্ক্রিনে যখন তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তখন তারা রাইফেল, রাইফেলের গুলি, ঘোড়ার দৌড়ঝাঁপ, কথোপকথন, মাথার হেট, চেহারার বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, মোটকথা সকল নড়াচড়া ও অভিনয়ের ওপর তাদের দৃষ্টি নিথর হয়ে যায়। এমনকি সিনেমায় প্রদর্শিত যুদ্ধ গোলা-গুলি বিনিময়সহ সব ধরনের সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর প্রতিও তারা পূর্ণরূপে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। তারা টিভির বিভিন্ন ছবি এমন আনন্দ ও মনোযোগের সাথে দেখে, যেমন তারা একেবারে শৈশবকালে বিভিন্ন রঙিন বস্তু দেখে মজা অনুভব করে।

আধুনিক মাঠ জরিপ এটাও বলে যে, শিশু ও বয়স্ক লোকেরা যখন টিভি দেখে তখন তারা টিভির অনুষ্ঠানমালার ঘটনাবলী ও দৃশ্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিনাবাক্যে গ্রহণ করে নেয়। শিশুরা সিনেমার সকল বিষয় বড়দের তুলনায় বেশি ভালো স্মরণ রাখতে পারে। এর মৌলিক কারণ হলো, শিশুরা তাদের অল্প বয়সে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি এবং শ্রবণ শক্তির মাধ্যমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন বেশি পছন্দ করে। অন্য ভাষায় আমরা এই ফলাফল বের করতে পারি, শিশুরা টিভি ও সিনেমার সক্রিয় ছবিগুলো তাদের সীমিত মেধা-মননে ভালভাবে গেঁথে নেয়। তাদের শিরা-উপশিরায় এর মর্ম সংক্রমিত হয়ে যায়। অতঃপর যখন এই শিশু বড় হতে থাকে তখন ক্রমেই তার মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া গভীর, স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী হতে থাকে। সিনেমার পাশাপাশি হাস্য-রহস্য,

www.pathagar.com

কৌতুক ও কার্টুনের প্রতিও শিশুদের সীমাহীন ঝোঁক রয়েছে। অল্প বয়স্ক শিশুরা কৌতুক, কার্টুন ও গোয়েন্দা সিরিজ সীমাহীন আগ্রহ ও গুরুত্বের সাথে উপভোগ করে। তাদের পরিবেশের বাইরের যেসব জিনিস রয়েছে, যেমন রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা নভেল, ঔপন্যাসিক ব্যক্তিত্ব, কাল্পনিক ঘটনাবলী ও দাস্তানের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বাস্তব মনে করে গ্রহণ করে।

শিশুদের এই মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে মিডিয়া বিশেষজ্ঞরা টিভি গেমস অথবা ইলেক্ট্রনিক খেলাধুলা আবিষ্কার করেছে। এর মাধ্যমে তারা দুর্বল শিশুদের মন-মস্তিষ্ক ও আবেগ-অনুভূতির ওপর হানা দেয়; বরং বলা চলে নৈশ আগ্রাসন চালায়। কল্যাণ ও অকল্যাণের যুদ্ধে ঔপন্যাসিক পদ্ধতিতে কল্যাণকে পরাজিত ও অকল্যাণকে বিজয়ী করে দেখানো হয়। এভাবে পশ্চিমা মিডিয়া কুফুরী আকীদা-বিশ্বাস ও গ্রীক মূর্তি নির্মাণ বিজ্ঞানকে নতুন প্রজন্মের মন-মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিয়ে সেভাবেই তাদের গড়ে তোলে। এটি পশ্চিমা মিডিয়ার এক নিরব যুদ্ধ।[৬]

মিউজিক, ফিল্ম স্পোর্টস, গবেষণা, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাজার হাজার ক্যাসেট ও মুভি গোটা বিশ্বে অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করা হয়। কুফর, শিরক ও কুসংস্কারে ভরপুর কার্টুন ও মুভির মাধ্যমে শিশুদের নিষ্পাপ সাদাসিধা মন-ফলকের ওপর কালিমা লেপে দেয়া হয়। এসব কার্টুন ও মুভিতে সাধারণত দাড়ি বিশিষ্ট মানুষদের শয়তান ও ভূত-দৈত্য বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়, যাদের বিবেক-বুদ্ধির উর্ধ্বে অলৌকিক শক্তি অর্জিত থাকে। তারা আকাশে উড়তে থাকে, বড় বড় পাহাড়-পর্বত টুকরো টুকরো করে দেয় এবং আকাশচুম্বী সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়।

অল্প বয়স্ক দর্শকদের ওপর টিভি ও সিনেমার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার কম বেশি সে ফলই সামনে আসে, যা যুবকদের ওপর হয়ে থাকে। কেননা, যৌবনকাল মনস্তাত্ত্বিক দাবীসমূহের নিরিখে ধ্যান-ধারণার প্রশস্ততা, কল্পনাবিলাস এবং জাগ্রত থেকে সোনালী স্বপ্ন দেখা, নানা প্রকার মনস্তাত্ত্বিক আগ্রহ আকর্ষণ, অনুসন্ধিৎসা এবং নিজেকে প্রকাশের কঠোর কামনা-বাসনা ও আকাঙ্খার সময়কাল হয়ে থাকে। এ সময় একজন যুবক এমন সামাজিক জীবনের চৌকাঠে পা রাখে, যেখানে চিত্তাকর্ষক এবং বিপরীতমুখী কামনা-বাসনার সাথে তার পালা পড়ে। যদিও সে সরাসরি এসব উপভোগ করে না, কিন্তু তার আস্বাদ গ্রহণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে থাকে। এমনও হয় যে, সে কল্পনা জগতে সেই জীবন উপভোগ করে এবং এ জীবনের সাথে বিনিময়যোগ্য কিছু দ্বারা পরিতৃপ্ত লাভ করে। যাতে সে ভবিষ্যত সম্ভাব্য জীবনে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের জন্য নিজেকে তৈরি করতে পারে।

---

৬. দৈনিক আল মদীনা পত্রিকা পাশ্চাত্যের এই অসাধারণ শক্তিশালী, কিন্তু নিরব যুদ্ধ ভিডিও গেমসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করে এবং শেরেকী বিষয়বস্তুসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে। পত্রিকাটি ভিডিও গেমসের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপের দাবীও তোলে, কিন্তু এ আহবান কোনো তাওহীদবাদীর কানে পৌঁছাতে পারেনি।

www.pathagar.com

একজন যুবক তার যৌবনকালে সেসব সিনেমা এবং সিরিজের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণবোধ করে, যেগুলো হাসি-কৌতুকপূর্ণ এবং হাসার ও হাসানোর বিষয়বস্তু রয়েছে, যেগুলো তার আবেগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনা এবং ঘুমন্ত কামনা-বাসনা, আগ্রহ আকাঙ্খাকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে তুলবে। এসব সিনেমা দেখে একাল যুবক তার অপরিপক্ব এবং দাবিয়ে রাখা অনুভূতি বাইরে নিয়ে আসে।

এ সময়কালে একজন যুবক সেসব বিষয়বস্তু এবং কাহিনী পছন্দ করে, যা তার মাঝে অনুসন্ধিৎসা, তত্ত্ব-তালাশের যোগ্যতা এবং আগ্রহ-আকর্ষণ সৃষ্টি করবে। সে অতি তাড়াতাড়ি সেসবের পরিণতি এবং উপায় উপকরণ ও কার্যকারণ সম্পর্কে অবহিত হতে চায়। তাই সে গোয়েন্দা সিনেমা, কাউ বয় এবং জেমস বন্ডের সিনেমাগুলো অত্যন্ত সাগ্রহে সোৎসাহে গভীর নিমগ্নতার সাথে দেখে। সে এমন সিনেমার নায়ক অভিনেতাদের নিজের জীবনের আদর্শ বানিয়ে নেয়। তাদের মতো আচার-আচরণ, নড়াচড়া, স্থিতি, তাদের মতো কথোপকথন, তাদের ফ্যাশন অবলম্বন তো নিজের জীবনের সর্বোচ্চ সফলতা বলে অভিহিত করে। এভাবে একজন যুবক সময়ের আগেই সামাজিক জীবনে প্রবেশ করে।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

ইসলামী মিডিয়া : দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতি

ইসলামে মিডিয়ার দীনী গুরুত্ব

নিম্নবর্ণিত বুনিয়াদগুলোর ভিত্তিতে ইসলামে মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম।

০১. ইসলামের আবির্ভাব গোটা বিশ্ব ও সমগ্র মানবতার জন্য। আর আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও মালিক। সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরামাণু তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়।

০২. যে ব্যক্তিই এ দীন গ্রহণ করবে, তার ওপর এ দীন অন্যের নিকট পৌছানোর দায়িত্বও অনিবার্যভাবে এসে যায়। স্ব স্ব যুগে প্রত্যেক নবী-রাসূল এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন হাদীসেও এর তাগিদ এসেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আপনার পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়।' (সূরা আন নাহল–১২৫)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আমার পক্ষ থেকে তোমরা যাই জান, তাই পৌছে দাও। যদিও তা একটি আয়াতই হোক।'

রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যত্র বলেন, 'আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনল অতঃপর তা অন্যের নিকট পৌছে দিল।'

০৩. শেষ নবী, তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ ও পর্যায়ক্রমে পরবর্তীদের দায়িত্ব এ দীন অন্যের নিকট পৌছে দেয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'রাসূলের দায়িত্ব শুধু পৌছে দেয়া।'

০৪. ইসলামের পয়গাম অন্যের নিকট না পৌছানো বড় গুনাহ। কারণ তখন তা একরকম ইসলাম গোপন করার শামিল হবে। এজন্য প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য করণীয় হলো জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দীনের পয়গাম অন্যের নিকট পৌছাতে থাকা। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে দীনের বাণী অন্যের নিকট পৌছাতে গিয়ে যে সীমাহীন দুঃখ-যাতনা ও অবর্ণনীয় জুলুম নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, ইসলামী ইতিহাসে তা ভরপুর।

www.pathagar.com

মিডিয়া ও দাওয়াত

পবিত্র কুরআনে মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যমের অর্থ প্রকাশ করার জন্য 'দাওয়াহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা একটি অতি ব্যাপক, বিস্তৃত, সাহিত্যপূর্ণ, অলংকারপূর্ণ ও শক্তিশালী শব্দ। এর বিকল্প অন্য কোন শব্দ নেই। 'দাওয়াহ' শব্দ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-'আপনার পালনকর্তার পথের প্রতি (দাওয়াত) আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়।' (সূরা আন নাহল-১২৫)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন।' (সূরা আনফাল-২৪)

আরো ইরশাদ হয়েছে, 'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই সফলকাম।' (সূরা আলে ইমরান-১০৪)

আরো ইরশাদ হয়েছে, 'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত দাওয়াত দিয়েছি।' (সূরা নূহ-৫)

কুরআনের আলোচ্য আয়াতগুলোর 'দাওয়াত বা আহবান' শব্দ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়, ওলামায়ে কেরাম ও দীনদার শ্রেণীর দায়িত্ব হলো আল্লাহ ও তাঁর দীন ইসলামের প্রতি মানুষকে আহবান করা। এ বিষয়ে 'দাওয়াহ' শব্দটি অন্যান্য শব্দের তুলনায় অতি ব্যাপক বিস্তৃত এবং এর মধ্যে দাঈ'র দাওয়াতী কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতাও চিহ্নিত হয়ে যায়। 'দাওয়াহ' শব্দ দ্বারা যে মর্মার্থ ফুটে ওঠে তা নিম্নরূপ-

ক. দাওয়াহ পরিভাষার মধ্যে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর নিকট পয়গাম পৌঁছানো কিংবা সীমিত ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের নিকট আহবান পৌঁছানো উভয়ই শামিল রয়েছে। এই পরিভাষার মধ্যে পথনির্দেশ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের গুণ-বৈশিষ্ট্য পাওয়া পাওয়া। পাশাপাশি এতে দাওয়াতে সম্বোধিত ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার কথাও রয়েছে, যাতে দাওয়াত নিশ্চিতভাবে সফলকাম ও ফলপ্রসূ হয়।

খ. দাওয়াহ পরিভাষার মধ্যে সম্বোধিত ব্যক্তির ব্যাপারে দাঈ'র যিম্মাদারী বা দায়িত্ববোধও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সে দায়িত্ববোধ হলো, দাওয়াতের প্রতি দাঈ'র পূর্ণ আস্থা-বিশ্বাস থাকতে হবে। তার বিবেক বুদ্ধি অন্তর ও শিরা-উপশিরায় তা সংক্রমিত হতে হবে। কারণ দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তাবোধ থেকেই সে অন্যের নিকট এ পয়গাম পৌঁছাতে বাধ্য, যাতে অন্যরাও তার আলোয় আলোকিত হয়, যে আলোয় সে আলোকিত হয়েছে।

গ. দাওয়াহ পরিভাষার মধ্যে আনুগত্য অনুসরণ ও তত্ত্বাবধানের মর্মও শামিল রয়েছে, যাতে সে জানতে পারে, অন্যদের ওপর দাওয়াতী পয়গামের কি প্রতিক্রিয়া

www.pathagar.com

হয়েছে, সে কি পরিমাণ ভূমিকা পালন করেছে, সেই প্রতিক্রিয়ার ধরন ধারণ এবং অবস্থাই বা কি? কোথাও এমনটি তো হয়নি যে, তার দাওয়াত ব্যর্থ হয়েছে।

মোটকথা, দাওয়াহ শব্দের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের অর্থ অন্তর্নিহিত রয়েছে। আধুনিক যুগের পরিভাষায় ডাইনামিক আন্দোলন এবং নিরলস নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম বলা যেতে পারে। এই পরিভাষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এভাবে বুঝা যেতে পারে, মিডিয়ার প্রভাবের তিনটি বিভাগ রয়েছে, এক. পুনরাবৃত্তি, দুই. নতুনত্ব, তিন. মনে করিয়ে দেয়া।

পুনরাবৃত্তি

কোনো পয়গাম অন্যের নিকট নিত্য নতুন পদ্ধতিতে পৌঁছানো এবং লাগাতার তার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর অর্থ হচ্ছে, অবস্থা ও ঘটনাভেদে একই পয়গাম নিত্য নতুন ও অভিনব পদ্ধতিতে বার বার উপস্থাপন করা, যাতে তার মধ্যে অসাধারণ শক্তি ও প্রভাব এসে যায়। এরপর আবার যখন সুযোগ আসবে তখন সেটাকে গনীমত মনে করে সেই একই পয়গাম অভিনব পন্থায় মোড়ক পাল্টিয়ে উপস্থাপন করা, যাতে দর্শক-শ্রোতার নিকট তা একেবারে নতুন মনে হয়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই, মানবজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন অনেক মৌলিক প্রয়োজন রয়েছে যা তার আকীদা-বিশ্বাস ও আচরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার পুনরাবৃত্তি অতি জরুরী হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ পোলিও ও অন্যান্য রোগ বালাই থেকে হেফাযতের জন্য টিকা দেয়া, যার জন্য সময় সময় মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়। এমনিভাবে ইসলামী শরীয়ার বিধি-নিষেধ, যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কুরবানী ইত্যাদির মাসায়েল সর্বদা নতুন নতুন আঙ্গিকে ফলপ্রসূ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা এবং কুরআন-হাদীসের দাওয়াত পদ্ধতি বার বার পুনরাবৃত্তির সাথে অভিনব ও নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরা।

নতুনত্ব

'নতুনত্ব' শিরোনাম দ্বারাই একথা ভালভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এর অর্থ এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তা গ্রহণ করা। কারণ উভয়ের মাঝে একটি সম্পর্ক ও যোগাযোগ আছে। উদারহণস্বরূপ তাওহীদ বিষয়ে আলোচনা করার অর্থ হলো, শিরক, কুফর ও মূর্তিপূজার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা। এমনিভাবে নবী-রাসূলগণের জীবন ও চরিত্র নিয়ে নিত্য নতুন পদ্ধতিতে আলোচনা করার অর্থ হলো, সবার জন্য এমন জীবন ও এমন চরিত্রই প্রত্যাশা করা। সভ্য মানুষে পরিণত হওয়ার আহবানের অর্থ হলো, মূর্খতা নিরক্ষরতা নির্মূল করা, সমাজে সুশৃংখল জীবন যাপন করা, পরিবেশকে দূষণ থেকে রক্ষা করা এবং নাগরিক আইন-কানুন ও ব্যবস্থাপনার প্রতি যত্নবান হওয়ার আহবান করা—এসব কিছুই এতে অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

মনে করিয়ে দেয়া

মনে করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণাকে নতুন আঙ্গিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তা মানব মস্তিষ্কে নতুনভাবে প্রবেশ করিয়ে দেয়া। কারণ ভাল চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা এবং পবিত্র আকীদা-বিশ্বাস ও দাওয়াতের সম্পর্ক কোন পরিবেশ ও কালের সাথে নয়; বরং তার সম্পর্ক মানব জীবনের সাথে। মানব জীবনে সে চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার বাস্তবায়ন ঘটাতে তা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেয়া। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা বেশি বেশি আলোচনা-পর্যালোচনা কর, কারণ আলোচনা মুমিনের জন্য উপকারী।'

এমনিভাবে ইরশাদ হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা ঈমান আন'। এভাবে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়ার মনস্তাত্ত্বিক বুনিয়াদ হলো, মানুষ ভুল করা ও ভুলে যাওয়ার সমন্বয়ে গঠিত। মানুষ খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। এজন্য তাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং কর্তব্যের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হিকমত প্রজ্ঞা ও মনীষার দাবী করে।

অত্যন্ত আফসোস ও বিস্ময়ের কথা হলো, বর্তমান যুগে আপনি যদি ইসলামের সৌন্দর্য ও গুণাবলী বর্ণনা করেন তাহলে লোকেরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সাথে একথা বলে প্রত্যাখ্যান করে দেয় যে, এটা প্রোপাগান্ডা, কিন্তু যদি দীনের কথা মিডিয়ার মাধ্যমে পৌছানো হয় এবং তার পরিচিতি করানো হয়, তাহলে এটাকে প্রোপাগান্ডা আখ্যায়িত করা হয় না। আর তা সম্ভবও নয়। এজন্য আমাদের প্রথমে প্রোপাগান্ডা ও দাওয়াতের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য বুঝতে হবে।

প্রসিদ্ধ লেখক লা সুইল 'প্রোপাগান্ডা ও তার কর্মপদ্ধতি' নামক গ্রন্থে লেখেন, প্রোপাগান্ডা হিলা বাহানার অপর নাম। অন্য এক লেখক প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন, ইশারা ইঙ্গিত ব্যবহার করে ব্যক্তি ও দল তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পিত প্রয়াস চালায়, যাতে তারা নিজেদের মতো অন্য ব্যক্তি ও দলের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর বিজয়ী হতে পারে। অপর এক মার্কিন গবেষক বার্টাজ বলেন, প্রোপাগান্ডা মূলতঃ আক্রমণের অস্ত্র, প্রতিরক্ষার অস্ত্র নয়। প্রোপাগান্ডার মধ্যে খুব সহজেই জনমত পরিবর্তন করার শক্তি পূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এক মনস্তত্ত্ববিদ লেখেন, প্রোপাগান্ডা ধোকা প্রতারণা ও হিলা বাহানার অপর নাম।

প্রোপাগান্ডার দ্বিতীয় দিক ও উৎস হলো, যেসব ভাল ও কল্যাণকর দিকের ওপর প্রোপাগান্ডা নির্ভরশীল, যেসব উপকরণ ও মাধ্যম তাতে ব্যবহার করা হয়, যেসব উদ্দেশ্য ও মর্ম তার মাধ্যমে প্রচার-প্রসার করা হয় এবং সেসব ফলাফল যা এই প্রোপাগান্ডার দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের ওপর পতিত হয়, সেগুলোই প্রোপাগান্ডার দ্বিতীয় উৎস।

উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোর সারকথা হলো, প্রোপাগান্ডা এমন এক কাজ ও পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে পাঠক, শ্রোতা কিংবা প্রোপাগান্ডা দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তির মস্তিষ্ককে একটি কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির ওপর একত্রিত করা। অন্য ভাষায়, মস্তিষ্ক ধোলাই করা এবং

www.pathagar.com

সেসব পচা-গন্ধ ও অপবিত্রতাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করার জন্য তৈরি করা, যা প্রোপাগান্ডা বিশেষজ্ঞরা পাঠক-শ্রোতার বিবেক ও মস্তিষ্ককে সন্দেহযুক্ত ধর্মহীন চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও ব্যর্থ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিপূর্ণ করতে চায়। অথচ সুস্থ রুচি, বাস্তবতা ও মানবতার সম্মানের সাথে তার সামান্য পরিমাণও সম্পর্ক নেই। যদি মিথ্যা প্রোপাগান্ডার পরিবর্তে বাস্তবতা হয় এবং সঠিক চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাস হয়, তাহলে প্রোপাগান্ডাকারীদের মোটেও এর প্রয়োজন হয় না যে, সে বিষাক্ত, মিথ্যা ও বাস্তবতা থেকে বিমুখ হয়ে শীতল প্রোপাগান্ডার আশ্রয় নেবে এবং তার মাধ্যমে সে লোকদের চোখের ওপর কালো পট্টি বেঁধে দেবে এবং বিবেকের ওপর মোটা পর্দা ঢেলে দেবে।

ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দেয়, প্রোপাগান্ডার বয়স খুব বেশি হয় না। খুব দ্রুত বাস্তবতার ওপর থেকে পর্দা উঠে যায় এবং লোকেরা দিবসের উজ্জ্বল আভায় সে বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে, যার ওপর প্রোপাগান্ডা বিশেষজ্ঞগণ তোষামোদের পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে প্রদত্ত সুন্দর প্রতিশ্রুতি সোনালী স্বপ্নের সুউচ্চ প্রাসাদের মজবুত দেয়াল প্রমাণিত হয়, তা আবার এত দ্রুত পতনের কোলে ঢলে পড়ে যেমন গ্রীস্মকালে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। জার্মানের গোয়েবলসের সকল প্রোপাগান্ডার কি অবস্থা হয়েছে।

সতের বছর পর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার লৌহ প্রাচীর কিভাবে ভূমিসাত হয়ে গেছে। মুসোলিনী, নেপোলিয়ান এবং হিটলারের প্রোপাগান্ডার ফলাফল কি হয়েছে। এসব কালকের কথা ছিল, যখন হিটলার ভাষণ দিতে মঞ্চে আগমন করতেন তখন মন মস্তিষ্ক ও মানসিকতা অস্থিরকারী সঙ্গীত বাজানো হতো। ভাষণের মাঝখানে বিশেষ বিশেষ বাক্য ও পরিভাষার ওপর আলোর বিচ্ছুরণ ঘটানো হতো। এভাবে সকল অস্ত্র গ্রহণ করা হতো, যাতে শ্রোতারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা জানা যায়, প্রোপাগান্ডার অর্থ হলো প্রকৃত বাস্তবতাকে উল্টে দেয়া, জনসাধারণকে ধোকায় ফেলা এবং জাতীয় স্বার্থের ব্যাপকতর কল্যাণের খাতিরে সমুচ্চ ও মর্যাদাযুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে উৎসাহী না হওয়া—এসব কথা ইসলামী মিডিয়ার মর্মার্থ কিংবা ইসলামী দাওয়াতের গন্ডি থেকে সম্পূর্ণ বাইরের বিষয়। কারণ একজন মুসলিম সাংবাদিকের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়, সে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা এবং তার সঠিক সত্য আকীদা-বিশ্বাস ও শিক্ষামালা উপস্থাপন করবে, দীন ও শরীয়তের বাস্তবতা বিকৃত করে উপস্থাপন করবে না। এই ভিত্তিতে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান ও সংবাদের ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক স্থায়ীত্বের গুণাবলী বিদ্যমান থাকে।

এ ভিত্তিতে সে না বৈপরীত্যের শিকার হয়, আর না মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের শিকার হয় এবং না সে অন্যান্য ধর্মের মুবাল্লিগদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে পছন্দ করে। এরপর

www.pathagar.com

সে কোনোভাবেই চায় না এবং তার জন্য উপযুক্তও নয় যে, বাস্তব অবস্থা ও ঘটনাবলী বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার পরিবর্তে আবেগকে উত্তেজিত করার কাজ করবে এবং মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও বিকৃত বাস্তবতার ওপর ভরসা করবে। কারণ এসব কিছু বালির এমন প্রাচীর, যা পলকেই বালুকা স্তূপে পরিণত হয়ে যায়।

ইসলামী মিডিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা

ইসলামী মিডিয়া ও গণমাধ্যমের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা। আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনের সূচনাই হয়েছিল সততা, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা দিয়ে। এটাকেই মূল সম্বল করে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাফা পাহাড়ের ওপর থেকে স্বজাতিকে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি নিজের ব্যাপারে সততা ও বিশ্বস্ততার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়ে তবেই দীনী দাওয়াতের মৌলিক নীতিমালা পেশ করেন। পবিত্র চেতনা, সততা ও পরিচ্ছন্নতার দাওয়াত ইসলামের প্রথম মৌলিক দাওয়াত।

সূরা যুমারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য আগমন করার পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক জালেম আর কে হবে? কাফিরদের বাসস্থান জাহান্নামে নয় কি? আর যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে মেনে নিয়েছে; তারাই তো খোদাভীরু।' (সূরা যুমার-৩২-৩৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন সম্বোধিতদের থেকে তার সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর সাক্ষ্য নিয়ে নেন, তখনই তাদের সামনে দীনী দাওয়াত উপস্থাপন করেন। কারণ কারো সম্পর্কে যদি একবারও মিথ্যার অভিজ্ঞতা হয়ে যায় তাহলে তার ওপর আর আস্থা রাখা যায় না। এমতাবস্থায় আজ যখন চারদিকে রুগ্ন ও অসুস্থ্য রাজনীতির জয়জয়কার এবং বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও ধোকা-প্রতারণার রাজত্ব চলছে, তখন শুধু ইসলামী মিডিয়ার কাছেই এই প্রত্যাশা করা যায় যে, সে সর্বাবস্থায় সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রেখে চলবে। বাস্তবতা যতই তিক্ত হোক না কেন তা উপস্থাপন করে তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার কিনারায় পৌঁছে দেবে, যারা মিথ্যা প্রোপাগান্ডার খড়কুটায় বসে প্রলয়ংকরী তুফানের ভয়াবহতার সাথে খেলা করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

পবিত্র ও উন্নত উদ্দেশ্য

বর্তমানে আন্তর্জাতিক মিডিয়া বা গণমাধ্যম যেসব উদ্দেশ্যের বিকাশ ও প্রচার-প্রসার তাদের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ :

০১. বিভিন্ন মানব শ্রেণী ও জাতিগোষ্ঠীর মাঝে শত্রুতা, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও মতানৈক্য উসকে দেয়া।

০২. নিঃস্ব সর্বহারাদের ধনীক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করা।

www.pathagar.com

০৩. সংখ্যাগরিষ্ঠকে সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে এবং সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা।

০৪. আঞ্চলিক ও গোত্রীয় দ্বন্দ্ব, গোঁড়ামি এবং জাহেলিয়াতের বিস্তার ঘটানো।

০৫. নিজেদের অস্ত্র বিক্রি ও অস্ত্র তৈরির কারখানাগুলোকে কর্মব্যস্ত রাখা এবং অধিকতর অর্থ-সম্পদ অর্জনের খাতিরে বিভিন্ন জাতি ও প্রতিবেশী দেশগুলোর মাঝে যুদ্ধের দামামা বাজানো এবং যুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে তাদের দেশ সচ্ছল হয়।

মিডিয়া গণমাধ্যম স্বীয় সরকারের ভুলভ্রান্তি ও মন্দ কর্মগুলোর ওপর পর্দা ঢেলে দেয় আর অন্য সরকারের তিলকে তাল বানিয়ে জনগণের সামনে উপস্থাপন করে। সকল অশ্লীলতা ও মন্দ কর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় সে সবার অগ্রভাগে থাকে। নাস্তিক ধর্মহীন গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা ও তাদের প্রতিরক্ষাই তার প্রধান কর্তব্য। সমাজের অটুট বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করে এবং তাকে অনৈক্য উত্তেজনার পথে পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সামান্য টাকার বিনিময়ে অতি সহজেই সে তার ঈমানের সওদাবাজি করে। তুচ্ছ পয়সার বিনিময়ে অবৈধ রক্তপাত, চরিত্র হনন, বাস্তবতাকে বিকৃত করা; বরং তা পদদলিত করে সকল নিয়ম-নীতি ও ঈমান-আকীদা পর্যন্ত বিকিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

পক্ষান্তরে ইসলামী মিডিয়া ব্যাপকভাবে মানবতার স্বার্থ ও কল্যাণের সংরক্ষক এবং শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও মানবতাকে সামাজিক অনৈক্য বিশৃংখলা থেকে মুক্ত করা তার মৌলিক কর্তব্য মনে করে। সে কুরআনের চিরন্তন চিরস্থায়ী বাস্তবতা এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ন্যায়-ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষামালা এবং উজ্জ্বল আলোকিত জীবনের মহাসড়কের দিকে পথনির্দেশ করে। তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য গড়া, ভাঙ্গা নয়। সমাজকে অনিষ্ট ও পাপাচার থেকে মুক্ত রাখা, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার পথে ঠেলে দেয়া নয়। মানুষের সম্মান করা, তার দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা ও তার অধিকার হরণ করা নয়। মাসূম নিষ্পাপ মানুষের ইজ্জত-সম্ভ্রম নিয়ে খেলা করা নয়, অধঃপতন ও লাঞ্ছনায় ক্লেদাক্ত করা নয়। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বুনিয়াদ কুরআনের নিম্নের আয়াতগুলো—

০১. 'এমন কোনো জিনিসের পেছনে লেগে যেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চিতভাবেই চোখ, কান ও দেল সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (সূরা বনী ইসরাঈল-৩৬)

০২. 'যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।' (সূরা নূর-১৯)

ইসলামী মিডিয়া নিজের দিকে লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য না কোনো বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশন করে আর না কোনো যাচাই-বাছাই ও বিচার-বিশ্লেষণ

www.pathagar.com

ছাড়াই শুধু গুজবের ভিত্তিতে দুস্কৃতকারী ও দুর্বৃত্তদের সংবাদ প্রকাশ করে। ইসলামী মিডিয়া কোনো সংবাদ প্রকাশ করার পূর্বে সর্বদিক দিয়ে তা বিচার-বিশ্লেষণ করে তারপরই প্রকাশ করে। কোনো সংবাদ প্রকাশের ফলে ব্যক্তি ও সমাজের ওপর তার কি প্রভাব পড়বে এবং কি পরিণাম ও ফলাফল বয়ে আনবে, একথা চিন্তা করেই সে সংবাদ পরিবেশন করে।

যারা চারিত্রিক মূল্যবোধের সাথে খেলা করে, অনিষ্ট অকল্যাণের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং নওজোয়ানদের সামনে অনিষ্টকে সুন্দর মনোরম করে উপস্থাপন করে, এমন লোকদের সাথে ইসলামী মিডিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, অর্থহীন সংবাদ, অনর্থক আলোচনা এবং ভিত্তিহীন প্রবন্ধ-নিবন্ধ, অতিরঞ্জিত খবরাখবর, যৌন সুড়সুড়িমূলক কাহিনী, যৌনতা ও কুপ্রবৃত্তির চেতনা উত্তেজিতকারী ছবি, ফটো ও নিবন্ধ সে প্রকাশ করে না। আর না সে নারী পুরুষের চেতনা ও বিবেকের সাথে খেলা করা পছন্দ করে। ইসলামী মিডিয়ার মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যক্তির সংস্কার সংশোধন এবং ইসলামী সমাজ গঠন ও বিনির্মাণ।

ইসলামী মিডিয়ার সার্বক্ষণিক জাগৃতি ও তত্ত্বাবধান

ইসলামী মিডিয়ার তৃতীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, সে সমাজের বিদ্যমান খারাবী ও দোষ-ত্রুটিগুলোকে আপন দৃষ্টি দিয়ে দেখে, তার পুরো অবস্থা নোট করে, তার গভীরে ক্রিয়াশীল উপাদান ও কারণগুলোর অনুসন্ধান চালায় এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, যাতে বাস্তবতার গভীরে পৌঁছে তা থেকে শিক্ষা অর্জন করতে পারে। মিডিয়ার নামই হলো, সমাজে বিদ্যমান খারাবী এবং তার গভীরে ক্রিয়াশীল উপাদানগুলো পর্যন্ত পৌঁছা, সমাজ গঠন ও বিনির্মাণে দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং এর জন্য কৃত প্রচেষ্টাগুলোর তত্ত্বাবধান ও আনুগত্য করা।

ইসলামী মিডিয়া উট পাখির মত পরিস্থিতি থেকে চক্ষু বন্ধ করে চলে না, শিশুতোষ ও বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম এবং খেলাধুলার মাধ্যমে জনগণের মন ভোলানোর চেষ্টা করে না। যেমন সাধারণভাবে আজকের তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এবং বিশেষভাবে মুসলিম দেশগুলোর দুঃখজনক অবস্থা হলো, আসল সমস্যা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সমাজে বিদ্যমান ত্রুটিগুলোকে অপরাধের সীমা পর্যন্ত এড়িয়ে চলার জন্য সস্তা বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম দ্বারা লোকদের মন ভোলানোর চেষ্টা করা হয়। কিছু বিরতি দিয়ে দিয়ে নতুন নতুন চিত্তাকর্ষক শ্লোগান দেয়া হয়।

পক্ষান্তরে ইসলামী সমাজে আমরা দেখি, রাসূলুল্লাহ (সা.) সময়মত সমাজের প্রতিটি ছোট-বড় ঘটনা ও সংবাদের খবর নিতেন। যখনই কোনো সমস্যা আসত, কোনো সংবাদ কিংবা গুজব ছড়ানো হতো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত সচেতনতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তাৎক্ষণিক তার মোকাবেলা করতেন। এরকম কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মসজিদে গমন করতেন। 'আস সালাতু

www.pathagar.com

জামেআতুন–নামায প্রস্তুত' ঘোষণা দিতেন, মেহরাবে তাশরীফ নিতেন এবং হামদ ছানার পর উক্ত ঘটনা কিংবা খবর সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতেন। ফলে বিষয়টির বাস্তবতা লোকদের সামনে সূর্যের ন্যায় আলোকিত হয়ে যেত। সিহাহ সিত্তার কিতাবসমূহে এ ধরনের ভূরি ভূরি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

পক্ষান্তরে জার্মান লীডার গোয়েবলস বর্ণিত অনুরূপ পরিস্থিতিতে নিরবতার পলিসিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এক মার্কিন স্কলার জার্মান পত্র-পত্রিকায় গোয়েবলসের দিক-নির্দেশনামূলক বক্তৃতা-বিবৃতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন, জার্মান পত্র-পত্রিকায় গোয়েবলসের পঞ্চাশ হাজার দিক-নির্দেশনামূলক বক্তৃতা-বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে এক চতুর্থাংশ বক্তৃতা-বিবৃতিতে তিনি সংবাদপত্রকে এই দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, অমুক বিষয়ে নিরবতার পলিসি গ্রহণ করা হোক। বর্তমান যুগেও তৃতীয় বিশ্বের মিডিয়ার অবস্থা হলো, তারা সংবাদ ও ঘটনাকে খুব প্রসারিত হওয়ার সুযোগ দেয়। অথচ এই সামান্য বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের অবগত হওয়া উচিত, বাস্তবতার অনুপস্থিতিতে মিথ্যার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

সীরাতের সকল কিতাবে এই ঘটনা উল্লেখ আছে, একবার মদীনার মুসলমানরা এক আওয়াজ দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু তাদের এটা জানা ছিল না, এই ভয় ও ভীত-সন্ত্রস্ততার কেন্দ্র কোন দিকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। নিজে একটি ঘোড়ার জিন-শূন্য পিঠে সওয়ার হয়ে বের হন, যাতে বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কিছুক্ষণ পর তিনি লোকদের আশ্বস্ত করে বললেন, ভীত সন্ত্রস্ত ও অস্থির হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।

ইসলামী মিডিয়া যখন কোনো বিষয় ও ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করে, তখন কোনো এক দলের পক্ষে একতরফা সিদ্ধান্ত শোনায় না; বরং ইসলামী মিডিয়ার পলিসি হয় সম্পূর্ণ পৃথক, মধ্যপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ এবং মুসলিম উম্মাহর ব্যাপক স্বার্থের অনুকূলে। ইসলামী মিডিয়া জনগণের সহজ-সরলতা থেকে ফায়দা উঠিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে না।

ইসলামী মিডিয়া বাস্তব সমস্যা সংকট থেকে চোখ বন্ধ রাখার পরিবর্তে তার বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ করে ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান বের করে। সে সৃষ্ট সমস্যা সংকটের সার্বিক পর্যালোচনা করে। নব উদ্ভূত সমস্যা সংকট সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। জাতির মাঝে ঐক্য-সংহতি সৃষ্টি করে বিভেদ অনৈক্য থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে বিভেদ অনৈক্য নির্মূলের আহবান জানায়। সমস্যা সংকট সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার নাম ইসলামী মিডিয়া। সমস্যা সংকটকে উসকে দিয়ে ব্যবসা করার নাম ইসলামী মিডিয়া নয়। তার উদ্দেশ্য ব্যবসা নয়। যে কেউ ইসলামী মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজ পর্যন্ত সত্য কথা পৌঁছাতে চায়, সে তা পারে। ইসলামী মিডিয়া সর্বদা তার পয়গাম পৌঁছানোর ক্ষেত্রে পরিণাম ও ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রাখে। সে দেখে এই পয়গাম কতটুকু পৌঁছেছে এবং তার কি ফলাফল অর্জিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)

www.pathagar.com

হযরত মুআজ বিন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামেনে প্রেরণ করার সময় যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন তাতে তিনি প্রতিটি পথনির্দেশের পর তার ফলাফল দেখার এবং তার তত্ত্বাবধানেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত মুআজ (রা.)-কে বলেন, তুমি সর্বপ্রথম ইয়ামেনবাসীকে এ কথা বলবে। তারা যদি তা মেনে নেয় তারপর এ কথা বলবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয় তাহলে তাদের সাথে এই আচরণ করবে। এই ঘটনা দ্বারা এই ফলাফলই বের হয় যে, মিডিয়ার দায়িত্ব হলো, সে সমস্যা সংকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিবর্তে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করবে। দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হয়ে গেলে তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করবে।

নওজোয়ানদের ব্যাপারে ইসলামী মিডিয়ার যিম্মাদারী

এরকম ঘটনা খুব কমই হয় যে, নিরেট পরিকল্পিত পদ্ধতিতে নওজোয়ানদের সম্পর্কে মিডিয়ায় দীনী প্রোগ্রাম উপস্থাপন করা হয়। আরব ও ইসলামী দেশগুলোর এই অবস্থা। এখন আর অনৈসলামী দেশগুলোর অবস্থা আপনি অনুমান করতে পারেন।

আমাদের সমাজের দ্বিতীয় ত্রুটি হচ্ছে, প্রকৃতিগত লজ্জা শরম এবং পারিবারিক পরিবেশ ও শিক্ষা-দীক্ষার ভিত্তিতে নওজোয়ানরা সাধারণতঃ তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক পরিবর্তন এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে সম্পূর্ণ বেখবর থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় না। সমাজেও এ ধরনের জ্ঞান সরবরাহ করা হয় না, যা সঠিক শক্তিশালী দীনি ও ইলমী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভুল ও অসম্পূর্ণ তথ্য তারা কোথাও না কোথাও পেয়ে যায়, যা তাদর জন্য চরম ক্ষতিকর হয়। এর ফলে তারা ভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়ে যায়। মসজিদগুলোতে যেসব আলোচনা হয়, তাও নওজোয়ানদের প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ। এ ভিত্তিতে মিডিয়ার দায়িত্ব হলো, সে সচেতনতার সাথে নির্ভেজাল ইলমী ভিত্তির ওপর নওজোয়ানদের জন্য প্রোগ্রাম প্রস্তুত করবে। এমন পরিকল্পিত প্রোগ্রাম, যা তাদের মনস্তত্ত্ব, চাহিদা ও প্রয়োজন সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছে।

নওজোয়ানদের মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজন

নওজোয়ানরা সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের পাতায় তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সংকট এবং অস্থিরতার কারণ অনুসন্ধান করে। যখন তারা পত্রিকায় ম্যাগাজিনের পাতায় তাদের সমস্যা সংকট সম্পর্কে পড়ে, তখন তারা তার সমাধানের প্রতি মনোযোগী হয়। কারণ প্রকৃতি ও রুচিগতভাবে এসব সমস্যা সংকট দেখে তাদের মধ্যে এক ধরনের সুক্ষ্ম মানবীয় অনুভূতি জাগ্রত হয়। সমস্যা-সংকটে জর্জরিত মানুষদের দেখে তাদের মধ্যে দয়া, সমবেদনা সহমর্মিতা জাগ্রত হয়। তারা বাস্তবে অন্যের সমস্যায় অংশীদার হতে এবং তাদের আশা আকাঙ্খা ও উদ্দেশ্যের পূর্ণতাদানে সাহায্য সহযোগিতা করতে চায়। তারা তাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং সেসব সমস্যার সমাধানের পদ্ধতি ও কৌশল নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে,

www.pathagar.com

বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের সাথে মতবিনিময় করে। বয়সের সাথে সাথে যেমন তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি তাদের চিন্তাধারা এবং কর্মের পরিধিও বিস্তৃত হতে থাকে। ধীরে ধীরে যখন তারা সেসব সমস্যা সংকটের সমাধান সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে, তখন তারা আরো সচেতন হয় এবং কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেশি বাস্তব ও কর্মপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইসলামী মিডিয়ার দায়িত্ব হলো, সে নওজোয়ানদের এমন দিক-নির্দেশনা দান করবে, যাতে আগামীতে যেন তারা সমাজকে সঠিক পথনির্দেশ করতে পারে।

নারী

আমাদের সমাজে যদিও সাধারণতঃ নারীদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক খবরাখবরের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু শিক্ষিত নারীদের এসব ব্যাপারে আগ্রহ রয়েছে, যা তাদের স্বজাতীয়দের সাথে সম্পর্কিত। ইসলামী মিডিয়ার দায়িত্ব হলো, তারা নারীদের জন্য এমন প্রোগ্রাম উপস্থাপন করবে, যা দ্বারা তাদের দীনী ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ হয় এবং তাদের মাধ্যমে সমাজকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া সহজ হয়।

পারিবারিক সমস্যা সংকট থেকে দূরে থাকা এবং সেগুলো সমাধানের কৌশল, সামাজিক সমস্যা ও তার জটিলতার দিকে ইঙ্গিত, সমাজে প্রচলিত ভুল প্রথা-প্রচলন সংস্কারের প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রয়াস, কাহিনী এবং সিরিজের মাধ্যমে টিভি থেকে রেডিও প্রোগ্রাম সমাজ সংস্কারে বেশি সহায়ক হয়। কারণ রেডিও শোনার জন্য সেই গুরুত্ব ও মনোযোগের প্রয়োজন নেই, টিভি দেখার জন্য যা প্রয়োজন হয়। যুবতী মেয়েরা যুবক ছেলেদের তুলনায় বেশি পড়ে এবং বেশি প্রভাবিত হয়। পারিবার ও সমাজে সংঘটিত ঘটনা দুর্ঘটনার ব্যাপারে তাদের অসাধারণ আগ্রহ দেখা যায়।

ইসলামী মিডিয়ার দায়িত্ব হলো, সে যুবতী মেয়েদের জন্য এমন প্রোগ্রাম উপস্থাপন করবে, বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী যা তাদের সন্তানদের দীনী, চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। মিডিয়া এসব নারীর প্রকৃতিগত যোগ্যতা ও প্রতিভাই শুধু বিকশিত করবে না; বরং তার উন্নতি বিধান করবে এবং তাদের পথ-নির্দেশও দেবে। তাদের সহজাত যোগ্যতা ও প্রতিভা বিনষ্ট হতে দেবে না। তাদের সেসব সমস্যা সংকট বুঝতে সহায়তা করবে, যার কারণে পারিবরিক ঐক্য বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন জীবন মানের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টিতে সহায়তা করবে এবং একই মহল্লায় ও একই বিল্ডিংয়ে বসবাসকারীদের জীবন মানের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করবে না।

শিশুদের শারীরিক আবেগ, জ্ঞান-বিবেক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন সম্পর্কে তাদের শক্তিশালী তথ্য সরবরাহ করবে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি, বিনোদন ও ভোগ সামগ্রী সম্পর্কে তাদের সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেবে, যাতে ঘরের নারীরা প্রত্যেক

www.pathagar.com

নতুন বস্তু ক্রয় এবং প্রত্যেক নতুন ফ্যাশনের পেছনে না পড়ে। এসব নারীর মধ্যে অল্পে তুষ্টির চেতনা জাগ্রত করবে। ফলে পারিবারিক জীবন সুন্দর ও সুখময় হবে। কখনো তাদের মাঝে বেশি বস্তুগত উপায়-উপকরণ সংগ্রহের আগ্রহ জাগিয়ে তুলবে না।

বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ

নওজোয়ান ও নারীদের মতো বয়স্ক ব্যক্তিবর্গের প্রতিও ইসলামী মিডিয়ার মনোযোগী হওয়া উচিত। তাদের বাদ দিয়ে সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ সমাজ গঠনে তাদের মৌলিক ভূমিকা রয়েছে। জীবনের পড়ন্ত বেলায় উপনীত হওয়া সত্ত্বেও একটি সৎ সুস্থ সমাজ গঠন এবং তা উন্নততর বানাতে অবশ্যই তাদের প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্য কোনো অবস্থাতেই তাদের অবহেলা করার সুযোগ নেই। ইসলামী মিডিয়ার মৌলিক দায়িত্ব হলো, সে নতুন প্রজন্মের পথ-নির্দেশ ও প্রশিক্ষণে বয়স্কদের থেকে সহযোগিতা নেবে এবং তাদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকার লাভ করবে।

বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় এসেও মিডিয়ার সংবাদ ও খবরাখবরের আলোচনা-পর্যালোচনা, ঘটনা-দুর্ঘটনা, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ফলাফলের ব্যাপারে বিরাট আগ্রহ পোষণ করেন। তাদের বেশি আগ্রহের বিষয় হলো, সেসব বিজ্ঞাপন, যার মধ্যে নতুন ও আধুনিক শিল্প-পণ্যের প্রচার এবং সৌন্দর্য তুলে ধরা হয়। এমনিভাবে শারীরিক দুর্বলতার এই বয়সে চিকিৎসা, ওষুধ-পথ্য এবং এ বিষয়ের আধুনিক গবেষণা সম্পর্কেও তাদের অসাধারণ আগ্রহ থাকে। অপরদিকে জীবন সায়াহ্নের এই মনযিলে হালকা পাতলা খবরাখবর, চিত্তাকর্ষক ও বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম এবং নতুন কাহিনীর প্রতিও তাদের আগ্রহ থাকে।

সফল মিডিয়ার বৈশিষ্ট্য

সেসব বিষয়বস্তু মিডিয়া ও গণমাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো অন্যের নিকট পৌঁছানো হয়। তা লেখার মাধ্যমে হোক বা শ্রবণের মাধ্যমে হোক। প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে হোক বা দেখা, শ্রবণ ও মৌখিক কথোপকথনের মাধ্যমে সম্পন্ন হোক। মিডিয়ায় প্রকাশিত খবরাখবর ও রচনাবলীর মৌলিক উদ্দেশ্য, মিডিয়ার মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতা ও পাঠকের ওপর প্রভাব ফেলা।

মিডিয়া তা যে আকৃতিতেই হোক, তার একটি নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও পয়গাম থাকে। সেই পয়গাম ও উদ্দেশ্য তাতে প্রকাশিত খবরাখবর ও রচনাবলী দ্বারাই সুস্পষ্ট হয় এবং সে খবরাখবর ও রচনাবলীই দিক নির্ধারণ করে, তার কাজ কি, কোন্ সীমা পর্যন্ত তাকে এ কাজ আঞ্জাম দিতে হবে এবং কোথায় গিয়ে পৌঁছতে হবে। মিডিয়া কোনো একক ব্যক্তি বা বিশেষ ব্যক্তির জন্য হয় না; বরং তা কোনো বিশেষ দল, গোত্র, শ্রেণী কিংবা গোটা জাতির জন্য হয়। কখনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যেও খবরাখবর ও রচনাবলী লেখা হয়ে থাকে, কিন্তু এমতাবস্থায় সেই খবরাখবর ও রচনাবলীর কপি তৈরি করে ব্যক্তিগতভাবে লোকদের নিকট পাঠানো হয়। অন্য ভাষায় আমরা বলতে পারি, প্রতিটি সংবাদের

www.pathagar.com

একটি নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও বিশেষ পয়গাম থাকে। যদি কোন সাংবাদিক কিংবা রিপোর্টার তার সংবাদের মাধ্যমে কোনো পয়গাম পৌছাতে না পারে, তাহলে আধুনিক মিডিয়ার দৃষ্টিতে তার কোনো মূল্য নেই।

এমনিভাবে সংবাদের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রাখা, সংবাদ নির্ধারিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু সফলকাম হয়েছে এবং সামনে আর কোন কোন স্তর বাকী আছে–তার প্রতিও দৃষ্টি রাখা জরুরী। জনতম গঠন ও মন-মানস তৈরির জন্য সাংবাদিকদের নিকট নিজস্ব মাধ্যম ও নির্ধারিত উপকরণ থাকে, যার মাধ্যমে তারা জেনে নেয়, তাদের সংবাদ, ছবি, ফটো, মন্তব্য, সাক্ষাতকার, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা দ্বারা কি পরিমাণ মন-মানস তৈরি এবং কি পরিমাণ জনমত গঠন হয়েছে।

০১. পাঠক এবং শ্রোতাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে মিডিয়ার খবরাখবর ও রচনাবলীর সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। মিডিয়া জনগণের আবেগ-অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের কর্মপদ্ধতি ও আচরণ গঠনে উপকারী ও ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে এবং পরিবেশ ও যাদের সাথে সে সম্পৃক্ত, তাদের ওপর প্রভাব ফেলে।

অভিজ্ঞতা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়, সাধারণতঃ পাঠক, শ্রোতা ও দর্শক নিজেদের আগ্রহ অভিরুচির জিনিসের সাথেই সম্পর্ক রাখে। যা তাদের রুচি ও আগ্রহের সাথে মিল খায় না, তা তারা গ্রহণ করে না। অন্য ভাষায় আমরা বলতে পারি, মিডিয়ার উপস্থাপিত বিষয়াবলী গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে লোকেরা স্বাধীন। জোরপূর্বক তাদের ওপর কোনো জিনিস চাপিয়ে দেয়া যায় না। বর্তমান যুগে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মর্জি ও অভিরুচি অনুযায়ী সবকিছু দেখে, পাঠ করে ও শ্রবণ করে। এমনিভাবে কোনো বিষয়ের ওপর মতামত নির্ধারণ করা ও তার ওপর আস্থাশীল হওয়ার ব্যাপারে সে সর্বতোভাবে স্বাধীন।

নিজের ব্যাপারে অল্পে তুষ্টি ও বুঝকে বাস্তব আচরণে রূপান্তরিত করা বা পেছনে ঠেলে দেয়ারও সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। যেমন সে বিড়ি-সিগারেট খাওয়া ক্ষতিকর মনে করে, কিন্তু সেটাকে পরিত্যাগ করে না। দ্রুত গতিতে গাড়ী চালানোকে সে বিপজ্জনক মনে করা সত্ত্বেও দ্রুতবেগে গাড়ী চালায়, কিন্তু সফল মিডিয়া তাই, যা পুর্বাহ্নে লোকদের বিড়ি-সিগারেট খাওয়ার ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং দ্রুত গতিতে গাড়ী চালানোর ফলে নিশ্চিত মৃত্যুর কথা বুঝিয়ে দেয়, এরপর তাকে আশ্বস্ত করে। তৃতীয় স্তরে সেটা তার বাস্তব কর্ম ও আচরণে রূপান্তরিত করে দেয়। তা এভাবে, বুঝা+রাজি-খুশি=বাস্তব আচরণ।

এর দ্বারা এই বাস্তবতা ভালভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মিডিয়া জগতে বুঝাকে রাজি খুশির ভূমিকা আখ্যা দেয়া হয়। এই প্রয়োজনও সুস্পষ্ট হয় যে, তথ্য ও বিষয় এমনভাবে প্রস্তুত করা হবে, যাদের পর্যন্ত তার কথা পৌছানোর প্রয়োজন, সে তাদের ভালভাবে বুঝে নেবে, কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, যে জিনিস কারো জন্য সুস্পষ্ট ও বোধগম্য, তা অন্যদের জন্যও বোধগম্য ও সুস্পষ্ট হবে। এটা নির্ভর করবে একজন

www.pathagar.com

সাংবাদিক তার সম্বোধিত ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব, তার অভিরুচি ও ধ্যান-ধারণা, তার সংস্কৃতির মানদন্ড ও ঝোঁক সম্পর্কে কি পরিমাণ ওয়াকিফহাল–তার ওপর। কোনো বিষয়বস্তুর ওপর লেখা তৈরি করার পূর্বে এই বাস্তবতা তার সামনে থাকা উচিত। এ ক্ষেত্রে খোদ মিডিয়ার মৌলিক ভূমিকাকে কোনোক্রমেই পেছনে ঠেলে দেয়া যায় না। সে শ্রোতাদের জন্য পয়গামকে উদ্দেশ্যপূর্ণ ও ফলপ্রসূ বানানোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব রাখে। মিডিয়ার জগতে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে সূচনার স্তর বলা হয়।

০২. সফল মিডিয়ার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, সে পাঠকের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ খবরাখবর ও রচনাবলী এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে তা অতিরঞ্জন মুক্ত হয়। তা উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে রং চড়ানো এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকরণে অতিরঞ্জন ও সংকোচন থেকে মুক্ত হবে। সংবাদের মধ্যে না বেশি উষ্ণতা ও সুড়সুড়ি থাকবে আর না বেশি শীতলতা থাকবে। কারণ খবরের গভীরে ক্রিয়াশীল উদ্দেশ্যই মৌলিক গুরুত্ব রাখে, উল্লিখিত উভয় অবস্থায় সে তার প্রভাব ও উপকারিতা খুইয়ে ফেলবে। পাশাপাশি পাঠকদের সম্পর্কে সাংবাদিকদের এই প্রত্যাশাও রাখা উচিত নয় যে, সাংবাদিকদের পূর্বে পাঠক তার খবরাখবর দ্বারা প্রভাবিত হবে।

অর্থাৎ সর্বাগ্রে সাংবাদিকদেরই খবরাখবর ও রচনাবলী থেকে প্রভাবিত হওয়া জরুরী। তখনই এই প্রভাব ও শক্তিকে সে খবরের মাধ্যমে অন্যের নিকট স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হবে। যদি সে স্বয়ং খবরের বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হয় এবং তার অভ্যন্তরে লুকায়িত পয়গাম ও উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে বেখবর হয়, তাহলে অন্যের থেকে তার কোনো ধরনের প্রত্যাশা রাখা উচিত নয়। মিডিয়া বা গণমাধ্যম যতই শক্তিশালী হোক না কেন।

আরব কবি যুহাইর ইবনে আবু সালমা এই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, মানুষ তার চরিত্র ও গুণাবলীকে যতই লুকানোর প্রচেষ্টা করুক, কিন্তু তা মানুষের নিকট পৌঁছে যায়। আরবী বাগধারা, 'তোমার ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে, তা তোমার কথাবার্তা দ্বারাই প্রকাশ হয়ে পড়বে।'

অনেক রচনা, খবরাখবর ও কার্টুন এমন হয়, সত্তাগতভাবেই যাতে অতিরঞ্জনের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। এভাবেও পাঠকের আস্থা অর্জন করা যায়। যেমন কার্টুনের মধ্যে অনেক মানব অঙ্গকে অত্যন্ত আলোকিত ও কৌতুকপূর্ণ আকারে পেশ করে, যা দেখলেই হাসি আসে। উদাহরণস্বরূপ কোনো কৃপণকে কার্টুনের আকৃতিতে এভাবে দেখানো হয়, তার দুটো হাতই বেঁটে, যা কৃপণের আলামত। এর দ্বারা মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, লোকদের হৃদয়ে কৃপণতার প্রতি সাধারণ ঘৃণা ও তার সম্পর্কে হেয় মনোভাব সৃষ্টি করা। এখানে একটি প্রশ্নের উদয় হয়, পাঠকের আস্থা অর্জন করাকে সফল মিডিয়ার মৌলিক শর্ত কেন আখ্যা দেয়া হয়? এর জবাব হলো, আস্থা অর্জন করতে আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো পয়গাম তার কাছে সহজেই পৌঁছাতে পারবেন। সে চোখ বুজে আপনার ওপর আস্থা রাখবে। তাই কোনো সাংবাদিকের কাছে একজনের মৌলিক দাবী

www.pathagar.com

হলো, সে যে তথ্যই উপস্থাপন করুক, তাতে যুক্তি ও ভারসাম্য থাকবে এবং তা ধমক, প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার, আত্মঅহংকার ও আত্মগরিমা মুক্ত হবে; বরং মিডিয়ার বিষয়াবলী নম্রতা, ভালবাসা ও দয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

০৩. সফল মিডিয়ার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, সংবাদ ও রচনা উপস্থাপনে মনস্তাত্ত্বিক সমন্বয় ও বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা। এই মৌলিক বাস্তবতা প্রতিটি সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং রেডিও-টিভির প্রোগ্রাম তৈরিকারীদের সামনে থাকা উচিত, তারা সংবাদ উপস্থাপনে মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বার্তা সম্পাদকের আসল পূর্ণতা ও সৌন্দর্য এটা নয় যে, তিনি যেনতেনভাবে সংবাদ উপস্থাপন করে দেবে, বরং আসল পূর্ণতা ও সৌন্দর্য হচ্ছে, শ্রোতা ও প্রত্যক্ষকারীরা যেভাবে উত্তম থেকে উত্তম অবস্থায় তা শুনতে ও দেখতে চায়, সেভাবে বার্তা সম্পাদক সংবাদ প্রকাশ করবেন।

অন্য ভাষায়, সংবাদ উপস্থাপনকারীদের উচিত, সংবাদ-শ্রোতাদের হৃদয়ের আওয়াজ, অনুভূতি, তার বুঝ, গ্রহণযোগ্যতা, রাজি-খুশি এবং চেতনার সাথে সাথে চলেবে এবং বিবেকের পূর্বে অনুভূতিকে প্রভাবিত করতে সফলকাম হবে। সংবাদের প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি বাক্য এমনভাবে আদায় করবে এবং সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করবে, যা তার জন্য উপযোগী। অর্থাৎ রচনাবলী ও তার প্রাণের সাথে পুরোপুরি সমন্বয় করে সেই চেতনা নিজের ওপর চাপিয়ে নেবে, যা খবরের গভীরে লুকায়িত থাকে। আমরা এই মর্মকে এভাবেও আদায় করতে পারি, মিডিয়ার বিষয়বস্তু ও তথ্যাবলী বিবেক এবং চেতনার দুই বাহুর সাহায্যে আকাশে বিচরণ করে।

মিডিয়ার জগতে এই মৌলিক প্রশ্ন সর্বদা সামনে থাকে যে, এক মিডিয়ার পয়গাম অপর মিডিয়ার পয়গামের সাথে সমন্বয়পূর্ণ হবে, না তার বিপরীত হবে। সমন্বয় হওয়ার ক্ষেত্রে আপনার মিডিয়ার পয়গাম ফলপ্রসূ ও উপকারী প্রমাণিত হবে না। কারণ দর্শক অথবা পাঠক অথবা শ্রোতা সর্বদা নিত্য নতুন জ্ঞান, দুর্লভ খবরাখবর ও সর্বাধুনিক বাস্তবতার সন্ধানে থাকে। সে আপনার কাছ থেকে এক খবর বা একই গান বার বার শুনে তার সময় নষ্ট করবে না। এমতাবস্থায় কোনো কিতাব প্রণয়ন, রেডিও-টিভির প্রোগ্রাম তৈরি ও বিশ্লেষণ, পত্র পত্রিকার সংবাদ ও সম্পাদকীয় তৈরি এবং লেখার ক্ষেত্রে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব থাকা জরুরী। একই অবস্থা গ্রন্থ রচনার বেলায়ও প্রযোজ্য। একই বিষয়ের ওপর এত ব্যাপক কিতাব, পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন রয়েছে, যেগুলোর ডজন ডজন কিতাব, পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে আপনার কাজের কথা শতকরা দুই শতাংশেরও কম পাবেন।

প্রোগ্রামসমূহের পারস্পরিক বৈপরীত্য ও বিরোধের ক্ষেত্রে মিডিয়ার দায়িত্ব অত্যন্ত বিপজ্জনক সীমা পর্যন্ত স্পর্শকাতর ও নাযুক হয়। কারণ দুই পরস্পর বিরোধী প্রোগ্রাম দেখে বা শুনে পাঠক শ্রোতা হয়রান পেরেশান হয়ে যায়। তার বুঝে আসে না, সে কোনটির সমর্থন ও সত্যায়ন করবে। দুটি প্রোগ্রামে দ্বন্দ্ব বৈপরীত্য থাকলে পাঠক দর্শক তাৎক্ষণিকভাবে দুটোই প্রত্যাখ্যান করে এবং এ কথা বলে নিজের আঁচল ছাড়িয়ে নেয়

www.pathagar.com

যে, দুটোই মিথ্যা। মিডিয়ার কাছে তো তার প্রত্যাশা থাকে, সে তার পথ নির্দেশ করবে, কিন্তু এর পরিবর্তে সে দেখে, সে মিডিয়ার বিভিন্ন তীরের নিশানায় পরিণত হচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রোগ্রাম প্রস্তুতকারীদের মৌলিক দায়িত্ব হলো, সে এমনভাবে প্রোগ্রাম উপস্থাপন করবে যে, স্বয়ং তার অভ্যন্তরীণভাবে আস্থা সৃষ্টি হবে, তার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বিরোধ থাকবে না।

প্রোগ্রাম তৈরিতে মৌলিক যে বিষয়ের লক্ষ্য রাখা জরুরী তা হলো, যা কিছু উপস্থাপন করা হবে তা যৌক্তিক ও দলীল-প্রমাণভিত্তিক হবে। বিষয়গুলো এমন দলীল প্রমাণভিত্তিক হবে যা প্রত্যাখ্যান বা জবাব দেয়া অসম্ভব হয়ে যায়। কারণ মিডিয়ার পয়গাম যখন ছাঁচে ঢালা হয় তখন তাতে চেতনা ও যুক্তি উভয়টির প্রতিই পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হয়। এটা বাস্তবতা যে, বাস্তব জীবনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ঘটনা ও তথ্যাবলী ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার মোকাবেলায় বেশি ফলপ্রসূ, শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী হয়। দ্বিতীয় বাস্তবতা হলো, মিডিয়ার পয়গাম সুস্পষ্ট ও তার উদ্দেশ্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। সাংবাদিক তার খবরাখবর, ছবি, কার্টুন ও সম্পাদকীয় দ্বারা লোকদের কি পয়গাম দিতে চান, তার কি কোনো সীমিত উদ্দেশ্য আছে? সে স্বয়ং সুস্পষ্টভাবে তার উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করে না; বরং সে তা পাঠক দর্শক ও শ্রোতার মেধার ওপর ছেড়ে দেয় অথবা খবরের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়, যাতে পাঠক-শ্রোতার কোনো কষ্ট না হয়।

অতঃপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর লেখার জন্য জরুরী হলো, সে এ বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অথবা খোদ নিজের অভিমত প্রকাশ করে দেবে। আমেরিকার দুই সাংবাদিক একটি বিষয়ে মাঠ জরিপ চালিয়েছিল। তাদের জরিপের যে ফলাফল সামনে আসে তা হলো, যেসব প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত ছিল, সেগুলো ৪৮% শ্রোতা বুঝেছে। আর যেসব প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত ছিল না, তার সম্পর্কে ১৯% শ্রোতা পছন্দ ও পরিবর্তনের কথা বলেছেন। এমনিভাবে মিডিয়ার জগতে একথার ওপর মৌলিক গুরুত্ব দেয়া উচিত যে, মিডিয়ার পয়গাম সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত হওয়ার পাশাপাশি সে কাজের ধরন পদ্ধতিও আলোচনা করা জরুরী। এও জরুরী যে, সে খবরের সময় ও স্থান তার সাথে সম্পৃক্ত এবং উপযোগীও।

প্রোগ্রাম প্রস্তুতকারীদের জন্য এটাও জরুরী যে, তারা পাঠক শ্রোতার সাধারণ ধ্যান-ধারণা থেকে উপকৃত হবে এবং নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করবে। এই পদ্ধতিতে হিটলারের যুগে গোয়েবলস বিরাট ফায়দা লাভ করেছে।

০৪. ইসলাম উপকরণ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখেনি। তার নিকট উভয়ের মাঝে না শুধু সমন্বয় জরুরী; বরং ইসলামের মাপকাঠিই চূড়ান্ত। শালীন উন্নত উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করার জন্য অশালীন নিম্নমানের উপকরণ গ্রহণ করা যেতে পারে না।

www.pathagar.com

ক. আধুনিক যুগে বিত্তশালী, পুঁজি বিনিয়োগকারী এবং বড় বড় রাজনীতিক তাদের বস্তুগত স্বার্থ অর্জনের জন্য পত্র পত্রিকা ও মিডিয়াকে দ্বিতীয় উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে। এখন তো মিডিয়া একটি স্বতন্ত্র শিল্পের রূপ ধারণ করেছে।

খ. শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) তাঁর নযীরবিহীন গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'য় লেখেন, অর্থনীতি চরিত্রের অনুগামী হওয়া উচিত, কিন্তু আধুনিক যুগে বস্তুতান্ত্রিক মেধা মাদকদ্রব্য, নাইট•ক্লাব, নৃত্যমঞ্চ এবং সিনেমার বিকাশের জন্য মিডিয়ায় বড় বড় বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু ইসলামী মিডিয়া এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার ইসলামী চরিত্র ও মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী মনে করে।

গ. ইসলামী মিডিয়ায় সর্বাবস্থায় প্রতিটি জিনিসের ওপর চারিত্রিক মূল্যবোধ ও মৌলিক নীতিমালার প্রাধান্য রয়েছে, অন্যান্য সকল বস্তু তার অনুগামী। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য মিডিয়ায় বস্তুগত স্বার্থের মোকাবেলায় অভ্যন্তরীণ ও চারিত্রিক মূল্যবোধের কোনো মর্যাদা নেই। জনগণের জন্য যে প্রোগ্রামই উপস্থাপন করা হবে, তাতে বস্তুগত স্বার্থ ও লাভ সর্বাধিক মর্যাদা রাখে। কারণ তার সামনে কোনো উচ্চ শালীন মর্যাদাকর উদ্দেশ্য নেই, না কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আছে, আর না কোনো মানবীয় সমস্যার ব্যাপারে পশ্চিমা মিডিয়ার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পশ্চিমা মিডিয়া যে কোনো মূল্যে বস্তুতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দেয়। এর জন্য তাকে হারামের আশ্রয় নিতে হোক অথবা মাদক ও যৌন চেতনা উসকে দেয়ার প্রয়োজন পড়ুক অথবা পাশবিক প্রবৃত্তি বিকশিত করতে যত নিম্নেই অবতরণ করতে হোক না কেন, তার জন্য সে প্রস্তুত।

ঘ. উপায়-উপকরণ ও মাধ্যমসমূহকে যখন পবিত্র উদ্দেশ্যের ধারক হতে হবে তখন খবরাখবর ও রচনাবলীও পবিত্র এবং উন্নত হতে হবে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নিষ্ঠাপূর্ণ পথনির্দেশ এবং কল্যাণকামিতার চেতনা তার গভীরে ক্রিয়াশীল হতে হবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার উদ্দেশ্য হতে হবে মানবতার পুনর্গঠন। ইসলামী মিডিয়া সচেতন ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়। উত্তেজনা ও অহেতুক চেতনা থেকে মুক্ত থাকে। এসব কিছু থেকে যে বিষয়টি সর্বপ্রধান তা হলো, তার ভিত্তি হবে তাওহীদের বিশ্বাসের ওপর। বিদআত, কুসংস্কার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত থাকে। কারণ ইসলামী মিডিয়া ও দাওয়াত একে অপরের সাথে সংযুক্ত।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

তিমিরাচ্ছন্ন রাতের পর উজ্জ্বল প্রভাতের সোনালী সূর্য উদিত হবেই

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যদিও একের পর এক মুসলিম দেশগুলো স্বাধীন হতে থাকে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের প্রসারিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সভ্যতার জালে তারা দ্বিতীয় বার ফেঁসে যায়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ সকল মুসলিম দেশের ওপর নিকৃষ্টতম একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র এবং ধর্মহীন সরকার চাপিয়ে দেয়, যারা মুসলিম জনসাধারণকে বস্তুগত উন্নতি-অগ্রগতি ও ইসলামী মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত করে। সুতরাং বড় ধরনের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, রাজনৈতিক নির্যাতন এবং ঈমানী পরীক্ষা থেকে বাঁচার জন্য মুসলমানরা ইউরোপ-আমেরিকার দিকে গতি ফেরায়।

তাদের প্রথমে চিন্তা ছিল, কিছুদিন সেখানে চাকরি-বাকরি করে আবার দেশে ফিরে আসবে, কিন্তু মুসলিম অভিবাসীরা সেখানে গিয়ে যখন অর্থনৈতিকভাবে একটু সচ্ছল হয়ে ওঠল তখন তারা তাদের স্ত্রী-পুত্রদেরও সেখানে নিয়ে যায়। কিছুদিন পর তারা মৌলিক নাগরিক অধিকার অর্জন করে। ফলে সেসব মুসলমান আরো বেশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান এবং নিশ্চয়তা লাভ করে। তারা সেখানে জায়গা-জমি ক্রয়-বিক্রয়, ঘর-বাড়ী এবং ভোট প্রদান ইত্যাদি মৌলিক অধিকারও লাভ করে। কেননা, তারা সেখানে নিয়মিত ট্যাক্স দেয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা লাভের পর ইউরোপ-আমেরিকায় অভিবাসী মুসলমানদের মাথায় চিন্তা আসল, ইসলামই আমাদের পরিচয় ও স্বতন্ত্র-বৈশিষ্ট্য। এজন্য মসজিদের প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং তারা নিজ নিজ এলাকায় মসজিদ নির্মাণ ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন শুরু করে দেয়। মুসলিম সংগঠন, দীনী মাদরাসা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠতে শুরু করে। দাওয়াতী তৎপরতার জন্য নতুন নতুন ময়দান তালাশে দাওয়াতী মিশনগুলো অধিকহারে সেখানে তাদের জামাআত পাঠাতে থাকে। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে এ উপমহাদেশ এবং আরব দেশসমূহে জামাআত আসতে থাকে।

সাম্প্রতিক জরিপ থেকে জানা যায়, ইউরোপ-আমেরিকা থেকে তাবলীগ জামাআত একশ বিশটি দেশে আসা যাওয়া করছে। এছাড়াও আল্লাহর রহমতে আরো অনেক অখ্যাত দাওয়াত দানকারী ইউরোপ-আমেরিকার যিন্দানখানায় ইসলামী দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম বিদ্বেষী প্রচারণা, প্রোপাগান্ডা ও মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়া বর্বর পাশবিক নির্যাতন অমুসলিমদের হৃদয়ে মুসলমানদের প্রতি আরো সহানুভূতি

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে। বর্তমানে শুধু ইউরোপেই মোটামুটি দুই কোটি মুসলমান বসবাস করছে। তন্মধ্যে ফ্রান্সে মুসলমানদের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ লাখ, ইংল্যান্ডে বিশ লাখ, জার্মানীতে পনের লাখ এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে বাকী সোয়া কোটি। আর আমেরিকায় মুসলমানদের সংখ্যা আশি লাখ। তন্মধ্যে কালোদের সংখ্যা বিয়াল্লিশ শতাংশ। প্রতিবছর এগার হাজার ইসলাম গ্রহণকারী মার্কিনীর মধ্যে কালোদের হার পঁচাশি শতাংশ। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী নারীদের হার আটষট্টি শতাংশ।

আমেরিকায় এক হাজার মসজিদ, তিনশ'র বেশি ইসলামী কেন্দ্র এবং একশ' আটচল্লিশটি দীনী মাদরাসা রয়েছে। আর সক্রিয় কর্মতৎপর ইসলামী সংগঠন-সংস্থার সংখ্যা উল্লিখিত সংখ্যার বাইরে।

বিশ শতকের সূচনালগ্নে যেসব মুসলমান পশ্চিমা দেশে পাড়ি জমিয়েছে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে, যারা তাদের পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে এবং তারা পশ্চিমা সভ্যতায় নিজেদের সম্পূর্ণ বিলীন করে দিয়েছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান দীর্ঘ দিন পশ্চিমা সমাজে বসবাস করা সত্ত্বেও তারা তাদের ইসলামী পরিচয়বোধ ও স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্য ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। যখন তাদের সন্তানদের বিপথগামিতা এবং নৈতিক ও চারিত্রিক ধসের অনুমান হয়েছে, স্বচক্ষে ইসলাম বিদ্বেষের দৃশ্য এবং পশ্চিমা সমাজ টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, যৌন উচ্ছৃংখলতা, নৈতিক ও চারিত্রিক ধসের উত্তাল তরঙ্গ দেখেছে, তখন বিভিন্ন মুসলিম দেশ এবং এ উপমহাদেশ থেকে দীনের দাওয়াতদানকারী ব্যক্তিবর্গ ও জামাআতসমূহের অধিকহারে আসা-যাওয়া পশ্চিমা দেশে বসবাসরত মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াতী চেরাগ প্রজ্বলিত করেছে।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) ১৯৬৩ সালে প্রথম ইউরোপ সফরকালে যেসব পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি লিখেছেন, ইউরোপে এসে আমার অনুমান হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং পশ্চিমা দেশে কোন বিপ্লব বা পরিবর্তন না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাচ্যের দেশগুলোতেও কোনো পরিবর্তন আসবে না। কারণ প্রাচ্যের দেশসমূহের চাবিকাঠি পশ্চিমা দেশগুলোর হাতে। সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) পশ্চিমা সমাজের চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতনের অন্তরালে ক্রিয়াশীল ইহুদী তৎপরতা এবং তাদের মানবতাবিনাশী ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের ফলাফল উল্লেখ করে লেখেন, ইহুদীরা ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডে সফলকাম হওয়া আল্লাহ তাআলার ন্যায়বিচার এবং তাঁর সর্বাধিক দয়ালু গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। মানুষের জীবনধারা যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, সে জন্য আল্লাহ তাআলার প্রেরিত সর্বশেষ দীনও বিজয় লাভ করবে এবং পরিণতিতে মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেবে।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) এর ভবিষ্যদ্বাণী এমনভাবে পূর্ণ হচ্ছে যে, স্বয়ং পশ্চিমা দেশের চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসছে।

www.pathagar.com

নিজেদের প্রসারিত আন্তর্জাতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে চিন্তা, উদ্বিগ্নতা ও অনুশোচনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারা এই দুলদুল থেকে বের হবার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছে।

মার্কিন সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা মি. ব্রজেনেস্কি স্বীয় গ্রন্থ 'Out of Central'-এ লেখেন, যে সমাজে প্রতিটি জিনিসের সহজেই অনুমতি থাকে, প্রতিটি বস্তুই পাওয়া যায়, সে সমাজের চারিত্রিক ও নৈতিক মানদন্ড অত্যন্ত নীচু হয়। এমন সমাজে মানুষ সব সময় তার প্রবৃত্তির সকল চাহিদা পূরণের চিন্তায় বিভোর থাকে এবং যে কোনো মূল্যে তা পূরণ করেই ছাড়ে।

প্রসিদ্ধ মার্কিন ঐতিহাসিক আর্থার চ্যালেঞ্জার স্বীয় গ্রন্থ 'U.S.A-তে লেখেন, মার্কিন সমাজে একাধিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নির্মূল করা এবং সকল সভ্যতা-সংস্কৃতিকে মার্কিন ছাঁচে ঢালার অভিজ্ঞতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে পড়েছে। কারণ পাশ্চাত্য চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছে।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসনও পশ্চিমা বিশ্বের প্রকৃত উন্নতি-অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে লেখেন, আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি যেসব সংকট সমস্যার সম্মুখীন তার সারকথা হলো, বস্তুগত দিক দিয়ে আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ততক্ষণ স্থায়ী থাকবে যতক্ষণ সে তার হারানো প্রাণ দ্বিতীয় বার অর্জন করতে সক্ষম হবে।

প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ ড. আলেকজাস কার্ল তার বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ 'Man The Unkwown'-এ লেখেন, বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি মানবিক মূল্যবোধ ও তার সকল বৈশিষ্ট্য নির্মূল করে দিয়েছে। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের মনস্তত্ত্বের সাথে কোনোভাবে সমন্বয় হয় না। আমাদের স্বভাব, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য জানা-বোঝা ছাড়াই এই সভ্যতা অস্তিত্ব লাভ করেছে। যদিও আমাদের প্রচেষ্টার কারণেই এই সভ্যতা অস্তিত্বশীল হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের প্রকৃত চাহিদা, কামনা ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত।'

তিনি আরেকটু অগ্রসর হয়ে লেখেন, 'মৌলিকভাবে যে বাস্তবতা আমাদের সামনে থাকা উচিত, তা হলো মানুষই আসল। প্রতিটি জিনিসই তার স্বভাব, প্রকৃতি ও রুচিবোধের সাথে সমন্বিত হতে হবে, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষ যে দুনিয়া আবিষ্কার করেছে, সেখানেই সে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মানুষ তার আবিস্কৃত দুনিয়া এজন্য সুসংগঠিত করতে পারেনি। কারণ, সে এই দুনিয়ার প্রকৃতির ব্যাপারে বাস্তবিকই অজ্ঞ।

এই ভিত্তিতে মানুষ যে ঈর্ষণীয় উন্নতি-অগ্রগতি সাধন করেছে এবং যেভাবে জড় জগত মানুষের জীবনের জ্ঞানের ওপর প্রাধান্য ও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে, তা সেই দুর্ঘটনা ও দুঃখজনক ট্রাজেডিরই অংশ, আজ মানুষ যার সম্মুখীন। আমাদের জ্ঞান-বিবেক যে পরিবেশ গঠন এবং যেসব আবিষ্কার-উদ্ভাবন করেছে, আমাদের প্রাণ ও চরিত্রের সাথে তা সমন্বয় হয় না। আর না আমাদের দেহাবয়বের ওপর খাপ খাচ্ছে। আমরা পাশ্চাত্য

www.pathagar.com

অধিবাসীরা আজ চারিত্রিক ও চিন্তাগতভাবে সীমাহীন নীচু স্তরে নেমে গেছি। আমরা নিম্নমানের হতভাগা লোক। যে জাতিগোষ্ঠী শিল্পের উন্নতির শীর্ষ চূড়ায় পৌছে গেছে এবং অসাধারণ দ্রুততার সাথে এই অবস্থান লাভ করেছে, সে জাতি আজ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে চলেছে। দাঁড়িয়ে আছে পতনের বেলাভূমিতে। যে দ্রুততার সাথে তারা উন্নতির শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছেছে, তার চেয়ে বেশি দ্রুততার সাথে অধঃপতন এবং বর্বরতা ও পাশবিকতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে, কিন্তু তাদের এ পতনের অনুভূতিও হবে না।'

মার্কিন সমাজের ক্রমবর্ধমান ক্ষয়িষ্ণুতা, বিচ্ছিন্নতা এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রগুলোতে ছেয়ে থাকা অস্থির ও বিশৃংখল পরিবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রসিদ্ধ মার্কিন পত্রিকা U.S. NEWS-এর প্রধান সম্পাদক মার্টিমার বি টু উকারম্যান (Martimer B.2 Uckerman) ১৯৯৪ সালের ১৮ই আগস্ট সংখ্যায় লেখেন, 'মার্কিন সমাজ জীবনের কাঠামো অতি দ্রুত ছিন্নভিন্ন হয়ে একটা জাতীয় প্রতিবন্ধক হতে চলেছে। পুরো দেশের ওপর নৈরাজ্য, বিশৃংখলা ও অস্থিরতা স্থায়ী আসন গেড়ে নিয়েছে। মার্কিন সমাজে বিচ্ছিন্নতা একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। প্রতি চার জন মার্কিনীর মধ্যে তিন জনের ধারণা, তাদের চারিত্রিক, নৈতিক ও আত্মিক মান অত্যন্ত নিম্নস্তরে নেমে গেছে এবং প্রতি তিন জনের মধ্যে দুইজনের ধারণা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সঠিক রাস্তা থেকে পিছলে পড়েছে।

এমনকি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের অনৈতিক কর্মকান্ডের কারণে তার প্রতি জনগণের সমর্থন পনের পয়েন্ট নিচে চলে গেছে। পুরো দেশের ওপর অস্থিরতা ও বিশৃংখলা শিকড় গেড়েছে। নেশাকর মাদকদ্রব্য পারিবারিক জীবন ছিন্নভিন্ন করে চলেছে। শিক্ষার মান নিচে নেমে গেছে। পাবলিক স্থানগুলো নেশাখোর ও ঠগবাজদের আড্ডায় পরিণত হয়েছে। এমন মনে হচ্ছে, আমরা সামাজিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পার্থক্য সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি। সর্বত্র প্রতিযোগিতার মানসিকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কৃষাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের সাথে যুদ্ধরত। নারীরা পারিবারিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। তারা তাদের নারীত্বের ওড়াচ্ছে।

ছেলে-সন্তানরা পিতা-মাতার প্রতি বিমুখ অসন্তুষ্ট। মায়েরা দাম্পত্য জীবন থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছে। পিতা সন্তানদের দায়িত্ব মুক্ত হতে চাচ্ছে। উপাসনাকারীরা উপাসনালয় থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। ছাত্ররা ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে হাঙ্গামারত। যেন দেশব্যাপী জনগণের কল্যাণকামিতার কালচারের পরিবর্তে জনগণের অভিযোগের কালচার উথলে ওঠছে। প্রত্যেকেই কামনা-বাসনার শিকার। নিঃস্ব বঞ্চিতরা নিজেরদেরকে বিত্তশালীদের শিকার মনে করছে। অপরাধ স্বীকৃত বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। কেননা, অপরাধকে অতৃপ্ত শৈশব জীবনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া বলে মেনে নেয়া হয়েছে। মোটকথা যেসব মানবিক বৈশিষ্ট্যের ওপর আমেরিকা গর্ব করত, অর্থাৎ মেহনত, পরিশ্রম, স্বতঃস্ফূর্ত ডিসিপ্লিন এবং দায়িত্বের অনুভূতি, সেগুলো আজ অলীক

www.pathagar.com

স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। নতুন প্রজন্ম শান্তি, প্রশান্তি এবং পারিবারিক ও নৈতিক ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। দ্রুত লাভ ও অর্জন তাদের জীবনের অবলম্বনে পরিণত হয়েছে। প্রবৃত্তির চাহিদা ও কামনা-বাসনা তাদের একমাত্র নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন মিডিয়া, টিভি, সিনেমা ও অশ্লীল গান-বাজনা তাদের চেতনাকে উত্তেজিত ও উজ্জীবিত করছে। মার্কিন নৈতিকতা এক সময় যেগুলোকে ঘৃণা করত, উদাহরণস্বরূপ কট্টরপন্থা, হারাম কর্মকান্ড, নেশাকর দ্রব্য ব্যবহার, মদ্যপান, যেনা, ব্যভিচার ইত্যাদি মার্কিন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে।

পক্ষান্তরে সচ্চরিত্র, দীন-ঈমান, পরিবারিক জীবন এবং রাষ্ট্র-সরকারের প্রতি সম্মান-সমীহবোধ সেখান থেকে নির্মূল হয়ে গেছে। পুঁজিবাদী ও বাণিজ্যিক মানসিকতা পারিবারিক জীবন, প্রতিবেশীর মিলমিশ, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ঐক্য-সংহতি চির নির্মূল করে দিয়েছে। জাতি এই শাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে বিক্ষুব্ধ-অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে। সময় এসেছে জীবনের মোড় পরিবর্তন করার। শিক্ষা ও অর্থনীতির পুনর্গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে কৌশল ও দায়িত্বের অনুভূতি বাড়াতে হবে এবং নৈতিকতাকে সর্বশীর্ষে স্থান দিতে হবে। জাতি আজ সামাজিক ও চারিত্রিক অধঃপতন থেকে বের হবার দাবী জানাচ্ছে।

মানুষ চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। যদিও প্রাচীন যুগের সহজ-সরলতার দিকে ফেরা অসম্ভব এবং ঘড়ির কাঁটা পেছনে নেয়া সম্ভব নয়। তথাপি আজকের ধ্বংস ও বরবাদী থেকে বের হবার জন্য যে শূন্যতা আমাদের অস্থির করে তুলেছে, তার প্রতি যদি সম্মান প্রদর্শন না করা হয়, তাহলে আগামীকাল ভয়-ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং পরশু সেটা ত্রাস ও সন্ত্রাসের রূপ ধারণ করবে। যখন ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাসের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন সেটা জ্ঞান-বিবেক ও ধৈর্য-সহ্য উভয়ের জন্য বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। বর্তমানে আমরা এই পরিবেশে প্রবেশ করেছি। এটি আমাদের জন্য মহাবিপদ ও অশনি সংকেত।'

এই মহাবিপদের আশংকা না শুধু ইউ.এস নিউজ পত্রিকার চিফ এডিটরের, আর না শুধু আমেরিকা মহাদেশের লোকদের, বরং গোটা পশ্চিমা দুনিয়ার জন্যই এই আশংকা। তারা ইতোমধ্যে সেটা অনুভবও করতে শুরু করেছে, যার প্রতিনিধিত্ব করেছেন ইউ.এস নিউজ-এর চিফ এডিটর। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যেখানে আস্তানা গেড়েছে, সেখানেই এ মহাবিপদ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ডিশ এন্টিনা এবং ইন্টারনেট এই বিপদের আশংকাকে বৈশ্বিক রূপ দান করেছে। এই মহাবিপদ ও আত্মিক শূন্যতার অনুভূতি এত ব্যাপক হয়ে গেছে যে, বিত্তশালীদের সন্তানরা এক ধরনের আত্মহারা হয়ে শান্তির তালাশে বিশ্বব্যাপী চষে বেড়াচ্ছে। অপরদিকে ইদানীং পশ্চিমা দেশের টিভিগুলোতে আত্মিক প্রোগ্রাম সীমাহিন জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। পাশ্চাত্যের প্রতিটি লোক একটি আকীদা-বিশ্বাস এবং একটি জীবন দর্শনের তালাশে আছে। এই ধারা এক শতাব্দী ধরে চলে আসছে। হাজার হাজার অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ শান্তি-প্রশান্তির তালাশে পাগলপারা।

www.pathagar.com

রুসল, দীব, মারয়াম, মুরতাযা দেহলীন, ওমর ফারুক আব্দুল্লাহ, খালেদ ইসলাম এবং মুরাদ হোফম্যান প্রমূখের মতো হাজার হাজার মেধাবী লোকেরা আত্মিক প্রশান্তির জন্য ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। এ অমূল্য সম্পদ তারা আর কোথাও পায়নি। খোদ জার্মান বুদ্ধিজীবী মুরাদ হোফম্যান পশ্চিমা দুনিয়ায় বিরাজিত এই ধর্মীয় শূন্যতার যে পর্যালোচনা করেছেন, তা নিরাশার গাঢ় তমসার মধ্যে আশার আলো। মুরাদ হোফম্যান ইনস্টিটিউট অফ পলিসি স্টাডিজের তত্ত্বাবধানে ২০০০ সালের ২৪ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ইসলামাবাদ, করাচী ও লাহোরে লেকচার দিয়েছেন। আমরা তার লেকচারের একটি অংশ লাহোর থেকে প্রকাশিত মাসিক তরজুমানুল কুরআনের সৌজন্যে এখানে পেশ করছি।

মুরাদ হোফম্যান তার লেকচারের সূচনায় পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদের কথা উল্লেখ করে বলেন, খোদ পশ্চিমা চিন্তাবিদরা একথা স্বীকার করছেন, দীন-ধর্ম পরিত্যাগ করে আজ আমরা দুনিয়ার জান্নাত পাওয়ার পরিবর্তে অবিশ্বাসযোগ্য সীমায় পাশবিক বিশ্বযুদ্ধ, আণবিক ও রাসায়নিক সমরাস্ত্র, হত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞের মতো বিপদ ও বরবাদীর সম্মুখীন। মানুষ যদি দীন-ধর্ম ফিরিয়ে আনতে না পারে তাহলে মানবতা শুধু নিজেকেই ধ্বংস করবে না; বরং বিশ্ব ভূ-খন্ডকেও ডুবাবে।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডেভিড বেল তার লেখা 'পুঁজিবাদের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব' গ্রন্থে মনে করিয়ে দিয়েছেন, নৈতিকতা ও চরিত্রের পুনর্গঠনের জন্য কোনো না কোনো ধর্মের আশ্রয় নেয়া জরুরী। সে ধর্ম নিজেদেরই আবিষ্কার করতে হোক না কেন। তবুও ধর্মের আশ্রয় নিতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এক কূটনীতিক উইলিয়াম এ্যাপলস ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, পশ্চিমা বিশ্ব কমিউনিজমের মতো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ পাশ্চাত্য উচ্চ দূরদর্শিতা থেকে বঞ্চিত। উভয় চিন্তাবিদ এই সুস্পষ্ট বাস্তবতা স্বীকার করেছেন যে, কোনো মানব সভ্যতা কখনো আধ্যাত্মিকতা ছাড়া জীবন্ত থাকতে পারে না।

মুরাদ হোফম্যান পাশ্চাত্য দুনিয়ার বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, পশ্চিমা ওরিয়েন্টালিস্টদের নিকট ইসলামের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর এর কোন আশা ছিল না যে, বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে ইসলাম আবার বিশ্ব দিগন্তে নতুনভাবে উদিত হবে, যেই ইসলামের ওপর বিগত চারশ বছর ধরে জড়তা ও স্থবিরতার পর্দা পড়ে ছিল এবং যার অনুসারীদের ইউরোপীয় জাতি-গোষ্ঠীসমূহ তাদের কলোনী বানিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু সেই ইসলামী বিশ্বে ইসলামের এমন সব দাঈ জন্ম নিচ্ছেন, যাঁরা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে পাশ্চাত্যকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন। তাদের লিটারেচার সকল জায়গায় অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পড়া হয়। আজ আইসল্যান্ড এবং কোরিয়া থেকে কলাম্বিয়া পর্যন্ত দুনিয়ার এমন কোন দেশ নেই, যেখানে সক্রিয় ও কর্মতৎপর মুসলমান নেই। ১০০ বছর পূর্বে যারা সংখ্যায় দুনিয়ার মানুষের এক সপ্তমাংশ ছিল, আজ তারা দুনিয়ার জনসংখ্যার ২০ শতাংশ।

www.pathagar.com

আজ লন্ডন, প্যারিস, রোম, ভিয়েনা, লিসবেন, নিউইয়র্ক এবং লস এঞ্জেলেসের মতো শহরগুলোতে উল্লেখযোগ্য মসজিদ দেখা যাচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকায় লাখ লাখ মুসলমান কর্মতৎপর রয়েছে। অমুসলিম দেশগুলোর সর্বত্র ইসলাম দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। আজ বিশ্বের এমন কোনো সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল নেই, যেখানে ইসলামী আলোচ্য বিষয় নেই। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, ইউরোপের সকল ভাষায় পর্যাপ্ত ইসলামী লিটারেচার পাওয়া যাচ্ছে। কুরআনুল কারীম এমন এক গ্রন্থ, প্রতিটি ভাষায় যার অনুবাদ রয়েছে এবং সবচে বেশি এই গ্রন্থেরই অনুবাদ করা হচ্ছে। আল্লাহর যমীনে এ গ্রন্থেরই সবচে বেশি তিলাওয়াত হচ্ছে।

উল্লিখিত সব কিছুই যেহেতু আদর্শিক শতাব্দী বিশ শতকে হয়েছে। তাই কিছু ইসলামী আন্দোলন মৌলিকভাবে রাজনৈতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ কারণেই নিছক হতাশাবশতঃ কিছু লোক সন্ত্রাসের পথে চলছে। এ পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় ইসলামের বরাতও একটি আদর্শ হিসাবে দেয়া হয়। একদিক থেকে এ কথা তো ঠিক, জাগতিক বিষয় পারিচালনার জন্য ইসলাম চিন্তাধারার একটি সমষ্টি পেশ করে, কিন্তু আমাদের নিজস্ব আকীদা-বিশ্বাসের বরাত একটি আদর্শ হিসাবে প্রদান থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা, ইসলাম একটি আদর্শ-এ পরিভাষা থেকে রাজনীতি এবং এমন সব পার্থিব বিষয়ের চিন্তাধারা অনুমিত হয়, যাতে আখিরাত শামিল নয়।

দীন-ধর্মের ভবিষ্যত

পরিস্থিতি যা কিছুই হোক, কিন্তু বাস্তবতা হলো, একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে কেবল দু'টি বস্তুই বাকী রয়ে গেছে, যা পশ্চিমাদের মন-মস্তিষ্ক ও বিবেককে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। এক. সেক্যুলারিজম বা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ। দুই. ইসলাম। এ ছাড়া তৃতীয় আর কোন রাস্তা দৃষ্টিগোচর হয় না, যা পশ্চিমাদের আকৃষ্ট করতে পারে। যদিও পশ্চিমা চিন্তাবিদদের মধ্যে এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট। তবে এদের সংখ্যা গণনার বাইরে। তারা হয় তো দ্বিতীয় জন্মে সুযোগ পাওয়ার অপেক্ষা করবে। সুতরাং এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, ভবিষ্যত কার হবে? এ প্রশ্নের আগে আরেকটি প্রশ্নের জবাব তালাশ করতে হবে। সেটি হলো, একবিংশ শতাব্দী কি দীন-ধর্মের শতাব্দী হবে, নাকি অন্য কিছুর?

বর্তমান যুগ-পরিস্থিতির আলোকে মনে হচ্ছে, দীন-ধর্ম ক্রমেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। আর এ অবস্থা আমেরিকা থেকে ইউরোপে বেশি দৃশ্যমান। সেখানে মানুষ দলে দলে খৃস্টীয় চার্চকে বিদায় জানাচ্ছে। আবার চার্চগুলোও আমাদের যুগের ফ্যাশন মোতাবেক একের পর এক সমঝোতা করে তার মৌলিক নীতিমালা বিসর্জন দিয়ে চলেছে। সুতরাং এখন ইউরোপের খৃস্টীয় চার্চসমূহে সমকামী পাদরী জন্ম নিয়েছে। মানুষ যখন যেভাবে ইচ্ছা গর্ভপাতের অনুমতি লাভ করতে পারে। সেখানে মহিলা বিশপও রয়েছে। রোযার কার্যতঃ কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট নেই। বিশ্বাস করুন, এভাবে

www.pathagar.com

ইউরোপীয় চার্চগুলো বিপথগামী হয়ে চলেছে। খৃস্টবাদের ওপর বিশ্বাস পোষণকারীদের অধিকাংশ এমনকি কিছু প্রোস্ট্যান্ট পাদরীও ঈসা মসীহ'র আল্লাহ হওয়া এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার ওপর বিশ্বাস রাখে না-এটা কোনো তাজ্জবের কথা নয়। যাক, এটা পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। এখনও পর্যন্ত ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও প্রবৃত্তির অনুগামী নিয়ম-নীতিহীন দীন-ধর্ম এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দীন-ধর্ম স্বীকৃত চার্চগুলো থেকে দুরে সরে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে নতুন আশ্রয়ের সন্ধান করছে। আপনি পাশ্চাত্য জগতের কোনো বইয়ের দোকানে চলে যান।

আপনি দেখবেন, দীন-ধর্মের বিপরীতে রহস্যতত্ত্ব এবং তেলেসমাত ভেল্কিবাজির আলোচনা সম্বলিত বই-পত্রের সেকশন অনেক বড় হবে। আজও মানুষ জানতে চায় তাদের ভবিষ্যত কি? তারা সর্বপ্রকার নিগূঢ় রহস্য জেনে সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়। মৌলিকভাবে দীন-ধর্মের কামনা-আকাঙ্খা তাদের সকল শিল্পকে ফুলে ফলে সুশোভিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। মানুষ যে কোনো বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভের আগ্রহী। তা দুশমন, তন্ত্রমন্ত্র, ইবলীস শয়তান অথবা হিন্দু গুরু-যে কোনো কিছুর পূঁজাই হোক।

আমার অভিমত হচ্ছে, নতুন প্রজন্মের অধিকাংশই ইতিবাচকভাবে দীন-ধর্মের জন্য অস্থির পেরেশান। নিরর্থক ও রুহানিয়াত শূন্য জীবনের প্রতি তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। তারা এ বাস্তবতার তালাশে রয়েছে যে, 'আসলেই কি এমন কোনো জগত রয়েছে, প্রত্যেক বস্তু যেখানে চলে যায়।' পশ্চিমাদের লালন-পালন বিধি-নিষেধমুক্ত স্বাধীন পরিবেশে হয়েছে। তাদের অন্তরে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, যথার্থ মূল্যবোধ এবং হক ও বাতিলের বিশ্বস্ততার মানদন্ড পেয়ে যাওয়ার কঠিন কামনা-বাসনা নিহিত রয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, ইউরোপবাসীর মাঝে দীন-ধর্মের অসীম সম্ভাবনা রয়েছে, যা একবিংশ শতাব্দীকে দীন-ধর্মের যুগে বদল করতে পারে। অতএব প্রশ্ন হচ্ছে, অতীতের তুলনায় আজ খৃস্টবাদের মোকাবেলায় ইসলামকে উত্তম বিকল্প চিন্তা করা হবে কি না এবং একালে প্রচলিত ব্যক্তিগত দীন-ধর্মের বিপরীতে সম্মিলিত ইবাদাতকে প্রাধান্য দেয়া হবে কিনা?

প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে আমার সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে, ইউরোপে খৃস্টবাদ সংশোধনের অযোগ্য। অনুরূপ পাশ্চাত্যবাসী একটি কৃত্রিম ধর্ম তৈরিতে নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে এক জায়গায় একত্র করতে পারছে না। এমন ধর্মমত চলতেও পারে না। কেননা, কোনো ধর্মমত প্রচলিত হতে এমন ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব অত্যাবশ্যক, যিনি হবেন যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। শুধু ওহী এবং ইলহামের ওপরই ধর্মমতের বিনির্মাণ সম্ভব।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আমার অভিমত হচ্ছে, এ প্রশ্নে আমি অত্যন্ত আশাবাদী। নতুন প্রজন্ম নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ককে অত্যন্ত প্রিয় জানে একং বৃদ্ধকালে একাকী জীবন-

যাপন সম্পর্কে তারা অত্যন্ত চিন্তাশীল। এটা বাস্তবে যুবকদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্বল যে, ইসলাম নিজের সাথে বংশ, জাতি-গোষ্ঠী এবং ভ্রাতৃত্বের চিন্তা-চেতনাও নিয়ে আসে। ইসলামী সমাজে পাশ্চাত্যের খৃস্টানদের মাঝে তাদের প্রতিবেশীর সাথে প্রীতি-ভালবাসার চিন্তা-চেতনার বিপরীতে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক অনেক বেশি বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যদি পাশ্চাত্য সমাজের আবেগ-অনুভূতির শীতলতা বাস্তব বিষয় হয়, তা হলে মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক প্রীতি-ভালবাসা, উষ্ণ সম্পর্ক সমকালীন পাশ্চাত্য শিশুদের এক মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

কম্পিউটার যুগের দূরদ্রষ্টা স্বভাব-প্রকৃতি যৌন দিক থেকে অগ্নিগর্ভ পরিবেশ, পাশ্চাত্য জীবনে প্রতিযোগিতার পাশবিক দৌড়ঝাঁপ, যা স্কুল থেকে চাকরি, চাকরি থেকে যৌন সম্পর্ক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং অধিক থেকে অধিক পাওয়ার দৌড়ঝাঁপ এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, যে পরিবেশে প্রত্যেক সাধারণ আমেরিকান কমপক্ষে একবার মানসিক চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য। এমন লোকেরা এ স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না যে, অধিকাংশ মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে আশ্বস্ত, নিশ্চিত, মানসিক ভার-বোঝামুক্ত এবং তারা তাড়াতাড়িপ্রবণ নয়। তারা তাদের আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট এবং নিজের পরিবেশ ও ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে আশ্বস্ত ও নিশ্চিত মানুষ। এসব কারণে আমি অনুধাবন করি, যেসব মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের দৌড়ঝাঁপে ত্যক্ত-বিরক্ত, তারা ইসলাম সম্পর্কে বেশি বেশি জানতে আগ্রহী।

মোটকথা, আজ খৃস্ট ধর্মের অস্তিত্ব টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়েছে। সে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নতুন আশ্রয়ের তালাশে রয়েছে। খৃস্ট ধর্ম প্রাণহীন কাঠের মতো হয়ে পড়েছে। তাতে না কোন আবেদন আছে আর না কোন শিক্ষা আছে। এই প্রাণহীন ধর্ম থেকে তারা আজ অতিষ্ট হয়ে গেছে। হয়ে পড়েছে ঘর্ম ক্লান্ত। এখন তারা একটা নতুন ধর্মের তালাশে আছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের নতুন প্রজন্ম আজ শান্তি-প্রশান্তির অন্বেষায় একটি নতুন ধর্মের জন্য বিশ্বব্যাপী চষে বেড়াচ্ছে। এক কথায়, পাশ্চাত্যের মধ্যে ধর্মের সীমাহীন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যা একুশ শতককে ধর্মের শতাব্দীতে রূপান্তর করতে পারে। এখন সেই প্রথম প্রশ্ন হলো, একুশ শতকের সেই ধর্ম কোন ধর্ম হবে। একুশ শতকে কি খৃস্ট ধর্মের মোকাবেলায় ইসলামকে সর্বোত্তম বিকল্প মেনে নেয়া হবে? এর জবাব হলো, পরিস্থিতির আলোকে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আগামী শতাব্দী হবে ইসলামের শতাব্দী। দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেবে।

ইসলামের সম্ভাবনা

একুশ শতকে বিশ্বব্যাপী আজ ইসলামের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এখন প্রশ্ন, মানুষ ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে কিনা? এ প্রশ্নের জবাব নির্ভর করছে, মুসলমানরা ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করছে নাকি তার ভ্রান্ত প্রতিনিধিত্ব করছে, তার ওপর।

www.pathagar.com

বর্তমানে মুসলমানদের যে অবস্থা, তা দেখে কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে না। বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ইসলাম গ্রহণ করছে। একথাই অতীব সত্য, আল্লাহ তাআলাই যাকে চান তাকে সোজা পথে চালান। সানফ্রান্সিকোর জেফরে লিংগা-এর মতো অনেক মানুষ শুধু কুরআন পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অথচ এর পূর্বে মুসলমানদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সামগ্রিকভাবে মুসলমানদেরকে দীনের দাওয়াতদাতা হিসাবে ব্যবহার করেন। মুসলমানরা যদি পরিকল্পিতভাবে দীনের দাওয়াত-অন্যদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করত তাহলে ইসলামের আরো সম্ভাবনা দেখা দিত।

তাই আজ মুসলিম উম্মাহকে সর্বপ্রথম ইসলামের বাস্তব জীবনের দিকে ফিরে আসতে হবে। তারপর ইসলামকে বিশ্ববাসীর সামনে আবেদনময় করে উপস্থাপন করতে হবে। মানবতার কল্যাণকামী ও মুক্তির দিশাদানকারী ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। ইসলামকে রোগের এমন ব্যবস্থাপত্র হিসেবে পেশ করতে হবে, যাতে সব ধরনের রোগের চিকিৎসা রয়েছে। আত্মিক, মানসিক, শারীরিক সব ধরনের শান্তি-প্রশান্তি ইসলামে রয়েছে। এছাড়াও দাওয়াতের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো তুলে ধরতে হবে তা নিম্নরূপ :

০১. এক আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরতে হবে এভাবে যে, আসমান-যমীন, আরশ-কুরসী, লাওহ-কলম, চন্দ্র-সূর্য, তারা-নক্ষত্র, গাছপালা, তৃণলতা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, এক কথায় দৃশ্যমান ও অদৃশ্য যত কিছু এই সৃষ্টি জগতে রয়েছে সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। তিনি স্ব-অস্তিত্বে সর্বদা বিরাজমান। তিনি চিরঞ্জীব। আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের বিষয়টা জটিল কিছু নয়। এ বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য কোনো তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন নেই। আমরা স্বভাবগতভাবেই বুঝতে পারি, বিশ্বজগত কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার ফসল নয়; বরং এর পেছনে রয়েছে মহান স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল।

তিনিই দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুকে অস্তিত্ব দান করেছেন। মহান রাব্বুল আলামীন এ মহা বিশ্বকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সুবিন্যস্ত ও সুনিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। এ মহা বিশ্ব যে মহান আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই। আল্লাহ তাআলার এই পরিচয় তুলে ধরতে পারলে আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী কিছুটা হলেও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করবে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে হবে, তাওহীদ তথা সব ধরনের সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র এক আল্লাহই আমাদের প্রভু। তাওহীদ আমাদের বিরাট এক সম্পদ। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, লা-শরীক, তাঁর কোনো শরীক নেই, সহকারী-সহযোগীও নেই। এখানে তর্কের খাতিরে বলতে হয়, যদি একাধিক ইলাহ থাকে তবে তারা সমান সমান ক্ষমতাবান অথবা কেউ তুলনামূলক কম ক্ষমতাবান হবে। যারা কম ক্ষমতাবান হবে তারা ইলাহ হতে পারে না। কারণ তারা অপূর্ণ, অক্ষম। যদি সকলে সমান হয় তবে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে বা পারে না, যদি

www.pathagar.com

তা না পারে তবে তারা সকলেই অক্ষম। আর যদি করতে পারে তবে জগতে বিশৃঙ্খলা ঘটা অবশ্যম্ভাবী। অথচ আমরা দেখতে পাই, বিশ্বজগত পরিচালনায় কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিন, মাস, বছর, শীত, গ্রীষ্ম একই নিয়মে চলছে। সুতরাং একাধিক ইলাহ্ অসম্ভব। আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই, তিনি নিজ সত্তা ও গুণাবলীতে এক, একক। অতএব তাঁর সাথে কোনো শরীক না করে নির্ভেজাল তাওহীদ-বিশ্বাস আমাদের অত্যাবশ্যক, আর এই হলো 'সীরাতে মুসতাকীম' মুক্তির সরল পথ।

এই মহাবিশ্বের অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি সব সময় ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তিনি সমস্ত উত্তম গুণের অধিকারী, সব ধরনের দোষত্রুটি থেকে পূত পবিত্র। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। সকল বিষয়ের ওপর তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সকল সৃষ্টি তাঁরই ইচ্ছায় আবর্তিত। তিনি সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা। তাঁর কোনো উদাহরণ নেই, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এবং কোনো সহযোগীও নেই; তাঁর নযীর নেই, বেমিছাল তিনি। ইবাদত-বন্দেগী লাভের অধিকারে, বিশ্ব জাহানের শৃঙ্খলা বিধানে কেউ তাঁর শরীক সহযোগী নেই। ইবাদত ও চূড়ান্ত সম্মানের অধিকারী কেবল তিনিই। তিনিই অসুস্থকে সুস্থ করেন, সকল প্রাণীকে রিযিক দেন।

তিনিই বিপদ-আপদ, বালা-মসিবত ও দুঃখ-কষ্ট দূর করেন। আল্লাহ্ তাআলা অন্য কোন সত্তায় প্রবিষ্ট ও একীভূত হওয়া থেকে পবিত্র। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সব কিছুতেই অনাদি অনন্ত। তিনি দেহ ও আকৃতি বিশিষ্ট এবং দিক বা স্থানের গতিতে আবদ্ধ নন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। জান্নাতে মু'মিনগণ তাঁর দীদার লাভ করে ধন্য হবেন। তিনি যা চান তাই হয়, যা চান না তা হয় না। তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর ওপর কারো আইন বা নির্দেশ চলে না। নিজের কাজ সম্পর্কে তাঁর কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। কিছু করা তাঁর জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়। তাঁর প্রতিটি কাজই হিকমতপূর্ণ, প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তিনি ব্যতীত যথাযথ কোনো নির্দেশদাতা, কোনো হাকিম নেই।

০২. মানব জীবনের পথনির্দেশনার জন্য আল্লাহ্ তাআলা যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এক আল্লাহতে বিশ্বাস এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত আনুগত্যের প্রতি ছিল সকল নবীর আহ্বান, এরই নাম ইসলাম। ইসলাম মানে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শান্তি ও মুক্তিলাভ। তাই নবী-রাসূলগণ যুগে যুগে ইসলামের বাণী প্রচার করে গেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁরই মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা ইসলামের পরিপূর্ণতা দান করেছেন। তাই ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন, জীবন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মধ্যেই মানুষের একমাত্র শান্তি ও কল্যাণ নিহিত। এছাড়া অন্য কোন মত ও পথে শান্তি নেই। ইসলাম মানুষের জৈবিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবন থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক,

www.pathagar.com

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর তেইশ বছরের নবুওতী জীবনে আল্লাহর বাণী আল কুরআনের ভিত্তিতে নিরলস সংগ্রাম ও অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে এক সর্বাত্মক বিপ্লব সাধন করে এমন এক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেছিলেন, যা পরবর্তী সকল কাল ও দেশের মানুষের জন্য দুনিয়া-আখিরাতের প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তির একমাত্র আদর্শরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশেদীন তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে সঠিক পথে পরিচালনা করে খেলাফত ব্যবস্থার অনুপম কল্যাণ প্রবাহ মানব জাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন, যা পরবর্তী সকল যুগের ও সকল দেশের মানুষের জন্য এক অতুলনীয় দিক নির্দেশক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। অতএব মানবতাকে মুক্তি পেতে হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত পথ ধরেই চলতে হবে।

০৩. ইসলাম একটি ন্যায় ইনসাফ, ভারসাম্য ও মধ্যপন্থী ধর্ম। আল্লাহ পাক বলেন, এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্য সাক্ষী হতে পার।

ইসলাম প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ধর্ম। এ ধর্ম ইনসাফ ও কল্যাণের গ্যারান্টি। অতি সংকোচন ও অতিরঞ্জন থেকে পবিত্র। স্বাধীনতা ও উন্নতি-প্রগতির পতাকাবাহী। এই দীন শরীর, জান-প্রাণ, রূহ, বস্তুগত, আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক, নৈতিক ও ইহলৌকিক সকল প্রয়োজন পূরণ করে।

০৪. আকীদা-বিশ্বাসের পাশাপাশি বর্তমান সমাজের সামনে ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থাও তুলে ধরতে হবে। কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ খুব দ্রুত পতনের কোলে ঢলে পড়ছে। আপনারা হয়ত অনুভব করছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার পতন শুরু হয়ে গেছে। এই পতনের অন্যতম বড় কারণ হলো, পাশ্চাত্যের পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে তাদের পারিবারিক সম্পর্ক। সেখানে এক ধরনের অস্থির বিশৃংখল অবস্থা বিরাজ করছে। তালাকের হার বিপজ্জনকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড় বড় শহরের অর্ধেক ঘর একা এক ব্যক্তি চালাচ্ছে।

সে পুরুষ হলে তার স্ত্রী আর স্ত্রী হলে তার স্বামী নেই। নারীরা সন্তান চাচ্ছে কিন্তু স্বামী নেই। শিশুদের বিপুল অংশ পিতা ছাড়া প্রতিপালিত হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে আস্থা ও ভালবাসা হওয়া উচিত, তা ক্রমশঃহ্রাস পাচ্ছে। এ নিয়ে বর্তমান সময়ের চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা শংকিত। তারা একের পর এক গ্রন্থ রচনা করে যাচ্ছেন, কিভাবে পাশ্চাত্যের পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসাই জীবনের প্রকৃত স্বাদ। কখনো এতে জোয়ার-ভাটা আসতে পারে, কিন্তু তা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হয়। আজো প্রাচ্যের অনেক দেশ রয়েছে যেখানে অনেক পরিবারে দু'মুঠো খাবার জোটে না, কিন্তু তারা জান্নাতের স্বাদ অনুভব করে। কারণ, তাদের পরস্পরে ভালবাসা আছে। তারা একে

www.pathagar.com

অপরের মুখ দেখেই দুঃখ-কষ্ট, ক্ষুধা-দারিদ্র্য ভুলে যায়। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যে সব কিছু আছে। আছে ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যের ভা ার। স্তূপ পড়ে আছে প্রাকৃতিক সম্পদের। সৃষ্টির বহু শক্তিকে তারা অনুগামী করে ফেলেছে, কিন্তু তারা তাদের হৃদয়রাজ্য এবং পরিবারকে জান্নাতে রূপান্তরিত করতে পারেনি।

পাশ্চাত্য জাতি আকাশ জয় করেছে, কিন্তু জীবনের অন্ধকার রাতকে উজ্জ্বল প্রভাতে রূপান্তরিত করতে পারেনি। যদি মহাকবি আল্লামা ইকবাল (র.) জীবিত থাকতেন তাহলে বলতেন, যে জাতি আজ সূর্য বিজয় করেছে, তারকারাজির রহস্য উদঘাটনে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে, সে জাতি এখনো তাদের চিন্তার রাজ্যে সফর করতে সক্ষম হয়নি। নিজ ঘরকে ফুলবাগিচা ও জান্নাত বানাতে সক্ষম হয়নি। যারা দুনিয়াকে জান্নাত বানানোর চেষ্টায় লিপ্ত, তাদের ঘর জাহান্নাম হয়ে আছে। প্রদীপের নিচে অন্ধকার। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ পরিবারে শান্তির উপকরণ নেই। ফলে তারা ঘরের বাইরে, বিনোদনকেন্দ্রে আর নাইট ক্লাবে শান্তি খুঁজে ফিরে।

কারণ তারা ঘরে শান্তি পায় না। ঘরে এসে অনুভব করতে পারে না, তারা দুনিয়ার জান্নাতে প্রবেশ করেছে; বরং তারা ঘরের জীবন থেকে পালাবার চেষ্টা করে। আর মুসলমানদের পারিবারিক ব্যবস্থা বিশ্বায়ন, মিডিয়ার আগ্রাসন এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এখনো অটুট রয়েছে। পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্যের পারিবারিক ব্যবস্থা বেশি নিরাপত্তা প্রদান করে। মুসলিম উম্মাহর এই রক্ষা করা উচিত। এভাবে বিশ্ববাসীর সামনে পাশ্চাত্যের পারিবারিক ব্যবস্থর করুণ চিত্র আর প্রাচ্য তথা ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থার সুন্দর চিত্র তুলে ধরতে হবে।

০৫. পাশ্চাত্য সমাজের দ্বিতীয় বড় বিপর্যয় হলো, সে সমাজে নেশা ও মাদক দ্রব্যের ছড়াছড়ি, যার মধ্যে সিগারেট, মদ, কোকেন, এস.ডি প্রভৃতি নেশাজাত দ্রব্য। এই নেশার মধ্যে টিভি এবং ইন্টারনেটকেও শামিল করা যেতে পারে। কোনো অতিরঞ্জন ছাড়াই বলা যেতে পারে, নেশা ও মাদক আজ পাশ্চাত্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে। দুঃখের বিষয় হলো, লোকেরা মদের পেয়ালা, নেশাকর টেবলেট এবং বিশেষ ধরনের সিগারেট ছাড়া বাঁচতে পারে না। নেশা আর মদ তাদের উদভ্রান্ত দিগভ্রান্ত করে ফেলেছে। নিরাশ করে ফেলেছে জীবন সংগ্রাম থেকে। নেশার কারণে তারা প্রতিটা মুহূর্ত অশান্তির অনলে জ্বলছে। পশু আর জানোয়ারের মতো রোডে সড়কে আর নাইট ক্লাবে ঘোরাফেরা করে। জীবনের কোনো লক্ষ্যই তাদের সামনে নেই। এ রকম লোকেরা কার্যতঃ নতুন ধরনের শেরেকের ওপর আমল করে চলেছে। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর গোলাম হয়ে পড়েছে। কোথাও যদি রোযার নিয়ম-নীতি পালন করতে হয়, তা হলে একথা আরো সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। তারা সেটা করতে পারবে না। কেননা, সে নিজেই নিজের অস্তিত্বের মালিক নয়।

পক্ষান্তরে ইসলামের অনুসারীরা গর্ব করতে পারে যে, তারা তাদের অস্তিত্বের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। তারা প্রতিটি মুহূর্তে সচেতন ও চৌকস। তারা নেশাকে প্রশ্রয়

www.pathagar.com

দেয় না। নেশার পেছনে পড়ে স্বীয় জীবন ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয় না। কারণ ইসলাম নেশা কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, বরং নেশার ধারে কাছে যেতেও নিষেধ করেছে। ফলে আজো ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা সুন্দর ও অটুট আছে। এক কথায়, ইসলাম বিশ্ববাসীর জন্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এক বিকল্প জীবনব্যবস্থা। কেবল ইসলামই পাশ্চাত্যকে চলমান বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

০৬. সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব, বর্ণ ও বংশ বৈষম্য, কালো-সাদার দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য ধর্মের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ ইত্যাদি পশ্চিমা সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাদের দাসত্বের ইতিহাস আজও আমেরিকায় প্রত্যক্ষ করা যায়। নিকট অতীতে ইউরোপ-আমেরিকায় যত দ্বন্দ্ব লড়াই সংঘটিত হয়েছে, তার বেশির ভাগ হয়েছে জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের কারণে।

পক্ষান্তরে ইসলাম দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যত এমন এক ধর্ম, যেখানে গোত্র, বর্ণ, বংশ ও জাতিগত বৈষম্যের পরিবর্তে তাকওয়া ও খোদাভীতিকে মানদন্ড বানিয়ে প্রতিটি মানুষকে উম্মাহর মধ্যে গ্রহণ করে এবং নিষ্ঠার সাথে অন্য ধর্মকে সহ্য করে সাম্প্রদায়িকতা ও বহু ধর্মীয় সমাজের সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। পাশ্চাত্যের লোকেরা যখন ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারবে, তখন তারা ইসলামকে হারানো জান্নাত মনে করে বরণ করে নেবে। মেইলকাম এক্স যখন জানতে পারলেন, উম্মাহর মধ্যে সকল সম্প্রদায়ই অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, তখন তার চক্ষু খুলে যায়।

আসুন! আমরা এই মূল্যবোধকে বাস্তব জীবনের অংশ বানিয়ে সর্বপ্রকার বর্ণ, বংশ, ভাষা ও এ ধরনের সকল বৈষম্য নির্মূল করে এ থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করি। আমেরিকার লাখ লাখ আফ্রিকান প্রজন্ম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। রাসূলুল্লাহর মুআয্যিন হযরত বেলালও এই আফ্রিকার লোক ছিলেন, তাহলে সেখানকার লাখ লাখ মানুষ কেন তাঁর অনুসরণ করবে না? সকল ধর্মের সাথে উদারতা ও সাম্যের আচরণ করার নির্দেশ কুরআনুল কারীমে রয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ইসলামের এই মৌলিক উদারতা ও সাম্য যার ওপর আন্তর্জাতিক খৃস্ট ঐক্য আন্দোলনের পূর্বে চৌদ্দশ বছর পর্যন্ত আমল করা হয়েছে, পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে এত অসাধারণ মর্যাদা রাখে যে, তার প্রশংসা ব্যতিরেকে কেউ থাকতে পারে না।

ইসলাম বিশেষ কোনো জাতি ও গোত্রের জন্য নয়; বরং পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক মানবের জন্য। ইসলাম বিশেষ কোনো জাতিকেই তার দিকে আহবান করেনি; বরং গোটা মানব জাতিকেই সে নিজের দিকে আহবান করেছে। তার দাওয়াত ও পয়গাম কোনো গোত্র, বংশ, জাতি কিংবা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেই সীমিত থাকেনি। বিশ্বের যে কোণায় মানুষ কদম রেখেছে, ইসলামের দাওয়াতও সেখানে পৌঁছেছে এবং তার উন্নত শিক্ষা ও সমুন্নত মূল্যবোধ দ্বারা মানুষকে স্বীয় ক্রোড়ে তুলে নিয়েছে।

www.pathagar.com

বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার ও সমাজের অবহেলিত লোকদের সামনে ইসলাম সাম্যের সেই শিক্ষা পেশ করেছে, যাতে দাস ও মনিবের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামের এই উন্নত শিক্ষা, উচ্চ মূল্যবোধ এবং নযীরবিহীন তুলনাহীন ন্যায় ইনসাফের ফলে তার ক্রোড়ে বাদশাহও এসেছে, জনসাধারণও এসেছে, আরবও এসেছে, অনারবও এসেছে, শ্বেতাঙ্গও এসেছে, কৃষ্ণাঙ্গও এসেছে। মোটকথা, প্রতিটি শ্রেণীর, প্রতিটি স্তরের লোক ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। নিঃসন্দেহে তারা ইসলাম গ্রহণ করে এমন সম্পদ অর্জন করেছে, যা তাদের কখনো অর্জন হতো না।

এই বৈচিত্রময় পৃথিবীর প্রতিটি শ্রেণীর ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আসাই ইসলাম একটি সার্বজনীন বিশ্বজনীন ধর্ম হওয়ার প্রমাণ। যদি ইসলাম কোনো বিশেষ জাতি কিংবা গোত্রের জন্য হতো তাহলে তার অনুসারীরা প্রতিটি জাতি ও গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত হতো না, কিন্তু পাশ্চাত্য জগত বর্ণ, বংশ ও ধর্ম বৈষম্যে বিশ্বাসী। যদি তাই না হবে তাহলে তুর্কীদের শাসনামলে ৫০০ বছর পর্যন্ত গ্রামের অর্থোডক্স খৃস্টানরা তাদের অধিকার নিয়ে বসবাস করেছে, কিন্তু ৮০০ বছর ধরে স্পেনে বসবাসকারী মুসলমানরা কোথায় গেল? একথা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে।

০৭. পাশ্চাত্যের নতুন প্রজন্ম নিজেদের স্বাধীন মনে করে এবং সেই স্বাধীনতা অটুট রাখতে চায়। তারা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পথ-প্রদর্শক ও পাদরীদের ধর্মীয় রসম-রেওয়াজ, রহস্যময় আকীদা-বিশ্বাস এবং চার্চসংশ্লিষ্ট সকল নিয়ম-নীতি ঘৃণা করে।

এ ধরনের লোকেরা তখন প্রশান্তির তাজ্জবে হারিয়ে যায়, যখন তারা জানতে পারে যে, ইসলাম চার্চ, ইউরোপ, রসম-রেওয়াজ, আল্লাহর শরীর, ত্রিত্ববাদ, ক্রুশে মুক্তি এবং উত্তরাধিকারসুত্রে পাওয়া গুনাহর মতো অস্থিরপূর্ণ পরিকল্পনাকে স্বীকার করে না। যখন তারা জানতে পারে, মুসলমানদের থেকে বেশি বিধি-নিষেধমুক্ত ঈমানদার আর কেউ নেই, তখন তারা বিস্ময় প্রকাশ করে। তাদের জন্য এটি বিস্ময়ের কারণ যে, মুসলমানরা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোন ওসীলা বা মাধ্যম মানে না। তা পাদরী ও সন্ন্যাসীর আকৃতিতেই হোক না কেন।

মুসলমান ইবাদতের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একক ও ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর সামনে উপস্থাপিত হয়। একথা শুনে আপনারা বিস্মিত হবেন, যৌন বিষয়ে মুসলমানদের নিয়ম-নীতি আজো অসংখ্য নওজোয়ানকে ইসলামের দিকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে, যারা 'মূল্যবোধের প্রাচীনতাপ্রিয়' দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক। অসংখ্য পশ্চিমা নারী যারা হাট-বাজারে, অলি-গলিতে পুরুষের যৌন সম্ভোগের বস্তুতে পরিণত হতে লজ্জা ও ঘৃণাবোধ করে, তারা সেসব মুসলিম নারীদের প্রশংসায় প্রঞ্চমুখ যারা পর্দা-পুশিদার সাথে চলাফেরা করে এবং সুস্পষ্ট জানান দেয় যে, সে কোনো সস্তা যৌন পণ্য নয়। পশ্চিমা দেশে অশ্লীল লিটারেচার, চলচ্চিত্র, ফ্যাশন শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতা এবং নগ্ন যৌন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আজ নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নারী

www.pathagar.com

স্বাধীনতার সমর্থক পশ্চিমা নারীরাও বুঝতে শুরু করেছে, মুসলিম নারীরাও যে এ উদ্দেশে, অর্থাৎ নারীর মর্যাদা, ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা করছে, তারা তাদের তুলনায় অনেক সফলতার সাথে এ কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে।

'মায়ের জীবন যখন সংকটপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে তখনই কেবল গর্ভপাতের অনুমতি রয়েছে' গর্ভপাতের ব্যাপারে ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গি আজ পাশ্চাত্যে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। এ দ্বারা বোঝা যায়, ইসলাম শিশুর জীবনের ব্যাপারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। ক্যাথলিক বিশপও বিভিন্নভাবে নারীদের গর্ভপাতের অনুমতি দেয়।

পাশ্চাত্যের নিরব সংখ্যাগরিষ্ঠ সমকামিতার ব্যাপারেও ইসলামের অবস্থানকে সম্মান করে। এই নিরব সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমের নতুন পলিসির তীব্র সমালোচনা করে। যার অধীনে এক লিঙ্গের মধ্যকার সম্পর্ককে একটি জীবনপদ্ধতি মনে করে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অনেক পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীর আশঙ্কা, জনসাধারণ পর্যায়ে সমকামীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা, যার মধ্যে সমকামী বিবাহও শামিল রয়েছে, অধঃপতন ও ধ্বংসের সুস্পষ্ট নিদর্শন। এসব বুদ্ধিজীবী অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করেন যে, সানফ্রান্সিসকোর দুটি শহরে সম্পূর্ণ সমকামীদের বসবাস। পশ্চিমের এসব লোক যদি মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করে থাকে, যাতে সমকামিতাকে ঘৃণা করা হয়েছে, তাহলে এটা কোন তাজ্জবের বিষয় নয়।

পশ্চিমে একই সাথে দুটি কট্টর দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। একদিকে যৌনতাকে সম্পূর্ণ পরিহার করার দৃষ্টিভঙ্গি অপরদিকে লাগামহীন যৌন স্বাধীনতার দৃষ্টিভঙ্গি। এই বিপরীতমুখী দুই কট্টর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পশ্চিমের জ্ঞানী-গুণী লোকেরা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিরাট প্রভাবিত। ইসলাম এ দুয়ের মাঝামাঝি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত যৌনতার সমর্থক, যা একটি নির্ধারিত নিয়মের আওতায় হতে হবে। যখন যেভাবে ইচ্ছা যৌন কামনা চরিতার্থ করা যাবে না। ইসলামের বিয়ের পবিত্র বন্ধন পশ্চিমের লাগামহীন যৌনতার সাথে কোনভাবেই তুলনা হতে পারে না। এই বন্ধনের মাধ্যমে উভয়ের দাম্পত্য জীবনকে ইসলাম ইবাদত আখ্যা দিয়েছে।

০৮. ইসলামের অর্থব্যবস্থা মানবতার জন্য আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ রহমত। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো অর্থব্যবস্থার মধ্যে নেই। যেমন-

ক. ইসলামী অর্থব্যবস্থার সাধারণ নীতিমালা আল্লাহ পাকের তৈরি, যিনি মানব জাতির স্রষ্টা এবং কি ধরনের অর্থব্যবস্থা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে, সেটা ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। আর অন্যান্য অর্থ ব্যবস্থার জনক মানব মস্তিষ্ক, যাতে ভুল-ভ্রান্তির যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা আর মানব রচিত ব্যবস্থার মধ্যে তেমনিই পার্থক্য যেমন আসমান-যমীনের মাঝে পার্থক্য।

www.pathagar.com

খ. মানব রচিত অর্থব্যবস্থা শুধু বস্তুগত সমাধান পেশ করেছে। তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সম্পদ উপার্জন করা। আর ইসলামের দৃষ্টিতে বস্তু শুধু একটি উপায় উপকরণ, উদ্দেশ্য নয়; বরং মানবের আসল উদ্দেশ্য প্রভুর পরিচয় লাভ করা।

গ. মানব রচিত অর্থব্যবস্থার মধ্যে নৈতিকতা, উন্নত চরিত্র ও সমুন্নত মূল্যবোধের কোনো গুরুত্ব নেই; বরং তার সকল মনোযোগ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি কেন্দ্রীভূত থাকে। যে কোনোভাবে হোক না কেন। আর ইসলামী অর্থব্যবস্থার ইসলামী মূল্যবোধের সাথে পূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে; বরং তা ইসলামের স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা থেকে প্রবাহিত, যা মানুষের একে অপরকে সাহায্য করার এবং পরস্পরে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়।

ঘ. ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে ইসলামী আকীদা, ইসলামী শরীয়ত ও নৈতিকতা থেকে পৃথক করে অধ্যয়ন করা সম্ভব নয়। কারণ ইসলামী অর্থব্যবস্থা শরীয়তের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ঙ. ইসলামী অর্থব্যবস্থা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যা বিশ্বায়নের বুনিয়াদ, তার সমগ্র মনোযোগ ব্যক্তি মালিকানার দিকে। এ ব্যবস্থার দৃষ্টিতে ব্যক্তিই একক মালিক, তার নিকট ব্যক্তিস্বার্থ সামাজিক স্বার্থ থেকে উর্ধ্বে।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ফলে মজুদদারী ব্যবস্থা বৃদ্ধি পায়। মানুষের যে বস্তুর সবচে' প্রয়োজন, পুঁজিবাদীরা তাই স্টক করে রাখে। পরবর্তীতে চড়া মূল্যে বিক্রি করে। উপরন্তু এ ব্যবস্থার কারণে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এ দু'টি বিষয় আজকাল ভালভাবে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সকল মনোযোগ সামষ্টিক স্বার্থের ওপর নিবদ্ধ থাকে। এ ব্যবস্থায় উৎপাদনের সকল মাধ্যম ও উপকরণ, যেমন ক্ষেত, বাগান ও কারখানা ইত্যাদি রাষ্ট্রের মালিকানা। জনগণ শুধু বেতনের অধিকার রাখে, যা সমাজের খেদমতের বিনিময়ে সে পাবে।

এ ব্যবস্থার সবচে' ক্ষতিকর দিক হলো, এটা প্রকৃতি বিরোধী ব্যবস্থা, যা মালিক হওয়ার অভিলাষের সময় মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া অলসতা এবং হীনমন্যতা এই ব্যবস্থার ধর্ম। এ কারণেই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদনের হার প্রচুর কম দেখা গেছে; বরং এমনও অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, এক বেলার খাবার জোগাতে লোকদের স্বর্ণ-রৌপ্য পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে, কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। এ ব্যবস্থা একদিকে যেমন প্রকৃতি এবং ব্যক্তির অধিকার রক্ষাকারী, তেমনি অভ্যন্তরীণভাবে তা কিছু নৈতিক সীমারেখা এবং বাহ্যিকভাবে কিছু আইনগত সীমারেখার অধীন। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সামষ্টিক মালিকানারও স্বীকৃতি রয়েছে।

এ কারণেই যদি কখনো ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় তখন ইসলাম সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। ফুকাহায়ে কেরাম অনুমতি দিয়েছেন, প্রয়োজন

www.pathagar.com

পড়লে এমন ব্যক্তির কাছ থেকে জোরপূর্বক খাদ্য-শস্য ছিনিয়ে নেয়া যেতে পারে, যে ব্যক্তি তা স্টক করে রেখেছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই ফ্রান্সের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর জ্যাক আউস্ট্রোবী 'প্রচলিত অর্থব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থব্যবস্থা' নামক স্বীয় গ্রন্থে একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং দ্বিতীয় আরেকটি ব্যবস্থা রয়েছে, যাকে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বলা হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, ইসলামী অর্থব্যবস্থাই ভবিষ্যত অর্থনীতির নেতৃত্ব দেবে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, যা কয়েক বছর হলো দাফন হয়ে গেছে। এ ব্যবস্থার প্রতিরোধের জন্যই পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে বিকল্প হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছে, যা আজ বিশ্বায়নের ভিত্তি, কিন্তু এ ব্যবস্থার উল্লিখিত ক্ষতিকর বিষয়াবলীর আলোকে এ কথা বলা ১০০% সঠিক হবে যে, আসলে ইসলামী অর্থব্যবস্থাই পুরো বিশ্বের নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা রাখে।

০৯. ইসলামের আরো অনেক দিক রয়েছে, যেগুলো পশ্চিমাদের আকর্ষণের কারণ। তার মধ্যে স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে রমাযানের রোযা অন্যতম।

সর্বশেষ বিশ্লেষণ অনুযায়ী পশ্চিম ও প্রাচ্যের মাঝে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মতানৈক্য হলো জীবনের কোয়ালিটির ব্যাপারে। জীবনের কোয়ালিটি নির্ধারণ হবে মান হিসেবে না পরিমাণ ও সংখ্যা হিসেবে, এ নিয়ে দুই মেরু দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। পশ্চিম পরিমাণ ও সংখ্যার দিককে এ পরিমাণ প্রিয় মনে করে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জিনিসের পরিমাণ ও তার সংখ্যা নিরূপণ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা তাদের নিকট কোন গুরুত্ব ও মূল্য রাখে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে পশ্চিমে এই প্রবণতা ব্যাপকহারে প্রচলন হয়ে গেছে যে, যার বস্তুগত পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব নয়, সেটা শুধু আধ্যাত্মিক সত্যতা।

ইসলামী বিশ্বসহ প্রাচ্য যদিও নতুন নতুন জীবনোপকরণ ব্যবহারে অর্জিত আনন্দের প্রতি বেশ ধাবিত, যা বিশ্বায়নের কারণে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু এখনো এ অঞ্চলে জীবনের কোয়ালিটি নির্ধারণে মানের দিককে পরিমাণের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। ইসলামী যিন্দেগীর কোয়ালিটির মধ্যে আত্মিক প্রশান্তি , অবসর, চিন্তা-ভাবনা, আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ও আতিথেয়তা বিশেষভাবে গুরুত্বের অধিকারী। এই বাস্তবতা পশ্চিমের সেসব লোককে আকর্ষণ করে, যারা নির্বোধ বস্তুতান্ত্রিকতা থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত।

পথের অন্তরায়

০১. ওপরে আলোচনা করা হয়েছে, অনেক কারণের ভিত্তিতে ইসলাম পাশ্চাত্যের দুর্বল শ্রেণীর জন্য মহৌষধ মনে করা হয় এবং মনে করা উচিত। সেই ভিত্তিতে ইসলাম একুশ শতকের পথপ্রদর্শক ও আইডোলজি হতে পারে।

www.pathagar.com

তবে কিছু কারণ এমনও রয়েছে, যেগুলো বিপরীতমুখে কাজ করছে। যেমন মুসলিম উম্মাহ এখনো পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও স্বতন্ত্র কোনো মুসলিম সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নারী অধিকার ইত্যাদি বিষয়েও মুসলমানদের অবস্থান অস্পষ্ট এবং তাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখানো বিশ্বের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়নি।

০২. এছাড়াও অধিকাংশ মুসলমানের যাপিত জীবনপদ্ধতি দাওয়াত ও তাবলীগের প্রয়াসকে নিষ্ফল করে দেয়। পশ্চিমা দেশে বসবাসকারী অনেক মুসলমান বিশেষ করে অশিক্ষিত শ্রেণী ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস উপস্থাপন করার যোগ্যতা রাখে না। ফলে তারা নিম্নশ্রেণীর জীবপ-যাপন করে। নিজ দেশের সংস্কৃতি, খাদ্য, লেবাস-পোশাক, গান-বাদ্য, সামাজিক প্রথা-প্রচলন এবং ভাষা সংরক্ষণের জন্য তারা তাদের জাতীয় পরিকল্পনা ও রসম-রেওয়াজের সমষ্টিকেই ইসলাম হিসেবে উপস্থাপন করে।

এর থেকেও বেশি সেসব প্রবাসীর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয় তাদের পৈতৃক দেশ, যেখানে তারা অতি দ্রুত ফিরে যেতে চায়। জার্মানীতে বসবাসরত একজন তুর্কী নাগরিক তুরস্কে ইসলামী জাগরণের প্রত্যাশা করে। নিঃসন্দেহে অতিথি দেশে দাওয়াতের কাজের জন্য বেশি কিছু করার থাকে না। আবার যেসব লোক পশ্চিমা দেশে ইসলামের প্রচারের জন্য প্রয়াস চালাচ্ছে, তারা ইসলামকে এমনভাবে বেঢঙ্গা ও নিরসভাবে উপস্থাপন করছে যে, আত্মিক ও মানসিক অস্থিরতার শিকার পশ্চিমের লোকেরা তাতে কোন আত্মিক ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছে না।

ইসলাম উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে তারা ইসলামের আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য থেকে বাহ্যিক দিকটা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। অধিকাংশ শাখা-প্রশাখাগত মাসায়েলকে মৌলিক ও কেন্দ্রীয় আখ্যা দিয়ে তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এসব কারণের ভিত্তিতে অতিথি মুসলিমরা তাদের প্রতিবেশী পশ্চিমাদেরকে স্বীয় ধর্মের দিক দিয়ে প্রভাবিত করতে পারছে না।

০৩. এছাড়াও আরেকটি বড় কারণ যা ইসলামের বিজয়ের পথে বাঁধা সৃষ্টি করছে তা হলো, মানুষ খুব সহজেই বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার যোগ্যতা রাখে। একজন রোগী নিজেকে রোগী মনে করার পাশাপাশি তাকে ট্যাবলেটও খেতে হবে। ট্যাবলেট না খেলে তো রোগ ভাল হবে না। এর বিকল্প কোনো কিছু হতে পারে না। তদ্রূপ পাশ্চাত্য হলো রোগী। তাকে রোগ স্বীকার করে তা প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া তার রোগমুক্তির কোনো রাস্তা নেই। জার্মানীর এক সাবেক প্রেসিডেন্টের বক্তব্য, 'আমাদের সমস্যা জানা নয়, বরং জেনে তা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।'

পবিত্র কুরআনে সেসব জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যারা তাদের কাছে প্রেরিত কিতাব পড়তে অস্বীকার করেছিল এবং ঐশী সতর্কবাণীর প্রতি কোনো গুরুত্ব দিয়েছিল না। পরিশেষে তাদের শোচনীয় পরিণতি

www.pathagar.com

ভোগ করতে হয়েছে। তদ্রূপ পাশ্চাত্যও আজ সে পথে ধাবমান। পাশ্চাত্যের আজ অনিবার্য পতন শুরু হয়ে গেছে। পতনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে পাশ্চাত্য সভ্যতা। পাশ্চাত্যকে যদি পতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে হয়, তাহলে তাকে নতুনভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং ঐশী ফরমানের স্বীকৃতি দিতে হবে। আল্লাহকে এক বলে মানতে হবে, মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বশেষ নবী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, কুরআনকে সর্বশেষ কিতাব হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর আনীত সর্বশেষ ধর্ম ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে।

তাই তো দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্যে আজ ইসলাম গ্রহণের হিড়িক পড়ে গেছে। অশান্ত ঘর্মক্লান্ত মানুষগুলো দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে। এক জরিপ অনুযায়ী বর্তমানে আমেরিকায় বসবাসরত মুসলমানদের মধ্যে চল্লিশ শতাংশ নও মুসলিম। কেউ অধ্যয়ন করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কেউ বৈবাহিক সূত্রের কারণে মুসলমান হয়েছে। বিপুল একটি অংশ খৃস্টবাদের বৈপরীত্য, স্ববিরোধিতা এবং প্রকৃতিবিরোধী হওয়ার কারণে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

ইউ.এস.এ টুডে পত্রিকা ইসলাম গ্রহণের এই হিড়িককে এমন একটি তুফান হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, যে তুফান মার্কিনীদের মন মস্তিষ্কে একটি সার্বজনীন বিশ্বজনীন ধর্মে দ্রুত অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে দিয়েছে, কিন্তু পশ্চিমা জগতে ইসলাম কোনো আন্দোলন কিংবা প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে প্রসরিত হয়নি; বরং একটি গণ আহবানের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। ইহুদী ও খৃস্টান সংগঠনগুলো এই আহবানে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং এর প্রসারিত প্রভাব-প্রতিক্রিয়ারও স্বীকৃতি দিয়েছে।

এই আহবান একটি অক্ষমতার ফসল, যা নিজেই রাস্তা বের করে নিয়েছে। পাশ্চাত্য বর্তমান যে চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতনের শিকার, তার সমাধান করতে সে ঘর্মক্লান্ত হয়ে পড়েছে। উপসাগরীয় যুদ্ধের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'যদিও এই যুদ্ধে আমরা বিজয় লাভ করেছি, কিন্তু মাদকতা নির্মূলের যুদ্ধে আমরা পরাজিত হয়েছি। আরো ব্যাপক শব্দে আমরা জীবনের অন্যান্য সকল ময়দানে পরাজিত হয়েছি। তথাপি মার্কিন জনগণ এই যুদ্ধে বিজয়ী হতে যে সহযোগিতা দিয়েছে তা স্বীকার না করলে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হবে।'

বাস্তবতা হলো, শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়; বরং পাশ্চাত্যের সকল দেশে বসবাসরত মুসলমানরা জাতি হিসেবে মাদকতা থেকে বেঁচে থাকে এবং হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য ঠিক রাখার চেষ্টা করে। এ কারণেই ইউরোপ আমেরিকার বাজারে প্রতিটি স্থানে হালাল-হারামের পৃথক পৃথক তালিকা লটকানো দেখতে পাওয়া যায়।

পশ্চিমা দেশে বসবাসরত মুসলমানদের একটি উজ্জ্বল দিক হলো, তারা প্রবৃত্তির চাহিদা, নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে। মার্কিন সমাজে যৌনতা, নগ্নতা ও অশ্লীলতার এমন অন্ধ তুফান বয়ে চলেছে যে, এক মার্কিন চিন্তাবিদ নির্লজ্জভাবে তার একটি গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'কনডম নেশন'।

www.pathagar.com

১৯৯৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে গর্ভ বিনষ্টকরণকে আইনী মর্যাদা দেয়ার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু মার্কিন ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশন কাঠোরভাবে তার প্রতিবাদ করে। আর আরব বিশ্ব ও পাকিস্তান সম্ভবত আমেরিকার ভয়ে কিংবা মৌলবাদের অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য নিরবতা অবলম্বন করে। পরিণামে সম্মেলন তার অবস্থান পরিবর্তন করে এই সুপারিশ করতে বাধ্য হয়, সম্মেলন যদি চায় তাহলে গর্ভ বিনষ্টকরণকে আইনী মর্যাদা দিতে পারে। মার্কিন জনগণ সেখানে চলমান অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে।

তাদের এই অতিষ্ঠতার কথা বিভিন্ন সময়ে তাদের পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে দেখা যায়। অনুভূতিসম্পন্ন সচেতন মার্কিন জনগণ আজ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। ইসলামিক সেন্টারগুলোতে নও মুসলিমদের ব্যাপকহারে আনাগোনা দেখা যায়। অনেক সময় এমন নওজোয়ান ছেলে মেয়েদেরও ইসলামিক সেন্টারগুলোতে দেখা যায়, যাদের উদ্দেশ্য ইসলাম ও ইসলামী যিন্দেগী সম্পর্কে গবেষণাপূর্ণ অধ্যয়ন করা। এসব লোক জামাআতে নামায দ্বারা খুব প্রভাবিত হয়। অনেক মার্কিন নও মুসলিম তার আচরণ ও কর্মের মাধ্যমে খুব দ্রুত জাতীয় হিরোতে পরিণত হয়ে যায়। যেমন বক্সিং জগতের হিরো মুহাম্মদ আলী ক্লে, হাকীম আলী জেওয়ান, মাইক টাইসন আবদুল আজীজ এবং বৃটিশ পপস্টার ইউসুফ ইসলাম প্রমুখ।

ইহুদী মেধা-মস্তিষ্ক এবং খৃস্টানদের আসবাব-উপকরণের ফলে বিশ্ব পরিম লে মানব সমাজ যে অসাধারণ ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং যেভাবে শয়তানী শক্তি মিডিয়াকে তারা মুখপাত্র বানিয়ে নিয়েছে, তার সুদূরপ্রসারী সঙ্গীন প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কল্পনা করলেও শরীরের লোম শিউরে ওঠে। একজন মুসলমানের চোখের ঘুম উড়ে যায়। সে 'জলে স্থলে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় তা তোমাদের কর্মফল' আল্লাহর বাণীর দৃশ্য দেখে অস্থির হয়ে পড়ে, কিন্তু এর সাথে আবার তারা এ কথাও স্বীকার করে, আল্লাহ তাআলা তাঁর আরহামুর রাহিমীন গুণের কারণেই আজো সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। নতুবা ইবলিসী শক্তি পৃথিবীর বুকে এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, পাহাড়ও স্বীয় জায়গা থেকে হটে যেতে বাধ্য।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপমহাদেশের মুসলমানদের নিঃশেষ নির্মূল করার জন্য একশ' বছরের বেশি সময় ধরে তার সকল শক্তি ও উপকরণ প্রয়োগ করেছে। হাজার হাজার ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম যুবককে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। পরিকল্পিত মুসলিম হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছে। মানুষ হত্যার পাশাপাশি মুসলমানদের শিক্ষাকেও হত্যা করেছে। অবশেষে মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে এবং গণবিপ্লবের মাধ্যমে উপমহাদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করেছে। তারা এ দেশ থেকে চলে গেছে ঠিক, কিন্তু উপমহাদেশের মানুষদের মগজ ধোলাই করে মানসিকভাবে তাদের গোলাম বানিয়ে

www.pathagar.com

রেখে গেছে। তারা সশরীরে চলে গেলেও রেখে গেছে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার। উপমহাদেশের মুসলমানরা ভৌগোলিকভাবে স্বাধীন হলেও মানসিক ও চিন্তাগতভাবে স্বাধীন হতে পারেনি। তাই দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চলে যাওয়ার পর যারাই এদেশে ক্ষমতাসীন হয়েছে তারাই বৃটিশদের কর্মসূচী মুসলিম হত্যা, মুসলিম শিক্ষা হত্যার ধারা চালু রেখেছে।

বিশ্ব পরিমণ্ডলে আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলমানদের গণহত্যা, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, মানসিক, চিন্তাগত ও অর্থনৈতিকভাবে ধর্মান্তরের জন্য তাদের সকল শক্তি, উপকরণ ও মাধ্যম কাজে লাগাচ্ছে। একই পদ্ধতিতে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দোসর ক্ষমতাসীন মুসলিম শাসকরাও তাদের প্রভুদের আদলে মুসলমানদের ইসলামী স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত করার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। যেখানেই ইসলামের আলো উদ্ভাসিত হতে দেখা যায় সেখানেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের দেশীয় দালাল গোষ্ঠী ইসলামের আলো নির্বাপিত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা তাদের সকল শক্তি প্রয়োগ করে।

মুসলমানদের বাহ্যিকভাবে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্যাতন-অত্যাচার, অপরদিকে তাদের দেশীয় দালালদের নির্যাতনের স্টীম রোলার। মুসলমানদের জীবন আকাশের ঈষাণ কোণে কালো মেঘের ঘনঘটা। চারদিকে শুধুই অন্ধকার। আফগানিস্তান, চেচনিয়া, বসনিয়া, কাশ্মীর, আরাকান, ফিলিস্তীন, ফিলিপাইন এবং ইরাকের জনগণের ওপর শুধু এ জন্যই পাশবিক বর্বর নির্যাতন করা হচ্ছে যে, তারা মুসলমান। তাদের অপরাধ কেবলই তারা মুসলমান, কিন্তু নির্যাতন-নিপীড়নের তলদেশ দিয়েই রচিত হয় মুক্তির রাজপথ। আল্লাহ্ তাআলা সমহিমায় আবির্ভূত হন। ঘন অন্ধকারের মধ্যেও আল্লাহ্ তাআলা আশার আলো দেখান। আঁধার থেকে আলোর পথে নিয়ে যান।

গাঢ় তমসা আর উত্তাল হাওয়ার মধ্যেও আল্লাহ্ তাআলা ঈমানের আলো প্রজ্বলিত করেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর আলো পূর্ণ করেই ছাড়বেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। এরকম হাজার হাজার দৃষ্টান্তের মাত্র কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হলো—এটা প্রমাণ করার জন্য যে, নির্যাতন-নিপীড়নের তলদেশ দিয়েই রচিত হয় মুক্তির রাজপথ, প্রত্যেক কারবালার পরই যিন্দা হয় ইসলাম এবং প্রত্যেক তাতারী আগ্রাসনের পরই কাবার নতুন প্রহরী মিলে যায়।

০১. আমেরিকার এক শহরে বিদেশ থেকে একটি তাবলিগী জামাআত গিয়েছিল। এয়ারপোর্টের কাজ শেষ করে দু'টি কারে করে জামাআতের লোকজন মারকাযের উদ্দেশে রওয়ানা হন। একটি কার আগে আর একটি কার পেছনে। পেছনের কার রাস্তা হারিয়ে ফেলে। এদিকে মাগরিবের নামাযের সময়ও একেবারে সংকীর্ণ হয়ে গেছে। তাই পেছনের কারের সাথীরা এক ময়দানে গাড়ি থামিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করতে লাগলেন। পাশেই কিছু মার্কিন নওজোয়ান খেলাধুলা করছিল। তারা

খেলাধুলা ছেড়ে তাবলীগের সাথীদের নামাযের আশ্চর্য অভিনব অবস্থা দেখতে লাগল। নামায শেষ হলে নওজোয়ানরা জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি করছিলেন? তাবলীগের সাথীরা তাদের প্রশ্নের জবাবে সাধামাটা ভাষায় ইসলামের কিছু পরিচিতি তুলে ধরেন। পনের বিশ মিনিটের আলোচনার পর তিন নওজোয়ান ইসলাম গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করল। নিকস্থ হোটেলে গিয়ে তারা গোসল করে কাপড়-চোপড় পরিবর্তন করে ইসলাম গ্রহণ করে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আগের কারটি তাদের তালাশে এখানে এসে পৌঁছে। এভাবে তাবলীগের এই কাফেলা তিনজন নও মুসলিমসহ মারকাযে পৌঁছে।

০২. কানাডার মনট্রিল শহরের ২৫ বছরের এক যুবতী পাদরী, যে খৃস্টবাদের প্রচার-প্রসারকেই তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছিল। খৃস্টবাদের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশে সে এক আরব যুবকের বাড়ীতে যায়। আরব যুবক তার সাথে কথা বলার জন্য কিছুক্ষণ সময় প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি ভালভাবে ওযু করে খোশবু লাগিয়ে কুরআন পাকের তিলাওয়াত শুরু করেন। খৃস্টান যুবতী তার এই পুরা কর্মকান্ড নোট করে। ওযু ও খোশবু লাগানোর গুরুত্ব এবং কুরআন তিলাওয়াতের সময়ের অবস্থাটা সে খুব ভালভাবে অনুধাবন করে।

তিলাওয়াতের সময় যুবকের চোখ দিয়ে প্রবাহিত অশ্রুধারা, করুণ সুর এবং আবেগমাখা শব্দাবলী শুনে খৃস্টান যুবতীর মনে হলো, সে কোনো নতুন জগতে প্রবেশ করেছে এবং তার সামনে ফিরিশতা আসমানী কালাম শোনাচ্ছেন। খৃস্টান যুবতী আরব যুবকের রূহানী পরিবেশে খুবই প্রভাবিত হয়। যুবকের তিলাওয়াত শেষ হলে খৃস্টান যুবতী যে আরব যুবককে শিকার করতে এসেছিল, সে নিজেই আরব যুবক তথা ইসলামের শিকার হয়ে সাথে সাথে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিল।

০৩. লন্ডনের এক যুবতী ডাষ্টবিনে একখানা ছেঁড়া কাগজের টুকরো পায়। তাতে কুরআনের কিছু আয়াত ও তার অর্থ লেখা ছিল। যুবতী আয়াতগুলোর অর্থ পড়ে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। অতঃপর সে অনুসন্ধান শুরু করল, এগুলো কিসের অর্থ। অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেল, এগুলো কুরআনের আয়াত। এ ঘটনার পরের দিনই সে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

০৪. পাপাচার আর অপরাধের পচা কর্দম স্তূপে আবদ্ধ প্যারিসের এক নৃত্যশিল্পীর প্যারিসের রাজপথে এক আরব নারীর সাথে সাক্ষাত হয়। বোরকা পরিহিতা আরব নারীকে দেখে নৃত্যশিল্পী প্রশ্ন করে, আপনাকে তো পবিত্র মারইয়ামের রূহ মনে হচ্ছে। আপনি কে? আরব নারী বললেন, আমি একজন মুসলমান। ইসলামই আমাকে এই লেবাস দান করেছে। একজন মুসলিম নারী- যিনি ইসলাম অনুযায়ী স্বীয় জীবন ঢেলে সাজিয়েছেন, তিনি একজন সর্বগুণে গুণান্বিত মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। তিনি রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্যের সবচে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লজ্জা-শরম ও সতীত্বের মূর্ত প্রতীক হন। লজ্জার চাদরে আচ্ছাদিত থাকেন। পবিত্রতা ও সতীত্ব তাঁর সৌন্দর্যকে আরো মহিমান্বিত করে তোলে। তাঁর আঁচলে কোনো কালিমা নেই। কুদৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ

www.pathagar.com

হতে পারে না। তিনি তাঁর খোদা প্রদত্ত সৌন্দর্যের প্রতি সীমাহীন খুশি। এই সৌন্দর্যের তিনি যথাযথ মূল্যায়ন করেন। তা খোলা বাজারে ফেরি করে বেড়ান না। নাপাক নিকৃষ্ট কোনো পুরুষকে তিনি ধারে কাছেও ভিড়তে দেন না। তাঁর আবৃত শরীর বাজারের কোনো সওদা নয় যে, তা যে কোনো ব্যক্তি ক্রয় করতে পারে। আবার তিনি লজ্জা শরমের আবরণে এমন ভুলাভালা সহজ-সরলও নন যে, যে কেউ তাঁকে ধোকা দিতে পারে। তিনি আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক হন। বড় থেকে বড় প্রবঞ্চক ধোকাবাজও তাঁকে ধোকা দিতে পারে না। প্রেম-ভালবাসার মায়াবী হাতছানি তাঁকে শিকার করতে পারে না।

মুখরোচক মিষ্টি কথা তাঁকে শীশমহলের অভিযাত্রী করতে পারে না। আরব নারীর এ হৃদয়গ্রাহী কথাগুলো শুনে তাঁর নিষ্পাপ, হৃদয়গ্রাহী পবিত্র লেবাস দেখে প্যারিসের অর্ধনগ্ন নৃত্যশিল্পী অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। তার বিবেকের বদ্ধ দুয়ার খুলে যায়। চোখে তার অশ্রু আসে। সে অবচেতনভাবে আরব নারীর পেছন পেছন চলতে শুরু করে। এক পর্যায়ে আরব নারীর অবস্থানস্থলে গিয়ে এই বলে চিৎকার করে কান্না শুরু করে, আপনারা কত পবিত্র, কত নিষ্পাপ। আপনাদের ধর্ম আপনাদের কত সম্মান দিয়েছে। আর আমাদের সমাজের নারীরা সীমাহীন লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অপদস্থ। আমাদের সমাজের মানুষগুলো অবলা নারীর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে তাকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।

এক শ্রেণীর হিংস্র যৌনপূজারী পুরুষ নারীদের নিজেদের যৌন ভোগ-সম্ভোগ, অবৈধ চিত্তবিনোদন, মনোরঞ্জন ও আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে। তারা মানবিক চেতনা, উঁচু মূল্যবোধ এবং সুক্ষ্ম আত্মিক অনুভূতিকে পদদলিত করে নিজেদের দগ্ধ পিপাসা নিবারণ করতে চায়। তারা আইন প্রণয়ন করে নারীর লজ্জা-শরম, ইজ্জত-আব্রু, যা নারীর সবচে নিরাপদ রক্ষাকবচ, উত্তম অলংকার এবং তার সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্যের সূক্ষ্ম প্রকাশ-সেগুলো তারা মূল্যহীন করে দিয়েছে। মিশিয়ে দিয়েছে ধুলোয়।

আমাদের নারীদের ইজ্জত সম্মান বলতে কিছু নেই। আমাদের সমাজের নারীরা কেবলই পুরুষের ভোগ-সম্ভোগের বস্তু। নৃত্যশিল্পী এই কথাগুলো বলে সাথে সাথে আরব নারীর হাতে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকেই সোজা বায়তুল্লাহ শরীফে চলে যান। বাকী জীবন তিনি মক্কাতেই কাটিয়ে দেন।

০৫. প্যারিসের খ্যাতিমান এক ডাক্তার। আলজেরিয়ার এক সম্মানিতা নারী সিকিৎসা নেবার জন্য প্যারিসে তার নিকট যান। মহিলার সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু ডাক্তার তাকে রোগের বিবরণ জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রতিটি কথায় অত্যন্ত খুশি ও প্রশান্তির সাথে আলহামদু লিল্লাহ বলেন। প্রতিবার আলহামদু লিল্লাহ বলার সাথে সাথেই তার চেহারায় এক ধরনের আলো ঝলসে ওঠত। সীমাহীন কষ্ট সত্ত্বেও তিনি হায়-হুতাশ ও নিরাশা প্রকাশ করেন না। ডাক্তার রোগিনীকে ভালভাবে

www.pathagar.com

পর্যবেক্ষণ করে দেখেন, সীমাহীন কষ্ট সত্ত্বেও তার দৃঢ়তায় সামান্যতম পদস্খলন ঘটেনি। পাহাড়ের চেয়েও তিনি বেশি অবিচল। ডাক্তার আরো দেখেন, সীমাহীন কষ্ট সত্ত্বেও এই বৃদ্ধা ইশারা-ইঙ্গিতে হাত বাঁধছেন আর ঠোঁট নাড়িয়ে কি যেন পড়ছেন। মহিলার এই অবস্থা দেখে ডাক্তার বিরাট প্রভাবিত হন। তিনি মহিলাকে তার আত্মিক প্রশান্তি, দৃঢ়তা ও অবিচলতার কারণ এবং আলহামদু লিল্লাহ'র অর্থ জিজ্ঞেস করেন। বৃদ্ধার উত্তর শুনে ডাক্তার দ্বিতীয় দিনই মুসলমান হয়ে যান।

০৬. আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমসের এক ক্যামেরাম্যান, যিনি মার্কিনীদের জাতীয় নেতা জর্জ ওয়াশিংটনের প্রোপৌত্র। মিডিয়ার অব্যাহত প্রোপাগান্ডায় মুসলমান বিশেষ করে আরবদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ তার মন মস্তিষ্কে স্থায়ী আসন গেড়ে নিয়েছিল। তিনি একবার পেশাগত কারণে বাধ্য হয়ে লেবানন ও আফগানিস্তানে যান, যাতে সেখানে চলমান যুদ্ধের চিত্র মিডিয়াকে সরবরাহ করতে পারেন। সেখানে অনেক মুসলমানের সাথে তার সাক্ষাত হয়। মুসলমানদের প্রকৃত আচার-আচরণ অতি কাছে থেকে দেখে তার বিবেকের বদ্ধ দুয়ার খুলে যায়। মস্তিষ্কে গেঁথে থাকা তার পূর্বের কল্পনা সম্পূর্ণ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়ে। পশ্চিমা প্রোপাগান্ডার মুখোশ তার দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হয়।

এ ক্যামেরাম্যান আফগানিস্তান থেকে বসনিয়া যান। সেখানে দেখতে পান, জাতিসংঘের পতাকা তলে মার্কিন চৌধুরী সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের রক্তে হোলিখেলা খেলছে। অসহায় অবলা মুসলিম নারীদের ইজ্জত-সম্ভ্রম ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে খৃস্টবাদের প্রতি তার ঘৃণা জন্মে। তিনি বাচ্চাদের মতো হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠেন। নিজের কাছে প্রশ্ন করেন, শুধু মুসলমান হওয়ার অপরাধে আজ এই নিরস্ত্র মানুষগুলোর ওপর জুলুম করছে? তিনি যুদ্ধে নিহত একজন মুসলমান বন্ধুর দফনের জন্য গেলেন।

সেখানে তার দাফন-কাফনে শরীক হওয়ার জন্য আসা বিভিন্ন দেশের মুসলমানদেরও দেখতে পান। তারা শুধু ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কারণেই এখানে এসেছেন। ক্যামেরাম্যন এই দৃশ্য দেখে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং অবচেতনভাবে একথা বলতে বাধ্য হন, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা দুনিয়ার সকল সমস্যা-সংকটের সমাধান করতে পারে। এরপর তিনি কালেমা পড়ে ইসলামের শান্তির ছায়াতলে আশ্রয় নেন।

০৭. রাশিয়ান এক যুবক ইসলামের টানে স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন সব কিছু ত্যাগ করেন। বাকী জীবন ইসলামের প্রচার-প্রসারকেই জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে নেন। ইসলাম প্রচারের জন্য রাশিয়া থেকে চলে যান জাপান। সেখানে শিল্পপতিদের ইসলামের শান্তির ছায়াতলে আনার জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। তার কাজ হলো, যার সাথেই দেখা হয় তাকেই কয়েকবার ইসলামের কালেমা উচ্চারণ করার জন্য বলেন এবং

www.pathagar.com

তার একটি ইসলামী নাম রেখে দেন, কিন্তু কাউকে তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করার কথা বলেন না। এটাই তার সারাদিনের কাজ। তিনি শুধু বলেন, জাপানীরা অনেক ভাল জাতি। আমি যেভাবে একথাগুলো বলছি, আপনিও সেভাবে বলুন। সে বাক্যগুলোর মর্মার্থ বুঝা ছাড়াই তার সাথে সাথে উচ্চারণ করতে থাকে। তার তো জানা নেই, এই বাক্যগুলো কত আলোকিত, কিন্তু কি আশ্চর্য ! কিছু দিন পরেই আল্লাহর মহিমায় কালেমা তায়্যিবার নূর পাঠকারী অন্তররাজ্যকে আলোকিত করে তোলে এবং সে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

একবার টোকিও ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর তার কাছে ইসলাম সম্পর্কে জানতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি মুসলমান হয়ে ফিরে আসেন। দ্বিতীয় দিন তিনি রাশিয়ান যুবককে তার ইউনিভার্সিটিতে ইসলামের ওপর লেকচার দেয়ার জন্য আহবান জানান। সেখানে পনের জন প্রফেসর উপস্থিত ছিলেন। রাশিয়ান যুবক তাদের বলেন, এই কথাগুলো আমি যেভাবে বলব, আপনারাও সেভাবে বলবেন। এভাবে যুবক প্রফেসরগণকে কয়েকবার কালেমাটি উচ্চারণ করান। এরপর তাদের সবার একটা করে ইসলামী নাম রেখে দেন। ব্যস, তার লেকচার শেষ। কি আশ্চর্য ! কিছুদিন পর প্রফেসরদের সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। এটা ছিল তার একদিনের সাফল্য।

০৮. জাপানের রাজপরিবারের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বিনোদনের উদ্দেশে টোকিও'র বাইরে রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ রাজ কাফেলা পথিমধ্যে একটি মনোরম স্বচ্ছ ঝরণার নিকট কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করে। সেখানে তারা দেখে, সাদা কাপড় পরিহিত কিছু লোক ওঠ-বস করছে। তাদের চেহারায় বিস্ময়কর আলো চমকাচ্ছে। একজন সবার আগে আর বাকীরা পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে তার অনুসরণ করছে। তাদের জন্য এটা আজব অভিনব দৃশ্য ছিল। এঁরা ছিলেন তাবলীগ জামাআতের লোকজন।

নামাযের সময় হয়ে গেছে, তাই রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়ে গেছেন। দোভাষীর মাধ্যমে উভয় কাফেলার মধ্যে কথাবর্তা হয়। তাবলীগী ভাইদের সহজ সরল নিষ্ঠাপূর্ণ কথা ও দাওয়াতের যাদু রাজ কাফেলাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। পরে এ রাজ-কাফেলার সবাই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। জাপানীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। ১৯৯৭ সালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যহ একশ' জাপানী ইসলাম গ্রহণ করে। টোকিও'র ইসলামিক সেন্টার সেখানে একটি ইসলামী ইউনিভার্সিটি স্থাপন করার পরিকল্পনা তৈরি করছে।

০৯. ডেনিয়েল টিস এবং ক্যারেটস দু'ভাই কোটিপতি খান্দানের আদরের দুলাল। একজনের বয়স ১২ বছর আর অপরজনের বয়স ১৩ বছর, কিন্তু এত অল্প বয়সেই তারা অপরাধ জগতের রাজপুত্র হয়ে ওঠে। কোটিপতি পিতা-মাতা তাদের সঠিক পথে আনার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার তাদের পেছনে ব্যয় করেছিলেন। তারা মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ এবং শীর্ষস্থানীয় খৃস্টান ধর্ম প্রচারকদের পর্যন্ত সাহায্য নিয়েছিলেন তাদের

www.pathagar.com

অপরাধ জগত থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য, কিন্তু কোনো প্রচেষ্টাই ফলপ্রসু হয়নি। কোনো এক ব্যক্তি তাদের এক ইসলামী মাদরাসায় ভর্তি করার পরামর্শ দেন। পিতা-মাতা তার পরামর্শ মতে ইসলামী মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেন এবং তাদের সন্তানদের সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত মাদরাসার পরিচালক জনাব আবদুল বাকী সাহেবকে বলেন। সন্তানদের সঠিক পথে আনার জন্য পরিচালককে পঞ্চাশ হাজার ডলারও প্রদান করেন, কিন্তু অবদুল বাকী সাহেব এই ডলার ফিরিয়ে দিয়ে সন্তানদের মাদরাসায় রেখে দেন।

ভর্তির প্রথম দিনই মাদরাসার অন্যান্য ছেলেদের সাথে মারপিটের এগারটি ঘটনা সংঘটিত হয়। নিষেধ করা হলে তারা কারো নিষেধ মানতে অস্বীকার করে, কিন্তু আবদুল বাকী সাহেব নিরাশ হলেন না। তিনি মুহাব্বত-ভালবাসার এমন আচরণ করলেন, যাতে তৃতীয় দিনই তারা মোমের মত গলে গেল। চতুর্থ দিন অন্যান্য ছেলেদের সাথে নামাযে শরীক হতে লাগল। এক মাসে পাঁচ পারা কুরআন মুখস্থ করে ফেলে। এভাবে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে কোটিপতির দুই সন্তান ভালো হয়ে গেল এবং পেছনের জগত থেকে সম্পূর্ণ তওবা করল।

এত অল্প দিনের মাথায় ছেলেদের এভাবে ভাল হয়ে যেতে দেখে কোটিপতির গোটা পরিবার এই বলে স্থায়ীভাবে ইসলামের শান্তির ছায়ায় আশ্রয় নিল, যে ধর্ম আমাদের সন্তানদের মানুষ বানিয়েছে আমরা সে ধর্ম গ্রহণ করব। আবদুল বাকী বলেন, মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে এমন ষোলটি খৃস্টান পরিবার ইসলামে আশ্রয় নিয়েছে, যাদের সন্তান ইসলাম গ্রহণ করেছে। জনাব আবদুল বাকী সাহেবের বর্ণনামতে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী মাদরাসাগুলো দাওয়াতের ময়দানে অভাবনীয় সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। সেসব মাদরাসয় পাঠরত ছাত্রদের অভিভাবকরা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় মার্কিন শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন, আমরা ইসলামী মাদরাসাগুলোকে মূল্যায়ন করি, যেখানে একজন মানুষকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয়।

এসব মাদরাসায় ছাত্রদের না যৌনতার শিক্ষা দেয়া হয় আর না মাদক ও অপরাধের শিক্ষা দেয়া হয়। আবদুল বাকী সাহেব আরো বলেন, মার্কিন সমাজে নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও সেখানে এমন কিছু পরিবারও পাওয়া যায়, যারা মদ, নেশা ও যৌনতার ধারে কাছেও যায় না। যাদের অস্থির আত্মা স্বস্তি ও প্রশান্তির অন্বেষায় ব্যস্ত। টিভিতে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানমালার অসাধারণ জনপ্রিয়তা পশ্চিমা সমাজের ইখলাস নিষ্ঠা পূর্বের তুলনায় আরো বেশি সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। ইসলামের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার বন্ধন এখন শিথিল হওয়া শুরু হয়ে গেছে। এখন খৃস্টানরা তাদের বিকৃত ধর্ম ও গির্জার দুর্বল পাকড়াও থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের খুব কাছাকাছি হতে শুরু করেছে। সেখানকার ইসলামী মাদরাসাগুলো, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শুধু মুসলমান সন্তানদের দীনী শিক্ষা-দীক্ষার জন্য, সেগুলো আজ অমুসলিমদের মধ্যেও ইসলামের দাওয়াত প্রসারের মাধ্যমে পরিণত হচ্ছে।

www.pathagar.com

১০. মিসরী নাগরিক ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ তাওফীকের দাওয়াতী তৎপরতা উল্লেখ করার মতো। তাঁর কাজ নিরবে ঘরে বসে হাজার মাইল দূরে মার্কিন জেলখানায় বন্দী অপরাধীদের ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসার মিশন পরিচালনা করা। ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ তাওফীক শহীদ ইমাম হাসানুল বান্না (র.)-এর একজন খাছ শাগরেদ। তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকা যান। সেখানে গিয়ে দাওয়াতী কাজে লেগে পড়েন। মার্কিন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে মেলামেশার পর তার অনুমাণ হয়, এসব মানুষ ইসলামের ঝরণা ধারার তালাশে অস্থির পেরেশান। হেরেমের দিকে তাদের নিয়ে যাবার কেউ নেই। দাওয়াতী মিশন নিয়ে তিনি মার্কিন বন্দীশালাগুলোতেও যান। সেখানে অল্প পরিশ্রমে বিশাল ফল লাভ করেন। পরে তিনি একটি নির্ধারিত পরিকল্পনার আওতায় এ কাজ শুরু করেন।

তিনি বলেন, 'আমি আমেরিকায় অবস্থানকালে বিভিন্ন জেলখানায় দাওয়াতের কাজ শুরু করে দিয়ে এসেছি। এর জন্য সেখানে একটি টিমও তৈরি করে রেখে এসেছি। তারা আমার নির্দেশনামতে কাজ করে। আমেরিকা থেকে মিসর ফেরার পর চিঠি-পত্রের মাধ্যমে তাদের সাথে আমার যোগাযোগ হয়। পত্রের মাধ্যমে বন্দীদের মস্তিষ্ক গঠনের কাজ চলে। দুই তিন মাসের মধ্যেই এসব বন্দী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। যে নতুন ইসলাম গ্রহণ করে, সে অন্য নতুন বন্দীদের নাম, অপরাধ ও তার শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পত্রের মাধ্যমে টিমের কাছে পাঠায় এবং সে নিজেও দাঈ'র ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ জেলখানার দায়িত্বশীলরা এ কাজে আমাদের টিমকে সাহায্য করে। বিশেষ করে যেসব বন্দী জেলখানার নিয়ম-কানুন মেনে চলে না, তাদের সম্পর্কে আমাদের টিমকে অবহিত করে।

টিম আমাকে জানায়। তখন আমি তাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে পত্র লেখি এবং ইসলামের পরিচয় তুলে ধরি। তারা কিতাব চাইলে কিতাব না দিয়ে পত্রের মাধ্যমেই তাদের মস্তিষ্ক গঠন চলতে থাকে। এক পর্যায়ে যখন তারা সুশৃংখল জীবনে ফিরে আসার কারণে জেল থেকে মুক্তি লাভ করে, তখন আমাদের টিম তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলেন, এভাবে এ পর্যন্ত প্রায় দেড় লাখ লোক মুসলমান হয়েছে। এটা একমাত্র আল্লাহ তাআলার দয়া ও ইহসান। আমাদের গর্বের কিছু নেই। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কয়েক বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মৃত্যুর পর্যন্ত মার্কিন জেলে ইসলাম গ্রহণকারীদরে সংখ্যা দুই লাখ উন্নীত হয়েছিল। এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

মার্কিন জেল সম্পর্কে এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ বছরের ভেতরে পাঁচ লাখ বন্দীর অবস্থায় পরিবর্তন আসার কারণে তাদের মুক্তি দেয়া হয়েছে এবং সম্মানজনক জীবন-যাপন করার জন্য তাদের আর্থিক সহায়তাও দেয়া হয়েছে। এই রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, বন্দীদের সংশোধনের জন্য মুসলিম আলেমদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা উল্লেখ করার মতো। এজন্য কর্তৃপক্ষ তাদের সুযোগ-সুবিধা আরো বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা করছে।

www.pathagar.com

ভারতের অধিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ আইয়ুব গত দশ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলখানায় দাওয়াতী কাজ করছেন। ইতোমধ্যে মার্কিন সরকার তাকে ধর্মীয় মুবাল্লিগ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রতিমাসে তার হাতে গড়ে চার পাঁচ জন বন্দী ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার তাওফীকের মতো আরো কত অখ্যাত মানুষ ফ্রান্স, বৃটেন ও অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশে কোনো প্রচার-প্রোপাগান্ডা ছাড়াই এ পবিত্র কর্ম আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। ভারতেও একাজ চলছে, কিন্তু অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে।

১১. আপনি কেন ইসলাম গ্রহণ করতে চান। আপনি কোন দেশের বাসিন্দা। আপনার দীন-ধর্ম কি? আমার নাম মাইক। ফিলিপাইন আমার দেশ। খৃস্টবাদ আমার ধর্ম। আমার নাম রামচন্দ্র। আমি হিন্দু। ভারত আমার দেশ। আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা এম.এ। এক বছর ধরে আমি সৌদি আরবে অবস্থান করছি। আপনাদের নামায আমার কাছে খুব ভালো লাগে। রমযানে আপনারা সবাই এক সাথে ইফতার করেন, নামায পড়েন, যা আমার কাছে খুব ভাল লাগে।

আমাদের কোম্পানীতে বারটি দেশের লোক কাজ করে। এখানে যত মুসলমান কাজ করে সবার ভাষা ও দেশ আলাদা আলাদা, কিন্তু যখন তারা এক সাথে ইফতার করে, নামায পড়ে তখন মনে হয় সবাই আপন ভাই। এটা আমার কাছে খুব ভাল লাগে, কিন্তু আমাদের ধর্মে এরকম পারস্পরিক মিলমিশ নেই। আমাদের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নেই। এ ধরনের প্রশ্ন উত্তর প্রতি সপ্তাহে জেদ্দা, কুয়েত, দুবাই ও রিয়াদের ইসলামিক সেন্টারে ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে হয়ে থাকে। আপনি যদি ফজরের পর জেদ্দা রেডিও'র আরবী প্রোগ্রাম শুনেন তাহলে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে আট দশ জন ইসলাম গ্রহণকারীদের সাক্ষাতকার শুনতে পারবেন।

যারা ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন প্রথমে তাদের ইসলাম সম্পর্কে পুর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়া হয়। ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের মৌলিক কর্তব্যগুলো তাদের অবগত করানো হয় এবং সম্ভাব্য বিপদ-আপদ থেকেও সতর্ক করা হয়। যখন তারা ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রশান্তিআত্মতৃপ্তি লাভ করে, তখন তাদের আনুষ্ঠানিক কালেমা পড়িয়ে তাদের থেকে হলফনামায় স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয় যে, তারা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা সৌদি আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ডে সংঘটিত হচ্ছে। মালয়েশিয়ায় বসবাসরত চাইনিজ ও হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি।

ইউরোপ-আমেরিকার সমাজে ইসলাম কিভাবে তার স্থান মজবুত করছে এবং কোন কোন মাধ্যমে সেখানে প্রবেশ করছে–এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মার্কিন দৈনিক লস এঞ্জেলেস টাইমস তার সার্ভে রিপোর্টে লেখে, উত্তর আমেরিকায় দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হিসেবে ইসলাম খুব দ্রুত প্রসার লাভ করছে। এ দৈনিকের রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকায়

www.pathagar.com

মুসলমানের সংখ্যা আশি লাখের কাছাকাছি, কিন্তু পত্রিকাটির মতে, এই অনুমাণ সুনিশ্চিত নয়। পত্রিকার জরিপে যদিও মুসলমানের সংখ্যা পাঁচ লাখ বলা হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে একথাও বিশ্লেষণ করে দেয়া হয়েছে যে, এই সংখ্যা কেবল সেসব মুসলমানের যারা আমেরিকার মসজিদসমূহে নিয়মিত নামায আদায় করে। সার্ভেকারীরা আমেরিকার এক হাজার ছেচল্লিশটি মসজিদের দায়িত্বশীলদের কাছে জিজ্ঞেস করেছে, তাদের মসজিদে প্রত্যহ কতজন মুসল্লী নিয়মিত জামাআতে শরীক হয়। দায়িত্বশীলরা বলেন, এরকম নিয়মিত মুসল্লীর সংখ্যা ৪৬৫ জন।

উক্ত রিপোর্টেই বলা হয়ে, মুসলমানদের সামষ্টিক সংখ্যার দশ শতাংশ নিয়মিত মসজিদে নামায আদায় করে। সুতরাং মুসলমানদের সামষ্টিক সংখ্যা পাঁচ লাখ থেকে কম নয়, কিন্তু একথা থেকে এ ফল বের করা যুক্তিসঙ্গত নয় যে, আর বাকী নব্বই শতাংশ মুসলমান, যারা নিয়মিত মসজিদে যায় না, তারা নামায থেকে একেবারে বঞ্চিত। হতে পারে তাদের অনেকে ঘরে, অফিস-আদালতে কিংবা মহল্লার কোনো ছোটখাট স্থানে নামায আদায় করে নেয়। দৈনিকটি আরো লেখেছে, প্রতি বছর আমেরিকায় সোয়া লাখ নতুন মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

লন্ডনের প্রসিদ্ধ পত্রিকা লন্ডন টাইমস ১৯৯৩ সালের ৯ই নভেম্বর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, যার শিরোনাম ছিল–' পশ্চিমা মিডিয়ার বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব সত্ত্বেও ইসলাম পশ্চিমাদের হৃদয় জয় করে নিচ্ছে'। উক্ত শিরোনামে বলা হয়েছে, যে বিপুল হারে বৃটিশ নাগরিকরা আজ ইসলাম গ্রহণ করছে, তার কোন নযীর অতীতে পাওয়া যায় না। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী বিশ বছরের মধ্যে বৃটিশ নও মুসলিমদের সংখ্যা সেসব মুসলমানদের তুলনায় বহুগুণে বেড়ে যাবে যারা অন্যান্য দেশ থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছে। উক্ত রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, সেসব নও মুসলিমদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় চার গুণ বেশি। অথচ পাশ্চাত্যে ইসলাম সম্পর্কে সবারই এ ধারণা বদ্ধমূল রয়েছে যে, ইসলাম নারীদের সাথে অমানবিক আচরণ করেছে, তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।

লন্ডন টাইমস তার ১৯৯৩ সালের ৯ নভেম্বর সংখ্যায় বৃটিশ বংশভূত উচ্চ শিক্ষিতা অনেক নারীর সাক্ষাতকার প্রকাশ করেছে, যারা জেনে শুনে অধ্যয়ন করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। অনেকগুলো সাক্ষাতকার উদ্ধৃত করার পর পত্রিকাটি লেখে, অনেক নও মুসলিম নারী ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মাঝে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বলেন, ইসলামে নারীর সম্মান-মর্যাদা বেশি। ইসলাম নারীদের যে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে, পাশ্চাত্য তা দেখে না। পাশ্চাত্যের নিকট নারীরা পুরুষের ভোগ-সম্ভোগ, আনন্দ-বিনোদন, মনোরঞ্জন ও আমোদ-প্রমোদের বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতার শ্লোগান ধোকা-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলাম নারীদের প্রকৃত স্বাধীনতা দিয়েছে। সর্ব সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত দশ বছরে আটাত্তর হাজার বৃটিশ নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে নারীদের হার ২৬ শতাংশ।

www.pathagar.com

উপরোক্ত দুই পত্রিকার রিপোর্ট দ্বারা হালকাভাবে অনুমাণ করা যায়, আমাদের মুসলমানদের আমলহীনতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা অদৃশ্য থেকে ইসলাম প্রচারের উপকরণ সৃষ্টি করে দিচ্ছেন।

ফ্রান্সে বিগত পনের বছরে ষাট হাজার ফরাসী নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে নারীর হার ৬৭ শতাংশ। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, রাষ্টদূত, পাদরী, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, প্রফেসর, ডাক্তার, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, মনস্তত্ত্ববিদ, ফিল্ম স্টার এবং সামরিক অফিসার সবাই রয়েছেন।

সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে প্রকাশিত মাসিক আদ দাওয়ার এক রিপোট থেকে জানা যায়, ফরাসী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক রিপোর্টে সে দেশের সরকার স্বীকার করেছে, মুসলমানরা যে অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে অপরাধ বিস্ময়করভাবে কমে যায়। ফ্রান্সের এক শহরে বসবাসরত মুসলমানরা সেখানকার সিটি করপোরেশনের নিকট মসজিদ নির্মাণের জন্য আবেদন করে, কিন্তু করপোরেশনের মেয়র তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যন করে। একাধারে চার বছর পর্যন্ত বার বার এই আবেদন প্রত্যাখ্যান হতে থাকে। বাধ্য হয়ে মুসলমানরা একটি বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণ করে সেখানে একটি বড় হলে নামায আদায় শুরু করে।

ফরাসী পুলিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে রিপোর্ট দিয়েছে, যখন থেকে মুসলমানরা এখানে নামায পড়া শুরু করেছে তখন থেকে এই এলাকায় অপরাধ কমতে থাকে। পুলিশের এই রিপোর্টের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেসব মহল্লায় সংঘটিত অপরাধের সার্ভে শুরু করে যেখানে মসজিদ রয়েছে। রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে, কোনো মহল্লায় সাধারণতঃ মসজিদ নির্মাণের পর বিস্ময়করভাবে সেখানে অপরাধের হার কমতে থাকে। এর কারণ কি? এর কারণ আমাদের জানা নেই। এ রিপোর্টকে ভিত্তি বানিয়ে ফরাসী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সারা দেশে মসজিদ নির্মাণের সাধারণ অনুমতি দিয়ে দেয়।

সরকারীভাবে স্বীকার করা হয়েছে, ফ্রান্স ও ইউরোপের দেশগুলোতে অপরাধের ওপর নিয়ন্ত্রণের জন্য কোটি কোটি ডলার খরচ করা হয়ে থাকে, তারপরও তারা ব্যর্থ হয়। এই রিপোর্টের পরই ফ্রান্সের জেল কর্তৃপক্ষ জেলে আবদ্ধ কয়েদীদের সংশোধনের জন্য মুসলমান দাঈদের আহবান জানাতে শুরু করে। খুব দ্রুত তারা এর ফলাফল দেখতে পায়। অপরদিকে ফ্রান্সের মুসলমানরা তাদের সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য এমন ব্যবস্থা করেছে, যাতে তারা উচ্চ নাম্বার নিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের উপমহাদেশ সফরের সময় যে টিম তার সাথে এসেছিল, তার মধ্যে পাচ জন ছিল মুসলমান। একজন মার্কিন কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ, দ্বিতীয় জন বিল ক্লিন্টনের প্রেস সচিব, তৃতীয় জন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, চতুর্থ জন অর্থ বিষয়ক উপদেষ্টা এবং পঞ্চম জন একজন নারী।

www.pathagar.com

সম্প্রতি লন্ডনে আহমদ আবদুর রহমন নামক এক দাঈ একটি ডকুমেন্টারী সিনেমা তৈরি করেছেন, যাতে তিনি সাতচল্লিশ জন নও মুসলিমের নিকট তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। উক্ত সিনেমায় আমেরিকা ও ইউরোপের ষোল জন নও মুসলিমের সাক্ষাতকার বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সিনেমার এক অংশে বলা হয়েছে, সাধারণত পশ্চিমা দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কি ধরনের সন্দেহ-সংশয় রয়েছে এবং পশ্চিমা মিডিয়া কিভাবে তার সর্বশক্তি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করে।

কিন্তু এত কঠিন বিদ্বেষ বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলাম কেন প্রসার লাভ করছে এবং সরকারের কোনো ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা ছাড়াই মানুষ কেন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে। এই বাস্তবতা স্বীকার করে সাবেক এক বৃটিশ রাষ্ট্রদূত যিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর তার নাম রেখেছেন হাসান, তিনি লেখেন, আমার বিস্ময় লাগে, ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে এত কঠোর বিরোধীতা শত্রুতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মানুষ কেন ইসলাম গ্রহণ করছে। এই ধর্মে কি এত আকর্ষণ রয়েছে যে, লোকেরা নিজে নিজেই অবচেতনভাবে এর পেছনে ছুটছে।

এ প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে যে উত্তর আমি পেয়েছি তা হলো, ইসলামই একমাত্র সর্বশেষ ধর্ম, যা সমগ্র মানবতার হেদায়াত, পথনির্দেশ ও তার প্রকৃত সফলতার গ্যারান্টি। এই ধর্ম যেহেতু হুবহু মানবপ্রকৃতি অনুযায়ী, সেজন্য সে মানুষের সমস্যা সংকট থেকে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না; বরং এসব সমস্যা সংকটে সে সঠিক সমাধান পেশ করার চেষ্টা করে। অস্থির পেরেশান মানুষের আত্মিক মানসিক শান্তি প্রশান্তি দান করে। এজন্য মানুষ যদি দলে দলে এ ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে আমার কাছে তা তাজ্জবের বিষয় নয়।

সাবেক বৃটিশ রাষ্ট্রদূত বিভিন্ন মুসলিম অমুসলিম দেশে অবস্থানের সময় উভয়ের মাঝে যে মৌলিক পার্থক্য অনুভব করেছেন তা তিনি নিজের ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'মুসলিম দেশগুলোতে আমি সাধারণভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা পেয়েছি। মুসলিম সোসাইটিতেও শান্তি ও স্বস্তি দেখেছি। পক্ষান্তরে অমুসলিম দেশগুলোতে আমি মানুষদের চেহারায় চিন্তা- পেরেশানীর ছাপ দেখেছি।'

ফ্রান্সের এক সাবেক রাষ্ট্রদুত যিনি সৌদি আরব, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছেন, তিনিও ঠিক একই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আমি রিয়াদ ও জেদ্দায় কোনো রক্ষী ছাড়া একাই ঘোরাফেরা করতাম। হাজার হাজার ডলার আমার পকেটে থাকত। আমার অবস্থানস্থলের দরোজাও সাধারণত খোলা থাকত। কখনো চুরি হতো না। কেনা-বেচায় কেউ আমাদের সাথে প্রতারণা করত না। ভুলে যদি কখনো দোকানদারকে বেশি টাকা দিয়ে দিতাম তাহলে দোকানদার তা ফিরিয়ে দিতেন। মুসলিম দেশ থেকে যখন আমরা প্যারিসে পৌছলাম তখন প্রথম দিনই আমার পকেট তার হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন আমার স্ত্রীর স্বর্ণের অলংকার এবং তৃতীয়

www.pathagar.com

সপ্তাহে আমাদের ফ্ল্যাটে চুরি হলো। এ ঘটনার পর আমি ইসলাম সম্পর্কে কিছু চিন্তা-ভাবনা এবং কিছু লেখাপড়া করি। এরপর মুসলমান হয়ে যাই। কারণ খৃস্ট ধর্ম একটি প্রাণহীন লাশ। যিন্দেগীর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। যদি এর সুস্পষ্ট কোন দলীল আপনি চান তাহলে তাদের দেখুন যারা নিয়মিত গুরুত্বের সাথে গির্জায় যাওয়া আসা করে। ফ্রান্সে শুধু চার শতাংশ লোক রবিবার গির্জায় যায়। জার্মানীতে ছয় শতাংশ আর বৃটেনে সাত শতাংশ লোক নিয়মিত গির্জায় যাওয়া আসা করে, কিন্তু মুসলমান প্রতি দিন পাচ বার মসজিদে যায়।

তাদের নিয়মিত মসজিদে গমনকারীর সংখ্যা ষাট থেকে সত্তর শতাংশ। মুসলমানদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, দীন ধর্মের সাথে তাদের প্রাণবন্ত সম্পর্ক রয়েছে। ইসলাম তাদের চব্বিশ ঘন্টার জীবন পরিবেষ্টন করে আছে। আমরা পশ্চিমা দেশের লোকদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত মজলিসে তাদের থেকে শুনেছি, তারা বলাবলি করছে, খৃস্টবাদ থেকে আমাদের আস্থা উঠে গেছে। আমাদের ধর্ম প্রচারকরা বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়েছেন।

আহমদ আবদুর রহমানের সিনেমায় ইসলাম গ্রহণ করার যে কারণ বলা হয়েছে, সামগ্রিকভাবে সবার দৃষ্টিতে তা হচ্ছে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা গোটা মানবতাকে ধ্বংস ও বরবাদীর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের ড. গ্রাহাম বলেন, এখন ইসলাম পূর্ব ও পশ্চিমের বিষয় নয়; বরং সে একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজের এবং তাওহীদের সবচে বড় আহবায়ক।

বৃটেনের এক সাবেক খৃস্টধর্ম প্রচারক বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে একজন গোঁড়া খৃস্টান ছিলাম। ইহুদীদের প্রতি আমার এত বড় সহানুভূতি ছিল যে, আমি তাদের সাহায্যের জন্য ইসরাঈলে পর্যন্ত গিয়েছি। সেখানে ইহুদী ও ফিলিস্তিনি মুসলমানদের সাথে মেলামেশার কিছুদিন পরই আমার অনুমান হয়ে গেল, প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরা মজলুম। ইহুদীরা তাদের ভূমি জবরদখল করে নিয়েছে। ইহুদী বড় জালেম, অত্যাচারী, পাষ , অহংকারী, দুশ্চরিত্র, দুস্কৃতকারী, মানবতার শত্রু এবং ধোকা প্রতারণাই তাদের জীবনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। তারা একেবারেই মনুষ্যত্ব শূন্য।

পক্ষান্তরে মুসলমানদেরকে আমি চরিত্রগতভাবে অনেক উন্নত পেয়েছি। ইসরাঈল থেকে আমি দ্বিতীয় সপ্তাহেই ফিরে এসে মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক বাড়িয়ে দেই এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে পড়াশোনা শুরু করি। পরে বুঝতে পারলাম, আসলেই মুসলমানরা মজলুম। পশ্চিমা মিডিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমাদের মন মগজ বিষাক্ত করে তুলেছে। এর এক মাস পরই আমি ইসলাম গ্রহণ করি।

সিনেমার এক অংশে বলা হয়েছে, ইসলাম গ্রহণকারীদের জীবনে বিরাট বড় পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে পশ্চিমা পরিবেশে লালিত-পালিত নারীরা ইসলামের আরোপিত বিধি নিষেধ বড় সানন্দে গ্রহণ করে নিয়েছে। কারণ জার্মান নারী হান্নার

www.pathagar.com

বক্তব্য অনুযায়ী ইসলাম নারীদের যে অধিকার দিয়েছে অন্য কোনো ধর্ম তা দেয়নি। ইসলামের পারিবারিক বন্ধন অটুট থাকে। বেলজিয়ামের নও মুসলিম মহিলা রাবেয়া বলেন, মুসলিম পরিবারে নারীদের বিরাট সম্মান রয়েছে। যতই তাদের বয়স বৃদ্ধি হয় ততই তাদের সম্মান মর্যাদা ও মূল্যায়ন বৃদ্ধি পায়। ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে সাবেক এক মহিলা খৃস্ট ধর্ম প্রচারক বলেন, যখন আমরা নামাযে থাকি তখন সরাসরি আমরা সৃষ্টিকর্তার সাথে কথা বলি। আমাদের মাঝখানে কোনো মাধ্যম থাকে না, যেমন খৃস্ট ধর্মে পাদরীরা মাধ্যম থাকে।

মার্কিন নও মুসলিম মহিলা আয়েশা সুফিয়া বলেন, ইসলামে তাকদীরের ওপর ঈমান আনা ইসলামের এমনই এক সৌন্দর্য যে, পাশ্চাত্য যদি এর ওপর ঈমান আনত তাহলে তাদের সকল আত্মিক, মানসিক ও শারীরিক রোগের চিকিৎসা হয়ে যেত। অপর এক নও মুসলিম যিনি ইহুদী এবং ফ্রি মিশন আন্দোলনের একজন সক্রিয় ও কর্মতৎপর কর্মী ছিলেন, তিনি বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি আমার নাম রেখেছি রোকনুদ্দীন। তিনি কুরআন শরীফ সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, যখন আমি প্রথমবার কুরআন পড়লাম তখন আমার কাছে এটি অলৌকিক মনে হয়েছে। এর নূর আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে।

জীবনে আমার প্রথমবার আত্মপ্রশান্তি অর্জিত হলো। এই অনুভূতিই আমাকে ইসলামের দিকে ধাবিত করেছে। যে ব্যক্তির আত্ম প্রশান্তির প্রয়োজন সে যেন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে। যে ব্যক্তি একবারও কুরআন পড়বে সে একথা অস্বীকার করতে পারবে না, এটি আল্লাহর কালাম। আমি আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তির জন্য সমগ্র পৃথিবীতে হন্যে হয়ে ঘুরেছি। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করেছি, কিন্তু পবিত্র কুরআন আমাকে যে সম্পদ দান করেছে তার কোনো মূল্য হয় না। কুরআন পাঠ করে আমার জীবন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে, যা একমাত্র কুরআনের অলৌকিকতা। আফসোস ! দুনিয়া এই আলো থেকে বঞ্চিত।

সিনেমার শেষ অংশে নও মুসলিমগণ পশ্চিমা সোসাইটির সমস্যা, সংকট ও তার ইসলামী সমাধান পেশ করেছেন। তারা বলেছেন, অমুসলিম সোসাইটি যে যৌনতার দাবাগ্নি, চারিত্রিক বিপথগামিতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং মানসিক রোগের শিকার, তা থেকে মুক্তির পথ একমাত্র ইসলাম। কেবল ইসলামই পারে তাদের এ সংকট থেকে মুক্তি দিতে। পশ্চিম জার্মানীর নও মুসলিম রাবেয়া বলেন, পশ্চিমা সমাজে নারীদের যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, নিছক প্রতারণা।

পশ্চিমা স্বাধীনতার অর্থই হলো, প্রবৃত্তির চাহিদামতো জীবন যাপন করা, কিন্তু প্রকৃত নারী স্বাধীনতা কেবল ইসলামেই রয়েছে। ইসলামী শিক্ষা ও নীতিমালার ওপর আমল করলেই কেবল সেই স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে। পশ্চিম জার্মানীতে বিগত আট বছরে বার হাজার নারী ইসলাম গ্রহণ করেছে। তুরস্কে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইসলাম গ্রহণ করে তার নাম রেখেছেন মুরাদ হোফম্যান। তিনি ইসলামের প্রতিরক্ষা বিষয়ে

www.pathagar.com

কয়েকটি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা পড়ার মতো। জার্মান সরকার এখন মুসলমানদের অনুমতি প্রদান করেছে, তারা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দীনিয়াত বিষয় পড়াতে পারবে।

বৃটেনের প্রসিদ্ধ পপস্টার ইসলাম গ্রহণ করে তার নাম রেখেছেন ইউসুফ ইসলাম। তিনি তার বাকী জীবন নতুন প্রজন্মের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য উৎসর্গ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সীরাত বিষয়ে ভিডিও ক্যাসেট বের করছেন, যাতে এ সম্পর্কে অমুলিমদের ভুল ধারণার নিরসন হতে পারে। এ ছাড়াও যেসব বৃটিশ নারী ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের সংখ্যা প্রায় সাতাত্তর হাজার।

মার্কিন কেন্দ্রীয় গির্জা সংগঠন ছয় হাজার চারশ' তিপান্ন জন খৃস্টান ধর্ম প্রচারককে বিভিন্ন ইসলামী ও আফ্রিকান দেশে প্রেরণ করেছে, যাতে সেখানে তারা খৃস্টবাদের প্রচার করতে পারে। তাদের পেছনে দশ বছরে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ ডলার ব্যয় করা হয়েছে, কিন্তু দুই বছর পর রিপোর্ট এসেছে, অর্ধেকের বেশি খৃস্টান ধর্ম প্রচারক মুসলমান হয়ে গেছে। এখন তারা ইসলামী ও আফ্রিকান দেশে মুসলিম দায়ী হিসেবে ইসলামের প্রচার করছে। পাদরীদের ইসলাম গ্রহণের এই ঘটনা বেশির ভাগ আফ্রিকান দেশে সংঘটিত হয়েছে।

১৯৯৬ সালে মার্কিন মুসলমানদের সম্পর্কে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, মার্কিন সেনাবাহিনীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা দশ হাজার। এর মধ্যে বেশির ভাগ সেসব মুসলমান যারা সৌদি আরবে অবস্থানকালে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এসব মুসলিম সেনা সদস্যেও দীনী দিক-নির্দেশনা, চারিত্রিক ও নৈতিক দীক্ষা এবং নামাযের ইমামতির জন্য সেনা সদস্য আবদুর রশীদকে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাকে যে সামরিক ব্যাজ দেয়া হয়েছে তাতে চাঁদ-তারকাও রয়েছে। সেনাবাহিনী সদস্যদের দুই ঈদের নামায ও খুতবা যখন প্রথমবার টিভি-রেডিওতে প্রচার করা হয়, তখন থেকে ছয় মাসের মধ্যে পনেরশ' সেনা সদস্য আবদুর রশীদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। আবদুর রশীদ বলেন, দুই ঈদের নামায প্রচার হওয়ার পর কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সেনা দফতর থেকে আমার কাছে ফোন এসেছে ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য।

মার্কিন সেনাবাহিনীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান, খোদ আমেরিকায় মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং তাদের গঠনমূলক কর্মতৎপরতার কারণে আমেরিকার ইতিহাসে প্রথমবার মার্কিন কংগ্রেস প্রাসাদে ইফতার পার্টি এবং হোয়াইট হাউসে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান হয়েছে, তাতে দেড়শ' মুসলমানকে দাওয়াত করা হয়েছে। সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আলগোর ওয়াশিংটনের ইসলামিক সেন্টার পরিদর্শন করেছেন এবং ইসলাম সম্পর্কে তার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

বৃটেনের মতো ইসলাম ও মুসলিম-বিদ্বেষী দেশে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৃটিশ রাজপুত্র চার্লস বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামের

www.pathagar.com

প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং মানব সোসাইটির ওপর তার অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেছেন, তিনি বর্তমানে কুরআন অধ্যয়ন করছেন, যাতে বৃটেনে বসবাসরত মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস, জীবন পদ্ধতি ও সভ্যতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়।

এ তো শুধু পশ্চিমা দেশ সম্পর্কে কিছু ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হলো, নতুবা আফ্রিকান ও এশিয়ান দেশগুলোতে ইসলাম গ্রহণের অসংখ্য অগণিত ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। এসব দেশে অঞ্চলের পর অঞ্চল ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে। আফ্রিকান দেশগুলোতে সবচে বেশি ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ঘটছে। ভারতের হিন্দুদের মধ্যেও শ্রেণী বৈষম্য ও নিম্ন শ্রেণীর ওপর ব্রাহ্মণ্যবাদী জুলুম নির্যাতন তাদের ইসলামের দিকে ধাবিত করছে। এছাড়াও হিন্দু ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস, প্রথা-প্রচলনও হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে তদের অনুসারীদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে। কিছু কিছু হিন্দু যুবক তাদের মায়ের মৃত্যুর পর তাদের অগ্নিতে জ্বলতে দেখে এবং লাশের বেইজ্জতী বরদাশত না করতে পেরে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

গোটা বিশ্বে ইসলামের জাগরণের দ্বিতীয় দিক স্বয়ং মুসলমানদের চেষ্টা প্রচেষ্টা। এই জাগরণ বিভিন্ন ইসলামী দেশ, দীনী সংগঠন, প্রখ্যাত দাঈ ও কলম সৈনিকদের সক্রিয় চেষ্টা প্রচেষ্টা এবং প্রাণান্তকর সংগ্রামের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সর্বশীর্ষে সৌদি আরব। নিঃসন্দেহে সৌদি আরব খেলাফতে উসমানিয়ার পতনের পর ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্বের যে গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। খেলাফতে উসমানিয়ার পতনের পর যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল সে শূন্যতা পুরণে সৌদি আরব বীরের ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামী জাগরণের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি হলো বিভিন্ন দীনী, দাওয়াতী ও সেবা সংগঠন-সংস্থা, যেগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করছেন সরাসরি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ।

১৯২৪ সালে মোস্তফা কামাল পাশা আতাতুর্ক খেলাফতে উসমানিয়ার পতনের ঘোষণা দিলে গোটা ইসলামী বিশ্বে এ ঘোষণার বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবাদ হয়, কিন্তু মুসলমানরা নিরাশা ও হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা এই নাযুক পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা শুরু করেন। ভারতের খেলাফত আন্দোলন গোটা বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে দীনী ও রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ সময় দীনী শিক্ষার ময়দানও প্রসারিত হতে থাকে।

প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলূম দেওবন্দ, দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা এবং আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি। এসব দীনী ও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপমহাদেশের মুসলিম নওজোয়ানদের মস্তিষ্কে ইসলাম সম্পর্কে সৃষ্ট সন্দেহ-সংশয় ও ধর্মহীন চিন্তা-চেতনা দূর করে নতুনভাবে ইসলামের ওপর আস্থাশীল করার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে যাচ্ছে এবং জনসাধারণের মধ্যেও ব্যাপকভাবে দীনের মৌলিক শিক্ষা প্রসার করার জন্য

www.pathagar.com

নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আজ উপমহাদেশ পেরিয়ে গোটা বিশ্বে তার প্রভাব পড়ছে। এ ক্ষেত্রে দারুল উলূম দেওবন্দের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলা চলে, উপমহাদেশে ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে সবচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে দারুল উলূম দেওবন্দ। পাক-ভারত উপমহাদেশে দারুল উলূম দেওবন্দের আদলে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মকতব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যারা ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

মিসরের ইমাম হাসানুল বান্না (র.) এবং তাঁর ইখওয়ানুল মুসলিমীন আন্দোলন গোটা আরব বিশ্বে দীনী জাগরণের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে। শুধু আরব বিশ্বেই নয়, বরং গোটা দুনিয়াতেই তাঁর আন্দোলন বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সৌদি আরবের শাসক মালিক আব্দুল আজীজ প্রথম ধাপেই হিজাযে শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার নির্মূলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। মালিক আব্দুল আজীজ দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিলে অনুসারীরা তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণে গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে দীনী জাগরণের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত মুসলমান, চাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক আর চাই সংখ্যালঘু হোক, সবারই বস্তুগত, নৈতিক, চারিত্রিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং ইসলামী দাওয়াত ও শিক্ষা ব্যাপক করার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছেন। যেসব মুসলিম দেশে পূর্ব থেকে দীনী দাওয়াত ও শিক্ষার কাজ চলে আসছে, সেখানকার অবকাঠামোগত ও শিক্ষাগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মন খুলে মুক্ত হস্তে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আফ্রিকা, এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়াতে তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে মুসলমানদের অবস্থা সার্ভে করিয়েছেন। নিজস্ব ব্যয়ে মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতাল ও রেডিও স্টেশন স্থাপন করেছেন।

কুয়েতের সেবা সংস্থা আল হাইয়্যাতুল খায়রিয়্যাহ, সৌদি আরবের রাবেতা আলমে ইসলামী, জামিআ ইসলামিয়া, ধর্ম মন্ত্রণালয়, দারুল ইফতা, নদওয়াতুশ শাবাব আল ইসলামী, মুআছছাছাতুল হারামাইন, মুআছছাছাতু ইকরা আল খায়রিয়্যাহ, মুআছছাছতুল মালিক ফয়সাল আল খাইরিয়্যাহ, সংযুক্ত আরব আমিরাতের রেড ক্রিসেন্ট, মুআছছাছা শেখ যায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ানসহ আরো অসংখ্য অগণিত সেবা সংস্থা গোটা বিশ্বে মুসলমানদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে। সাহায্য সেবার পর সৌদি আরবের দ্বিতীয় বড় কীর্তি হলো, কুরআন ছাপিয়ে প্রচার করা।

অপরদিকে গোটা বিশ্বের মুসলিম নওজোয়ানদের দীনী শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দরোজা খুলে দিয়েছে। রাবেতা আলমে ইসলামীর মাধ্যমে ষাট হাজারের বেশি মসজিদ নির্মিত হয়েছে, পঁচিশ হাজারের বেশি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পূর্বপ্রতিষ্ঠিত হাজার হাজার মাদরাসায় সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছে। মুআছ্ছাছাতুল মালিক ফয়সাল আল খায়রিয়্যাহ দীনী, দাওয়াতী, সাহিত্য ও ইলমী

www.pathagar.com

ময়দানে কর্মরত ব্যক্তিত্ব, দাঈ, মুরব্বী, ওলামা ও গবেষকদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পুরস্কার প্রদানের ধারা চালু করেছে। সম্প্রতি দুবাই সরকারও বার্ষিক 'ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্মাননা' প্রদানের ধারা চালু করেছে। সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং লিবিয়া জাতীয় উন্নয়নের জন্য মুসলমান বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছে।

এর দ্বার একদিকে মুসলমানদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এসেছে, অপরদিকে তাদের আকীদা ও আমলের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। অমুসলিম দেশের জনগণও আরব বিশ্বে ব্যাপকভাবে কাজ করছে। এতে তারা আরবদের মধ্যে নিরাপদে অবস্থান করে মুসলমানদের খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে। মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে অধ্যয়ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেখানকার শান্তি-নিরাপত্তা ও ইসলামী সাম্য-মৈত্রীর পরিবেশ দেখে প্রভাবিত হয়েছে। ফলে বিপুল সংখ্যক অমুসলিম ইসলামের শান্তির ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে আর বিপুল সংখ্যকের মধ্যে ইসলামের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। আরব দেশে প্রতিবছর তিন হাজারের বেশি লোক ইসলাম গ্রহণ করছে। তার মধ্যে নারীদের হার ২৭ শতাংশ। এদের বেশির ভাগ শ্রীলংকা, ফিলিপাইন ও ভারতের।

সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার ও তুরস্ক ইসলাম প্রচারে আধুনিক মিডিয়া এবং প্রযুক্তিও ব্যবহার করেছে, যার সুদূরপ্রসারী ফল পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৯৯ সালে সৌদি আরব ১২০টি দেশে হজ্জের প্রোগ্রাম প্রচার করার জন্য বিবিসি, সিএনএন ও স্টার টিভির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। হজ্জের পরের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এই আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম দেখে টিভি দর্শকরা ইউরোপ-আমেরিকার ইসলামিক সেন্টারে ফোনের মাধ্যমে যে যোগাযোগ করেছে, তার সংখ্যা আট লাখের উর্ধ্বে। সেসব ফোনকারীর মধ্যে বিপুল সংখ্যক এমনও ছিল যারা স্বীকার করেছে, এর পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে তাদের মন মস্তিষ্কে অনেক সন্দেহ-সংশয় এবং মুসলমানদের সম্পর্কে কু-ধারণা বদ্ধমূল ছিল। হজ্জের প্রোগ্রাম দেখে তা দূর হয়েছে।

সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার এবং তুরস্কে ইন্টারনেট ও টিভির মাধ্যমে গোটা বিশ্বে ইসলামী দাওয়াত প্রচার-প্রসারের প্রচেষ্টা চলছে। তুরস্কে তিনটি টিভি চ্যানেল ইসলামী নীতিমালা মেনে উন্নত মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এর সীমারেখা পূর্ব ইউরোপ এবং পশ্চিম জার্মানী পর্যন্ত প্রসারিত। অর্থনৈতিকভাবেও এসব চ্যানেল বিরাট লাভবান হচ্ছে। অপরদিকে ইসলামী নীতিমালার আলোকে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, কল-কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান দেশকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী বানানোর জন্য অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে। তুরস্কে প্রস্তুতকৃত টিভি অনুষ্ঠানের চাহিদা আরব বিশ্বেও ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কাতার সরকার একটি স্যাটেলাইট চ্যানেল স্থাপন করে ইসলামী দাওয়াতের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছে। এই চ্যানেলটি বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড. ইউসুফ আল কারযাভীর তত্ত্বাবধানে

www.pathagar.com

পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যদিও মুসলিম দেশে তেমন একটা সফলকাম হচ্ছে না, কিন্তু পশ্চিমা দেশে ইসলামী ব্যাংককে বিপুলভাবে স্বাগত জানানো হচ্ছে। অমুসলিম ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিরা এমন ব্যাংকে পুঁজি বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করছে। পশ্চিমা দেশে ক্রমশঃ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের চাহিদা বাড়ছে। অন্য ভাষায়, পশ্চিমা দেশে অর্থনৈতিক ময়দানেও মুসলমানরা অগ্রসর হচ্ছে। কম্পিউটার সফটওয়ারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পনগরী ক্যালিফোর্নিয়াতে একজন মুসলমান আছেন, যিনি বিল গেটস কোম্পানীর সবচে বড় সাপ্লায়ার।

ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকা ছাড়া ইসলাম পৃথিবীর যে কোণায় কদম রেখেছে সেখানেই নিজের আসন করে নিয়েছে এবং নেতিয়ে যাওয়া মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জাগরণের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে দিয়েছে। রাশিয়া পৃথিবীর সুপার শক্তি ছিল এবং সত্তর বছর পর্যন্ত দুর্দান্ত প্রতাপের সাথে পৃথিবী শাসন করেছে। ইসলামের উত্তপ্ত রশ্মি সেই সুপার শক্তিকে বিগলিত করে ছেড়েছে। এখন তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। চেচনিয়ার নিরস্ত্র মুসলমানদের কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা ভিক্ষা চাইতে হচ্ছে।

এই মহাশক্তির পতন শুরু হয় ১৯৭৯ সাল থেকে, যখন সে আফগানিস্তানে হামলা চালায়। রাশিয়ার যেসব সৈন্য আফগানিস্তানে লড়াই করতে এসেছিল, তারা হয় আফগান মুজাহিদদের হাতে জাহান্নামে পৌঁছেছে আর না হয় ইসলামের যাদুতে আচ্ছন্ন হয়েছে। রাশিয়া আফগানিস্তানের মুসলমানদের সাথে লড়াই করার জন্য মুসলিম সৈন্যদের পাঠাত। এর উদ্দেশ্য ছিল, হয় তারা তাদেরই জাতি ভাইদের সাথে লড়াই করে বিজয়ীবেশে আর না হয় লাশ হয়ে ফিরে আসবে। উভয় অবস্থায়ই রাশিয়ার বিজয়, কিন্তু তাদের এ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, কারণ রাশিয়ার এই মুসলিম সেনারা আফগাস্তিান থেকে নতুন চেতনা নিয়ে স্বদেশে ফিরত। দেশে ফিরে তারা আপন আপন অঞ্চলে ইসলামের তাবলীগের কাজ শুরু করে দিত।

অপরদিকে আফগানিস্তানে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামরিক মেরুদ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায়। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ মার্কিন সরকারকে রিপোর্ট দিয়েছে, যদি অতি দ্রুত আফগানিস্তানের সাথে রাশিয়ার চলমান যুদ্ধের ইতি টানা না হয় তাহলে রাশিয়া টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, এমনকি ইউরোপ-আমেরিকার স্বার্থও প্রভাবিত হবে। কারণ আফগানিস্তানের যুদ্ধের ফলে গোটা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে জেহাদের চেতনা উজ্জীবিত হবে, বিশেষ করে আরব যুবকরা দলে দলে আফগানিস্তানের জেহাদে অংশ গ্রহণ করছে। এতে এ আশংকা আরো প্রকট হয়ে ওঠেছে যে, মুসলিম দেশগুলোর বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ ও একনায়কতান্ত্রিক সরকারগুলোর পতন ঘটবে। অন্য ভাষায়, এসব মুসলিম দেশের সাথে পাশ্চাত্যের যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গোয়েন্দা সংস্থার এই রিপোর্টের পর শেষ পর্যন্ত আমেরিকা রাশিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করে সসম্মানে আফগানিস্তান থেকে বের হয়ে আসতে বাধ্য করে। এভাবে দুনিয়ার পরাশক্তি

www.pathagar.com

রাশিয়াকে পরাজিত করার পরিকল্পনা তৈরিকারী মর্দে মুমিন জেনারেল জিয়াউল হক শহীদ এবং জেনারেল আখতার আবদুর রহমান শহীদ (র.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আফগান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে রাশিয়ার মাটিতে। এভাবে আফগান যুদ্ধের তলদেশ দিয়ে বিশ্বব্যাপী জেহাদের পতাকা উড্ডীন হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে ইসলামের পুনর্জাগরণ। পৃথিবীর মানুষ ইসলামের পতাকাতলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এসবই নিরস্ত্র আফগান মুজাহিদদের অবদান। এখন মুসলিম উম্মাহ অপেক্ষায় আছে, যেভাবে বর্তমানে আমেরিকার নৈতিক ও চারিত্রিক পতন ঘটেছে তেমনিভাবে তার রাজনৈতিক শক্তিও টুকরো টুকরো হয়ে যাক। মুসলিম উম্মাহ আমেরিকার জানাযা পড়ার অধীর অপেক্ষায় দিন গুনছে।

ইতোপূর্বে আমি আমেরিকার নৈতিক পতনের বিশদ আলোচনা করেছি এবং এর সপক্ষে মার্কিন চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও গবেষকদের সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করেছি। আর এখন নৈতিক পতনের পাশাপাশি তার অর্থনৈতিক পতনেরও সূচনা হয়ে গেছে। আমেরিকার অর্থনীতি পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য, আমেরিকা উপসাগরীয় দেশগুলোর প্রতিরক্ষার জন্য বার্ষিক ত্রিশ থেকে ষাট মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে, যাতে জাপান, ইরান, ইরাক, চীন ও রাশিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, কিন্তু আসল উপকার হচ্ছে জাপানের। জাপান বিদ্যুৎ শিল্পের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আমেরিকাকে বিশ্ব বাজার থেকে বের করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত আমেরিকা ইসরাঈলকে রক্ষার জন্য অঢেল অর্থ ব্যয় করে চলেছে, যাতে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট আমেরিকার স্বার্থের কোনো ক্ষতি না হয়। এই ভিত্তিতে আমেরিকা প্রতিবছর দুই কোটি ডলার ঋণী হচ্ছে। যার অনিবার্য ফল হলো, অর্থনৈতিক ময়দানেও আমেরিকার পতন অবশ্যম্ভাবী। পল কেনেডি ১৯৮৭ সালে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যার শিরোনাম ছিল 'পরাশক্তিগুলোর উত্থান-পতন'। উক্ত গ্রন্থে লেখক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, চলমান শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকার পতন ঘটবে. যার সূচনা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্ব থেকে।

লেখক বলেন, যত বেশি আমেরিকা তার সামরিক বাহিনী ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য অর্থ ব্যয় করছে, তত বেশি তার অর্থনৈতিক শক্তি দুর্বল হচ্ছে। আমেরিকার এই ভারসাম্যহীন পলিসির ফলে ক্রমশ: বিনিয়োগ কমছে, অর্থনীতির সূচক নিম্নগামী হচ্ছে এবং সাধারণ জনগণের ওপর ট্যাক্সের বোঝা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রবৃদ্ধি ঘটবে। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আমেরিকা একুশ শতকে তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। আন্তর্জাতিক বাজারে আমেরিকার বাণিজ্যিক ভারসাম্য ত্রিশ শতাংশ কমে গেছে। স্থানীয় বাজারেও জাপানের কারণে তাকে পিছু হটতে হয়েছে। জাপান বিদ্যুৎ ও ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জামাদি, মেশিনারিজ এবং রঙিন টিভির মার্কিন বাজার দখল করে নিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে দশ শতাংশ থেকে পঁচিশ শতাংশ এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে নব্বই শতাংশ মার্কিন বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলোকে দেখুন। ১৯৮৭ সালে আমেরিকায় আন্তর্জাতিক কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৩৪টি আর জাপানে ছিল ৫৩টি। আমেরিকার একশটি ব্যাংক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করছিল, এখন তাতে হ্রাস পেয়েছে আর জাপানের রয়েছে আঠাশটি ব্যাংক, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করছে। তৃতীয় নম্বরে জার্মানী, তার রয়েছে এগারটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক। আমেরিকার বর্তমান পরিস্থিতি দেখে সেখানকার এক গ্রুপের বক্তব্য হলো, আমেরিকাকে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যাপারে ভয় করলে চলবে না, যাতে আন্তর্জাতিক বাজার তার দখলে থাকে। দ্বিতীয় গ্রুপের বক্তব্য হলো, বাইরের দিকে বেশি মনোনিবেশ না করে আমেরিকাকে সর্বাগ্রে তার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সামাল দেয়া প্রয়োজন। এই গ্রুপ আরো বলছে, অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার প্রকৃত নাগরিকরা সংখ্যালঘুতে আর অভিবাসীরা ক্রমেই সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হবে।

এজন্য এখন থেকেই বাইরের লোকদের আমেরিকায় আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত। বিশেষ করে আরব ও মুসলমানদের, যাদের সংখ্যা খুব দ্রুত বাড়ছে। তাদের কারণে মার্কিন ভূ-খন্ডে সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। চতুর্দিক থেকে আমেরিকা বিপদের মুখোমুখি। আমেরিকাতে ক্রমেই আয়ের তুলনায় ব্যয় বাড়ছে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন। ইহুদীরা বলছে, আরব ও মুসলমানরা আমেরিকার জন্য বিপজ্জনক। আগামীতে যে দ্বন্দ্ব হবে তা হবে সভ্যতার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে মুসলমানরা চীনের মিত্র হবে, যাতে আমেরিকাকে পরাস্ত করা যায়। আরেক গ্রুপের বক্তব্য হলো, তৃতীয় বিশ্বের সাথে আমাদের কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নেই। তাই তাদের নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো উচিত নয়। আমরা কেন ইসরাঈলের জন্য এত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছি।

সামরিক, অর্থনৈতিক সাহায্য ছাড়াও বিনা কারণে ইসরাঈলকে কোটি কোটি ডলার সাহায্য দেয়া হচ্ছে। ছোট একটি দেশের জন্য ডজনের পর ডজন দেশকে অসন্তুষ্ট করা হচ্ছে। ফলে ক্রমাগত আমেরিকার শত্রু বাড়ছে। একথাগুলো ২০০০ সালে লেখা হয়েছিল। আজ থেকে সাত বছর পর আমেরিকা আফগানিস্তান ও ইরাকের ওপর সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে পৃথিবীর বিরাট একটি অংশকে শত্রু বনিয়ে ফেলেছে। ফলে অনেক পশ্চিমা দেশও আমেরিকাকে ঘৃণা করছে। এতে সন্দেহ নেই, এসব কিছু আমেরিকার জুলুম-নির্যাতন ও মানবতার প্রতি বিদ্বেষের ফল। এতেও কোনো সন্দেহ নেই, পরাশক্তি আমেরিকাকে জিরোশক্তি বানানোর জন্য ইহুদীরা উঠে পড়ে লেগেছে। এক কথায়, পাশ্চাত্য তথা আমেরিকার পতন অনিবার্য। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের খুব কাছাকাছি। তার পথ চলা একেবারেই শেষ প্রান্তে।

www.pathagar.com

প্রমাণপঞ্জী

গ্রন্থাবলী

০১. আল আদাবুল আরাবী আল হাদীস- আদ দুসূতীকৃ

০২. আত তাবশীর ওয়াল ইস্তে'মার- ওমর ফররুখ

০৩. আল ই'লামুল খালিজী- মুহাম্মদ আলী আল আবিনী কৃত

০৪. আল ই'লামুল ইসলামী ওয়াল আলাকাতুল ইনসানিয়্যাহ-
নদওয়াতুশ শাবাব আল ইসলামী, রিয়াদ কর্তৃক সংকলিত

০৫. আল ই'লামুদ-দুওয়ালী

০৬. আল ই'লামুস সৌদি

০৭. আত তিলফিফিয়্যুন ফি দুওয়ালিল খালীজ

০৮. আল ই'লাম ওয়াল বাইতিল মুসলিম-ফাহমী তায়্যেব আন নাজ্জার কৃত

০৯. মিন খাসায়িসিল ই'লাম আল ইসলামী-মুহাম্মদ খায়ের রমযান ইউসুফ কৃত

১০. উসূলুল ই'লাম আল ইসলামী-ইবরাহীম ইমাম কৃত

১১. উসূলুল ই'লাম আল ইসলামী ওয়া আসাসুহু-
সাইয়েদ মুহাম্মদ সাদাতী কৃত

১২. আল ই'লামুল ইসলামী ওয়া তাতবীকাতুল ইলমিয়্যাহ-
মুহিউদ্দীন আবদুল হালীম কৃত

১৩. আল ই'লাম ফি সদরিল ইসলাম-আবদুল লতীফ হামযা কৃত

১৪. আল ই'লাম ওয়াদ দিআ'য়া-মুহাম্মদ মুনীর হিজাব কৃত

১৫. আল ইসলাম ফি ওয়াজহিত তাগরীব-আনওয়ার আল জুনদী কৃত

১৬. দাম্মিরুল ইসলাম ওয়া আবীদূ আহলাহু-জালালুল আলম কৃত

১৭. ইলা আইনা ইয়াত্তাজিহু ই'লামুনাল ইসলামী আল মুআসির-
আল মুস্তাশার আলী জারীশা কৃত

১৮. খাসায়িসুল ই'লামুল ইসলামী-আলী জারীশা কৃত

www.pathagar.com

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

০১. দৈনিক আল আহরাম, কায়রো (আরবী)
০২. দৈনিক আল আখবার, কায়রো (আরবী)
০৩. দৈনিক আশ-শারকুল আওসাত, জেদ্দা (আরবী)
০৪. দৈনিক আল ক্বাব্স, কুয়েত (আরবী)
০৫. দৈনিক আস সিয়াসাহ্, কুয়েত (আরবী)
০৬. দৈনিক আর-রাইয়ুল আম, কুয়েত (আরবী)
০৭. দৈনিক আশ–শারূক, দোহা, কাতার (আরবী
০৮. দৈনিক উকায, রিয়াদ (আরবী)
০৯. দৈনিক কওমী আওয়াজ, লাখনৌ (উর্দূ)
১০. দৈনিক টাইমস অফ ইন্ডিয়া, লাখনৌ (ইংরেজী)
১১. দৈনিক ইন্ডিয়া টুডে, দিল্লী (ইংরেজী)
১২. মাসিক আল বা'ছুল ইসলামী, লাখনৌ (আরবী)
১৩. মাসিক আল ইযাআ' ওয়াত তিলফিযিয়্যিন, কায়রো (আরবী)
১৪. মাসিক আদ দওয়াহ্, রিয়াদ (আরবী)
১৫. মাসিক আল মুখতারুল ইসলামী, কায়রো (আরবী)
১৬. মাসিক আল ই'তিসাম, কায়রো (আরবী)
১৭. মাসিক আদ দওয়াহ্, লন্ডন (আরবী)
১৮. মাসিক আফকারে মিল্লী, দিল্লী (উর্দূ)
১৯. পাক্ষিক তা'মীরে হায়াত, লাখনৌ (উর্দূ)
২০. পাক্ষিক আর রা'য়িদ, লাখনৌ (আরবী)
২১. সাপ্তাহিক রোজ আল ইউসূফ, কায়রো (আরবী)
২২. সাপ্তাহিক আখিরু ছাআ', কায়রো (আরবী)
২৩. সাপ্তাহিক আশ-শাবকা, বৈরুত (আরবী)
২৪. সাপ্তাহিক আস সাইয়াদ, বৈরুত (আরবী)
২৫. সাপ্তাহিক সাইয়্যিদাতী, লন্ডন (আরবী)

www.pathagar.com

অনুবাদকের গ্রন্থাবলী

প্রকাশিত

০১. পশ্চিমা মিডিয়ার স্বরূপ

০২. বিশ্বায়ন : সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্র্যাটেজী

০৩. দীনি দাওয়াত : পথ ও পদ্ধতি

০৪. দি রেফারেন্স বুক অব সাহাবা

০৫. সংক্ষিপ্ত মুনাজাতে মকবূল ও কুরআনী চিকিৎসা

০৬. হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ খান (র.) : জীবন ও কর্ম

০৭. মাহে রমাযান : অর্জনের এই তো সময়

০৮. মুসলিম নারীদের কীর্তিগাঁথা

০৯. পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : টার্গেট মুসলিম উম্মাহ

প্রকাশের অপেক্ষায়

০১. ইসলামের প্রচার-প্রসারে নারীসমাজের অবদান

০২. আহকামে দীন (পাঁচ খণ্ডে)

০৩. কুরআন-হাদীসের আলোকে শিশুর লালন-পালন

০৪. কুরআন-হাদীসের আলোকে আদর্শ মুসলমান

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু কিতাব

* সুন্নাতে রাসূল (স) ও নব বিজ্ঞান– ডা. তারেক মাহমুদ চুগতাঈ ৩৪০
* আলফিয়্যাতুল হাদীস– মাওলানা মানযুর নু'মানী (র) ২০০
* বিষয়ভিত্তিক হাদীস ফয়জুল কালাম– মুফতিয়ে আযম আল্লামা ফয়জুল্লাহ (র) ২০০
* আল ফিকহুল মুয়াসসার– মাওলানা শফিকুর রহমান নদভী (র) ১৪০
* বেহেশতী জেওর মাসায়েল অংশ– মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) ১৪০
* আল কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান– মাওলানা তাকী উসমানী ২০০
* ৪০-এর মু'জিযা– মমতাজ দৌলতানা ২০০
* দাস হয়েও মহামনীষী যাঁরা– মাওলানা সাঈদ আহমদ ২০০
* আরবী প্রতিশব্দ অভিধান– মুহাম্মদ আমিনুল হক ১৫০
* মেশকাত শরীফের পূর্ণাঙ্গ বাংলাব্যাখ্যা গ্রন্থ তাওজীহুল মেশকাত
  – মাওলানা আলমগীর হুসাইন ৩২০
* ৬০০-এর অধিক প্রশ্নোত্তর সম্বলতি সহজ সীরাত– মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) ১০০
* উম্মতের মায়েরা যুগে যুগে– মাওলানা ইসহাক মুলতানী ১৩০
* ভাল ছাত্র হওয়ার আলোকিত পথ– যাকারিয়্যাহ তাহেরপুরী ৬০
* রিয়াদুস্ সালেহীন (১ম ও ২য় খণ্ড)– আল্লামা ইমাম নববী (র) ৩০০
* রিয়াদুস্ সালেহীন (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)– আল্লামা ইমাম নববী (র) ৩০০
* দেখা সাক্ষাতের রীতিনীতি ও সালামের বিধান– মাওলানা মুহাম্মদ রফয়ত কাসেমী ৮০
* হেজাযের তুফান ১ম খণ্ড– এনায়েতুল্লাহ আলতামাস ১৫০
* হেজাযের তুফান ২য় খণ্ড– এনায়েতুল্লাহ আলতামাস ১৬০
* শয়তানের বেহেশ্ত ১ম খণ্ড– এনায়েতুল্লাহ আলতামাস ১৮০
* শয়তানের বেহেশ্ত ২য় খণ্ড– এনায়েতুল্লাহ আলতামাস ১৮০
* প্রেম ও যুদ্ধ– এনায়েতুল্লাহ আলতামাস ১০০
* সহীহ্ কাছাসুল আম্বিয়া (১ — ৪ খণ্ড একত্রে)– তাহের সূরাটী ৩৭০
* মেশকাত শরীফ, আরবী, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ
* বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন (আকাবিরের ছাত্রবেলা) ২৫০
  মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী

www.pathagar.com

দুটি কথা...............

কমিউনিজমের পতনের পর বর্তমানে পাশ্চাত্যের প্রধান প্রতিপক্ষ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ। পাশ্চাত্য ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে নির্মূল করার জন্য শুরু করেছে নতুন ক্রুসেড, যার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে কথিত সন্ত্রাসী হামলার নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্য দিয়ে। এটিকে অজুহাত বানিয়ে তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে আফগানিস্তানকে। রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়া হয়েছে ইরাকে। না জানি কতদিন চলবে মুসলিম দেশ জবরদখলের এ ধারা। আর এ ক্রুসেডে তাদের অগ্রসেনানী হলো বিশ্ববিস্তৃত ইহুদী নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমা মিডিয়া নেটওয়ার্ক।

বর্তমান যুগ মিডিয়ার যুগ। এ মিডিয়া মানবতার কল্যাণে যেখানে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারতো, সেক্ষেত্রে এটির ভূমিকা এখন 'মিডিয়া সন্ত্রাস' অভিধায় আখ্যায়িত। সমরাস্ত্র ও সেনাবাহিনীর দ্বারা মানুষ হত্যার যে কাজ হতো না, মিডিয়া মানবতা হত্যায় এ যুগে তার চাইতে বেশি ভূমিকা পালন করছে। মিডিয়ার মাধ্যমে ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে অগণিত মানুষ হত্যার। এটাকে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক লড়াই বা আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার লড়াই যে নামেই আমরা আখ্যায়িত করি না কেন, মহান আল্লাহ কর্তৃক 'মাগদূব আলাইহিম' খ্যাতদের কূটবুদ্ধি নিঃসৃত মিডিয়ার এই অপপ্রয়োগ ও সন্ত্রাসী ভূমিকা গোটা মানব গোষ্ঠীর জন্যে এক মস্তবড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি বিরাট বাধার প্রাচীর হয়ে দণ্ডায়মান এখন বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ মিডিয়ার এই মানবতাবিরোধী ভূমিকা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। অন্ততঃ এর প্রতিরোধে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে শান্তিকামী মানুষদের অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। মানবতার দুশমনরা এ যুগে মানুষকে শারীরিকভাবে গোলাম বানানোর পরিবর্তে মেধা-মনন ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাদের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করতে অধিক তৎপর। আর মনস্তাত্ত্বিক দাসত্ব শারীরিক দাসত্বের চেয়েও অনেক বেশি ভয়াবহ। মেধা-মনন ও চিন্তা-চেতনাকে বিষাক্ত করার সবচে' শক্তিশালী কার্যকর অস্ত্র হলো এই মিডিয়া। এক হিসাবে মিডিয়ার শক্তি আণবিক শক্তির চেয়েও অধিক ভয়াবহ। মিডিয়া কোটি কোটি মানুষের মেধা-মনন ও চিন্তা-চেতনাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই ঘোরাতে পারে, যা মারণাস্ত্রও পারে না।

পাশ্চাত্য ভালকরেই জানে, যদি বিশ্বব্যাপী তাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আধিপত্য ধরে রাখতে হয় এবং গোটা বিশ্বকে বস্তুবাদী ও ভোগবাদীকরণ করতে হয়, তাহলে তাদের জীবনদর্শন ও জীবনাদর্শকে তাদের অনুসরণীয় বানাতে হবে। এই ফাঁদ পেতে মানুষের বিবেক স্বীয় প্রভাববলয়ে নিয়ে আসতে হবে। মানুষের চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার ওপরই প্রথম হামলা চালাতে হবে। এ দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের সবচে' মোক্ষম অস্ত্র হলো মিডিয়া-প্রচার মাধ্যম। আর সে লক্ষ্যেই বিশ্বব্যাপী চলছে পশ্চিমা মিডিয়ার সন্ত্রাসী তাণ্ডব। বর্তমানে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে ক্রুসেড যুদ্ধ চলছে এবং পাশ্চাত্য জগত মুসলমানদের পাইকারীভাবে খুন করার যেসব পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তার সর্বশেষ বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে করা হয়েছে। একটি ভূমিকা ও দশটি অধ্যায়ের বিশাল পরিসরজুড়ে সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি, বিশ্বব্যাপী পশ্চিমা মিডিয়ার ভয়াবহ ধ্বংসলীলা এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে চলমান ক্রুসেড সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও চুলচেরা বিশ্লেষণ এতে করা হয়েছে। ইসলাম, মুসলমান এমনকি গোটা মানবতাবিরোধী পশ্চিমা এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগতি ও তার হাত থেকে মানবতাকে রক্ষায় আধুনিক তারুণ্যে নতুন চেতনা, নতুন জাগৃতির সৃষ্টি হোক, এটাই সময়ের একমাত্র দাবী।

ডিজাইন, সালসাবীল, মোবা : ০১৭১১-২৬৬৮৪৫